শ্রীমদ্ভাগবত

পরিচয় ও আলোচনা

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, দীনবন্ধু কলেজ, শিবপুর
ও
শ্রীপ্রণতি সান্ন্যাল
শিক্ষয়িত্রী, কুমার আশুতোষ বালিকা বিদ্যালয়, দমদম্

... ...

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, দীনবন্ধু কলেজ, শিবপুর
কর্ত্তৃক
পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত

মূল্য ৬-৫০

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ
তখনো হে নাথ প্রণমি তোমায়
গাহি বসে তব গান।

অন্তরযামী ক্ষম সে আমার
শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন
ভক্তিবিহীন তান,

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ॥

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমদ্‌ভাগবত

পরিচয় ও আলোচনা

উৎসর্গ লিপি

পরম পূজ্যপাদ পরম ভাগবত শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়
পূজ্যপাদেষু

বাবাজী মহাশয়,

আজ ৯ই নভেম্বর, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ, সন্ধ্যা ৫-৫০ মিনিটের সময় বরাহনগর গঙ্গাতীরে "পাঠবাড়ি" নামক ধর্ম্মমন্দিরে আমি ও আমার অধ্যাপক-বন্ধু শ্রীবিনয়কুমার চৌধুরী আপনার শয়নকক্ষে যাইয়া আপনার অতি সন্নিকটে শ্রীচরণপ্রান্তে বসিয়াছিলাম। নবদ্বীপ-নিবাসিনী পুণ্যস্মৃতি শ্রীললিতা সখীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুকণ্ঠ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত মন্দির-প্রাঙ্গণে পরিচয় হইয়াছিল, তিনিও আপনার নিকটে যাইয়া বসিলেন;—আমরা দুই বন্ধু আপনার দক্ষিণ দিকে, দীনেশবাবু বামদিকে উপবিষ্ট। শান্ত পরিবেশ, প্রশান্ত আপনার দৃষ্টি, আমার নিজের মন একাগ্র ও আপনার প্রতি নিবদ্ধ। আমি নিবেদন করিলাম যে, শ্রীভাগবত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছি, সেই গ্রন্থ জনসমাজে প্রকাশিত করিবার জন্য আপনার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। তখন আমার মনে হইল যেন মুহূর্ত্তের জন্য আপনার করধৃত জপমালা স্থির হইয়া যাইল, আমি আপনার চক্ষুতারকার দিকে চাহিয়া আছি, কিন্তু আপনার দৃষ্টি কোথায় রহিয়াছে বুঝিতে পারিলাম না;—অবশেষে আপনি সেই নিস্তব্ধ কক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"**তাঁর ইচ্ছা হয়েছে, তিনি আপনাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন।**" আমার প্রার্থনা এবং আপনার আশীর্ব্বাদের মধ্যে হয়ত ক্ষণকালমাত্র ব্যবধান, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তটুকু আমার মনে যেন বহুযুগের পুঞ্জীভূত আনন্দ আনিয়া দিয়াছিল। আমি আবার আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম।

বসিয়া আছি, একজন বৈষ্ণব "চরিতসুধা" পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন,—সেই শান্ত পরিবেশে, জনবিরল কক্ষে আপনার শ্রীগুরুদেব পরমবৈষ্ণব শ্রীশ্রীচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের কথামৃত আমরা সকলে শ্রবণ করিতে লাগিলাম। পাঠ হইতেছিল আপনার শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী মহাশয়ের কথোপকথন। আপনার করধৃত জপমালা সময় সময় ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, স্থির সমাহিত দৃষ্টি, মধ্যে মধ্যে শরীরে পুলক ও শিহরণ লক্ষ্য করিতেছি, আপনার মুখ বহুজন্মের আনন্দ ও সাধনায় সমুজ্জ্বল। বৈষ্ণব পাঠ করিলেন আপনার শ্রীগুরুদেবের কথা —"মানুষ সব জীবের মধ্যে নিকৃষ্ট।" আপনার শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত এই বিস্ময়কর কথাগুলির বিশদ ব্যাখ্যাও বৈষ্ণব মহাশয় পাঠ করিলেন। আপনি মধ্যে মধ্যে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, আর এক একবার আমার মুখের দিকে চাহিতেছেন। আমি আপনার সেই কৃপাদৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিলাম, হৃদয়ে সেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম।

সন্ধ্যারতির সময় হইল। বৃহৎ চত্বর অতিক্রম করিয়া দেবমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিনয়বাবু, দীনেশবাবু ও আমি আরতি দেখিতে লাগিলাম। দূরে আপনার শয়নকক্ষের দ্বারদেশে আপনাকে দেখা যাইতেছে, আপনি দরজার সম্মুখে নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া দেবদেবীর আরতি দর্শন করিতেছেন। আমার মন বিক্ষিপ্ত,—একবার আরতি দেখিতেছি, আবার একবার দূরে নিশ্চল বৈষ্ণবমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি!

আরতি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ মনে হইল, আমার শ্রীভাগবত গ্রন্থ শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়কে উৎসর্গ করিলে আমার বিষয়ী-জীবনের শেষ কার্য্যটি সার্থক হয়। আবার ভাবিলাম, এখন তো আরতি শেষ হইলে বাড়ি ফিরিব, আর তো বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। আরতি শেষ হইলে প্রাঙ্গণে আসিয়া বিনয়বাবু বলিলেন, 'চলুন, একবার বাবাজী মহাশয়কে প্রণাম করে তাঁর অনুমতি নিয়ে বাড়ি যাই।" আমি

এই অপ্রত্যাশিত সুযোগে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া বিনয়বাবুকে বলিলাম—"আমার শ্রীভাগবত গ্রন্থটি বাবাজী মহাশয়কে উৎসর্গ করিবার বাসনা হইতেছে, তিনি কি অনুমতি দিবেন?" বিনয়বাবু উত্তর দিলেন—"আসুন, দেখা যাক্।" সঙ্গে দীনেশবাবু রহিয়াছেন, বিনয়বাবু তাঁহাকেও আমার প্রার্থনার কথা জানাইলেন। ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া আমরা তিনজন আপনার সাধনকক্ষে উপস্থিত হইলাম—দেখিলাম, আপনি দরজার নিকটেই দাঁড়াইয়া আছেন।

সকলে প্রণাম করিলাম। আপনি একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন। বিনয়বাবু ধীরে ধীরে আমার মনের প্রার্থনা আপনার নিকট নিবেদন করিলেন,—আপনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ, নিচের দিকে চাহিয়া আছেন, দীনেশবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "অনুমতি দিতে হবে।" আপনি মুখ তুলিয়া হাসিলেন—সে হাসি বিষয়বিলাসী মানুষের হাসি নয়, সে অমৃতভোগী দেবতার হাসিও নয়, সে পরিপূর্ণ আনন্দময় বৈষ্ণবের হাসি! আমি তখনই বুঝিলাম, আমাকে কৃপা করিয়াছেন। আপনি হাসিয়া বলিলেন, "আমি ভাগবতের কী বা জানি!" ছাপার অক্ষরে পড়িয়াছিলাম তৃণ হইতেও সুনীচ, অমানী অথচ মানদ বৈষ্ণবের কথা, আজ এই মুহূর্ত্তে ছাপার অক্ষর মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া আমার সম্মুখে প্রতিভাত হইল। অনুমতি পাইলাম, কৃতার্থ হইলাম, আমাকে উপলক্ষ করিয়া বিনয়বাবু ও দীনেশ্বাবু আনন্দিত হইলেন।

অতঃপর আপনি বিনয়বাবু ও আমাকে প্রসাদ দিবার জন্য জনৈক বৈষ্ণবকে আদেশ দিলেন, আবার আপনার অতি সন্নিকটে দক্ষিণদিকে আমরা দুইজনে বসিলাম। পাশের একটি অপ্রশস্ত কক্ষে প্রসাদ দিবার আয়োজন হইতেছে বুঝিলাম—ইতিমধ্যে আপনি দুইবার অনুসন্ধান করিলেন—'কি হল', 'কি হল';—এমনই আপনার অহেতুকী কৃপা! প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আসিয়া পুনরায় আপনাকে দর্শন করিলাম এবং আপনার

শান্তদৃষ্টিবিগলিত নীরব আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম।

উৎসর্গের সঙ্কল্প করিয়া যাই নাই, আপনার দর্শন পাইব কিনা তাহারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ দর্শন পাইলাম, পুনঃ পুনঃ বৈষ্ণব-চক্ষুর অধীন হইলাম, শ্রীভাগবতগ্রন্থ উৎসর্গ করিবার অনুমতি পাইলাম। এই কৃপা আমি কোন সুকৃতির দ্বারা অর্জ্জন করি নাই, ইহা আপনার অহেতুকী কৃপা।

আজ সারাদিন মেঘাচ্ছন্ন, রাত্রি প্রায় ৮-১০ মিনিটের সময় বরাহনগরের অস্পষ্ট রাস্তা ধরিয়া আমরা দুই বন্ধু ফিরিতেছি, ঈষৎ বৃষ্টি পড়িতেছে। আমার মুখে কথা ছিল না, আমার মন তখন সাধুসঙ্গের আস্বাদরসে কানায় কানায় পরিপূর্ণ, একটি কথা বলিবারও ইচ্ছা হইতেছিল না। আমার পাশে তাঁহার মালাজপ করিতে করিতে চলিয়াছেন বিনয়বাবু—বৈষ্ণব বিনয়—যিনি বহুবর্ষ যাবৎ আপনার সহিত সুপরিচিত, যিনি আমার আজিকার বৈষ্ণব দর্শন যাত্রার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কর্ণধার। হঠাৎ বিনয়বাবু বলিলেন—"আপনাকে বাবাজী মহাশয় বুকে স্থান দিয়েছেন।" আমি সেই আলো ও অন্ধকারের ভিতর দিয়া বিনয়বাবুর মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই তিনি পুনরায় বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি।" আমি আর কিছুই বলিলাম না, আমার তখন ভাষা ছিল না।

এই শ্রীভাগবতগ্রন্থ আলোচনায় সহযোগী-গ্রন্থকর্ত্রীরূপে আমার পরম স্নেহাস্পদ ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী শ্রীপ্রণতি সান্যালও আছেন। তিনি আজ আপনার নিকট যাইতে পারেন নাই—তবে নবদ্বীপে তিনি বহুবার আপনাকে দর্শন করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মচারিণী—এখন বয়স মাত্র বাইশ বৎসর। শ্রীবামনদেবের কৃপায় প্রণতি শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব দিবসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—ভাদ্রমাস, শুক্লপক্ষ, দ্বাদশীতিথি, মকররাশি। সেই

কৃপাবলে প্রণতি ভক্তিমতি এবং স্থানে স্থানে নরনারীগণের নিকট শ্রীভাগবত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,—এই পবিত্র ভাগবতীকথা পাঠ ও কীর্ত্তন তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আজ শ্রীপ্রণতি সান্যাল ও আমি আপনার শ্রীচরণে মস্তক অবনত করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

কলিকাতা
৯ই নভেম্বর, ১৯৫২
রবিবার
রাত্রি ১০-৩০

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
....
বৈষ্ণবকৃপা-ভিখারিণী
শ্রীপ্রণতি সান্যাল

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

"শ্রীমদ্‌ভাগবত : পরিচয় ও আলোচনা" যথেষ্ট অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমরা কেন লিখিতে উৎসাহিত হইলাম তাহাই সর্ব্বপ্রথমে নিবেদন করিতেছি। শ্রীভাগবত একটি বিরাট গ্রন্থ—ভাব বা ভাষা সমন্বয়ে মহাভারতের অপেক্ষাও কঠিন। তিনটি জিনিষ একত্র হইলে তবে শ্রীভাগবতের সম্বন্ধে কিছু বলিবার বা লিখিবার অধিকারী হওয়া যায়—অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ধর্ম্মভাবের সম্যক্ অনুভূতি এবং সেই ধর্ম্মানুভূতি নিজ জীবনের প্রতি কার্য্য ও চিন্তায় প্রকাশ। এরূপ লোক সংসারে বিরল ;—যাঁহারা সত্যসত্যই অধিকারী তাঁহারা হয়ত বৃন্দাবনে অথবা হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে বাস করেন, লোকালয়ে আসিয়া পুস্তক লিখিবার বা ছাপাইবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই। প্রশ্ন উঠে যে তাহা হইলে সাধারণ মানুষের এই ভাগবতের সহিত পরিচয় কিরূপে হইবে ?

পূর্ব্ব পূর্ব্ব টীকাকারগণ—শ্রীধরস্বামী মহাশয়, শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি ইঁহারা সকলেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, বিষয়বৈরাগ্য এবং ধর্ম্মতত্ত্বের অনুভূতিও তাঁহাদের ছিল, তথাপি একটি কারণে তাঁহাদের টীকা সাধারণ পাঠকের নিকট দুর্ব্বোধ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাঁহারা যে যুগে টীকা রচনা করিয়াছিলেন সে-যুগে সমাজে দুই শ্রেণীর লোক ছিল—পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত। পণ্ডিতেরা টীকা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতেন, সাধারণে তাহা শ্রবণ করিত। সুতরাং টীকাগুলি সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, এবং অনেক সময় গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে টীকা ইঙ্গিতে বিষয়বস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছে, টীকাকার মহাশয়গণ ধরিয়া লইয়াছেন যে পাঠকও পণ্ডিত, পাঠক বহু-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তবে ভাগবত পাঠ

করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে বর্ত্তমানযুগে যে, সাধারণ শিক্ষিত অনেক লোক এই ভাগবত গ্রন্থ সমাদরে পাঠ করিবেন তাহা টীকাকারগণ দেখিতে পান নাই, এবং তাহার ফলে বর্ত্তমান যুগের অসংখ্য সাধারণ শিক্ষিত ভাগবতরসপিপাসু মানব ভাগবতী অমৃত-কথার আস্বাদন হইতে বঞ্চিত। এখনও যে সনাতন প্রথায় পণ্ডিতগণ ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহা মোটেই যুগোপযোগী নহে। কারণ নিবেদন করিতেছি।

কোন ধর্ম্মসভায় একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা হয়ত দিনের পর দিন চলিতেছে, রসপিপাসু শ্রোতা সেই পাণ্ডিত্য-জালের ভিতর হারাইয়া যাইতেছেন, কয়েকদিন ভাগবত শ্রবণের পর কি মূলবস্তু প্রাপ্ত হইলেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ জটিল ব্যাখ্যার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ অসাধারণ রসামৃত-সাগর জনসাধারণের নিকট আজিও অজ্ঞাত ও অনাস্বাদিত। অথচ এই বাংলাদেশে অসংখ্য নরনারী আছেন যাঁহারা এই ভাগবত-কথামৃত গ্রহণ করিবার জন্য ও আস্বাদন করিবার জন্য আগ্রহশীল। বর্ত্তমানে একমাত্র কলিকাতা নগরেই ক্রমবর্দ্ধমান ধর্ম্মসভা এবং তাহার জনতা লক্ষ্য করিলে বাঙ্গালী শ্রোতার রসপিপাসার আগ্রহ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাই যুগোপযোগী সহজ ও সরল ব্যাখ্যা একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কারণ, এই অসাধারণ ধর্ম্ম-গ্রন্থের বহুল প্রচার হইলে তবেই নিজ সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন বাঙ্গালী-জাতির আত্মসংবিৎ ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা। 'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়ণায়'—কল্যাণের আর অন্য দ্বিতীয় পন্থা নাই। তথাপি অসামান্য প্রতিভা, অসাধারণ ধর্ম্মানুভূতির জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব টীকাকারগণ আমাদের প্রণম্য, তাঁহাদের ব্যাখ্যা চিরদিনের সমাদরের বস্তু, বাঙ্গালী পাঠক কোনদিনই সেই নিত্য-ভাস্বর টীকাসমূহকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবেন না।

সহজ ধর্ম্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ ও প্রকাশ বিষয়ে ইউরোপীয়—বিশেষ করিয়া ইংরাজ পণ্ডিতগণ নিপুণ। তাঁহাদের একটা পক্ষপাতশূন্য সমালোচনা-প্রণালী আছে, যাহার জন্য তাঁহারা যাহা বলিতে চাহেন তাহা সহজ করিয়া বলিতে পারেন, শ্রোতার ব্যাখ্যাগুলিকে নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী অতি সহজেই বুঝিতে পারেন;—সমালোচক ও পাঠকের মধ্যে কোন অস্পষ্টতার ব্যবধান থাকে না। বর্ত্তমান যুগে আমাদিগকে সেই সহজ-প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহার ফলে শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভের পথ সরল ও সুগম হইবে।

এই শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ অনন্ত ভাবরসের উৎস। ভক্ত বৈষ্ণবগণ বলেন যে, এই গ্রন্থ কেবলমাত্র ছাপা অক্ষরসমষ্টি নহে, ইহা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত, তাঁহার 'ইতি' কেহই করিতে পারেন না, তাই শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতি সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে অন্ধগণের হস্তিদর্শনের মত আভাসমাত্র। সুতরাং শ্রীভাগবত সম্বন্ধে শেষ কথা কোন পণ্ডিত, কোন সাধু মুনি ঋষিও বলিতে সমর্থ হন নাই। যতই ব্যাখ্যা করা যাক না কেন, যতই টীকা লিখিত হউক না কেন, তবুও মনে হয় আরো কি বাকি থাকিয়া গেল, কি যেন বলা হইল না। ইহাই শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৈশিষ্ট্য। এই কথা ধ্রুব সত্য, এই সব সত্য মনে রাখিয়া সাধন-ভজন বিহীন, পাণ্ডিত্যের লেশমাত্র বর্জ্জিত হইয়াও আমরা শ্রীভাগবতের পরিচয় ও আলোচনা করিলাম—এই গ্রন্থ শ্রীভাগবতের আভাস মাত্র, আভাসের অধিক আর কিছুই নহে। বহু সন্দেহ ও ভীতি অতিক্রম করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, যাহা লিপিবদ্ধ হইল তাহা শ্রীভাগবত গ্রন্থের দয়া ব্যতীত কখনই সম্ভবপর হইত না;—কোনদিন হয়ত এক ঘণ্টা বসিয়াও আধাপাতা লিখিতে পারি নাই, কোনদিন গ্রন্থের কৃপায় সহজেই ৫।৬ পাতা লেখা হইয়াছে, বুঝিয়াছি "কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়', ;—ইহা কেবলমাত্র শ্রীবৃন্দাবন দাস মহাশয়ের পক্ষে সত্য নহে"—ইহা শুষ্ক বিনয়ের ভাণমাত্র নহে, ইহা সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে ভাগ্যবান্‌

গ্রন্থকারের পক্ষে যেমন সত্য, তেমনই আমাদের মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষেও ধ্রুব সত্য। এই "পরিচয় ও আলোচনা" শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতের জন্য লেখা নহে, অনুভূতিসম্পন্ন বৈষ্ণবের জন্যও নহে ;—ইহা সাধারণ পাঠকের জন্য, আগ্রহশীল সাধারণ লেখকের বস্তু-পরিচয় ও আলোচনা মাত্র। এই 'পরিচয় ও আলোচনার' ক্ষীণ দীপশিখা যতটুকু আলো দিবে, হয়ত তাহার বেশী ছায়ার সৃষ্টি করিবে, তবু আমাদের এই প্রদীপ সাধারণ পাঠকের মনের মন্দিরে নিবেদন করিলাম, এই ক্ষীণকায়া প্রদীপটুকুর ক্ষীণতর আলোককে 'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান' কৃপা করিয়া সার্থক করুন।

এই ভাগবতগ্রন্থের বহুস্থানে ক্রীশ্চান ধর্ম্মগ্রন্থ ও টমাস-আ-কেম্পিস প্রভৃতি ক্রীশ্চান সাধু-সন্ন্যাসীগণের চিন্তাধারার বিস্ময়কর সামঞ্জস্য আছে। ক্রীশ্চানেরা বিগ্রহমূর্ত্তি স্বীকার করেন না, অথচ সাকার অথবা নিরাকার ভগবানের সম্বন্ধে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মানুভূতি সব ধর্ম্মের সাধকগণের মধ্যেই যে এক, তাহা এই ভাবধারার সামঞ্জস্য হইতে প্রমাণিত হইতেছে। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভাবধারার তুলনামূলক আলোচনা রসোপলব্ধি গাঢ়তর হইবার সম্ভাবনা, সেইজন্য আমরা শ্রীভাগবতগ্রন্থ কীর্ত্তন করিবার সময় নানাস্থানে তাহা উল্লেখ করিয়াছি ; কিন্তু গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাহা লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইলাম না।

এই গ্রন্থের রচনাকাল লইয়া পণ্ডিত-সমাজে ঘোরতর মতদ্বৈধ রহিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে শ্রীভাগবতগ্রন্থ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল ; কিন্তু বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে প্রয়াগতীর্থে ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীশুকদেব সর্ব্বপ্রথম এই ভাগবতী কথা মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ লীলাসংবরণ করিয়াছেন প্রায় পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে, সুতরাং বৈষ্ণবপণ্ডিতগণের মতে এই ভাগবতী গ্রন্থ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত। তাহার পর হইতে সহস্র সহস্র ভক্তকণ্ঠে, শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুর লীলাকালে, বৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি মহাতীর্থে, বিষয় বিলাসভূমি কলিকাতা প্রভৃতি মহানগরীতে এই শ্রীভাগবত কীর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে, ভক্তকণ্ঠের সমবেত প্রেরণায় এই শ্রীভাগবতের শ্লোকগুলি মন্ত্রশক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। তাই ভক্তগণ কর্ত্তৃক বহুসমাদৃত বিশিষ্ট শ্লোকগুলি আমরা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিলাম। গ্রন্থের রচনাকাল লইয়া জটিল তর্কজালের অবতারণা করা বৃথা।

ভজনসাধনবিহীন হইয়াও আমরা ভক্তশ্রোতাগণের কৃপায় এই শ্রীভাগবতগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সাধু-সন্ন্যাসীগণের আশ্রমে, গৃহীগণের ধর্ম্মসভায় কীর্ত্তন করিতে উৎসাহিত হইয়াছি, অনেক নরনারী দয়া করিয়া সেই ভাগবতী কথা ধৈর্য্যের সহিত, আনন্দের সহিত শ্রবণ করিয়াছেন। সেই সমস্ত কৃপাশীল শ্রোতাগণের উৎসাহ ব্যতীত এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে, প্রকাশিত করিতে আমরা সাহসী হইতাম না, তাই আজ গ্রন্থ-মুদ্রণের দিনে তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া প্রকাশিত ভাগবতী কৃপার নিকট বারংবার কৃতজ্ঞ মস্তক অবনত করিতেছি।

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী শ্রীমদ্‌স্বামী দেবানন্দ মহারাজ (বর্ত্তমানে শ্রীবলরাম মন্দিরের অধ্যক্ষ), শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনমঠের সভাপতি শ্রীমদ্‌স্বামী সোমেশ্বরানন্দ মহারাজ এবং মথুরাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্‌স্বামী সেবানন্দপুরী মহারাজ নানাবিধ উপায়ে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। শ্রীভাগবত বলেন, যে "সাধবো দীনবৎসলাঃ"—সাধুগণ দীনবৎসল—আমরা সেই ভাগবতী কথার স্বরূপ স্বামীজিগণের ভিতর দিয়া বারংবার উপলব্ধি করিয়াছি। স্বামীজিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ আশ্রমে ভক্তবৃন্দের নিকট এই ভাগবতী কথা কীর্ত্তন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদের গ্রন্থ রচনা-কার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। ইহারা সকলেই পণ্ডিত, সাধন-ভজনশীল এবং ধর্ম্মানুভূতিসম্পন্ন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তথাপি ইহারা অযোগ্য গৃহীর রচিত গ্রন্থ বারংবার শ্রবন করিয়াছেন, ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আনন্দ

প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। এই সাধুগণের সংস্পর্শ, উপদেশ এবং উৎসাহ-প্রদান স্মরণ করিয়া আজ তাঁহাদের শ্রীচরণে ভক্তি সহকারে মস্তক অবনত করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-দর্শনের সুযোগ্য অধ্যাপক ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম. এ. পি-এইচ ডি., মহাশয়ের সাহায্যের কথা আজ স্মরণ করিতেছি। এই গ্রন্থরচনার সময় যখনই ব্যাকরণের কোন প্রশ্ন উঠিয়াছে, টীকাকারগণের জটিল দর্শনতত্ত্ব সমন্বিত টীকার নিগূঢ় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, শ্রীভাগবত রচনার সময় লইয়া সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, তখনই পণ্ডিত জানকীবল্লভের শরণাপন্ন হইয়াছি। তিনি প্রসন্নমুখে, ধৈর্য্যের সহিত সমস্ত বিষয়বস্তু নিজে বুঝিয়া তাহার পর আমাদিগকে তাঁহার অভিমত প্রদান করিয়াছেন। কখনও কখনও তিনি চিন্তা করিবার সময় লইয়াছেন এবং তাড়াতাড়ি একটা যাহা হউক বুঝাইয়া না দিয়া স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া তবে পরদিন আমাদের সন্দেহের নিরসন করিয়া দিয়াছেন। বস্তুসর্ব্বস্ব এই জড়যুগে এইরূপ সতত শাস্ত্রচর্চ্চায় নিযুক্ত, মননশীল জীবনযাপনকারী, আনন্দময় পণ্ডিত মহাশয় পূর্ব্বযুগের দার্শনিক মনীষিগণের কথা আমাদিগকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দিতেন, আজ গ্রন্থপ্রকাশের দিনে তাঁহার নিকট গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী দম্‌দম্‌ নিবাসিনী শ্রীগৌরী সেন আমাদের এই গ্রন্থের সুদীর্ঘ পাণ্ডুলিপি ছাপাখানার জন্য আগাগোড়া লিখিয়া দিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার মুক্তার মত উজ্জ্বল এবং সুস্পষ্ট অক্ষরগুলি ছাপা হইবার পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগের মনে গ্রন্থের একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। বিশেষতঃ তিনি পাণ্ডুলিপি লিখিবার সময় স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিয়াছেন, কোথাও অস্পষ্ট ভাষাকে সুস্পষ্ট করিতে বলিয়াছেন, কোথাও বা প্রশংসা করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তরুণ বয়সে তিনি যে পূর্বজন্ম সংস্কার প্রসূত তত্ত্বানুভূতি সময় সময় প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীকালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "স্মৃতিকথা" "শ্রীরামকৃষ্ণঃ জীবন ও সাধনা" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের সময় যেমন অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, নানাবিধ উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক অনুরূপ সহানুভূতি প্রকাশ ও সাহায্য প্রদান করিয়া আমাদিগের চির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি বন্ধুবৎসল, আত্মীয় প্রতিপালক এবং বুদ্ধিমান্ অথচ বিনয়ী। তাঁহার সহিত প্রীতির সম্বন্ধ আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাঁহার মত লোককে ধন্যবাদ দেওয়া নিরর্থক,—তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার মত আদর্শ সংসারী লোকগণের নিকট শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

দশমবর্ষীয় বালক শ্রীনিমাই চরণ দাস এই ধর্ম্মগ্রন্থের প্রুফ লইয়া দিনের পর দিন ছাপাখানায় যাতায়াত করিয়াছে। ক্ষুদ্রাকার বালক কলিকাতার যানবাহনসঙ্কুল রাজপথ দিয়া পরম উৎসাহ সহকারে ছাপাখানায় গিয়াছে ফাইল কপি আনিয়াছে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ বহন করিয়াছে। আজ গ্রন্থপ্রকাশের দিনে বালক নিমাইকে প্রীতি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যদি "শ্রীমদ্‌ভাগবতঃ পরিচয় ও আলোচনা" পাঠ করিয়া বাঙ্গালী কোন পাঠকের মনে বৃহত্তর পটভূমিকায় ভাগবতী কথা জানিবার জন্য কৌতুহল উপস্থিত হয় তাহা হইলে আমাদের সমস্ত দোষত্রুটি, অক্ষমতা

এবং সাধনভজনহীনতা সত্ত্বেও এই গ্রন্থরচনা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। নিবেদন ইতি।

দোল-পূর্ণিমা, ১৩৫৯
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩
কলিকাতা।

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপ্রণতি সান্ন্যাল

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশকের নিবেদন

প্রায় দুই বৎসরাধিক কাল **শ্রীমদ্ভাগবত—পরিচয় ও আলোচনা** নিঃশেষ হইলেও নানা কারণে এই পুস্তক প্রকাশন সম্ভব হয় নাই। যাঁহার কৃপায় পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় সেই পরম কারুণিক জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এবং ভাগবত-রত্ন, পণ্ডিতপ্রবর, আচার্য্য শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল।

শব্দ নির্বাচনে, ঘটনা বিন্যাসে ও ভাবব্যঞ্জনায় শ্রদ্ধেয় আচার্য্যদেবের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ আছে এবং এই কারণে গভীর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থও তাঁহার যাদুকরী লেখনীর স্পর্শে উপন্যাসের ন্যায় হৃদয়গ্রাহী ও সুখপাঠ্য হয়। তাঁহার রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও সাধনা' 'শ্রীশ্রীযীশুখৃষ্ট-জীবন ও আলোচনা' ইত্যাদি পাঠক সমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথজী ও বেলুর মঠের মুখপত্র 'উদ্বোধন' ও অন্যান্য ভক্ত গৃহী ও সন্ন্যাসীগণ এই পুস্তকের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছিলেন—কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই উৎসাহবাণী স্মরণ রাখিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হইল। আশা করি, কি ধর্ম্মপিপাসু কি সাধারণ পাঠক এই পুস্তক পাঠে তৃপ্তি, আনন্দ ও শান্তি লাভ করিবেন।

পুস্তকের আয়তন, কাগজের মূল্য ইত্যাদি বিবেচনায় সামান্য মূল্যবৃদ্ধি আশা করি মার্জ্জনীয়। ইতি—

৺শ্রীপঞ্চমী—
১৮ই মাঘ, ১৩৬৬
১৫নং বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলিকাতা-৯

দীন সেবক
শ্রীকমলকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

একাদশ স্কন্ধ

দ্বাদশ স্কন্ধ

শ্রীমদ্‌ভাগবত

পরিচয় ও আলোচনা

—০:*:০—

পরিচয়

(১)

শ্রীব্যাসদেবরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবত বৈষ্ণবগণের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ—অপর যে সকল ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ বৈষ্ণবগণ সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীভাগবতের স্থান ও সমাদর সকলের উর্দ্ধে। অথচ এই গ্রন্থে যে সমস্ত উদার এবং বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব নিহিত আছে তাহা কেবল বৈষ্ণব-মতাবলম্বী ভক্তের জন্য নহে,—ইহাতে জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, কর্ম্মী ও গৃহী সকলেই নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিবেন। কিন্তু এই গ্রন্থ শ্রীব্যাসদেব-রচিত মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদি অপেক্ষা ভাষা ও ভাব-সমন্বয়ে কঠিন। শ্রীভাগবত কামধেনু তুল্য—যিনি যাহা উদ্দেশ্য করিয়া দোহন করিবেন তিনি তাহাই পাইবেন। দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, অচিন্ত্য ভেদাভেদ—আরও কত অভিমতের অনুকূল শ্লোক এই গ্রন্থে রহিয়াছে। কিন্তু আমি যে মতটি খুঁজিতেছি তাহাই আছে, অন্য কিছুই নাই—এই 'মতুয়ার বুদ্ধি' বর্জ্জন না করিলে

সমস্তই ঘোলাটে হইয়া যাইবে। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ দ্বাদশটি স্কন্ধে বিস্তৃত—শ্লোক-সংখ্যাও ১৪১০৩। অসংখ্য টীকার মধ্যে শ্রীধর স্বামিকৃত ভাবার্থ-দীপিকা, শ্রীজীব গোস্বামী কৃত ক্রম-সন্দর্ভ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃত সারার্থ-দর্শিনী টীকা বাংলাদেশে পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত; কিন্তু এই সমস্ত টীকাই অসাধারণ পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত; সুতরাং সাধারণ বাঙ্গালীর সহজবোধ্য নহে। অথচ অসংখ্য ভক্তিপিপাসু বাঙ্গালী আছেন, যাঁহারা পাণ্ডিত্যের দুর্গম পথ পরিহার করিয়া ভাগবতের সারকথা জানিবার জন্য সমুৎসুক।

শ্রীভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের মানুষ-লীলা। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলা প্রধানতঃ দশম স্কন্ধে বর্ণিত হইলেও সমগ্র শ্রীভাগবত কৃষ্ণলীলা-রসে ওতপ্রোতভাবে আপ্লুত। শ্রীকৃষ্ণ মানব-শিশুরূপে মথুরায় জন্মগ্রহণ করিলেন, গোকুলে ও বৃন্দাবনে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া মথুরায় যাইয়া কংসনিধন করিলেন, দ্বারকায় রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রজাপালন করিলেন, এবং অবশেষে লীলা সংবরণ করিয়া তাঁহার নিত্যধামে গমন করিলেন। ইহাই ভাগবতের মূলকথা।

ব্যাসদেব শ্রীভাগবত রচনা করিলেন কেন? দ্বাপর যুগে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর (অপর নাম যোজনগন্ধা) গর্ভে ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যাসদেবের পূর্ণনাম "শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস"। যমুনা নদীর দ্বীপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য তিনি দ্বৈপায়ন। এক বেদকে তিনি চারিভাগে বিভক্ত করেন, তাই তিনি ব্যাস। তিনি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম "কৃষ্ণ"। তাঁহার পিঙ্গলবর্ণ দাড়ি, বৃহৎ জটাভার ও প্রদীপ্ত চক্ষুদ্বয় ছিল। তাঁহার দেহ হইতে একটা তীব্র গন্ধও চারিদিকে বিকীর্ণ হইত। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস মানবজাতির কল্যাণের জন্য মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদি রচনা করিয়া মনের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না,—যেন কি বলা হইল না, যেন কি অসম্পূর্ণ থাকিয়া

গেল। একদিন প্রভাতকালে সরস্বতী নদীর জলে স্নান করিয়া ব্যাসদেব তাঁহার আশ্রমে একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেবের মনের বিমর্ষ অবস্থা তাঁহার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া নারদ ব্যাসদেবকে "উত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্"—অর্থাৎ শ্রীহরির গুণ ও লীলা বর্ণন করিতে উপদেশ দিলেন,—কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তিতেই তপস্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্র, জ্ঞান ও দানের একমাত্র পরিণতি। এই উপদেশের প্রত্যক্ষ সার্থকতা দেখাইবার জন্য নারদ ব্যাসদেবের নিকট স্বীয় পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

শ্রীনারদ বলিলেন যে কোনও এক পূর্ব্ব জন্মে তিনি ঋষিগণের এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ষাকালে ব্রতোপলক্ষে আগত কয়েকজন ঋষির সেবাকার্য্যে পঞ্চমবর্ষীয় দাসীপুত্র নারদ নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিলেন এবং তাঁহাদের পরস্পর কীর্ত্তিত শ্রীহরি-কথা শ্রবণ করিলেন। ভক্তের উচ্ছিষ্ট ভোজনের ফলে তাঁহার জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পাপরাশি বিদূরিত হইল, এবং তাহার পর হরিকথা শ্রবণের ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। ঋষিগণ চারিমাস সেখানে বাস করিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহাদিগের ত্রিসন্ধ্যায় কীর্ত্তিত হরিকথা শুনিয়া নারদের রজোগুণ ও তমোগুণ দূরীভূত হইলে, "দীনবৎসলাঃ" ঋষিগণ চলিয়া যাইবার সময় "কৃপয়া" (কৃপা করিয়া) নারদকে গোপনীয় হরিলীলা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

দিন চলিতে লাগিল। ঋষিপ্রদিষ্ট অমোঘ পথ অবলম্বন করিয়া নারদ মুক্তির আশায় বসিয়া আছেন, কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয় বালক পরাধীন এবং মাতার স্নেহবন্ধনও বড়ই কঠোর। "একাত্মজা মে জননী যোষিন্মূঢ়া চ কিঙ্করী"—অর্থাৎ আমি মাতার একমাত্র সন্তান, মাতা অবলা এবং

দাসী,—সুতরাং মাতার সমস্ত মোহগ্রস্তা শক্তি নারদকে স্নেহের বন্ধনে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখিল। অপেক্ষা করিয়া আছেন,—সুযোগ আসিল। একদিন রাত্রিকালে গো-দোহনের জন্য দাসী গৃহের বাহিরে যাইলে সর্প-দংশনে তাহার মৃত্যু হইল। নারদ বলিলেন,

তদা তদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ
অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাম্ ॥১।৬।১০

—অর্থাৎ মাতৃবিয়োগকে আমি ভক্তগণের কল্যাণ কামনাকারী শ্রীভগবানের অনুগ্রহ মনে করিয়া উত্তরদিকে গমন করিতে লাগিলাম।

উত্তর দিকে দেব-ঋষিবিরাজিত হিমালয় পর্ব্বত রহিয়াছে বলিয়া শ্রীভাগবতে দেখা যায় যে সাধু ও সাধকগণ উত্তর দিকে প্রস্থান করিতেছেন।

পঞ্চবর্ষীয় অসহায় বালক একমাত্র পরমাত্মীয় মাতার মৃত্যুকে শ্রীহরির অনুগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। ভক্ত ও ভগবানের কী বিচিত্র সম্বন্ধ! গহন বন, হিংস্র জন্তু, পথশ্রম, ক্ষুৎপিপাসা অগ্রাহ্য করিয়া নারদ চলিয়াছেন—কোথায় চলিয়াছেন? নারদ তাহা জানেন না, জানিতে চাহেন না, শুধু জানেন,

পথ আমারে সেই দেখাবে
যে আমারে চায়।

অবশেষে পরিশ্রান্ত নারদ এক অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিলেন, আদেশ পাইলেন এবং দেহত্যাগ করিয়া নূতন নিত্যশরীর ধারণ করিলেন। ভগবদ্‌গুণ ও লীলা স্মরণ ও কীর্ত্তনের প্রত্যক্ষ ফল নিজের পূর্ব্ব জীবনের ইতিহাসে বর্ণনা করিয়া নারদ বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্যাসদেব সমাধিলব্ধ শ্রীভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় পুত্র শ্রীশুকদেবকে তাহা অধ্যয়ন করাইলেন।

এই শুকদেবের জীবন-কাহিনী অতীব বিচিত্র। সংসারের স্পর্শে মায়াবিষ্ট হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় শুকদেব মাতৃগর্ভ হইতে কিছুতেই ভূমিষ্ঠ হইলেন না—মাতৃগর্ভে ষোড়শ বর্ষ কাটিয়া গেল। গর্ভভার নিপীড়িতা মাতার অবস্থা দর্শন করিয়া ব্যাসদেব গর্ভস্থ শিশুকে ভূমিষ্ঠ হইতে আদেশ করিলে শিশু পিতার নিকট বর প্রার্থনা করিলেন—যেন এই সংসারের মায়া তাঁহাকে বিমোহিত করিতে না পারে। ব্যাসদেব স্বীকৃত হইলে শুকদেব মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া কঠোর বৈরাগ্যবশতঃ তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট গতিতে গমন করিতে লাগিলেন, ব্যাসদেব তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পশ্চাতে অনুসরণ করিলেন। এক জলাশয়ে অপ্সরাগণ নগ্নদেহে স্নান করিতেছিল। উলঙ্গ ষোড়শবর্ষীয় শুকদেব সেই জলাশয়ের তীরভূমি দিয়া গমন করিলেন, যুবতীগণের স্নানকার্য্যে কোনও ব্যাঘাতের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইল না। পুত্রকে অনুসরণ-কারী মহাভারত ও পুরাণাদি রচয়িতা বৃদ্ধ ব্যাসদেব যখন সেই জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন যুবতীগণ দেহের লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ ব্যাসদেব বিস্মিত হইলেন—যুবক শুকদেবকে দেখিয়া রমণীগণ লজ্জা প্রকাশ করিল না, অথচ বৃদ্ধ ব্যাসদেবকে দেখিয়া স্ত্রী-সুলভ লজ্জা প্রদর্শন করিতেছে। রমণীগণ ব্যাসদেবের কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া উত্তর দিল যে শুকদেব ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা, তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান নাই। সুতরাং তাঁহার সম্মুখে নারীগণের লজ্জাবুদ্ধি আসে নাই। কিন্তু মহাভারতরচয়িতা বৃদ্ধ ব্যাসদেব স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ সম্বন্ধে তখনও সম্পূর্ণ সচেতন; সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া নারীগণ বস্ত্রসংবরণ করিয়াছিল। ব্যাসদেব লজ্জিত হইলেন। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী চিন্ময় শুকদেবকে পিতা ব্যাসদেব পরম যত্নসহকারে শ্রীভাগবত অধ্যয়ন করাইলেন।

এদিকে দ্বাপরের শেষে রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ পরীক্ষিৎ হস্তিনাপুরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। একদিন মৃগয়া করিতে বাহির হইয়া ক্ষুৎ-পিপাসা প্রপীড়িত মহারাজ পরীক্ষিৎ শমীক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঋষি তখন ধ্যানস্থ। পিপাসার জল প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হওয়ায় মহারাজের মনে যুগপৎ ক্রোধ ও অভিমানের উদয় হইল, তিনি ঋষিকে শাস্তি দিবার মানসে একটী মৃত সর্প ঋষির স্কন্ধদেশে জড়াইয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ঋষি ধ্যানস্থ, সুতরাং বাহ্যজ্ঞান-বিহীন। ইতিমধ্যে তাঁহার পুত্র বালক শৃঙ্গী ক্রীড়ার সঙ্গিগণের নিকট হইতে রাজা কর্ত্তৃক ঋষি পিতার অবমাননা শ্রবণ করিয়া হঠাৎ প্রদীপ্ত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি "বাগ্‌বজ্রং বিসর্জ্জহ"—অভিশাপ বাক্য প্রয়োগ করিলেন—অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে সর্পদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হইবে। ঋষি পিতা এই শাপের কথা অবগত হইয়া বালক পুত্রকে শাপ প্রত্যাহার করিবার জন্য বহুবিধ অনুনয় করিলেন, কতই বুঝাইলেন, কিন্তু শৃঙ্গী সুমেরুবৎ নিজ উদ্দেশ্যে অবিচল—শুধু বলিলেন, "পিতা, আমি উপহাসচ্ছলেও কখনও মিথ্যা বলি নাই, আমার অভিশাপ বাক্য নিষ্ফল হইবে না।" ঋষি শমীক অমোঘবাক্ বালকের কথা বুঝিয়া নিবৃত্ত হইলেন,—মহারাজ পরীক্ষিতের সর্পদংশনে আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় সমগ্র ভারতবর্ষে হাহাকার পড়িয়া গেল। মহারাজ পরীক্ষিতের বয়স তখন প্রায় ষাট বৎসর।

এই দুর্ব্বার অভিশাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ ঐহিক সুখ পরিত্যাগ করিলেন এবং পুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনপূর্ব্বক ঋষিপুত্রনির্দ্দিষ্ট মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। এদিকে পরম ভাগবত মহারাজের প্রতি অভিশাপ বাক্য এবং তাঁহার গঙ্গাতীরে অনশনব্রতের কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইলে নানা

দিক্‌দেশ হইতে দেবর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, মুনি, ব্রাহ্মণ, রাজভক্ত প্রজা আসিয়া পরীক্ষিতের সমীপে শোকাবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিলেন, —এমন কি স্বয়ং ব্যাসদেব ও নারদ সেখানে উপস্থিত। সকলেই আসিয়াছেন, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন, কেহ বা ঋষিপুত্রের অভিশাপ ব্যর্থ করিবার জন্য যজ্ঞ, কেহ বা দান করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছেন কিন্তু মহারাজের মনের মত কিছুই হইতেছে না—অব্যর্থ ব্রহ্মশাপের কোনও লৌকিক প্রতিকার আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতে-ছেন না। সভা নিস্তব্ধ, মৃত্যুর করাল ছায়ায় সমগ্র জনমণ্ডলী মলিন, প্রতিকারবিহীন ব্রহ্মশাপের আশঙ্কায় সকলেই মৌন—কেবল গঙ্গার মৃদু কলধ্বনি চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে ভীষণ হইতে ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে।

এমন সময় এক অভিনব ঘটনার প্রতি সমগ্র সভার সহস্র চক্ষু নিপতিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক ষোড়শবর্ষীয়, শ্যামবর্ণ, দিগম্বর, ধূলিধূসরিততনু, আয়তলোচন, পিঙ্গলকেশকলাপ, আশ্রমচিহ্ন-বিহীন তেজঃপুঞ্জকলেবর ঋষি বালকগণে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। ইনি স্বৈরবিহারী চির-কিশোর শ্রীশুকদেব। সভাস্থিত বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ, দেবর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষিগণ সকলে এক মুহূর্ত্তে যন্ত্রতাড়িতবৎ উত্থিত হইয়া ব্রহ্মভূত এই পরম রমণীয় মূর্ত্তিকে বরণ করিয়া লইলেন, মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, রাজচক্রবর্ত্তী এই ধূলি-ধূসরিত দিগম্বর ভিক্ষুককে বন্দনা করিতেছেন দেখিয়া বালকগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। রাজপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠ আসনে শুকদেব উপবেশন করিলেন।

শ্রীশুকদেব সমগ্র ভাগবতে দুইটি নামে পরিচিত—শ্রীশুকদেব ও শ্রীবাদরায়ণি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন যে ব্যাসপুত্র শুকপক্ষীর ন্যায় মধুরভাষী, অতএব ইনি শুক নামেই প্রসিদ্ধ হইবেন। অপরের নিকট শ্রীভাগবতী কথা কীর্ত্তন

করিবার প্রধান গুণ—মধুর কণ্ঠ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ। শ্রীশুকদেবের এই দুইটিই ছিল বলিয়া তিনি ভাগবতী কথা শ্রোতাগণের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বাদরায়ণি। ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমে বাস করিতেন বলিয়া তিনি "বাদরায়ণঃ।" ব্যাসদেবের বদরিকাশ্রমে বাস করিবার কারণ ছিল। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে :

অন্যত্র দশভির্ব্বর্ষৈঃ যৎপুণ্যমুপলভ্যতে
মনুজৈঃ একরাত্রস্য বাসাৎ বদরিকাশ্রমে ॥

—অর্থাৎ অন্য তীর্থে দশ বৎসর বাস বদরিকাশ্রমে এক রাত্রি বাসের সমান। বদরিকাশ্রমনিবাসী বাদরায়ণের পুত্র ভাগবতে 'বাদরায়ণি' নামেও প্রসিদ্ধ।

শুকদেব কোথা হইতে আসিলেন ? কেন আসিলেন ? তিনি কি মহারাজের প্রতি অভিশাপের কথা জানিতেন ? কে তাঁহাকে সেই গঙ্গাতীরে রাজার মৃত্যুসভায় আহ্বান করিল ? ভাগবত অথবা পুরাণে কোথাও ইহার কোন উত্তর নাই। কেবলমাত্র শুকদেবের সম্বন্ধে শ্রীভাগবত "অকুণ্ঠমেধসং" অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ এই কথাটী ব্যবহার করিয়াছেন, হয়ত এই একটী কথার মধ্যেই পাঠক-হৃদয়ের সমস্ত প্রশ্নের সমাধান নিহিত রহিয়াছে।

মহারাজ পরীক্ষিতের সমগ্র ইন্দ্রিয় ও প্রাণশক্তি এখন শ্রীশুকদেবের প্রতি নিবদ্ধ, সহস্র সহস্র ঋষিগণের অবস্থিতি সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। জলমগ্ন ব্যক্তি হঠাৎ তীরভূমি স্পর্শ করিয়াছে, পরীক্ষিতের আশা ও আনন্দের সীমা নাই—ইহজীবনের আশা নহে, অনন্ত জীবনের আশা। দিগম্বর সন্ন্যাসীকে মহারাজা পূজা করিলেন, তাঁহাকে "যোগিনাং পরমং গুরুম্" (যোগিগণের পরম গুরু) বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, গো-দোহন করিতে যত সময় লাগে ততক্ষণও শুকদেব গৃহস্থগণের গৃহে অবস্থান করেন না, ইহা পরীক্ষিৎ জানেন অথচ তাঁহার মৃত্যুদিন অবধি তাঁহার

সম্মুখে অবস্থান করিতে শুকদেবকে অনুরোধ জানাইলেন। শুকদেব সুখাসীন হইলেন,—কত গো-দোহনকাল অতিবাহিত হইল!—এইরূপে যুগে যুগেই দাসের শৃঙ্খলে প্রভু আবদ্ধ হইতেছেন। পরীক্ষিৎ "লোক-সুমঙ্গলা" হরিকথা শুনিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিলেন :

কথয়স্ব মহাভাগ! যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্॥ ২।৮।৩

—অর্থাৎ হে মহাভাগ, আমাকে উপায় বলিয়া দিন, যেরূপে আমি বিষয়-সঙ্গরহিত মনকে অখিল বিশ্বের পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া নিজ দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারি।

বড় কঠিন প্রশ্ন! আজন্ম ভোগসুখলালসায় বর্দ্ধিত মহারাজ "নিঃসঙ্গ" অর্থাৎ বিষয় চিন্তারহিত মন প্রার্থনা করিতেছেন। যে মন সমগ্র জীবনটাই রাজোচিত বিষয়সুখভোগ করিতে অভ্যস্ত, সেই মনকে তিনি বিষয় চিন্তা হইতে উঠাইয়া লইবার উপায় জানিতে চাহিতেছেন, সেই বিষয়-কলুষিত মনকে "নিঃসঙ্গ" করিয়া শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত করিবার শক্তি অন্বেষণ করিতেছেন,—শুধু আজ সাধুসঙ্গপরিশুদ্ধ মন মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হইলেই চলিবে না, সেই মন শ্রীকৃষ্ণে নিঃশেষে অর্পণ করিয়া দেহত্যাগ করিবার উপায় প্রার্থনা করিতেছেন। **মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রার্থনাই সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রশ্ন, ইহার উত্তরই শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়।** ইহাই সমগ্র মানবজাতির সমষ্টিগত প্রাণের প্রশ্ন—কি উপায়ে মৃত্যুর সময়ে মনকে বিষয়নির্মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে জীব নিঃশেষে নিবেদিত করিতে পারে। ইহাই দেবর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি, বদ্ধ জীব, ধনী ও দরিদ্রের মর্ম্ম-কথা, ইহাই সমগ্র জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শ্রীভাগবতে শ্রীশুকদেবের মুখনির্গলিত দ্বাদশ স্কন্ধ কথাগুলি এই একমাত্র প্রশ্নের সমাধান করিতেছে, কি করিয়া 'কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্'।

কোথায় বসিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ ও মুনিঋষিগণ শুকমুখনির্গলিত এই ভাগবতী কথা শ্রবণ করিলেন? নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; তবে বহুবিধ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে গঙ্গা ও যমুনার মিলনক্ষেত্র প্রয়াগতীর্থের বিস্তীর্ণ তটভূমিতে গঙ্গাতীরে বসিয়া রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীভাগবত শ্রবণ করেন। এই ভাগবতী কথা প্রথম শ্রবণের সময় কখন? শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান বা কলিযুগ আরম্ভ হইবার ত্রিশ বৎসর পরে প্রথমতঃ শ্রীশুকদেব শুভ ভাদ্র মাসের শুক্লা নবমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই সাতদিন শ্রীভাগবত কীর্ত্তন করেন। সে আজি হইতে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা।

শ্রীশুকদেব সমগ্র ভাগবত বর্ণনা করিলেন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি, সাহিত্য, ইতিহাস, অলঙ্কার, দর্শন স্বচ্ছ স্রোতের ন্যায় তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল, কেহবা এক অংশ, অপরে অপর কোনও অংশ গ্রহণ করিল,—সমগ্র অংশ কেহই ধারণা করিতে সক্ষম হইল না। শ্রীউগ্রশ্রবাসূত অতি দূরে বসিয়া শ্রীভাগবত কথামৃত শ্রবণ করিতেছিলেন—ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সংকীর্ণ জাতি এই সূতমহাশয়। শ্রীশুকদেব ভাগবত বর্ণনাকালে শ্রোতৃবৃন্দের মুখের দিকে চাহিতেছিলেন, হঠাৎ সূতমহাশয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। হস্ত কৃতাঞ্জলিবদ্ধ, আয়ত নয়নযুগলে নিমেষ নাই, দেহ চিত্রের ন্যায় ধীর ও স্থির—শুকদেবের মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। যখন শ্রীশুকের কথা শেষ হইয়া আসিল, তখন ঋষিদের চমক ভাঙ্গিল—তাঁহারা ভাবিলেন, "এমন একটি অপূর্ব্ব বস্তু জগতে থাকিবে না? আমরা কেহই তো সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। শুক তো স্বৈরবিহারী, কোথায় চলিয়া যাইবেন তাহার স্থিরতা নাই। তবে এই অমূল্য রত্ন রক্ষার উপায় কি? এই অমূল্য সম্পদ্‌ হইতে কি জগৎ বঞ্চিত হইবে?" ঋষিদের প্রাণে যখন এইরূপ নীরব

হাহাকার যুগপৎ উত্থিত হইল, তখন সর্ব্বান্তর্যামী শুকদেব তাহা অবগত হইয়া মৃদুহাস্যে স্নিগ্ধহৃদয় শ্রীউগ্রশ্রবাসূতের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,

এতাং বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নিমিষালয়ে ॥

১২।৪।৪৩

—অর্থাৎ এইখানে সব রাখিয়া গেলাম, ইহার নিকট হইতেই আপনারা সমস্ত পাইবেন। তখন সেই সভায় তুমুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

শ্রুতিধর শ্রীসূতের নিকট সমগ্র ভাগবত রহিয়া গেল। এমন কি, কখন শ্রীশুক হাসিয়াছেন, কখন কি ভঙ্গী করিয়াছেন, কখন কি ভাবে কোন্ শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছেন, কিছুই বাদ যায় নাই—শুদ্ধ ভক্তহৃদয়ে স্বয়ং শ্রীশুকদেব, পরীক্ষিৎ, সমগ্র সভা চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ হইয়া রহিল।

শ্রীউগ্রশ্রবাসূত সম্বন্ধে অনেক কথা চিন্তা করিবার রহিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, উগ্রশ্রবা প্রতিলোমজ সন্তান,—রোমহর্ষণ নামে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে তাঁহার জন্ম। সুতরাং উগ্রশ্রবা সঙ্কীর্ণ-জাতি। অথচ তিনি ছিলেন ভক্ত এবং শ্রুতিধর—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকলেরই পূজনীয়। কত বড় সম্মান হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে যে শ্রীশুকমুখনির্গলিত সমগ্র ভাগবতের তিনিই একমাত্র অধিকারী,—সহস্র সহস্র মুনিঋষি সভায় উপস্থিত হইয়া ভাগবতী কথা শ্রবণ করিলেও কেহই সমগ্র ভাগবতগ্রন্থকে ধারণা করিতে পারেন নাই। একজন মাত্র সমগ্র ভাগবত এমন করিয়া আয়ত্ত করিলেন যে, ভবিষ্যতে নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি সহস্র সহস্র ঋষিগণের নিকট এই ভাগবতী কথা বিশ্লেষণপূর্ব্বক আবৃত্তি করিতে সমর্থ হইলেন; সেই এক এবং অদ্বিতীয় মহাপুরুষ শ্রীউগ্রশ্রবাসূত মহাশয়। এই প্রতিলোমজ সঙ্কীর্ণজাতি

উগ্রশ্রবার সম্মুখে জোড়হস্তে বসিয়া অবনত মস্তকে সহস্র সহস্র জ্ঞানী ও সাধনভজনশীল ঋষিগণ মনোযোগসহকারে ভাগবতী কথা শ্রবণ করিতেছেন, ইহা এক বিচিত্র দৃশ্য, বিচিত্র কাহিনী। অথচ উগ্রশ্রবা মহাশয় নীচজাতি, সমাজে তাঁহার স্থান ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের অনেক পরে। আজ ভাগবতী কথার জন্য সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা সকলেই শ্রীউগ্রশ্রবাসূতের নিকট ঋণী।

এই বিষয়টি আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি যে হিন্দুশাস্ত্রসমূহে জাতিবিভাগের বিধান থাকিলেও জাতিগৌরব প্রসূত ঘৃণা অথবা অহঙ্কারের কোন প্রশ্রয় কোথাও দেওয়া হয় নাই। শ্রদ্ধা জন্মগত অধিকার নহে, সকলকেই আচরণের দ্বারা সমাজে শ্রদ্ধাভাজন হইতে হইবে। ক্ষতব্রত, মিথ্যাচারী ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াই পূজনীয় হইতে পারে না—পূজনীয় হইতে হইলে ব্রাহ্মণের মত জীবনযাপন করা চাই। শ্রীভাগবতে ব্রাহ্মণ ভরত-মহাশয়ের ব্রাহ্মণ-ভ্রাতাগণকে 'প্রাকৃতৈঃ দ্বিপদপশুভিঃ'—দুইপদ বিশিষ্ট জন্তুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ভরতমহাশয়ের ব্রাহ্মণ-ভ্রাতাগণ কর্দ্দমাক্ত মাঠে ক্ষেত্র সমতল করিবার জন্য ভরতকে নিযুক্ত করিত, নানাবিধ পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য তাঁহাকে দিয়া করাইয়া লইত এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ক্ষুদ, তুষ, কীটদষ্ট মাসকলাই, রন্ধনপাত্রসংলগ্ন দগ্ধ অন্ন তাহাকে খাইতে দিত। কৃষিজীবী এই ব্রাহ্মণভ্রাতাগণের ভ্রাতৃস্নেহ ছিল না, ধর্ম্মবুদ্ধি ছিল না, শুধু গলায় পৈতা ঝুলাইয়া সমাজের নিকট হইতে সম্মান আদায় করিবার চেষ্টা করিত। শ্রীশুকদেব এইরূপ যজ্ঞসূত্র সর্ব্বস্ব ব্রহ্মণ্যাভিমানী মানুষগুলিকে দুইপদবিশিষ্ট জন্তু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং আচার-ব্যবহারের দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণের সম্মান দাবী করিতে পারে, শুধু ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইল না। ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে নীচজাতি

উগ্রশ্রবাকে দেখিয়া ঋষি, মুনি, ব্রাহ্মণ সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ভাগবতী কথা শ্রবণ করিতেছেন। শ্রীভাগবতের এই আখ্যান সর্ব্বযুগে হিন্দুসমাজে এক বিশিষ্ট গৌরব অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

জাতিবুদ্ধি নিরর্থক,—জ্ঞান, সাধনা, সদাচারই সর্ব্বস্ব,—ইহা বুঝাইবার জন্য, মহাভারত, ভক্তমাল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে অনেক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সুপরিচিত কথাগুলি আমাদের মনে পড়ে। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ"— শ্রীহরির প্রতি ভক্তিশীল চণ্ডালও, ভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সমাজের অতিনিম্নস্তরের মানুষও তাহা হইলে ক্ষেত্রবিশেষে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পূজনীয়। "ভক্তমাল" গ্রন্থে অনুরূপ ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতেছেন, সমগ্র ভারতবর্ষের দূরদূরান্তর হইতে অনাহূত, রবাহূত অসংখ্য রাজভক্ত প্রজা প্রসাদ পাইবার আশায় রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মহারাণী দ্রৌপদী দেবী ইহাদিগকে পরিবেশন করিতেছেন,—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অতিথি-গণের সেবা পরিদর্শন করিতেছেন। দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছে। যখনই একদল অতিথির ভোজন সমাপ্ত হইতেছে তখনই শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ পাঞ্চজন্য বাজিয়া উঠিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। একজন বৈষ্ণবমহাশয় দীনহীনবেশে অতিথিগণের পংক্তির ভিতর বসিয়া অবনতমস্তকে যজ্ঞের প্রসাদ গ্রহণ করিতেছিলেন। শতবিধ অন্নব্যঞ্জন,—কোন্‌টির পর কোন্‌টি খাইতে হইবে তাহা দরিদ্র বৈষ্ণব বুঝিতে না পারিয়া এলোমেলো ভাবে ব্যঞ্জনগুলি গ্রহণ করিতেছিলেন। মহারাণী দ্রৌপদী তাহা লক্ষ্য করিলেন, এবং অবজ্ঞা-ভরে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই অতিথি নিশ্চয়ই নীচজাতি, তাই

আহার্য্য দ্রব্যের ক্রম রক্ষা করিয়া সেবা করিতে জানে না। এই পংক্তির সকলের আহার শেষ হইল কিন্তু এইবার পাঞ্চজন্য আর বাজিল না। শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খকে শাসন করিবার জন্য বেত্রদণ্ড ধারণ করিলেন। তখন শঙ্খ পাঞ্চজন্য বলিল—প্রভু, আমার কোন অপরাধ নাই, "বৈষ্ণবেরে জাতিবুদ্ধি করিল দ্রৌপদী।" বৈষ্ণবকে নীচজাতি মনে করিয়া দ্রৌপদী মনে মনে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং দ্রৌপদীর অপরাধে পাঞ্চজন্য শঙ্খ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৌরব ঘোষণা করিতে অক্ষম হইয়াছে। ভক্ত বৈষ্ণব সর্ব্বজনপূজিত ভক্তজাতি, তাঁহাকে নীচজাতি মনে করিয়া অনাদর প্রদর্শনের ফলে এত বড় বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থে সৎ আচরণের সম্মান দেখান হইয়াছে, নিছক জন্মগত জাতির সম্মান গৌণ।

মহাভারতের এইরূপ আর একটি বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ শান্তির দূত হইয়া পাণ্ডবগণের জন্য পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে কুরুরাজসভায় গমন করিতেছেন। যাত্রাকালে কুন্তীদেবীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। কুন্তীদেবী কথাপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার ভিতর একটি শ্লোক মহাভারতে চিরজীবী হইয়া রহিয়াছে।

তস্যাং সংসদি সর্ব্বেষাং ক্ষত্তারং পূজয়াম্যহম্।
বৃত্তেন হি ভবত্যার্য্যো ন ধনেন ন বিদ্যয়া॥

—হে কৃষ্ণ, তুমি সেই কুরুসভায় দাসীপুত্র বিদুরকে আমার প্রণাম জ্ঞাপন করিও। আচরণের দ্বারাই মানুষ মহৎ হয়, অর্থ অথবা বিদ্যার দ্বারা মানুষ বড় হইতে পারে না।

ব্যাসদেব কুন্তীদেবীর মুখ দিয়া যে উপদেশ ভারতবাসিগণকে প্রদান করিয়াছেন তাহা চিরস্মরণীয়। সেই কুরুসভায়, দেবর্ষি, মহর্ষি, মুনি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়বীরগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু কুন্তীদেবী কাহারও

নিকট মস্তক অবনত করিলেন না। কারণ যখন কুরুসভায় রজস্বলা দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করা হইয়াছিল তখন রাজরোষভয়ে সেই সভার উচ্চজাতি, উচ্চবংশীয় সভাসদ্‌গণ কেহই তাহার প্রতিবিধান করিতে উঠিয়া দাঁড়ান নাই। উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন দাসীপুত্র বিদুর। দরিদ্র, দাসীপুত্র বিদুর সমগ্র রাজশক্তি, রাজরোষ তুচ্ছ করিয়া বজ্রধ্বনিত কণ্ঠে রাজা দুর্য্যোধনের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাই দাসীপুত্র হইয়াও আচরণের দ্বারা তিনি সমগ্র সভার শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন। কুন্তীদেবী বলিতেছেন, ধনৈশ্বর্য্যের দ্বারা কেহ তো বড় হয় না, এমনকি শুধু বিদ্যা থাকিলেও সে ব্যক্তি পূজনীয় নহে। মানুষের আচরণই মনুষ্যত্বের একমাত্র কষ্টি পাথর।

এই সমস্ত উপদেশগুলি অনুধাবন করিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ভক্তি ও সৎ আচরণের বিশেষ গৌরব প্রদান করিয়াছেন, কেবলমাত্র জাতিবুদ্ধির উপর সমাজের ভিত্তি স্থাপনা করিয়া যান নাই। তাই সঙ্কীর্ণজাতি হইয়াও শ্রীউগ্রশ্রবাসূত আজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মুনিঋষি সকলেরই চিরপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন।

(৩)

—সময় অতীত হইতে লাগিল, শ্রীসূত নিজবক্ষে শ্রীভাগবত বহন করিতেছেন, উদ্দেশ্য এখনও সফল হয় নাই, অবরুদ্ধ ভক্তি-স্রোত গ্রহণ করিবার পাত্র তখনও খুঁজিয়া পান নাই। ইতিমধ্যে নৈমিষারণ্যের শৌনকাদি ঋষিগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন, হঠাৎ একদিন রোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৌনকাদি ঋষিগণ সসম্মানে সূতকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীভাগবত কথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা নিবেদন করিলেন,

ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত।

অর্থাৎ হে দেব, গুরুজনগণ ভক্তিমান্ শিষ্যকে গোপনীয় বিষয় উপদেশ দিয়া থাকেন।

ঋষিগণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সূতমহাশয় নৈমিষারণ্যে বসিয়া সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবত শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত কথা জগতে প্রচারিত হইল।

এই স্থানে একটি কথা উল্লেখ ও প্রণিধানযোগ্য। শ্রীব্যাসদেব স্বীয় পুত্র শুকদেবকে এই ভাগবতী কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন—শুকদেব সংসার-বিরক্ত, স্বৈরবিহারী, পরম সন্ন্যাসী। তাঁহার কর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ত্তব্য নাই, গ্রহণীয় অথবা ত্যজনীয় কিছুই নাই, কাহাকেও শ্রীভাগবতী কথা শুনাইবার আগ্রহ অথবা উদ্দেশ্য নাই। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীতে কেবলমাত্র এই উদাসীন শুকদেবের মধ্যেই যে মহাপুরাণ অবরুদ্ধ তাহা কালক্রমে পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবার সর্ব্ববিধ সম্ভাবনা বর্ত্তমান ছিল। হয়ত শুকদেবের অন্তর্দ্ধানের সহিত শ্রীভাগবতও বিশ্ব হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইত; কিন্তু ভগবদিচ্ছায় অন্যরূপ ঘটিয়া গেল। মহাভাগবত রাজা পরীক্ষিত, যিনি মাতৃগর্ভে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার অসামান্য সৌভাগ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধবুদ্ধি পরীক্ষিতের একদিন বুদ্ধিবৈক্লব্য উপস্থিত হইল, তিনি ধ্যানমগ্ন নিরপরাধ ঋষির গলদেশে মৃতসর্প স্থাপন করিয়া অকারণে মহতের অবমাননা করিলেন। অকারণ মহতের অবমাননা অশেষ অনিষ্টের আকর। শ্রীমদ্ভাগবতেই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং
লোকানাশিষ এব চ
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি
পুংসো মহদতিক্রমঃ। ১০।৪।৪৬

—অর্থাৎ কোনও লোক যদি মহতের অবমাননা করে তাহা হইলে তাহার আয়ুক্ষয় হয়; শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, ইহলোক, পরলোক এবং তাহার সর্ব্ববিধ কল্যাণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

সমাজবাসী মানুষ যতপ্রকার অপরাধে অপরাধী হইতে পারে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অপরাধ মহতের অবমাননা। এই মহতের অবমাননা কি? গুরুদ্রোহী শিষ্য, পুরোহিতদ্রোহী যজমান, পিতৃ-মাতৃদ্রোহী সন্তান, বৃদ্ধদ্রোহী যুবক, শিক্ষকদ্রোহী ছাত্র;—ইহারা সকলেই মহতের অবমাননায় অপরাধী। যেমন প্রাকৃতিক জগতে প্রত্যেক আঘাতের প্রতিঘাত আছে, ঠিক সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতে মহদতিক্রমের অনুরূপ প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী। শিষ্য হয়ত বৃদ্ধগুরুর দোষত্রুটি মনে মনে বিচার করিতেছে, গুরুভ্রাতাগণের নিকট নির্জ্জনে তাহা লইয়া সমালোচনা চলিতেছে, গুরুকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছে। ইহার ফল হইতেছে এই যে তাহার মন্ত্রদীক্ষা নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে—আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। পুত্রগণ পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, পিতামাতা কেবলমাত্র তাহাদের অন্নসংস্থান ও আধিব্যাধির সেবা করিবার যন্ত্রমাত্র,—ইহাই মনে মনে ধারণা করিয়া থাকে। যতই বড় হইয়া পিতামাতার সাহায্যনিরপেক্ষ হইতে থাকে, ততই অধিক পরিমাণে রূঢ় ভাষা, অবজ্ঞাসূচক কথা তাহারা পিতামাতার সাক্ষাতে অথবা অসাক্ষাতে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে, এমনও দেখা যায়। এইরূপ আশীর্ব্বাদবঞ্চিত সন্তান ভবিষ্যতে অন্নকষ্ট ভোগ করে, ক্ষেত্রবিশেষে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াও এইরূপ শ্রদ্ধাবর্জ্জিত সন্তানসন্ততি সুখী হইতে পারে না। শিক্ষাজগতে এইরূপ মহতের অবমাননা আজকাল অহরহঃ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ পিতাপুত্রের সম্বন্ধের মত নির্ম্মল ও সুন্দর। কিন্তু সেই পবিত্র সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, ছাত্র ভাবিতেছে যে স্কুল কলেজে মাহিনা

দিয়া পড়িয়া সে শিক্ষকের মাথা কিনিয়া রাখিয়াছে,—শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের আবার প্রয়োজন কি? এইরূপে মহতের অবমাননা করিয়া শিক্ষাপ্রদান ও শিক্ষাগ্রহণের মূলোচ্ছেদ হইয়া যাইতেছে, মানুষ-গড়া শিক্ষা দেশে আর নাই, শুধু উদরপূরণের উপায় শিক্ষাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে বিভিন্নক্ষেত্রে মহতের অবমাননা হইতে সমগ্র সমাজ ও সমাজ-জীবন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। তাই বর্ত্তমান ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আসিয়াও সুখস্বচ্ছন্দতা আসে নাই, প্রতি সংসারে অভাব-অভিযোগ, কলহ-অশান্তি লাগিয়াই আছে, দেশের ভিতর দলাদলি বাড়িয়া উঠিতেছে, যুদ্ধের আশঙ্কা মানুষকে শঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে, ব্যাধির প্রকোপ বাড়িয়া চলিয়াছে, পৃথিবী শস্যসম্ভার গোপন করিতেছেন, বন্যা ও মহামারী দেশের ভিতর নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিন মহাপুরুষ ভরতমহাশয়কে অপমানিত করিয়া মহাকালীর পূজারিগণ তাঁহার খড়্গপ্রহারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; অশেষবিধ উপচারে, পরম ভক্তিসহকারে দেবী মহাকালীর পূজা করিয়াও তাহারা মহতের অবমাননার প্রতিঘাত হইতে রক্ষা পায় নাই। এখন দেবী স্বয়ং খড়্গ ধারণ করেন না, কিন্তু মহতের অবমাননা তিনি কখনও সহ্য করেন নাই, এখনও সহ্য করেন না—এখনও তাঁহার নানাবিধ আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক যন্ত্রসমূহ মানুষকে নির্ম্মমভাবে আঘাত হানিয়া থাকে। শুধু জড়বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষকে বড় করিতে পারে না, যদি তাহা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে রোম-সাম্রাজ্য, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, বিশাল হিন্দুসাম্রাজ্য কখনই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না—সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্বদেশের ইতিহাসে জাতি-ধ্বংসের একমাত্র কারণ মহতের অবমাননা—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পশুবুদ্ধি ধ্বংসের কারণ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বুদ্ধি ব্যষ্টিরূপে ও সমষ্টিরূপে জীবনের ধারক ও কল্যাণপ্রদ।

সুতরাং ঋষি শমীকের অবমাননায় সর্ব্ববিধ অনিষ্টের আশঙ্কা মহারাজ পরীক্ষিতের জীবনে দেখা দিল। অথচ বিধির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে তাঁহার বুদ্ধি-বৈক্লব্য না হইলে তাঁহার উপর ব্রহ্মশাপ হয় না, ব্রহ্মশাপ না হইলে তিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করেন না, তিনি প্রায়োপবেশন না করিলে তাঁহার প্রতি দয়া করিতে শ্রীশুকদেব আবির্ভূত হন না, শ্রীশুকদেব না আসিলে শ্রীভাগবতী কথা জগতে প্রচার লাভ করে না। বুদ্ধি-বৈক্লব্য, ব্রহ্মশাপ, শ্রীভাগবত প্রচার—সবই কার্য্যকারণশৃঙ্খলে আবদ্ধ। অমোঘ ব্রহ্মশাপের সম্মুখে পরীক্ষিতের আয়ু মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্মরাশিতে পরিণত হইল; কিন্তু অমোঘ শুককৃপার ফলে তাঁহার যশ, শ্রী, ইহলোক, পরলোক সমস্তই রক্ষা পাইল। তাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তাঁহার জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে ঋষির বজ্রবাক্য বরমাল্যসম নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়া জগতে শ্রীভাগবত-কথা প্রচার করিতে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপরীক্ষিতের এই আত্মবিসর্জ্জন শ্রীমদ্‌ভাগবতকথা প্রচারের মূল স্তম্ভস্বরূপ। শ্রীশুকদেবের বিশুদ্ধ প্রেমে গাঁথা এই ভাগবতীমালা তাঁহার মানবপ্রীতির চন্দনফোঁটা শিরে ধারণ করিয়া আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। ইন্দ্রের মদমত্ত ঐরাবত একদিন দেবর্ষিপ্রদত্ত পারিজাত কুসুমের মালা শুঁড়ে করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছিল, দেবর্ষির প্রসাদস্বরূপ সেই মালার প্রভাব সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সেইরূপ আমরা শুকদেবগ্রথিত ভাগবতীমালা মস্তকে ধারণ করিব, অথবা পরিত্যাগ করিব—সে আমাদের রুচি এবং ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

(৪)

এই শ্রীমদ্‌ভাগবতগ্রন্থ বৈষ্ণবগণের নিকট স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্বরূপ। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা আমরা পূজা করি, শালগ্রাম শিলা

পূজা করি, সেইরূপ ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই ভাগবতের পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীভাগবতগ্রন্থ কৃপা করিলে তবেই ভক্তিলাভ সম্ভবপর হয়। তাই ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া বৈষ্ণব তুলসী-চন্দন ও পুষ্পমাল্যের দ্বারা প্রথমেই শ্রীভাগবত গ্রন্থের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধ শ্রীভগবানের দ্বাদশটি অবয়ব। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে ঃ—

স্বকীয়ং যদ্ভবেৎ তেজস্তচ্চ ভাগবতেঽধাৎ
তিরোধায় প্রবিষ্টোঽয়ং শ্রীমদ্ভাগবতার্ণবম্ ॥
তেনেয়ং বাঙ্‌ময়ী মূর্ত্তিঃ প্রত্যক্ষা বর্ত্ততে হরেঃ
সেবনাৎ শ্রবণাৎ পাঠাৎ দর্শনাৎ পাপনাশিনী ॥

—অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজের তেজ ভাগবতে রাখিয়া সেই ভাগবতসমুদ্রেই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। সেইজন্য এই ভাগবত শ্রীহরির প্রত্যক্ষ বাঙ্‌ময়ী মূর্ত্তি। ইহার সেবা, শ্রবণ, পঠন বা দর্শনে পাপ বিনষ্ট হয়। যেখানে শ্রীভাগবত পাঠ হয় তথায় গঙ্গা যমুনাদি সমস্ত তীর্থ বিরাজ করিয়া থাকেন—ভক্ত, ভগবান ও তীর্থের সম্মিলনে সেই স্থান পরম পবিত্র হইয়া যায়। এই বিশ্বাসের ফলে বৈষ্ণব এবং ভক্তগণ ভাগবত পাঠ অথবা শ্রবণ করিবার সময় কোনরূপ চাঞ্চল্য অথবা অস্থিরতা প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা বলেন যে শ্রীভাগবত শ্রবণের সম্পূর্ণ ফল পাইতে হইলে দেহকে যথাসাধ্য স্থির রাখিতে হয়, মুখে অন্য কথা উচ্চারণ কিংবা অন্যের সহিত কথোপকথন করিতে নাই। একান্ত প্রয়োজনীয় হইলে প্রণামপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে বাহিরে আসিয়া কার্য্য সমাপনান্তে অতি সত্বর নিঃশব্দে অন্যের ব্যাঘাত না জন্মাইয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিতে হয়। চক্ষু দুইটি বক্তার মুখের দিকে স্থাপন করিয়া রাখা উচিত, তাহাতে মনঃসংযোগের সহায়তা করে। কোথাও শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিতে যাইলে পাঠারম্ভের পূর্ব্বেই তথায় যাইতে

সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হয় এবং পাঠসমাপনান্তে স্থান ত্যাগ করিতে হয়। যদি কোন কারণে উপস্থিত হইতে দেরী হইয়া যায় তাহা হইলে অপর শ্রোতাগণকে ঠেলিতে ঠেলিতে ভক্তগণের ভাবভঙ্গ করিয়া সভামধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টিপূর্ব্বক সশব্দে স্থান গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা অন্যায়। ভাগবত পাঠ কালে নিস্তব্ধতাই সর্ব্বসময়ে শোভনীয়। অনেকে পাঠকীর্ত্তনাদির সময় ভাবাবিষ্ট হইয়া (দশায় পড়িয়া) অন্যের বাধা ও উৎপাতের সৃষ্টি করেন—ইহা অত্যন্ত দূষণীয়। সভাস্থলে সংযম একান্ত. প্রয়োজন। যদি প্রাণে উচ্ছ্বাসের আবেগ আসে, তাহা হইলে সংক্ষেপে 'ধন্য ধন্য' অথবা 'হরি হরি' ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া চিত্তের আবেগ প্রশমন করিতে হয়। ইহাই বৈষ্ণবগণের সুচিন্তিত উপদেশ।

শ্রীভাগবত পঠন অথবা শ্রবণকে সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ করিতে হইলে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েরই সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রথমেই বক্তার প্রতি শ্রোতাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। বক্তা যে আসনে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছেন সেই আসনকে 'ব্যাসাসন' বলা হইয়া থাকে—'ব্যাসাসন' অর্থাৎ যেন স্বয়ং ব্যাসদেব সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীভাগবতকথা ভক্তগণের শ্রুতিগোচর করিতেছেন। কিন্তু ব্যাসাসনের প্রতি ভক্তির উদ্রেক করিতে হইলে শুদ্ধানুরাগী বক্তা হওয়া প্রয়োজন। এই শুদ্ধানুরাগী বক্তা সম্বন্ধে শ্রীগৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন : "শ্রীভাগবতের প্রতি আন্তরিক প্রীতিবশতঃ উহার আলোচনায়, উহার কীর্ত্তনে, উহার চিন্তাতে, উহার আস্বাদনেই যাঁহার প্রবল আসক্তি, অন্য কোন বস্তুতে চিত্ত আকৃষ্ট নহে, তাঁহাকেই 'শুদ্ধানুরাগী বক্তা' বলা যাইতে পারে। এই জাতীয় বক্তা শ্রীভাগবত কীর্ত্তন করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থবোধ করেন, আর মনে করেন, এই সমস্ত সাধু শ্রোতা তাঁহার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া কত বাধা, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ক্লেশপূর্ব্বক বসিয়া শ্রীভাগবতীয় কথা শ্রবণ করিতেছেন। ইহারা

আগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছেন বলিয়াই তো তিনি শ্রীভাগবতকথা উচ্চারণ করিতেছেন, তাঁহার রসনা পরম পবিত্র শ্রীভাগবতীয় ধ্বনির সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিতেছে। ইঁহারাই দয়া করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেছেন। এই জাতীয় বক্তা কোনরূপ অর্থ, দ্রব্যলাভ, যশ-প্রতিষ্ঠাদির আকাঙ্ক্ষায় শ্রীভাগবত পাঠ করেন না। ইঁহারাই উত্তম বক্তা। ইঁহারাই শুদ্ধানুরাগী বক্তা। আর এক জাতীয় বক্তা আছেন, যাঁহারা ধনাদি কামনায় শ্রীভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন, ইঁহাদিগকে কনিষ্ঠ জাতীয় বলা যাইতে পারে।" শুদ্ধানুরাগী বক্তা এবং শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতার সম্মিলনে শ্রীমদ্ভাগবত পঠন ও শ্রবণ সফল ও সার্থক হইয়া থাকে। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন,

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃং স্তৎপাদসলিলং যথা॥ ১০।১।১৬

—অর্থাৎ যেমন শ্রীকৃষ্ণপাদোদ্ভূতা গঙ্গা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীভাগবতকথাসম্বন্ধীয় প্রশ্ন, প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা এবং শ্রোতা—এই তিন জাতীয় ব্যক্তিকেই সমভাবে ধন্য ও পবিত্র করিয়া থাকে।

ইহাই শ্রীভাগবতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তবে অমৃতের পরিচয় অমৃতবার্ত্তা শ্রবণমাত্রেই নহে, অমৃত দর্শন করিলেও হয় না—অমৃত স্বয়ং আস্বাদন করিতে হয়; এই আস্বাদন সাধু-কৃপাসাপেক্ষ।

প্রথম স্কন্ধ

(১)

ঋষিপ্রশ্ন

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে বিস্তৃত ; প্রত্যেকটি স্কন্ধ আবার কয়েকটি অধ্যায়ের সমষ্টি। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে যদিও সমগ্র গ্রন্থের বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও গুণবর্ণন, তথাপি প্রথম স্কন্ধ হইতেই ধারাবাহিকরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলা বর্ণনা করা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলাকাহিনী প্রধানতঃ দশম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ স্কন্ধের বিষয়বস্তুসমূহ এখন যথাক্রমে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথম স্কন্ধ প্রধানতঃ শ্রীভাগবতের মুখবন্ধস্বরূপ। ইহার প্রথম শ্লোক বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। টীকাকণ্টকিত এই শ্লোকের সারাংশ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

জন্মাদ্যস্য যতো ঽন্বয়াদি তরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তিযৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র নিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি। ১।১।১

ব্যাসদেব মঙ্গলাচরণ করিয়া প্রথমেই জগৎ কারণস্বরূপ পরমাত্মাকে ধ্যান করিতেছেন। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও মোক্ষ যাঁহা হইতে হইয়া থাকে, যিনি 'স্বরাট্' অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, যিনি "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই "সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি" অর্থাৎ সেই স্বপ্রকাশ সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে ধ্যান করি।

'সত্যং পরং ধীমহি—এই কথাগুলি শ্রীভাগবতে নানাস্থানে অনেক-বার ব্যবহার করা হইয়াছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সত্যময় রূপের প্রতি শ্রীশুকদেব শ্রোতাগণের মনোযোগ বারংবার আকর্ষণ করিয়াছেন।

নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ সহস্র বৎসরব্যাপী যজ্ঞ করিতেছেন, এমন সময় রোমহর্ষণ পুত্র শ্রীউগ্রশ্রবাস্থত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঋষিগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া উগ্রশ্রবাস্থত মহাশয় সুখাসীন হইলে ঋষি শৌনক বলিলেন ঃ

মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্ম্মভিঃ ॥ ১।১৬।১০

অর্থাৎ কলিকালের জীব সাধারণতঃ অলস, অল্পবুদ্ধি ও অল্পায়ু। আবার সেই অল্প পরমায়ুই দিনে বৃথা কর্ম্ম ও রাত্রিতে নিদ্রায় কাটিয়া যায়।

এই শ্লোকটি সংসারী জীবন ও তাহার পরিণতির একটি সংক্ষিপ্ত সার। ঋষি শৌনক বিষয়ী মানুষকে "মন্দ" অর্থাৎ অলসপ্রকৃতি বলিতেছেন। শরীর তাহাদের অলস নয়, মন অলস। সৎচিন্তা, ভগবৎ-চিন্তা করিতে ইহারা অক্ষম। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেখিয়াছিলেন যে বিষয়ী লোক দক্ষিণেশ্বরের ঘরের ভিতর তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ঈশ্বরলীলা সম্বন্ধে আলোচনা সহ্য করিতে পারিতেছে না, পরস্পর পরামর্শ করিয়া নৌকায় যাইয়া বসিবার উপক্রম করিতেছে। নৌকা ছাড়িতে দেরী আছে, তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ধর্ম্মকথা তাহারা শুনিবে না, ধর্ম্মকথা শোনা অপেক্ষা নৌকায় যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও ভাল। ইহারই নাম মন্দপ্রকৃতি মানুষ। সত্ত্বগুণের অভাব। সুতরাং ভগবৎ কথায় উৎসাহ নাই, আবার তমোগুণাচ্ছন্ন বলিয়া জড়পিণ্ডের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে অথবা মনে মনে বিষয় চিন্তা করিতে ইহারা ভালবাসে। ইহাই মন্দপ্রকৃতি মানুষের লক্ষণ। "মন্দপ্রজ্ঞস্য"—বিষয়ী

লোকের মন্দ বুদ্ধি। অথচ মানুষ সর্ব্বদাই আপনার বুদ্ধির বড়াই করে, কিন্তু তাহার শুদ্ধা বুদ্ধি নাই, বিষয়বুদ্ধি যথেষ্ট আছে। যে বুদ্ধিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করা যায় তাহা বিষয়বুদ্ধি, শুদ্ধা বুদ্ধি নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় ইহা "চি ড়েভেজান-বুদ্ধি।"—উদরপূরণ সুচারুরূপেই হয়, কিন্তু তাহার অধিক আর কিছুই হয় না,—এমন কি অদুঃখবিদ্ধ সুখও অর্জ্জন করা যায় না। বিষয়ী লোক "মন্দায়ুষঃ"—অল্পায়ু। বিষয়ী লোক সাধারণতঃ ভোগপরায়ণ, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে মানুষ অল্পায়ু হইয়া পড়ে। সুতরাং যে হয়ত আশী বৎসর পরমায়ু লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইন্দ্রিয় লালসার উপভোগের ফলে তাহার আয়ু ছিদ্রভাণ্ডের জলের মত নির্গলিত হইয়া যায়,—ডাক্তার বৈদ্য কেহই তাহাকে পূর্ণ আয়ু প্রদান করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়সংযম ও ভগবৎ-চিন্তাই দীর্ঘায়ুলাভের একমাত্র উপায়। ঋষি শৌনক বলিতেছেন যে, এমন বিষয়ী লোকের দিবা ব্যর্থ কর্ম্মে এবং রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হইয়া যায়। বিষয়ী মানুষ "মন্দ" এবং "মন্দপ্রজ্ঞ" বলিয়া বৃথা কর্ম্মকেই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকে। গৃহী তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বিষয়কর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে,—ইহাতে তো কিছুই দোষ নাই। কিন্তু ইহাই দোষ হইয়া দাঁড়ায়; এই সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরচিন্তনের দ্বারা শোধিত করা হয় না বলিয়াই এই কর্ম্ম ব্যর্থ কর্ম্মে পরিণত হইয়া যায়। ভক্ত বলেন:

বড় বড় কর্ম্ম করে বড় অভিমানে
কৃষ্ণনাম সিন্ধু-বিন্দু না হয় সমানে॥

হস্ত বিষয়কর্ম্ম করুক, কিন্তু প্রাণ ব্রহ্মপদে সমর্পণ করিতে হইবে, নতুবা কর্ম্ম অশেষ জঞ্জালস্বরূপ হইয়া মানুষের জন্মজন্মান্তর ভ্রমণের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। শ্রীভাগবত বলেন "দুর্ল্লভং মানুষংজন্ম"—এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যদি শুধু পশুর মত ইন্দ্রিয়সেবা ও উদরপূরণ

ফুরিয়াই চলিয়া যাইল তাহা হইলে সে মানুষ মন্দ, মন্দপ্রজ্ঞ ও মন্দায়ু—তাহার জীবন ব্যর্থকর্ম্মকুশল একটা বৃহৎ যন্ত্রমাত্র।

ঋষিগণ আরও বলিলেন ঃ

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য ! কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ,
ভূরীণি ভূরিকর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ ॥
অতঃ সাধোঽত্র যৎসারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া,
ব্রূহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ১।১।১০।১১

—অর্থাৎ হে সাধো, এই কলিকালে মানবগণ প্রায়শঃ অল্পায়ু, অলস, অত্যন্ত মন্দবুদ্ধি, হতভাগ্য এবং রোগাদির দ্বারা প্রপীড়িত, তাহাতে আবার পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বহুবিধ কর্ম্ম এবং বহুপ্রকার শ্রোতব্য বিষয় আছে।

অতএব হে সাধো, ইহাদের মধ্যে যাহা সার তাহা আপনি স্বীয় প্রতিভাবলে সংগ্রহ করিয়া জীবগণের মঙ্গলার্থে বলুন, যাহাতে আমাদের বুদ্ধি নির্ম্মল হয়।

ঋষিগণ আরও বলিলেন, "ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং"—অর্থাৎ তাঁহারা উগ্রশ্রবার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধাশীল, অতএব তাঁহারা সূত মহাশয়ের ভাগবতী কথা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং—শ্রদ্ধাশীল শ্রোতা—এই বাক্য কয়টির মধ্যেই শ্রীভাগবত কথা শ্রবণের এবং উহার সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্তির একমাত্র উপায় প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা, সন্দেহকলুষিত, অস্থিরচিত্ত মানব শ্রদ্ধাবর্জ্জিত মন লইয়া শ্রীভাগবতী কথা শ্রবণ করিলে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইবে।

এইরূপে প্রথম স্কন্ধের 'ঋষিপ্রশ্ন' নামক প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

(২)

শ্রীউগ্রশ্রবাসূত মহাশয় শ্রীভাগবত আখ্যান আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তিনি শ্রীশুকদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়া পরে সুধীসমাজে সুপরিচিত নিম্নোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিলেন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ১।২।৪

—অর্থাৎ নারায়ণ, নর (ব্রহ্মা) নরোত্তম (প্রজাপতি) দেবী (দুর্গা) ও সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া তাহার পর পুরাণ ও ইতিহাস পাঠ করিবে। এই বিখ্যাত শ্লোকটীর ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে।

নারায়ণং আদিপুরুষং বিষ্ণুম্, নরতি, সৃষ্ট্যা নয়তি জগৎসত্তামিতি নরো ব্রহ্মা তম্, নরেষু প্রজাসু উত্তমো, নিয়ন্তৃত্বাৎ প্রধানঃ প্রজাপতিস্তম্, দীব্যতি জগৎপ্রপঞ্চেন ক্রীড়তি ইতি দেবী দুর্গা তাম্, তথা সরস্বতীম্ বাগ্‌দেবীং নমস্কৃত্য—জয়তি অনেন সংসারমিতি ব্যুৎপত্ত্যা জয়স্তৎ তৎ গ্রন্থঃ—ইতিহাসপুরাণধর্ম্মগ্রন্থাঃ।

সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিবার রীতি ধর্ম্মসমাজে প্রচলিত। এই শ্লোক শ্রীমহাভারতেও আছে। 'জয়' শব্দের অর্থ মহাভারত, অথবা যে গ্রন্থের দ্বারা সংসার জয় হয়। এই দ্বিতীয় অর্থে অর্থাৎ সংসার বিজয়ের উপায় অর্থেই 'জয়' শব্দ শ্রীভাগবতের প্রতি প্রযুজ্য হইয়াছে। উগ্রশ্রবাসূত বলিলেন, ভগবানের লীলাগুণ শ্রবণ করিতে করিতে 'বাসুদেবকথারুচিঃ' অর্থাৎ বাসুদেবের কথায় রুচি জন্মিয়া থাকে এবং ক্রমশঃ মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিশ্চলা ভক্তির উদয় হয়। ভক্তি হইলে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন ও উপলব্ধি হয় এবং তাহার অমোঘ ফলস্বরূপে

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ ১।২।২১

—অর্থাৎ আত্মস্বরূপ ভগবানের দর্শনমাত্রেই আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির অহঙ্কাররূপ সমস্ত গ্রন্থি (বন্ধন) ছিন্ন হইয়া যায়, সকল সন্দেহ দূরীভূত হয়, এবং জন্ম-জন্মান্তরের সমগ্র কর্ম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

তখন আর বেদপাঠ, যজ্ঞক্রিয়া, যোগাভ্যাস এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্ব্বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সকল কিছুই করণীয় থাকে না। কারণ,

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ১।২।২৮।২৯

—অর্থাৎ বাসুদেবই সমগ্র বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, যজ্ঞ সকল বাসুদেবের তুষ্টির জন্য অনুষ্ঠিত, যোগশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট যম নিয়মাদি যোগাঙ্গ বাসুদেব প্রাপ্তির জন্যই বিধেয়, এবং আশ্রমোক্ত কর্ম্ম সকলও বাসুদেবেই অর্পিত হইয়া থাকে। বাসুদেব সম্বন্ধে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। বাসুদেব প্রাপ্তিই তপস্যার উদ্দেশ্য, দানব্রতাদি ধর্ম্ম বাসুদেবের জন্যই অনুষ্ঠিত, এবং সেই বাসুদেবেই মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ গতি। অতএব যিনি বাসুদেবকে জানিতে পারিয়াছেন তাঁহার আর করণীয় কিছুই নাই।

এই বাসুদেব পৃথিবীর কল্যাণের জন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং দুষ্টের বিনাশ করিয়াছিলেন। বরাহ, নরনারায়ণ, মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বামন, রাম, বুদ্ধ প্রভৃতি অবতার হইয়াছিলেন এবং এই বাসুদেব কলিযুগের অবসানে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া কল্কি নামে বিখ্যাত হইবেন। এই সমস্ত অবতারই শ্রীকৃষ্ণের অংশ ও কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবান।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ১।৩।২৮

এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের মানুষ-লীলা এতই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী যে নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী আত্মারাম শ্রীশুকদেব সমগ্র বিষয়, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়াও আনন্দ সহকারে শ্রীভাগবত শ্রবণ ও বর্ণনা করিয়াছিলেন। কারণ,

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে,

কুর্ব্বন্ত্যহেতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ১।৭।১০

—অর্থাৎ যে সমস্ত মুনিগণ আত্মারাম, যাঁহাদের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাও শ্রীহরিতে অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন—শ্রীহরির এমনই আকর্ষণী শক্তি ও গুণ।

এই শ্লোকটি বৈষ্ণবগণ কর্তৃক অত্যন্ত সমাদৃত এবং ইহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা বিজড়িত হইয়া আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তখন পুরীতে অবস্থান করিতেছেন। একদিন জগন্নাথ মন্দিরে বেদান্তপণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের সমাধি অবস্থায় সাক্ষাৎ হইল। পরের ঘটনা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হইতেছে।

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে
আনন্দে করিল জগন্নাথ দরশনে।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা,
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা।
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিল
স্নেহ ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিল।
বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ।

বিনয়ের অবতারস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলেন—

প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ,
সেই ত কর্ত্তব্য আমার তুমি যেই কহ ॥

বৈদান্তিক সার্ব্বভৌমের মুখ হইতে বেদান্ত ব্যাখ্যা স্রোতের ন্যায় বাহির হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ মহাপ্রভু নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া সাতদিন তাহা শ্রবণ করিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইহার অপূর্ব্ব বর্ণনা আছে।

সাতদিন পর্য্যন্ত করে বেদান্ত শ্রবণে
ভালমন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে ॥
অষ্টম দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম
সাতদিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥
ভালমন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি
বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি ॥
প্রভু কহে মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করি যে শ্রবণ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি
তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে বিনয় প্রকাশ করিলে সার্ব্বভৌমের সন্দেহ হইল এবং কথাপ্রসঙ্গে শ্রীভাগবতের বিখ্যাত শ্লোকটি শ্রীগৌরাঙ্গ উল্লেখ করিলেন।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রর্ন্থা অপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্যহেতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১।৭।১০

ভট্টাচার্য্য কহিলেন—এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়।

প্রভু কহে তুমি কি অর্থ কর তাহা আগে শুনি,
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি।

ভট্টাচার্য্য এই শ্লোকের নয় রকম অর্থ করিলেন। প্রভু পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইয়া এই শ্লোকের আঠার প্রকার অর্থ করিলেন, অথচ ভট্টাচার্য্যের নয় রকম অর্থের কিছুই গ্রহণ করিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিপ্রধান ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সার্ব্বভৌমের

চৈতন্যপ্রসাদে মনের জাড্য সব গেল,
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল।

বহুদিন পরে পুনরায় শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট সার্ব্বভৌমের ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকের পূর্ব্বোক্ত আঠার প্রকার অর্থ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতনকে পুনরায় ইহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এইরূপে বৈষ্ণব সমাজে ভাগবতের শ্লোকটি চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

(৩)

শ্রীসূত মহাশয় বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা ভয়বিহ্বলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন এবং অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে বিনষ্ট করিতে আসিতেছে বলিয়া শিশুর প্রাণরক্ষা ভিক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিলে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুন্তীদেবীকৃত এই স্তবের মধ্যে নিম্নোক্ত শ্লোকটী ভক্তসমাজে সুপরিচিত। ৩

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্ গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভব দর্শনম্॥ ১৮।২৫

—অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, যে বিপদ উপস্থিত হইলে তোমার দর্শন লাভ হইয়া থাকে সেই সকল বিপদ জন্মে জন্মে আমাদের নিত্যই হউক। যে

বিপদে ভগবৎ দর্শন লাভ হয়, সেই বিপদও আমার কাম্য, আর যে সম্পদে ভগবৎ দর্শন নাই, সে সম্পদ বৃথা।

কুন্তীদেবী এইরূপে স্তব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার—যে লীলাকথার দশম স্কন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে—উল্লেখ করিলেন এবং অবশেষে বলিলেন,

শৃণ্বন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ, স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ,
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥
১।৮।৩৬

—অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, যে সকল মানব তোমার লীলা নিরন্তর শ্রবণ করেন, কীর্ত্তন করেন, শিষ্যদের প্রতি উপদেশ করেন, ধ্যান করেন, সেই সকল মানব অচিরেই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ কর্ম্মভোগ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া নিজপুরী দ্বারকায় গমন করিবার উদ্‌যোগ করিলেন।

প্রথম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের গমন ও ভীষ্মের মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ বর্ণিত হইয়াছে। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় "সর্ব্বধর্ম্মবিবিৎসয়া"—সকল ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার জন্য ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির তথায় গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তথায় উপস্থিত।

দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভূমৌ দিবশ্চ্যুতমিবামরম্,
প্রণেমুঃ পাণ্ডবা ভীষ্মং সানুগাঃ সহ চক্রিণা ॥ ১।৯।৪

—অর্থাৎ পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্বর্গচ্যুত দেবতার ন্যায় অম্লানদেহ শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবকে প্রণাম করিলেন।

সেখানে সহস্র সহস্র দেবর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি উপস্থিত—স্বয়ং শুকদেব, দেবর্ষি নারদ ও ব্যাসদেবও উপস্থিত, সেই মুনি-ঋষির সম্মুখে মুনি-ঋষি-পরিসেবিত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কিরীটপরিশোভিত মস্তক

ভীষ্ম-চরণে অবনত করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শতছিন্ন, রুধিরলিপ্ত ভীষ্মদেবের মুখ হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের নানাবিধ কথা শতধারায় বাহির হইতে লাগিল, সকলে—এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও—সেই সকল ধর্ম্মকথা অবহিতচিত্তে পরম-শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলেন। অতঃপর ভীষ্মদেব সকলকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। এই কৃষ্ণস্তুতির ভিতর একটি পংক্তি বিশেষভাবে পরিলক্ষণীয়। ভীষ্ম বলিতেছেন,

মম নিশিতশরৈঃ বিভিদ্যমান-
ত্বচি বিলসৎকবচেহ'স্তু কৃষ্ণে আত্মা।

—অর্থাৎ আমার তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা যাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আমার আত্মা সমর্পিত হউক।

অপূর্ব্ব কথা, অপূর্ব্ব ভাব। নিষ্কাম কর্ম্মের এমন উদাহরণ সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণে আর কোথাও নাই। ভীষ্ম জানিতেন যে শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ, পরমাত্মা; তথাপি দুর্য্যোধনের অন্নে তিনি প্রতিপালিত বলিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া সম্মুখে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে বাণসমূহের দ্বারা জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন। তিনি জানেন যে-পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সেই পক্ষের জয় অবশ্যম্ভাবী,—তিনি জানেন যাঁহাকে শস্ত্রাঘাত করিতেছেন তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীহরি। তথাপি নিষ্কামবুদ্ধিতে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতেছেন, প্রতিপক্ষের পুরোভাগে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণকে শরাঘাত করিতে তাঁহার মন সঙ্কুচিত হইতেছে না, তাঁহার কোন দ্বিধা-ভাব নাই। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম, ইহাই 'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।' অতঃপর ভীষ্মদেব উত্তরমার্গ অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহার দাহকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন।

মৃত্যুর পরে দুইটি সনাতন মার্গ আছে—একটি দেবযান, অপরটি পিতৃযান। দেবযানে জীবাত্মার গতি হইলে মুক্তিলাভ হয়, পিতৃযানে

গমন করিলে পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। দেবযানের আর একটি নাম উত্তরায়ণ বা উত্তর মার্গ এবং পিতৃযানের অপর নাম দক্ষিণায়ন মার্গ। মুক্তি দুই প্রকার—সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। উত্তরায়ণে ক্রমমুক্তি কিন্তু এই দেহে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সদ্যোমুক্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে দেবযান অথবা পিতৃযান—কোন মার্গই অবলম্বন করিতে হয় না। তিনি দেহ ধারণ করিয়াও জীবন্মুক্ত, মৃত্যুর দ্বার দিয়া তিনি মুক্তির অধিকারী।

শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, "দেশে চ কালে চ মনো ন সজ্জয়েৎ প্রাণান্ নিযচ্ছেৎ মনসা জিতাসুঃ"—যোগী স্বীয় প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে তীর্থক্ষেত্র অথবা উত্তরায়ণ কালের অপেক্ষা না করিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিবেন। সাধু পুরুষের পক্ষে সব সময়ই সুসময়, পৃথিবীর সমস্ত মাটীই তাঁহার নিকট তীর্থক্ষেত্র।

অতঃপর যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগ্নী সুভদ্রার অনুরোধে কয়েকমাস হস্তিনাপুরে অবস্থান করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য রথে আরোহণ করিলেন। তখন

অজাতশত্রুঃ পৃতণাং গোপীথায় মধুদ্বিষঃ,
পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ স্নেহাৎ প্রাযুঙ্‌ক্ত চতুরঙ্গিণীম্ ॥ ১।১০।৩২

—অর্থাৎ পাছে পথে শত্রুগণ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে এই ভয়ে রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার নিমিত্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেরণ করিলেন।

মহামায়ার অপূর্ব্ব লীলা। যিনি 'ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং' —ভয়ের ভয়স্বরূপ, ভীষণ অপেক্ষাও ভীষণ, যাঁহার কটাক্ষমাত্রে গ্রহগণ ভীত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করে, দেবাসুরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই অলঙ্ঘ্যবীর্য্য মহাভয়বিনাশন পরমপুরুষের রক্ষার জন্য সৈন্য নিযুক্ত করিতে হইতেছে! মহামায়ার কী বিচিত্র বিধান!

(৪)

পরীক্ষিতের জন্ম-বৃত্তান্ত

দ্বাদশ অধ্যায়ে পরীক্ষিতের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। যখন অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভ বিনষ্ট করিবার জন্য পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন, তখন

মাতুর্গর্ভগতো বীরঃ স তদা ভৃগুনন্দন !
দদর্শ পুরুষং কঞ্চিৎ দহ্যমানোঽস্ত্রতেজসা। ১।১২।৭

—অর্থাৎ মাতৃগর্ভস্থিত পরীক্ষিৎ ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে দগ্ধপ্রায় হইয়া কোনও এক পুরুষকে দেখিতে পাইলেন।

এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র নির্ম্মলকান্তিযুক্ত সুবর্ণ-কিরীটধারী শ্যামবর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। ইনিই পরীক্ষিৎকে মাতৃগর্ভে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিলেন। পরীক্ষিতের জন্মের পর ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, এই শিশু "বিষ্ণুরাত" অর্থাৎ বিষ্ণুকর্তৃক প্রদত্ত (রক্ষিত) এই নামে বিখ্যাত হইবেন। কিন্তু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু চতুর্দ্দিকে সমাগত আত্মীয়স্বজনগণকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—তিনি সেই গর্ভে-দৃষ্ট পুরুষকে সমবেত বীরমণ্ডলীর মধ্যে অন্বেষণ করিলেন। 'পরি' অর্থাৎ চারিদিকে 'ঈক্ষতে' অর্থাৎ কাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন, অতএব "বিষ্ণুরাত" পরবর্ত্তীকালে 'পরীক্ষিৎ' নামে জগতে বিখ্যাত হইলেন। এই যে মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণদর্শন তাহা একমাত্র পরীক্ষিৎ ব্যতীত অপর কাহারও ভাগ্যে সংঘটিত হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই রাজা পরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণলীলায় রতি পরিলক্ষিত হইত।

স বৈ ভাগবতো রাজা পাণ্ডবেয়ো মহারথঃ
বালক্রীড়নকৈঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণক্রীড়াং য আদদে ॥ ২।৩।১৫

—অর্থাৎ রাজা পরীক্ষিৎ বাল্যকালে খেলনা লইয়া খেলা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক খেলার অভিনয় করিতেন।

সুতরাং পরীক্ষিতের এই অপূর্ব্ব জীবন-বৃত্তান্ত মনে রাখিয়া আমাদিগকে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ, মুনিবালকের অভিশাপ, শুকদেবের শ্রীভাগবতবর্ণন সমস্তই উপলব্ধি করিতে হইবে।

মহামতি বিদুর তীর্থভ্রমণকালে মৈত্রেয় নামক ঋষির নিকট আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিদুরের তীর্থভ্রমণ ও বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ তৃতীয় স্কন্ধে ও চতুর্থ স্কন্ধে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রথম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিদুরের তীর্থ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার কথোপকথন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথমেই রাজা যুধিষ্ঠির মহামতি বিদুরকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,

ভবদ্বিধাঃ ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো,
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ১।১৩।১০

—অর্থাৎ আপনার ন্যায় পাপশূন্য মহাত্মাগণ স্বয়ং তীর্থের ন্যায় পবিত্র, আপনারা নিজেরা পবিত্র, আপনাদিগকে দর্শন করিলেও অপরে পবিত্র হইয়া যায়। বিশেষতঃ আপনারা সর্ব্বদাই শ্রীহরিকে অন্তরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তথাপি আপনারা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কারণ এই যে, বিষয়ী সংস্পর্শে তীর্থস্থান কলুষিত হইয়া যায়, আপনাদের সংস্পর্শে পাপস্পৃষ্ট তীর্থস্থান পুনরায় পবিত্রতা লাভ করে।

যখন গঙ্গাতীরে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনের সময় মুনি-ঋষিগণ উপস্থিত হইলেন সেই সময় সূত মহাশয় ঠিক অনুরূপ ভাবযুক্ত একটি শ্লোক ব্যবহার করিয়াছিলেন।

প্রায়েন তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি
তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ। ১।১৯।৮

—অর্থাৎ সাধুগণ প্রায়ই তীর্থযাত্রাচ্ছলে তীর্থস্থানসমূহকে পবিত্র করিয়া থাকেন। সাধুগণের তীর্থভ্রমণের কোন প্রয়োজন নাই

তথাপি তীর্থগুলিকে পবিত্র করিবার জন্য তাঁহারা তীর্থভ্রমণ করিয়া থাকেন।

অতঃপর বিদুর দেখিলেন যে ধৃতরাষ্ট্র অতিবৃদ্ধ এবং পুত্রশোকগ্রস্ত হইয়াও যুধিষ্ঠিরের অন্নদাস হইয়া নিশ্চিন্ত মনে দিন যাপন করিতেছেন—মৃত্যু যে তাঁহার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। তাই বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন।

রাজন্ নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশ্যেদং ভয়মাগতম্ ॥ ১।১৩।১৮

—হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আপনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া বনগমন করুন, মহা-ভয়ঙ্কর মৃত্যু আপনার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। বিদুর আরও বলিলেন—"হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ"—যে লোক বৃদ্ধ বয়সে শ্রীহরিকে হৃদয়ে সংস্থাপন পূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করেন তিনিই নরশ্রেষ্ঠ।

এদিকে যেদিন শ্রীকৃষ্ণ মানুষদেহ পরিত্যাগ করিয়া এই পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলেন, সেই দিনই "অভদ্রহেতুঃ কলিরন্ববর্ত্তত"—অর্থাৎ জীবের অমঙ্গলকারণ কলি আবির্ভূত হইল। তখন সম্রাট্ যুধিষ্ঠির "পুরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে তথাত্মনি"—নগরে, দেশে, গৃহে, এবং মানুষের অন্তঃকরণে—কলির প্রসার হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া এবং কলিকৃত লোভ, মিথ্যা, কুটিলতা ও হিংসাদি অধর্ম্ম সমূহ দর্শন করিয়া তাঁহার সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন পৌত্র পরীক্ষিৎকে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতিরূপে হস্তিনাপুরে অভিষিক্ত করিলেন এবং স্বয়ং "চীরবাসা নিরাহারো, বদ্ধবাঙ্ মুক্তমূর্দ্ধজঃ", —অর্থাৎ কৌপীনধারী, নিরাহারী, মৌনী ও মুক্তকেশবন্ধন হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত স্বর্গারোহণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

(৫)

পরীক্ষিৎ-কর্ত্তৃক কলি-নিগ্রহ

মহারাজ পরীক্ষিৎ সম্রাট্ হইয়া স্বীয় মাতুল উত্তরের কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করিলেন এবং ইরাবতীর গর্ভে তাঁহার জনমেজয় প্রভৃতি চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর কৃপাচার্য্যকে গুরুপদে বরণ করিয়া মহারাজ গঙ্গাতীরে "ভূরিদক্ষিণাম্" অর্থাৎ বহু দক্ষিণা যুক্ত তিনটি অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, এবং সেই যজ্ঞে "দেবা যত্রাক্ষিগোচরাঃ" অর্থাৎ দেবগণ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া মানবগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। কিন্তু পরীক্ষিতের ইহজীবনে দুইটি মাত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঘটনা,—তৎকর্ত্তৃক কলিনিগ্রহ এবং তাঁহার শ্রীভাগবতশ্রবণ। মহারাজ পরীক্ষিৎ একদিন শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে কলি প্রবেশ করিয়াছে। কলিকে উচ্ছেদ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মহারাজ অসংখ্য সৈন্য সমভি-ব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। বহুদূর অতিক্রম করিয়া সরস্বতী নদীর তীরে তিনি দেখিলেন যে দণ্ডহস্তে রাজবেশ ধারণ করিয়া জনৈক শূদ্র ত্রিপাদবিহীন একটি বৃষ ও অশ্রুনেত্রী একটি গাভীকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেছে। এই রাজবেশধারী শূদ্র কলি, বৃষরূপধারী স্বয়ং ধর্ম্ম এবং গাভীরূপিণী সর্ব্বংসহা পৃথিবী। পরীক্ষিৎ সেই অত্যাচারী শূদ্রকে বধ করিবার মানসে তৎক্ষণাৎ ধনুকে শর যোজনা করিলেন এবং বৃষকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,

> ন জাতু কৌরবেন্দ্রাণাং দোর্দ্দণ্ডপরিরক্ষিতে
> ভূতলে হ'নুপতন্ত্যস্মিন্ বিনা তে প্রাণিনাং শুচঃ ॥ ১।১৭।৮

—অর্থাৎ তুমি ভীত হইও না, কুরুবীরগণের ভুজদণ্ডে পরিরক্ষিত এই পৃথিবীতে এক তোমার শোকাশ্রু ব্যতীত অন্য কোনও প্রাণীর শোকাশ্রু কখনও পতিত হয় নাই।

গাভীকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বলিলেন,

মা রোদীরম্ব ভদ্রং তে খলানাং ময়ি শাস্তরি। ১।১৭।৯

—অর্থাৎ হে মাতঃ, তুমি রোদন করিও না, দুর্ব্বৃত্তগণের শাসক আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমার মঙ্গল হইবে।

পরীক্ষিৎ আরও বলিলেন যে, তিনি সম্রাটের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। সুতরাং এরূপ অত্যাচার তিনি কখনও সহ্য করিবেন না।

যস্য রাষ্ট্রে প্রজাঃ সর্ব্বাঃ ত্রস্যন্তে সাধ্ব্য সাধুভিঃ
তস্য মত্তস্য নশ্যন্তি কীর্ত্তিরায়ুর্ভগোগতিঃ॥ ১।১৭।১০
এষ রাজ্ঞঃ পরো ধর্ম্মোহ্যার্ত্তানামার্ত্তিনিগ্রহঃ
অত এনং বধিষ্যামি ভূতদ্রুহমসত্তমম্॥ ১।১৭।১১

—অর্থাৎ যে রাজার রাজ্যে প্রজাগণ দুষ্ট কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়, রাজ্য পালনে অক্ষম সেই রাজার কীর্ত্তি, আয়ু, ঐশ্বর্য্য এবং পুণ্যলোক-প্রাপ্তি—এই সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। দুঃখিত প্রজাগণের দুঃখমোচন করাই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অতএব আমি ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত জীব-হিংসাকারী অতিশয় দুষ্ট এই শূদ্রকে বধ করিব।

বৃষরূপী ধর্ম্মের চারিটি পদ—তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বেই কালবশে তিনটি পদ বিনষ্ট হইয়াছে, সত্যরূপ চতুর্থ পদটি এখনও কলিকালে আছে, তাহাও এই শূদ্র কলি বিনষ্ট করিতে সমুৎসুক। গো-রূপধারিণী পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ব্রাহ্মণদ্বেষী মিথ্যারাজার উৎপীড়নে দুঃখিতা হইয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন। পরীক্ষিৎ এই নিগ্রহের রহস্য অবগত হইয়া সুতীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করিয়া কলিকে বধ করিবার উদ্যোগ করিলে, কলি প্রাণভয়ে মহারাজার চরণে নিপতিত হইল।

শরণাগত কলিকে মহারাজ বধ করিলেন না, কিন্তু বলিলেন,

ন বর্ত্তিতব্যং ভবতা কথঞ্চন ক্ষেত্রে মদীয়ে ত্বমধর্ম্মবন্ধুঃ। ১।১৭।৩১

—অর্থাৎ তুমি আমার এই রাজ্যে থাকিতে পারিবে না। তুমি অধর্ম্মের পরমবন্ধু।

এইরূপে দেশত্যাগ করিবার আদেশ পাইয়া চতুর কলি দয়ালু পরীক্ষিৎকে বলিলেন, "আপনি সার্ব্বভৌম মহারাজ, আমি যেখানেই যাই না কেন আপনার ভয়ে আমার স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা অসম্ভব হইবে, আমি কোথাও নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে পারিব না। অতএব হে মহারাজ, যেখানে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া স্থিরভাবে বাস করিতে পারি এমন স্থান আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" তখন পরীক্ষিৎ পাঁচটি স্থান কলিকে বাস করিবার জন্য প্রদান করিলেন—পাশক্রীড়া, মদ্যপান, পরস্ত্রী-উপভোগ, প্রাণি-হিংসা এবং স্বুবর্ণ,—অধর্ম্মের আকর এই পঞ্চবিধ স্থান অধিকার করিয়া কলি স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মানবলীলা সংবরণের সঙ্গে সঙ্গেই কলি পৃথিবীতে প্রবেশলাভ করিলেও, যতদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন ততদিন পৃথিবীতে কলি নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিল যে, সকল অনর্থের মূল কলিকে বিনাশ করিলেই ত পৃথিবীর মঙ্গল হইত, অথচ মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহাকে প্রাণভিক্ষা দিয়া এবং তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া পৃথিবীর ভাবী অধর্ম্মের পথ বিস্তৃত হইতে অপরোক্ষভাবে সাহায্য করিলেন কেন? উগ্রশ্রবা এই সন্দেহের নিরসন করিবার জন্য বলিলেন,

নানুদ্বেষ্টি কলিং সম্রাট্ সারঙ্গ ইব সারভুক্,
কুশলান্যাশু সিধ্যন্তি—নেতরাণি কৃতানি যৎ॥ ১।১৮।৭

—অর্থাৎ সম্রাট্ পরীক্ষিৎ ভ্রমরের ন্যায় গুণগ্রাহী ছিলেন, সুতরাং কলিকে বিনাশ করিলেন না। কলি যদিও সকল অধর্ম্মের মূল, তথাপি তাহার একটি প্রধান গুণ ছিল—কলিযুগে পুণ্যকর্ম্মের মনে মনে সঙ্কল্প করিলেই তাহাতে পুণ্যসঞ্চয় হয়, কিন্তু মনে মনে পাপকর্ম্ম চিন্তা করিলেও

তাহাতে কিছুমাত্র পাপ হয় না। পাপচিন্তা কর্ম্মে পরিণত করিলে তবে পাপ হয়, নতুবা কেবল চিন্তাতেই পাপস্পর্শ করিতে পারে না। কলির এই মহৎগুণ থাকায় পরীক্ষিৎ কলিকে একেবারে বিনাশ করিলেন না।

বিষ্ণুপুরাণেও কলিযুগ মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।

যৎ কৃতে দশভির্বর্ষৈঃ ত্রেতায়াং হায়নেন যৎ
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎ কলৌ ॥

—অর্থাৎ সত্যযুগে যে ধর্ম্মসিদ্ধি লাভ করিতে দশবৎসর সময় লাগে, ত্রেতায় একবৎসর লাগে, দ্বাপরে একমাস প্রয়োজন হয়, সেই সিদ্ধি কলিযুগে একদিন ও একরাত্রির সাধনামাত্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৬)

পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ

এমন যে দয়ালু মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহার প্রতি ব্রহ্মশাপের কাহিনী শুনিবার জন্য মুনিগণ কৌতূহল প্রকাশ করিলে সূত বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন যে মহাভাগবত কলি-নিগ্রহকারী পরীক্ষিতের প্রতি অভিশাপ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথার সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলাসমন্বিত পরীক্ষিৎ-কাহিনী সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করা অল্পবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তথাপি উগ্রশ্রবা তাঁহার সাধ্যমত সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করিবেন।

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ স্তথা সমং
বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥ ১।১৮।২৩

—অর্থাৎ পক্ষিগণ অনন্ত আকাশের উর্দ্ধে নিজের সাধ্যমতই উড়িতে পারে, সেইরূপ পণ্ডিতগণও নিজের সামর্থ্যানুসারে ভগবৎলীলা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এইরূপ বৈষ্ণবোচিত দীনতা ও বিনয় প্রকাশ করিয়া সূতমহাশয় পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপের কাহিনী বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

একদা ধনুরুদ্যম্য বিচরন্ মৃগয়াং বনে,
মৃগাননুগতঃ শ্রান্তঃ ক্ষুধিত স্তৃষিতো ভৃশম্ ॥
জলাশয়মচক্ষাণঃ প্রবিবেশ তমাশ্রমম্,
দদর্শ মুনি মাসীনং শান্তং মীলিতলোচনম্ ॥ ১।১৮।২৪।২৫

—অর্থাৎ একদিন ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থ বনে বিচরণ করিতে করিতে মৃগের অনুসরণে অত্যন্ত ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলাশয় দেখিতে না পাইয়া নিকটস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় উপবিষ্ট প্রশান্ত ও মুদ্রিতনয়ন শমীক মুনিকে দেখিতে পাইলেন। প্রার্থনা করিয়া মুনির নিকট জল না পাইয়া

অবজ্ঞাতমিবাত্মানং মন্যমানশ্চুকোপ হ। ১।১৮।২৮

—আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। পরীক্ষিতের তখন বিধিবশে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গেই স্থির বিচারশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার সন্দেহ হইল যে মুনি হয়ত ক্ষত্রিয়ের প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ কপট সমাধি অনুকরণ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। এই মনে করিয়া রাজা মুনির গলদেশে মৃতসর্প স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে শমীকের পুত্র শৃঙ্গী বালকগণের সহিত খেলা করিতে করিতে পিতার অবমাননা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন,

অহো অধর্ম্মঃ পালানাং পীব্নাং বলিভুজামিব,
স্বামিন্যঘং যদ্দাসানাং দ্বারপানাং শুনামিব ॥ ১।১৮।৩৩

—অর্থাৎ যাহারা কাকের ন্যায় প্রভুর অন্নপুষ্ট এবং দ্বাররক্ষক কুকুরের ন্যায় ব্রাহ্মণ-প্রভুর রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে সেই ভৃত্যস্থানীয় রাজা আজ ঐশ্বর্য্যপুষ্ট হইয়া মুনির অবমাননা করিতেছে—ইহা বড়ই আশ্চর্য্য !

এইস্থানে শৃঙ্গীর তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক অসংযত ভাষা পরিলক্ষণীয়। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের মহারাজা পরীক্ষিৎকে কাক এবং কুকুরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শৃঙ্গী আরও বলিলেন,

তদ্ভিন্নসেতু মদ্যাহং শাস্মি পশ্যত মে বলম্॥ ১।১৮।৩৫

—এই মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী রাজাকে আমি কিরূপ শাস্তি দিতে সমর্থ তাহা তোমরা দেখ। এই বলিয়া "রোষতাম্রাক্ষঃ"—ক্রোধে আরক্ত-লোচন শৃঙ্গী কৌশিকী নদীর জলে আচমন করিয়া "বাগ্‌বজ্রং বিসসর্জ্জ হ" —বজ্রসম অভিশাপবাক্য প্রয়োগ করিলেন।

ইতি লঙ্ঘিতমর্য্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেঽহনি

ধক্ষ্যতিস্ম কুলাঙ্গারং চোদিতো মে তাতদ্রুহম্॥ ১।১৮।৩৭

—যে কুলাঙ্গার আমার পিতার গলদেশে সর্প স্থাপন করিয়া পিতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে, সেই রাজা পরীক্ষিৎকে অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে আমাকর্ত্তৃক প্রেরিত তক্ষক নাগ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত শৃঙ্গী পিতা শমীকের আশ্রমে ফিরিয়া আসেন নাই—ক্রীড়াসঙ্গিগণের নিকট পরীক্ষিতের কার্য্য শ্রবণ করিয়া সেই ক্রীড়া-ভূমিতেই মহারাজার প্রতি শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। যখন বজ্র-নির্ঘোষের সহিত অভিশাপবাক্য পরীক্ষিতের মস্তকে নিপতিত হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ অকল্যাণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে, তখন বালক শৃঙ্গী আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার গলদেশে মৃত সর্প দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। শমীকের তপোভঙ্গ হইল, তিনি পুত্রের রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া শৃঙ্গীকে "অবিপক্কবুদ্ধে"—মূর্খ বলিয়া তিরস্কার করিলেন। ঋষি বলিলেন যে, নরপতি বিনষ্ট হইলে সনাতন ধর্ম্ম লোপ পাইবে এবং মানবসমাজে "শুনাং কপীনামিব বর্ণসঙ্করঃ"—কুকুর এবং বানরগণের ন্যায় বর্ণসঙ্কর

উপস্থিত হইবে। অবশেষে মুনি শমীক পুত্রের অপরাধের জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

অপাপেষু স্বভৃত্যেষু বালেনাপক্কবুদ্ধিনা
পাপং কৃতং তদ্ভগবান্ সর্ব্বাত্মা ক্ষন্তুমর্হতি॥ ১।১৮।৪৭

—অর্থাৎ আমার অপরিণতবুদ্ধি বালক পুত্র নিরপরাধ ভগবদ্ভক্ত পরীক্ষিতের প্রতি শাপ প্রদান করিয়া যে অপরাধ করিয়াছে, সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ তাহা ক্ষমা করুন।

বৃদ্ধ, স্থিরবুদ্ধি, অভিজ্ঞ ঋষি এবং অল্পবয়স্ক, চঞ্চলমতি, বালক-তপস্বীর মধ্যে ইহাই প্রভেদ। একজন তপস্যাসম্ভূত শক্তিসমূহ সহজেই ধারণ করিতে পারেন, অপব্যবহার করিবার কোনও কারণ মনে উপস্থিত হয় না, অপর জন আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চিত হইলে চঞ্চল হইয়া উঠেন—ক্রোধ দমন করিতে পারেন না, হয়ত তপস্যা-প্রসূত বিভূতিশক্তির অপপ্রয়োগ-দ্বারা জগতের সমূহ ক্ষতিসাধন করিয়া ফেলেন। শৃঙ্গী পিতার অবমাননাকারী মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি 'কাক' 'কুকুর' প্রভৃতি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ গৃহস্থ সমাজেও গর্হিত—মুনি-ঋষির মুখে তো মোটেই শোভা পায় না। তিনি যখন ক্রীড়াস্থলে, তখন পিতার অবমাননার কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্রমে ফিরিয়া তাহা দর্শন করিবার মত মনের ধৈর্য্য অথবা বিচারবুদ্ধি তাঁহার ছিল না—তিনি হঠাৎ অস্থিরচিত্ত হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। "পশ্যত মে বলম্" বলিয়া ক্রীড়ার সঙ্গিগণের সম্মুখেই নিজ বিভূতিশক্তির অহঙ্কার করিতে তাঁহার লজ্জাবোধ হইল না—যেন একজন কলহপটু গৃহী সর্ব্বসমক্ষে তাহার বাহুবলের বড়াই করিতেছে! আশ্রমে ফিরিয়া ঋষি-পিতার গলদেশে মৃত সর্প দেখিয়া সাধারণ শোকগ্রস্ত বদ্ধজীবের ন্যায় শৃঙ্গী রোদন করিয়াছিলেন—এই উচ্ছ্বসিত বন্ধনবিহীন শোক শৃঙ্গীর দুর্ব্বলচিত্তের পরিচায়ক। অপরিপক্ক যোগিগণের এইরূপ ব্যর্থতা ও চঞ্চলতা জগতে

অশেষ অনিষ্টের আকর। কিন্তু বৃদ্ধ ঋষি যাহাই বলুন না কেন, তেজস্বী পুত্রের অমোঘবাক্য ব্যর্থ করিতে পারিলেন না, ভারতবর্ষের ধর্ম্মসমাজে একটা গুরুতর দুর্ঘটনার সূত্রপাত হইল।

(৭)

পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবের আগমন

মহারাজ অভিশাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিলেন। তাঁহার প্রায়োপবেশনের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে নানাদিক্-দেশ হইতে বহু নরনারী, মুনি ঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহস্র সহস্র রাজর্ষি ও মহর্ষিগণের মধ্যে বিশেষ করিয়া কয়েকজনের নাম শ্রীশুকদেব তিনটি শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন।

অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ শরদ্বা-নরিষ্টনেমি র্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ,
পরাশরো গাধিসুতোঽথ রাম উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদঃ সুবাহুঃ ॥
মেধাতিথির্দেবলঃ আর্ষ্টিষেণো ভরদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ,
মৈত্রেয় ঔর্ব্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনি র্দ্বৈপায়নো ভগবান্ নারদশ্চ ॥
অন্যে চ দেবর্ষিমহর্ষিবর্য্যা রাজর্ষিবর্য্যা অরুণাদয়শ্চ,
নানার্ষেয় প্রবরান্ সমেতা-নভ্যর্চ্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে॥ ১।১৯।৯-১১

এই যে বিশেষ করিয়া কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পরিলক্ষণীয়। এই মহাত্মাগণের নাম উচ্চারণ করিলেই পুণ্যসঞ্চার হয়, তাঁহাদের জীবনের প্রধান প্রধান কাহিনী ও সাধনভজন বিদ্যুৎবেগে শ্রোতার মনকে উজ্জ্বল ও পবিত্র করিয়া দেয়। সমগ্র নামগুলি সুস্পষ্টভাবে ও মনোযোগের সহিত উচ্চারণ করিলে সমষ্টিগতভাবে একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্য সহজেই শ্রুতিগোচর হয়,—একটা ছন্দঃস্রোত যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত প্রবাহিত হইতেছে, গম্ভীর শব্দশক্তি বিক্ষিপ্ত মনকে সমাহিত করিয়া শ্রীভাগবতশ্রবণের পক্ষে অনুকূল করিয়া তুলিতেছে।

শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধ নবম অধ্যায় ও অন্যান্য নানাস্থানে মহাকবি শ্রীশুকদেব মানুষের বিক্ষিপ্ত মনকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপ নামগুলির পরস্পর সংযোজনা ও সংঘর্ষ হইতে যেন হঠাৎ একটা বজ্রনির্ঘোষ উত্থিত হইতেছে, শ্রোতৃগণ চমকিত হইতেছেন, মন কুড়াইয়া লইতেছেন, সমাহিতচিত্ত হইয়া শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতেছেন। তবে এই উদাত্ত শব্দসঙ্গীত অনেকটা পাঠকের কণ্ঠস্বর ও জিহ্বার বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে।

শ্রীশুকদেবও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীউগ্রশ্রবা সূত মহাশয় এই স্থলে চারিটী শ্লোকে শ্রীশুকদেবের অপূর্ব্ব বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। এই শ্লোকগুলির মধ্যে শেষ শ্লোকটি বিশেষ করিয়া পরিলক্ষণীয়।

শ্যামং সদাপীব্যবয়োহ'ঙ্গলক্ষ্ম্যা স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং রুচিরস্মিতেন,
প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্য-স্তল্লক্ষণজ্ঞা অপিগূঢ়বর্চ্চসম্‌॥ ১।১৯।২৮

—অর্থাৎ শ্রীশুকদেব শ্যামবর্ণ, তাঁহার দেহে যৌবনসুলভ-কান্তি, মুখে মধুর হাস্য, সমস্ত দেহ স্ত্রীলোকগণেরও মনোহরণ করে। মুনিগণ এই তেজস্বী ঋষিকে শুকদেব বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং সকলে নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

এই শ্লোকটিতে 'শ্যামং'—শ্যামবর্ণ—কথাটি লক্ষ্য করিতে হইবে। উগ্রশ্রবা সূত মহাশয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। শুকদেব সর্ব্বদাই ভক্তিরসে নিমগ্ন, সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণচিন্তন করিয়া, তদ্ভাবভাবিত হইয়া, তদাকারকারিত হইয়া গিয়াছেন। তাই অহরহঃ শ্রীকৃষ্ণচিন্তনের ফলে শ্রীশুকদেবের জন্মকালীন গৌরবর্ণ আজ শ্যামবর্ণে পরিণত হইয়াছে। তিনি কালজয়ী, সুতরাং তাঁহার জন্মকালীন আকৃতিতে কাল কোন পরিবর্ত্তন আনিতে সমর্থ হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তনের ফলে তিনি কালজয়ী, সর্ব্বজয়ী। তাই ঐ একমাত্র পরিবর্ত্তন

শুকদেহে আসিয়াছে—তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে রূপায়িত হইয়া গিয়াছেন। শ্রীভাগবতের অন্যত্র শিশুপালের শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপতাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভবো হি ভবকারণম্'—শিশুপাল শত্রুভাবেও সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইল, কারণ সতত ধ্যানই ধ্যেয়বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্তির একমাত্র কারণ।

মহারাজা পরীক্ষিৎ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীশুকদেবকে পূজা করিয়া বলিলেন,

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্
পুরুষস্যেহ যৎ কার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্ব্বথা॥ ১।১৯।৩৭

—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই আপনাকে পাইয়াছি। অতএব যোগিগণের পরম গুরু আপনাকে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে মুমূর্ষু মানবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমাকে বলুন।

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া "প্রত্যভাষত ধর্ম্মজ্ঞো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ" —ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব প্রত্যুত্তর দিলেন। শ্রীশুকদেব যাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন তাহা দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম হইতেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রথম স্কন্ধে যে সমস্ত কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা সমস্তই শ্রীভাগবত বর্ণনার মুখবন্ধ স্বরূপে শ্রীউগ্রশ্রবা সূত-কর্ত্তৃক কথিত—প্রথম স্কন্ধে শ্রীশুকদেবের মুখের কোনও কথা লিপিবদ্ধ নাই। এই প্রথম স্কন্ধের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ঘটনা পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী অঙ্গরূপে শ্রীশুকদেবের গঙ্গাতীরে মৃত্যু-সভায় আগমন। সেইজন্য এই স্কন্ধের শেষ দুইটি অধ্যায়—অষ্টাদশ ও উনবিংশ অধ্যায়—যথাক্রমে "বিপ্রশাপোপলম্ভঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মশাপরূপ লাঞ্ছনা এবং "শ্রীশুকাগমনং" নামে শ্রীভাগবতে পরিচিত।

দ্বিতীয় স্কন্ধ

(১)

শ্রীশুকদেবের নিকট পরীক্ষিতের প্রশ্ন

এই দ্বিতীয় স্কন্ধে স্বয়ং শ্রীশুকদেব শ্রীভাগবত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকেই

শ্রীশুক উবাচ

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ !
আত্মবিৎ সম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ। ২।১।১

—অর্থাৎ শ্রীশুক বলিলেন—হে রাজন্, আপনি মানুষের পক্ষে যাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের অতি প্রিয় এবং অত্যুত্তম সেই প্রশ্ন করিয়াছেন,—এই প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর জগতের কল্যাণ সাধন করিবে।

এইরূপে শ্রীশুকদেব তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত বচনের দ্বারা যুগপৎ মহারাজকে উৎসাহিত এবং উপস্থিত ঋষিবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন এবং সর্ব্বযুগের মানবমণ্ডলীকে অমূল্য মানবজীবন সম্বন্ধে সাবধান ও সচেতন করিবার জন্য পুনরায় বলিলেন,

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ
দিবা চার্থেহয়া রাজন্, কুটুম্বভরণেন বা ॥ ২।১।৩

—অর্থাৎ গৃহী মানুষের আয়ু রাত্রিতে নিদ্রা, অথবা ইন্দ্রিয়সেবায় এবং দিনে অর্থোপার্জ্জন অথবা পরিবারবর্গ ভরণ-পোষণের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সুতরাং পরীক্ষিতের প্রশ্ন এবং শুকদেবের উত্তর মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিলে ক্রমশঃ চৈতন্য হইয়া মানব জাতির দৈহিক, মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। সাধারণতঃ মানবগণ

দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া থাকে, গুরুজনগণ "দীর্ঘজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, কিন্তু শুকদেব বলিতেছেন যে বিষয়রসে আসক্ত ব্যক্তির দীর্ঘ জীবন সম্পূর্ণ বৃথা ও নিষ্প্রয়োজন। দীর্ঘ জীবন তাহারই পক্ষে কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় যে সচেতন ভাবে ভগবৎ-চিন্তায় সেই সময়ের সুব্যবহার করিয়া থাকে, বিষয়ভোগলোলুপ মানুষের পক্ষে দীর্ঘায়ু অথবা অল্পায়ু উভয়ই সমভাবে নিরর্থক। জীবনের শতবর্ষ বৃথা ভোগসুখে অপব্যয়িত করিয়া যদি কোনও লোক আয়ুর শেষ দিনটুকু ভগবৎ-আরাধনায় অতিবাহিত করিতে পারে তাহা হইলে সেই একদিনের মূল্য ও সার্থকতা, উদাসীন শতবর্ষ অপেক্ষাও অধিক।

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটেত শ্রেয়সে যতঃ। ২।১।১২

—অর্থাৎ এই সংসারে দেহাদি বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তির ভগবৎ-চিন্তারহিত বহুবর্ষ পরমায়ু লাভে কি ফল? কোনও ফল নাই। পরন্তু "এইটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহা যেন বৃথা না যায়"—এই প্রকারে জ্ঞাত মুহূর্ত্ত কালও শ্রেষ্ঠ, কারণ সেই মুহূর্ত্ত শুভ চিন্তায় অতিবাহিত হইলে অশেষ মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।

এই শ্লোকটি বিশেষ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের অতীত জীবনের ইতিহাস এবং বর্ত্তমান জীবনের উপায়স্বরূপ। পরীক্ষিৎ বহুবর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়াছেন, তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, কলি নিগ্রহ করিয়াছেন, মৃগয়া করিয়া বহু পশু নিধন করিয়াছেন, রাজসিক ও তামসিক বুদ্ধিপ্রদীপ্ত মন লইয়া অর্থ, গৌরব এবং ইন্দ্রিয় ভোগের লালসায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু আজ মৃত্যুর সম্মুখে তাঁহার সেই সমগ্র ভোগসুখসমৃদ্ধ জীবন মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। বাকী আছে জীবনের আর সাতদিন মাত্র। এখনও যদি তাঁহার চেতনা হয় এবং এই সাতদিন নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তনে অতিবাহিত করেন

তাহা হইলে মহারাজের জীবনের এই অবশিষ্ট সাত দিনই সমগ্র জীবনের নিষ্ফলতা বিদূরিত করিয়া তাঁহার তুর্লভ মনুষ্যজীবন সার্থক করিবে। অতএব

তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য ! সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ
উপকল্পয় তৎ সর্ব্বং তাবদ্ যৎ সাম্পরায়িকম্ ॥ ২।১।১৪

—অর্থাৎ হে কুরুনন্দন, আপনার কিন্তু এখনও সাতদিন জীবনকাল আছে। অতএব আপনি এই সপ্তাহকাল মধ্যে যাহা পরলোকে হিতকর সেই কার্য সম্যকরূপে অনুষ্ঠান করুন।

পরীক্ষিতের জীবনের সাতদিন আর অবশিষ্ট আছে, অপর কাহারও হয় ত সাতমাস, কাহারও বা সাতবর্ষ, এমনকি ত্রিশ চল্লিশ বৎসরও বাকী থাকিতে পারে ; কিন্তু অনন্ত-কাল-সমুদ্রে সাতদিন যেমন ক্ষণস্থায়ী, সাত মাস অথবা ত্রিশ বৎসরও সেইরূপ তুচ্ছ ও চঞ্চলগতিশীল। দেখিতে দেখিতে কাল অতিবাহিত হইতেছে, আয়ুষ্কালও অনিশ্চিত সুতরাং মানুষ আজই সচেতন না হইলে হয়ত আর সচেতন হইবার সময় পাইবে না, একটা অমূল্য মানবজীবন বৃথাই নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই এই শ্লোকটি যেমন পরীক্ষিতের প্রতি সাবধান বাণী, তেমনই ইহাকে প্রত্যেক মানুষের প্রতি দয়ালু শ্রীশুকদেবের কৃপালিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে —"সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ, সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ।"

এই কৃপালিপি, এই সাবধানবাণী বিষয়ী মানুষের জীবনে সদা সর্ব্বদাই প্রয়োজন। বিষয়ী লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় যেন মৃত্যুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহারা অজ্ঞ অথবা উদাসীন। সংসারী জীবের জীবনযাত্রার জন্য কর্ম্ম প্রয়োজন, অর্থ প্রয়োজন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মৃত্যুও একটা বৃহৎ সত্য, ইহা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। সংসারী মানুষ মনে রাখে না বলিয়াই ইহ সংসারে যত অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মৃত্যুই মানবজীবনের পরিণতি, একটা জাতিও

মৃত্যুর অধীন, ইহা সংসারী মানব বিস্মৃত হইয়া থাকে বলিয়াই এই পৃথিবীতে চুরি, ডাকাতি, অত্যাচার, দম্ভ, অহঙ্কার, পরশ্রীকাতরতা, দ্বেষ, হিংসা এবং যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মানুষের উচ্ছৃঙ্খল পশু-প্রবৃত্তিকে দমন করিতে হইলে মৃত্যুসম্বন্ধে সচেতনতা সর্ব্বদাই প্রয়োজন। কিন্তু বিষয়ী মানুষ তাহা করে না, তাই পরমকারুণিক শ্রীশুকদেব সংসারী মানুষকে সাবধান করিয়া দিতেছেন—পরীক্ষিৎকে দেখ, সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ। তোমারও আয়ু অনন্ত নহে, মৃত্যু তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, জীবনের আচরণ, মৃত্যুর সচেতনতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর। কিন্তু মানুষ তাহা করে না। সে তাহার আয়ুষ্কালের হিসাব নিকাশ করে, এবং এই হিসাব নিকাশের ফলে সে সর্ব্বদাই মনে করে যে তাহার মৃত্যুর এখনও দেরী আছে, বহু দেরী আছে। মানুষ পাঁচজন জ্যোতিষী ডাকিয়া নিজের জীবনের কোষ্ঠী বিচার করায়, যে জ্যোতিষী বলে যে তাহার আয়ুষ্কাল নব্বই বৎসরের অধিক, সেই জ্যোতিষীকে প্রচুর দক্ষিণা দেয়, এবং মনের আনন্দে ন্যায় ও অন্যায় পথে বিষয়কর্ম্ম করিতে থাকে। আরও হিসাব আছে। বাবা খুড়া জ্যাঠা হয়ত আশী বৎসর জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাহাদের বংশ দীর্ঘজীবী, অতএব এই হিসাবী মানুষও আশী বৎসর বাঁচিবে,—এই ধারণা মনে বদ্ধমূল করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে। কখনও বা বিষয়ী মানুষ স্ত্রীর জন্মপত্রিকা বিচার করায়—জ্যোতিষী হয়ত বলে স্ত্রীর বৈধব্যযোগ নাই। তখন বিষয়ী মানুষ বৃদ্ধ বয়সে হৃষ্টচিত্তে বসিয়া বসিয়া বিষয় চিন্তা করিতে থাকে—মনে করে যে আগে স্ত্রীর মৃত্যু হউক, ঘটা করিয়া তাহার শ্রাদ্ধ করি, তখন নিজের মৃত্যুর জন্য চিন্তা, ভগবৎ-চিন্তা করিলেই চলিবে। এইরূপে নানাবিধ অঙ্ক কষিয়া যুক্তিতর্ক অবলম্বন করিয়া বদ্ধ জীব নিশ্চিন্ত হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিতে থাকে, কিন্তু মহাকাল হয়ত হিসাবনিকাশ, জ্যোতিষগণনা, আশাভরসা সবই ওলট পালট করিয়া দিয়া একদিন বদ্ধ জীবের চুলের

মুঠি ধরিয়া টানিতে টানিতে যমরাজের নিকট তাহার কৃতকর্ম্মের বিচারের জন্য লইয়া যায়, স্ত্রী পুত্র পরিবারের নিকট বিদায় লইবার জন্য এক মুহূর্ত্তও সময় দেয় না।

"সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ"। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের সতর্কবাণীর আরও গভীরতর ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। শ্রীশুকদেব ইঙ্গিত করিতেছেন যে মানুষের দুই প্রকারের মৃত্যু আছে, একটী সম্মানের মৃত্যু, অপরটী অপমানের মৃত্যু। ভগবৎচিন্তাশীল মানুষ মৃত্যুকে আগত দেখিয়া ভগবৎস্মরণ করিতে করিতে মৃত্যুকে বলেন যে তিনি প্রস্তুত, এই মুহূর্ত্তেই তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত,—মৃত্যু যেন তাঁহাকে অপমানিত না করে, তিনি এখনই সহজে, স্বেচ্ছায় মৃত্যুর সহিত অনন্তযাত্রা করিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে মৃত্যু সম্মানজনক, মৃত্যু অমৃতের দ্বারস্বরূপ মাত্র। কিন্তু বিষয়ী জীব মৃত্যু দেখিয়া ভয় পায়, স্ত্রীপুত্রপরিবারগণকে আঁকড়াইয়া ধরে, বিচ্ছেদভয়ে রোদন করিতে থাকে, সংসারের ঐশ্বর্য্য পড়িয়া থাকিল বলিয়া কাতর হইয়া জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে বারংবার লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই মৃত্যু আসিয়া সেই রোদনশীল মায়াবদ্ধ জীবকে কেশে ধরিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে শূন্যপথে কোথায় লইয়া চলিয়া যায়। এইরূপ মৃত্যুর পরিণাম কি তাহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। তাই অজামিল-আখ্যান বর্ণনার সময় শ্রীশুকদেব বলিয়াছেনঃ

নৈবাচ্যুতাশ্রয়জনং প্রতিশঙ্কমানাঃ
দ্রষ্টুঞ্চ বিভ্যতি ততঃ প্রভৃতি স্ম রাজন্‌॥

—হে পরীক্ষিৎ, যমদূতগণ শ্রীকৃষ্ণশরণাগত ব্যক্তিকে দর্শন করিতেও ভয় পাইয়া থাকে, নিকটে যাইয়া তাহাকে পাশবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা।

মৃত্যুকালে মৃত্যুদর্শন,—মৃত্যু আসিয়াছে এই জ্ঞান, সকল জীবেরই হইয়া থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষকে মৃত্যু স্পর্শ

করে না—সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তবেই মৃত্যু মানুষের দেহ হইতে প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। আমরা যে সমস্ত মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে অজ্ঞান বলিয়া মনে করি তাহা আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রম, দেহ মোহাচ্ছন্ন হইলেও, মন সচেতন, মৃত্যুকালে মনের ভিতর জাগ্রত অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীশুকদেবের কৃপাবাণী সকলেরই মনে রাখিতে হইবে—"সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ"—সর্ব্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।

এইরূপে মুমূর্ষু পরীক্ষিৎকে সাবধান হইতে বলিয়া শ্রীশুকদেব অষ্টাঙ্গযোগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন, ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়াসক্তি হইতে প্রত্যাহার করিবার যোগসম্মত কৌশল বলিয়া দিলেন এবং অবশেষে সহস্রশীর্ষ ভগবানের বিরাট দেহ বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন,

তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত
নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ। ২।১।৩৯

—অর্থাৎ সেই সত্য স্বরূপ আনন্দনিধি বিরাট্ পুরুষের ভজনা করা উচিত। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু আছে মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ এরূপ মিথ্যা আসক্তিতে আত্মার অধোগতি হইয়া থাকে।

কিন্তু হরিভক্তিতেই এইরূপ যোগ-অভ্যাসের একমাত্র পরিণতি। ভগবান্ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দাদি প্রমাণবেদ্য।

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্, হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥ ২।২।৩৬

—অর্থাৎ হে রাজন্, যেহেতু বাসুদেবে ভক্তিযোগ ব্যতীত আর মঙ্গলময় পথ নাই, অতএব ভগবান্ বাসুদেবকথা সকল অবস্থাতে সকল সময়ে সর্ব্বান্তঃকরণে মানবগণের শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়। বক্তা থাকিলে হরিকথা শ্রবণ করিবে, বক্তার অভাবে শ্রোতা থাকিলে কীর্ত্তন

করিবে, বক্তা ও শ্রোতার অভাবে মনে মনে স্মরণ করিবে। ফলতঃ শ্রীহরির আশ্রয় ব্যতীত কখনও নিরালম্ব অবস্থায় থাকিবে না। শ্বাসে-প্রশ্বাসে পথে-ঘাটে সুখে-দুঃখে সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে হরি স্মরণ করাই বিধেয়।

সর্ব্বশাস্ত্রে অহরহঃ ভগবৎস্মরণের বিধান দেওয়া হইয়াছে। মনকে সর্ব্বদাই শুভনামের চিন্তায় নিযুক্ত রাখিতে পারিলে মনের ভিতর অপচিন্তার মরিচা ধরিতে পারে না। সাধারণ ভাষায় আমরা ধর্ম্মসাধনকে দুইটী বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত করিতে পারি ;—একটি পোষাকী ধর্ম্ম, অপরটী আটপৌরে ধর্ম্ম। পোষাকী ধর্ম্ম কি ? বৎসরে একবার দুর্গাপূজা করা হইতেছে, মহাষ্টমীর দিন মহামায়ার শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান করা হইতেছে, মাসে একবার লক্ষ্মীপূজা করা হইতেছে—ইহা পোষাকী ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। বাকী সমস্ত দিন, সমস্ত মাস, সমস্ত বর্ষ কি করিয়া কাটিয়া যাইতেছে ? ধর্ম্মসাধন কখনও বিফলে যায় না, সুতরাং এইরূপ দীর্ঘকাল অন্তর পূজাপার্ব্বণের ফল অবশ্যই আছে, কিন্তু সে ফল অত্যন্ত সামান্য। ধর্ম্ম তো বাহিরের খোলসমাত্র নহে, প্রাণের মজ্জার সহিত মিশাইয়া যাইলে তবেই ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য মানবজীবনে সফল হইয়া থাকে। কিন্তু পোষাকী ধর্ম্ম কালেভদ্রে সাধিত ধর্ম্মের খোলসমাত্র, ইহার সহিত জীবনের রক্তমাংসের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয় প্রকার ধর্ম্ম-সাধনকে আমরা আটপৌরে ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। নিত্য, অহরহঃ, শ্বাসেপ্রশ্বাসে ভগবৎস্মরণ করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। সর্ব্বকর্ম্মে অভ্যাসযোগের দ্বারা ভগবানের সহিত সংযুক্ত হওয়াই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কর্ম্মের একটা আসক্তি ও বন্ধন আছে এবং এই কর্ম্মবন্ধন হইতে আমরা বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া পড়ি। কর্ম্ম সাধারণ মানুষকে করিতেই হইবে, সুতরাং সেই কর্ম্মের বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবার জন্য অহরহঃ ভগবৎস্মরণই একমাত্র উপায়। আমরা শ্রীভাগবতে দেখিতে পাই যে মাতা যশোদা

বৃহৎ বৃহৎ কটাহসমূহে দুগ্ধ জ্বাল দিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী সম্বন্ধীয় গীত গাহিয়া চলিয়াছেন। এই মহৎ আদর্শ-ই আটপৌরে ধর্ম্মের আদর্শ। ভক্ত বলেন ঃ

প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কর্ম্মে তাঁর
এইরূপে দিন কাটুক্ তোমার ॥

যে সকল ব্যক্তি কামনাযুক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রকার কামনাপ্রাপ্তিই মানব জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহাদের পক্ষে বিভিন্ন বিভিন্ন দেবতার উপাসনাই বিধেয়। "দেবীং মায়ান্তু শ্রীকামঃ" অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তি যোগমায়া দুর্গাকে পূজা করিবেন, প্রভুত্বকামনাকারী ব্যক্তি ব্রহ্মাকে, "বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থং উমাং সতীম্"—অর্থাৎ বিদ্যাকামী ব্যক্তি মহাদেবকে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখী হইবার জন্য সতী উমাকে এবং দেহের বলকামী ব্যক্তি পৃথিবীদেবীকে পূজা করিবেন। কিন্তু জীবনের সর্ব্ববিধ কামনাপ্রাপ্তির জন্যই হউক, অথবা নিষ্কাম আনন্দের জন্যই হউক, অথবা মোক্ষ প্রাপ্তির জন্যই হউক, মানবকে একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে হইবে। খণ্ড খণ্ড কামনাপ্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন দেবতার পূজা বিধেয়, কিন্তু জীবনের অখণ্ড সফলতা একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই প্রদান করিতে সমর্থ।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ২।৩।১০

—অর্থাৎ সর্ব্ববাসনাশূন্য পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তি অথবা সর্ব্বকামী ব্যক্তি অথবা মোক্ষকামী ব্যক্তি তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পুরুষোত্তমকে পূজা করিবেন।

শ্রীশুকদেবকর্তৃক ভাগবতকীর্ত্তন

অতঃপর শ্রীশুকদেব মঙ্গলাচরণ করিয়া "নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে" অর্থাৎ অসীম গুণশালী পরম পুরুষকে আমি নমস্কার করিতেছি,—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিলেন এবং তৎপরে স্বীয় পিতা ব্যাসদেবকে প্রণাম জানাইলেন।

নমস্তস্মৈ ভগবতে ব্যাসায়ামিততেজসে
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবম্। ২।৪।২৪

—অর্থাৎ ভক্তগণ যাঁহার মুখপদ্মবিনির্গত জ্ঞানরূপ অমৃত পান করিয়া থাকেন, সেই মহাপ্রভাবশালী সর্ব্বশাস্ত্রকর্ত্তা ভগবান্ ব্যাসদেবকে নমস্কার করিতেছি। পৃথিবীতে সর্ব্বশাস্ত্র প্রচারের ভার স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে "ব্যাসোচ্ছিষ্ট মিদং জগৎ", অর্থাৎ পৃথিবীতে যাহা কিছু ধর্ম্মগ্রন্থ, কাব্যপুরাণাদি আছে তাহা সমস্তই ব্যাসদেবের উচ্ছিষ্ট—ব্যাসদেবের শ্রীমুখ হইতে প্রথমে নির্গত হইয়া পরে অপর শাস্ত্রকর্ত্তাগণ-কর্ত্তৃক ইহা ব্যাখ্যাত এবং প্রচারিত হইয়াছে। তাই সর্ব্বপ্রথম স্বীয় পিতা ব্যাসদেবকে প্রণাম জানাইয়া শ্রীশুকদেব বলিলেন যে এই জ্ঞানরাশি শ্রীহরি ব্রহ্মাকে প্রদান করেন এবং ব্রহ্মার নিকট হইতে তাঁহার পুত্র নারদ ইহা শ্রবণ করিয়া পরবর্ত্তী যুগে ব্যাসদেবকে ইহা উপদেশ করেন।

এই স্থলে নবম অধ্যায়ে স্বয়ং শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে সংক্ষেপে যে তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করাইয়াছিলেন তাহা চতুঃশ্লোকী ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। এই শ্লোক চতুষ্টয়ের মধ্যেই সমগ্র শ্রীভাগবতের সারকথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্॥

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ,
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ২।৯।৩২-৩৫

—অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্, সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের মূল কারণ যে বস্তু ছিল, তাহা আমি,—অন্য কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও আমি। আর যে এই চিদচিদাত্মক জগৎ তাহাও আমি।

—যেমন জ্ঞাতা থাকিলে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ প্রতীত হইয়া থাকে, জ্ঞাতার অভাবে প্রতীত হয় না, সেইরূপ অচেতন বস্তু জ্ঞাতা থাকিলে প্রতীত হয়, জ্ঞাতা না থাকিলে প্রতীত হয় না, সেই অচেতন দ্রব্য আমার মায়া বলিয়া জানিবে।

—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ প্রভৃতি মহাভূত যেমন ভৌতিক ঘটপটাদিতে অনুপ্রবিষ্ট থাকে, আবার অপ্রবিষ্টও থাকে বলা যায়, সেইরূপ সৃষ্টির পরে আমি পরমাত্মা সেই ভূতসমূহে প্রবিষ্ট থাকি, অথচ আমার সেই অবস্থান সেইখানেই শেষ নহে।

—সকল কার্যে উপাদান কারণরূপে সহ-স্থিতি (অনুবর্ত্তন) ও সকল কার্য্যে নিমিত্ত কারণরূপে অনবস্থিতি (অননুবর্ত্তন), এই অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা যাহা সকল কার্য্যে সকল সময়ে অবস্থান করিতেছে, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু মানুষের বিচার্য্য।

অতঃপর "নারদঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত্যাস্তটে নৃপ,"—অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ সরস্বতী নদীর তীরে ব্যাসদেবকে এই ভাগবত শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে এই ধর্ম্মকথা প্রচারের মূলে রহিয়াছেন

শ্রীব্যাসদেব—সুতরাং 'ব্যাসোচ্ছিষ্টমিদং জগৎ' বলিয়া তিনি সমগ্র মানব জাতির প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

নারদকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতা ব্রহ্মা তাঁহার নিকট যেরূপ সৃষ্টি বর্ণন, বিরাট পুরুষের বিভূতি বর্ণন, এবং ভগবানের লীলাবতার বর্ণন করিয়াছিলেন তাহা দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক পরীক্ষিতের নিকট বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বিদুরের তীর্থ ভ্রমণের কথা উত্থাপিত করিলে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহা সবিস্তারে জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। তখন শুকদেব বিদুরের তীর্থভ্রমণকালে মৈত্রেয় ঋষির সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ অবলম্বন করিয়া শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

———

তৃতীয় স্কন্ধ

(১)

বিদুর-উদ্ধবসংবাদ

শ্রীশুকদেব এই স্কন্ধের প্রথম শ্লোকেই মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন যে তিনি যে সমস্ত প্রশ্ন শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন সেই প্রশ্নই বিদুর পূর্ব্বে মৈত্রেয় ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

এবমেতৎ পুরা পৃষ্টো মৈত্রেয়ো ভগবান্ কিল।
ক্ষত্রা বনং প্রবিষ্টেন ত্যক্ত্বা স্বগৃহমৃদ্ধিমৎ। ৩।১।১

—অর্থাৎ হে মহারাজ, পুরাকালে সর্ব্ব সম্পদ্‌যুক্ত নিজগৃহ পরিত্যাগ করতঃ বিদুর অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষিকে আপনার প্রশ্নানুরূপ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

এই প্রথম শ্লোকের ভিতর দিয়া শুকদেব পরীক্ষিৎকে উৎসাহিত করিতেছেন এবং অন্যান্য শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ মনোযোগ তৃতীয় স্কন্ধের বিষয়বস্তুর প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন। এই প্রশ্ন তুচ্ছ নহে, মৃত্যুভয়ভীত ভোগবিলাসী নরপতির সাময়িক ভক্তিপ্রসূত একটি সাধারণ প্রশ্নও নহে —মহাত্মা বিদুরও এক দিন এই প্রশ্নই শ্রেষ্ঠ ঋষি মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া পরীক্ষিৎ ভালই করিয়াছেন, এবং এই গভীর প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে উপস্থিত ঋষিবৃন্দের সর্ব্বতোভাবে অবহিত হওয়াই উচিত।

এই বিদুরের স্বগৃহত্যাগ করিয়া নানা দিক্ দেশে তীর্থপর্য্যটন একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস অথবা মর্কটবৈরাগ্যমাত্র নহে। বিদুরের গৃহ যে কেবলমাত্র 'ঋদ্ধিমৎ' অর্থাৎ সর্ব্বসম্পদ্‌শালী তাহাই নহে, এই গৃহ পরম-তীর্থ স্বরূপেও পরিণত হইয়াছিল। কারণ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের দূত হইয়া পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিবার জন্য হস্তিনাপুরে যখন দুর্য্যোধনের

প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন তখন দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের গৃহকে "আত্মসাৎকৃতং" অর্থাৎ আপন গৃহ মনে করিয়া তথায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পদধূলিতে এবং প্রীতি-বর্ষণে বিদুরের গৃহ তখন মহাতীর্থে পরিণত। সুতরাং এই গৃহ পরিত্যাগ করিবার জন্য আকস্মিক কোনও মনের বিকার উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না অথচ এই গৃহ বিদুর পরিত্যাগ করিলেন। কারণ জানিবার জন্য পরীক্ষিতের মনে কৌতূহল হইল। সর্ব্বান্তর্যামী শুকদেব তখন বলিলেন যে "ক্ষতপুণ্যলেশঃ"—পুণ্যলেশমাত্রবিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন বুদ্ধিদোষে দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের প্রতি অধর্ম্মাচরণ অনুমোদন করিলেন তখন বিদুর সভামধ্যে গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সদুপদেশ প্রদান করিলেন— "ত্যজাশ্বশৈব্যং কুলকৌশলায়"—বংশের মঙ্গলের জন্য অমঙ্গলস্বরূপ দুর্য্যোধনকে শীঘ্র পরিত্যাগ করুন। বিদুরের এই কথা শ্রবণ করিয়া "প্রবৃদ্ধকোপস্ফুরিতাধরেণ" অর্থাৎ প্রচণ্ডক্রোধে কম্পিত অধর দুর্য্যোধন বলিলেন,

> ক এনমত্রোপজুহাব জিহ্মং দাস্যাঃ সুতং যদ্বলিনৈবপুষ্টঃ
> তস্মিন্ প্রতীপঃ পরকৃত্য আস্তে নির্ব্বাস্যতামাশু পুরাচ্ছ্বসানঃ ॥
>
> ৩।১।১৫

—অর্থাৎ দাসীপুত্র এই বিদুরকে কে এই সভায় প্রবেশ করিতে দিল? এই খলস্বভাব বিদুর আমাদের অন্নে পরিপুষ্ট অথচ আমাদেরই শত্রুতা করিতেছে এবং আমাদের শত্রু পাণ্ডবগণের শুভকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহার প্রাণটি মাত্র রাখিয়া নগর হইতে এখনই ইহাকে বাহির করিয়া দাও।

এই কথা শ্রবণ করিয়া "কৌরবপুণ্যলব্ধঃ" বিদুর—কৌরবগণের বহুপুণ্যে যিনি কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। "কৌরবপুণ্যলব্ধঃ" কথাটি

বিশেষ করিয়া পরিলক্ষণীয়। কুরুবংশের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্য বিদুরের দেহ পরিগ্রহ করিয়া হস্তিনাপুরে বাস করিতেছিল, আজ বিদুরের নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই পুণ্যরাশি নিঃশেষিত হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ বিপদ্ ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কারণ উপস্থিত হইল। বিদুর থাকিতে ধৃতরাষ্ট্রের অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ ধৃতরাষ্ট্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং বিদুরকে হস্তিনাপুর হইতে অপসারিত করাও একান্ত প্রয়োজন।

বিদুর দীর্ঘকাল ধরিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। এইরূপে যখন তিনি প্রভাস তীর্থে উপস্থিত, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া হস্তিনাপুরে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তথাপি বিদুর হস্তিনাপুরে ফিরিলেন না, তীর্থভ্রমণ পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। একদিন যমুনাতটে বিদুরের সহিত উদ্ধবের সাক্ষাৎ হইল। বিদুর আত্মীয়স্বজনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ করিয়া জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধি-ভ্রংশের জন্য দুঃখিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বিদুর বলিলেন,

অজস্য জন্মোৎপথনাশনায় কর্ম্মাণ্যকর্ত্তুর্গ্রহণায় পুংসাম্

—অর্থাৎ জন্মরহিত ভগবান্ কুপথগামী দুষ্টগণকে দমন করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেন এবং কর্ম্মরহিত ভগবান্ জীবগণের কর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্যই স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহার মনুষ্যলীলা স্বভাবতঃই মনোহর এবং জগতের কল্যাণকর, সুতরাং বিদুর উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সেই কর্ম্ম ও মনুষ্যলীলা শুনিবার জন্য আগ্রহশীল।

পরম বৈষ্ণব উদ্ধব বিদুরের কথা শ্রবণ করিয়া

প্রতিবক্তুং ন চোৎসেহে ঔৎকণ্ঠাৎ স্মারিতেশ্বরঃ। ৩।২।১

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উৎকণ্ঠিত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে গভীরভাবে স্মরণ করিয়া হঠাৎ কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। পঞ্চ বৎসর বয়ঃক্রম

হইতেই উদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির সূত্রপাত হইয়াছিল,—চিরদিন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া উদ্ধব আজ বৃদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়িতেই উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণচিন্তনে একেবারে ডুবিয়া যাইলেন, বাহ্যজ্ঞান দূরীভূত হইল, —স মুহূর্ত্তমভূৎ তূষ্ণীং—কিছুক্ষণের জন্য উদ্ধব নীরব হইয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে উদ্ধবের বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি বলিলেন,

কিং নু নঃ কুশলং ব্রূয়াৎ গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্। ৩।২।৭

—আর আত্মীয়স্বজনের কুশল কোথায়? শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গৃহ শ্রীহীন হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের কথায় উদ্ধবের অপার আনন্দ, সুতরাং উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের মানবলীলা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন—জন্ম, পূতনাবধ, গোচারণ, কালীয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ, সান্দীপনি মুনির নিকট বেদ অধ্যয়ন, রুক্মিণীহরণ, দ্বারকায় ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন, যদুবংশ ধ্বংস এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা সংবরণ—সমস্তই ভক্ত উদ্ধবের মনের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত ভাসিয়া চলিল, এবং বিদুর মুগ্ধ হইয়া উদ্ধবপ্রদত্ত সমগ্র বর্ণনা শ্রবণ করিলেন। এই বর্ণনা প্রসঙ্গে যখন উদ্ধব পূতনানিধনের উল্লেখ করিতেছিলেন তখন যে শ্লোকটি তিনি ব্যবহার করেন তাহা বৈষ্ণব সমাজে বিখ্যাত এবং পরম সমাদৃত।

অহো, বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়া পায়য়দপ্য সাধ্বী,
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম। ৩।২।২৩

—অর্থাৎ আহা কী আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় পূতনা স্বীয় স্তনলিপ্ত বিষ শ্রীকৃষ্ণকে পান করাইয়াছিল, কিন্তু সেই দুষ্টা পূতনাও ভগবৎকৃপায় ধাত্রীর অনুরূপ গতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর এমন দয়ালু আর কেহ আছেন কি, যাঁহাকে আমরা ভজনা করিতে পারি?

'কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম'—এই কথাগুলি যেন বৈষ্ণব সমাজে মন্ত্রশক্তি অর্জ্জন করিয়াছে,—বৈষ্ণবগণ এই পংক্তিটি বারংবার কথন, শ্রবণ ও মনন করিয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, স্বচ্ছ স্রোতের মত সেই লীলাকাহিনী প্রবাহিত হইতেছে, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় লীলা-কাহিনীতে পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। উদ্ধব বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সংবরণ করিবার সময় উপস্থিত হইলে তিনি যদুবংশ ধ্বংস করিতে অভিলাষী হইয়া উদ্ধবকে দ্বারকায় বলিলেন, "বদরীং ত্বং প্রয়াহীতি"— উদ্ধব, তুমি বদরিকাশ্রমে গমন কর। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ক্ষণকালও সহ্য করিতে অক্ষম উদ্ধবের পক্ষে এই আদেশ মৃত্যুদণ্ড:অপেক্ষাও ভীষণ। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে উদ্ধব সরস্বতী নদীর তীরে শ্রীকৃষ্ণকে একাকী উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন—শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাদপদ্ম তাঁহার বাম উরুর উপর সংস্থাপিত এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশ অশ্বত্থবৃক্ষের উপর অবসন্নভাবে বিন্যস্ত। ঠিক সেই সময়ে 'দ্বৈপায়নসুহৃৎসখা'—ব্যাসদেবের পরমাত্মীয় ও বন্ধু মৈত্রেয় ঋষি ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৈত্রেয় ঋষির প্রণাম গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "স এষ সাধো চরমো ভবানাং"—হে সাধু উদ্ধব, ইহাই তোমার শেষ জন্ম,—এবং অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। এই প্রসঙ্গ শেষ করিয়া উদ্ধব বিদুরের নিকট বদরিকাশ্রম যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে বিদুর উদ্ধবের নিকট আত্মনিবেদন করিয়া বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে যিনি সাক্ষাৎভাবে তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়াছেন, সেই পরম ভাগ্যবান্ উদ্ধবই বিদুরকে উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ।

বিষ্ণোর্ভৃত্যাঃ স্বভৃত্যার্থকৃতশ্চরন্তি।

—অর্থাৎ আমি আপনার সেবক, অতএব আমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করুন।

উদ্ধব তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিবার সময় আমাকে তত্ত্বোপদেশ দান করিবার জন্য মৈত্রেয় ঋষিকে আমার সমক্ষেই আদেশ করিয়া গিয়াছেন; অতএব মৈত্রেয় ঋষিই আপনার পূজনীয়। তাঁহার নিকট হইতে আপনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন। অতঃপর উদ্ধব বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলে বিদুর অনুসন্ধান করিতে করিতে গঙ্গাতীরে মৈত্রেয় ঋষির দর্শন লাভ করিলেন।

(২)

মৈত্রেয় ঋষির প্রতি বিদুরের প্রশ্ন

বিদুর "অগাধবোধম্"—অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মৈত্রেয় ঋষিকে প্রশ্ন করিলেন।

সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকো ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমংবা
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং যদত্র যুক্তং ভগবন্ বদেন্নঃ। ৩।৫।২

—অর্থাৎ হে ভগবন্, লোকসমূহ সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য বহুবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা তাহাদের সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখনিবৃত্তি কিছুই হয় না; বরং সেই সকল কর্ম্ম হইতে পুনঃ পুনঃ দুঃখই পাইয়া থাকে। অতএব এই প্রকার দুঃখময় সংসারে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আপনি আমাকে বলুন।

বিদুর আরও বলিলেন যে তিনি শ্রীব্যাসদেবের মুখ হইতে মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থ শ্রবণ করিয়াছেন, এবং তাহাতে "ক্ষুল্লসুখাবহানাং" অর্থাৎ তুচ্ছ সুখাবহ ধর্ম্ম কর্ম্মাদির যে সকল কথা আছে তাহা শুনিয়া শেষ করিয়াছেন, আর সে সকল বিষয় শ্রবণ করিবার আগ্রহ নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কথামৃত পান করিয়া তিনি এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই; সুতরাং মৈত্রেয়

ঋষির নিকট শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র শুনিবার তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। মৈত্রেয় ঋষি পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পাইয়াছেন সুতরাং তিনি বিদুরকে হরিকথা শ্রবণ করাইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিবার সুযোগ এখন উপস্থিত,—মৈত্রেয় ঋষির আনন্দের সীমা নাই। এইরূপ অনেক সময় দেখা যায় যে, গুরুকে পাইয়া শিষ্যই কেবল অনুগৃহীত নহেন, শাস্ত্রজ্ঞানী গুরুও উপযুক্ত শিষ্য পাইলে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল মনে করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করেন। ইহ সংসারে গুরুস্থানীয় ব্যক্তি হয়ত অনেক আছেন, কিন্তু গুরুবাক্য গ্রহণ করিয়া তাহা জীবনে সফল করিবার মত শক্তিসম্পন্ন আধার পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল।

সমর্থ গুরু ও উপযুক্ত শিষ্য, ইহাদের মিলন মণিকাঞ্চনযোগের মত বিরল ও সুন্দর। তাই এইরূপ মৈত্রেয়-বিদুর মিলনের মত মণিকাঞ্চন-যোগ ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না। এমন দেখা গিয়াছে, যে কোন ধর্ম্মগুরুর হয়ত দশসহস্র শিষ্য আছেন কিন্তু তাঁহাদের ভিতর একজনও গুরুর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইতে পারিলেন না। এই বিষয়ে বর্ত্তমান যুগের দুইজন অসাধারণ সন্ন্যাসীর কথা উল্লিখিত হইতেছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগের ঠিক পাচ মাস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একদিন সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"কারেই বা বোলবো, কে-ই বা বুঝবে!" ঐহিক-জীবনের সায়াহ্নে সেই মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত এই সহজ কথাগুলির ভিতর কী গভীর আত্মবেদনা ও শিষ্যগণের শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ নিহিত ছিল, তাহা কোন ভাষাই সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারিবে না। সেই দিন ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং আরও অনেকে সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তথাপি রামকৃষ্ণের এই মর্ম্মভেদী নিশ্বাস!—"কারেই বা বোলবো, কে-ই

বা বুঝবে!" আরও কাছের কথা। বর্ত্তমানযুগের তপঃক্লিষ্ট মহাপুরুষ শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথের নাম সকলের নিকট সুপরিচিত। কথাপ্রসঙ্গে শিষ্যগণের যথেষ্ট গ্রহণ করিবার শক্তির অভাব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীসীতারামদাস তাঁহার জনৈক ভক্তকে লিখিয়াছেন: "সীতারামের প্রণববাদমূলক ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা আছে, এ পর্য্যন্ত সে গ্রন্থ ধারণের একটিও অধিকারী পাইনি।......যতক্ষণ পর্য্যন্ত সগুণ-সাক্ষাৎকার না হবে ততদিন নির্গুণ-সাধনার কেহ অধিকারী হতে পারে না। ছেলেদের মধ্যে কারও সগুণ সাক্ষাৎকার হয় নি। যিনি লিখিয়েছেন তিনিই এর ব্যবস্থা করবেন, সীতারাম যন্ত্রমাত্র।" এই যে মহাপুরুষদ্বয়ের শিষ্য সম্বন্ধে সন্দেহ ও আক্ষেপ, ইহা বহু ক্ষেত্রে বহু সন্ন্যাসীর জীবনে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। ব্যবহারিক জগতে দাতা বিরল, গ্রহীতা অসংখ্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম ইহার বিপরীত,—দাতা অনেক কিন্তু গ্রহীতা অত্যন্ত বিরল। কেন এমনটি হয়, তাহার কারণ নির্দেশ করা কঠিন; তবে মহামায়ার বিচিত্র লীলা,—"ঘুড়ির দুটি-একটি কাটে, তুমি হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।" সব ঘুড়ি যদি কাটিয়া যায়, সব শিষ্যই যদি মুক্তিপথগামী হয়, তবে লীলাময়ীর লীলা যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেইজন্য জ্ঞান ও উপদেশ ধারণ করিবার উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া আনন্দিত চিত্তে মৈত্রেয় ঋষি বলিলেন,

> সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সাধো, লোকান্ সাধ্বনুগৃহ্নতা,
> কীর্ত্তিং বিতন্বতা লোকে আত্মনোঽধোক্ষজাত্মনঃ। ৩।৫।১৮

—অর্থাৎ, হে বিদুর, তুমি আমাকে উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তুমি জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিলে এবং ইহাতে ভগবদ্‌গতচিত্ত তোমার নিজের কীর্ত্তি জগতে বিস্তার লাভ করিল।

বিদুর যে ভক্তি ও জ্ঞানযোগ শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র, তাহাও স্মরণ করাইয়া মৈত্রেয় বলিলেন যে বিদুর ব্যাসদেবের ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের

পত্নীরূপে গৃহীতা দাসীর গর্ভে, সত্যবতী-নন্দন ব্যাসদেবের ঔরসে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন,—যিনি স্বয়ং ব্যাসদেবের পুত্র, তাঁহার মত ভক্তি ও জ্ঞানকথামৃত শ্রবণ করিবার অধিকারী আর কে হইতে পারে? এই বলিয়া মৈত্রেয় বিশ্বসৃষ্টিরূপ লীলা, ভগবানের কার্য্যকারণাত্মিকা মায়া নাম্নী শক্তি, মহদাদিতত্ত্বের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া বিদুরকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে এই সমস্ত বিষয় ও শক্তির আদি কারণ "কূটস্থঃ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ"—নির্ব্বিকারস্বরূপ, সনাতন, জন্মরহিত সেই একমাত্র পরম পুরুষ। এই ভগবৎ মহিমা দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু তজ্জন্য মোক্ষলাভ সম্বন্ধে আশঙ্কার কোন কারণ নাই,—যেহেতু সেই পরম পুরুষ যোগাদি সাধনের ফলে ভক্তহৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। আদি কবি ব্রহ্মা সহস্র বৎসর ধ্যান করিয়া "ধিয়া যোগবিপক্কয়া"—যোগ-পরিপক্ক শুদ্ধা বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের মহিমা অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে,

অতো ভগবতো মায়া মায়িনামপি মায়িনী। ৩।৬।৩৯

—ভগবানের মায়া আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণেরও মোহজনক—সুতরাং যোগ, জ্ঞান, ভক্তিসাধন ব্যতীত সেই পরমপুরুষকে অবগত হওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই বলিয়া মৈত্রেয় অবাঙ্ মনসগোচর, দুর্জ্ঞেয় সেই ভগবানকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিলেন,

যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ৩।৬।৪০

—অর্থাৎ, যাঁহাকে অবগত হইতে না পারিয়া বাক্য ও মন চেষ্টা করিয়াও অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আসে, যিনি মানব এবং দেবতাগণের দুর্লভ, সেই অবাঙ্মনসগোচর দুর্জ্ঞেয় ভগবানকে আমি প্রণাম করিতেছি।

ইতিমধ্যে বিদুরের মনে এক সন্দেহের উদয় হইল এবং এই সন্দেহ নিরসনের জন্য বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন। যে ভগবানের জ্ঞান দীপপ্রভার ন্যায় অল্পস্থান মাত্র প্রকাশক নহে, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক নহে, প্রাকৃতিক বস্তুর ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল নহে, স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা নহে, সেই ভগবান্ মায়ার সহিত যুক্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিলেন? মায়ার একটা আবরিকা শক্তি আছে, কিন্তু ভগবানের জ্ঞানকে আবরণ করিবার শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তো কাহারও নাই। অথচ মায়া যদি সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের সহায়ভূতা হয়, তবে ভগবান্ ও মায়া উভয়েই একযোগে সৃষ্টি-কারণ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। কিন্তু ভগবানকে এক অদ্বিতীয় পরমপুরুষ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিদুর এই "অজ্ঞানসঙ্কটে"—অজ্ঞান-জনিত সংশয়সঙ্কটে—পড়িয়া মৈত্রেয় ঋষির শরণাপন্ন হইলেন। মৈত্রেয় বলিলেন, "সেয়ং ভগবতো মায়া" অর্থাৎ ভগবান্ সৃষ্টি-সময়ে যে মায়াকে অবলম্বন করেন তাহা ভগবান্ হইতে পৃথক নহে,—তাহা ভগবানের অনন্তশক্তির মধ্যে অন্যতম শক্তিমাত্র—মায়াশক্তি সাধারণতঃ কার্য্যপ্রকরণ ভেদে যোগমায়া ও মহামায়া নামে পরিচিত। এই অনাদি মায়াদ্বারাই জীবের বন্ধন ও দেহাভিমানরূপ অজ্ঞানতা হইয়া থাকে।

যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্য্যয়ঃ
প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ। ৩।৭।১০

—অর্থাৎ, দেহ কখনই আত্মা নহে, তথাপি এই মায়াদ্বারাই জীবের 'আমি দেহ, আমি কৃশ, আমি মরিব'—ইত্যাদি বিপরীত বুদ্ধি হইয়া থাকে। স্বপ্নে যেমন মানুষ নিজেকে ভুলিয়া নিজেই নিজের মস্তক ছেদন দেখিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মজ্ঞানবিহীন মায়াধীন ব্যক্তি দেহকেই আপনার চিরন্তন সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভুল করিয়া থাকে।

সন্দেহ দূর হইল, তখন বিদুর বলিলেন,

সংছিন্নঃ সংশয়ো মহ্যং তব স্থক্তাসিনা বিভো।

—হে ভগবন্, আপনার যুক্তিযুক্ত বাক্যরূপ খড়্গের দ্বারা আমার সন্দেহ ছিন্ন হইয়াছে।

কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানী বিদুরের এই সন্দেহ কেন হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বিদুর নিজেই কারণ নির্দ্দেশ করিলেন।

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ
তাবুভৌ স্থখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ। ৩।৭।১৭

—অর্থাৎ, এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি অতিশয় মূর্খ, দেহ ও সংসার-স্থখে আসক্ত—সে স্থখী; আবার যিনি পরমেশ্বরকে জানিয়াছেন তিনিও স্থখী—কারণ ইহাদের দুইজনের কাহারও মনে সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি মাঝামাঝি অবস্থায় আছেন—যিনি সংসারী হইয়াও অল্পজ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন—সেই লোকই নানাবিধ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখ পাইয়া থাকেন।

বিদুর বলিতেছেন যে, তিনি এতদিন অল্পবুদ্ধি ছিলেন বলিয়া নানাবিধ সন্দেহ তাঁহার মনে উদিত হইত, কিন্তু আজ সাধুকৃপায় তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। এই বলিয়া বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে 'গুরু' বলিয়া আত্মনিবেদন করিলেন, এবং প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করিয়া স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া মৈত্রেয় যাহাতে সমগ্র তত্ত্বকথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন, তাহার জন্য ঋষির অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলেন।

অনুব্রতানাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তম,
অনাপৃষ্টমপি ব্রূয়ুর্গুরবো দীনবৎসলাঃ। ৩।৭।৩৬
স্বতোজ্ঞানং কুতঃ পুংসাং ভক্তির্বৈরাগ্যমেব চ। ৩।৭।৩৯
সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপোদানানি চানঘ,
জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি। ৩।৭।৪১

—অর্থাৎ, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, গুরুগণ জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না রাখিয়া অনুগত শিষ্য ও পুত্রগণকে উপদেশ প্রদান করেন, কারণ তাঁহারা দীনবৎসল। আমি আপনার অনুগত শিষ্য, যে যে বিষয় আমার জিজ্ঞাসা করিবারও ক্ষমতা নাই, সেই সকল বিষয় যদি আমার পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করেন, তবে তাহা আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। জীবগণের আপনা হইতেই জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যের উদয় কখনও হয় না। একমাত্র গুরুর উপদেশ হইতেই এই সকল মনে উদিত হয়। গুরু শিষ্যকে যেরূপ অভয় প্রদান করিতে পারেন, সমস্ত বেদ, সমস্ত যজ্ঞ, তপস্যা ও দান তাহার একাংশও প্রদান করিতে পারে না।

আধ্যাত্মিকী বিদ্যা সাধু ও গুরুমুখী—ইহা স্বোপার্জ্জিত বিদ্যা নহে। সাধু ও গুরুপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই পরাজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয় না। এই কথা ভাগবতে বিভিন্নস্থানে বারংবার বলা হইয়াছে।

মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের কথা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং বিদুরের শুভ ইচ্ছা অবগত হইয়া বলিলেন যে, বিদুর শ্রেষ্ঠ ভক্ত, কারণ উৎসাহ এবং আগ্রহের দ্বারা পুরাতন ভগবৎলীলাকে বিদুর "পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্ "—পুনঃ পুনঃ নূতন করিয়া তুলিতেছেন।

এই বলিয়া মৈত্রেয় সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার ভগবৎদর্শন, ব্রহ্মাকর্তৃক ভগবানের স্তব, বরাহরূপী ভগবানের পৃথিবী-উদ্ধার বর্ণনা করিলেন। ভগবান্ যখন অনন্ত-শয্যায় যোগনিদ্রায় চারি সহস্র যুগ পর্য্যন্ত কারণ সলিলে শয়ন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার নাভিদেশ হইতে পদ্ম উদ্ভূত হইল এবং সেই পদ্মকোষে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া অনন্ত শূন্যে গ্রীবা সঞ্চালন করিলেন। তখন চারিদিকে এই গ্রীবা সঞ্চালনের ফলে তাঁহার চারিটি মুখ হইল—তিনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারূপে প্রকাশিত হইলেন। যিনি পূর্ব্বকল্পে শব্দব্রহ্ম নাম ধারণ করিয়াছিলেন তিনিই এখন পাদ্মকল্পে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারূপে

পরিচিত হইলেন। "আমি কে? আর জলে যে অদ্বিতীয় পদ্ম, ইহাই বা কাহাতে অধিষ্ঠিত?"—এই প্রশ্নের সমাধান করিতে অক্ষম হইয়া ব্রহ্মা পদ্মনালের মধ্যস্থিত ছিদ্রপথ অবলম্বন করিয়া নিম্নদেশে অবতরণ করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে, বুঝিতে বা অনুভব করিতে পারিলেন না। তখন তপস্যা ও সমাধির দ্বারা কারণ-সলিলশায়ী নারায়ণকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিলেন এবং নারায়ণের নিকট হইতে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিলেন যে, ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তিনি যথাক্রমে বর্ণনা করিতেছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের পাঁচটি বৃত্তি সৃষ্টি করিলেন,—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র। আত্মা, অনাত্মা এবং পরমাত্মা বিষয়ে অজ্ঞানতাই 'তমঃ', সর্ব্ব বিষয়ে বিপরীত জ্ঞানই 'মোহ'; অনিত্য বিষয়বস্তু ভোগ করিবার ইচ্ছাই 'মহামোহ'; সেই ভোগবাসনা বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে ক্রোধ হয় তাহাই 'তামিস্র'; ভোগবাসনালিপ্ত দেহের বিনাশে 'আমিই বিনষ্ট হইলাম' এই পশুবুদ্ধিই 'অন্ধতামিস্র'। ব্রহ্মা অজ্ঞান-বৃত্তির সৃষ্টি দর্শন করিয়া নিজকার্য্যকে সমীচীন মনে করিলেন না; অতএব তিনি ভগবানের ধ্যান করিয়া পবিত্র হৃদয়ে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামক চারিজন নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় মুনিকে সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারা চারিজন 'চতুঃসন্' অর্থাৎ চারিজন 'সন্' নামে শ্রীভাগবতে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা কালবাধ্য নহেন অর্থাৎ ইঁহারা চিরকালই বালক, কখনও কালের অধীন হইয়া বৃদ্ধি অথবা মৃত্যু প্রাপ্ত হইবেন না। ব্রহ্মা এই পুত্রগণকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, নিবৃত্তিমার্গপরায়ণ এই মুনিগণ তাহা করিলেন না দেখিয়া ব্রহ্মার ভীষণ ক্রোধ উৎপন্ন হইল। অতঃপর ক্রোধ শান্ত হইলে ক্রমশঃ ব্রহ্মার দেহ হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ—এই দশজন

পুত্র উৎপন্ন হইলেন—ইঁহারাই লোক-সৃষ্টি-প্রবাহের মূল। ব্রহ্মার ছায়া হইতে শ্রীভাগবতে বিখ্যাত দেবহুতির স্বামী কর্দ্দম ঋষি উৎপন্ন হইলেন। এই সময়ে সৃষ্টি বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক ব্রহ্মা স্বীয় মনোহারিণী কন্যা পরম পবিত্র সরস্বতীকে কামনা করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার এই বুদ্ধিবৈক্লব্য দেখিয়া মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ স্বীয় পিতা ব্রহ্মাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,

তেজীয়সামপি হ্যেতন্ন সুশ্লোক্যং জগদ্গুরো,
যদবৃত্তমনুতিষ্ঠন্ বৈ লোকঃ ক্ষেমায় কল্পতে। ৩।১২।৩১

—অর্থাৎ, হে জগদ্গুরো, তেজস্বিগণেরও এই পাপজনক কার্য্য প্রশংসনীয় নহে—তেজস্বিগণকে পাপ স্পর্শ না করিতে পারিলেও, ঐরূপ কার্য্য নিন্দনীয়। কারণ, আপনার ন্যায় তেজস্বিগণের চরিত্রের অনুকরণ করিয়া লোকসমূহ মঙ্গল লাভ করিবে।

ব্রহ্মা পুত্রগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং তখনই সেই কামকলুষিত দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

এই শ্লোকটির অনুরূপ একটি শ্লোক দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব উল্লেখ করিয়াছেন।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা। ১০।৩৩।৩০

—অর্থাৎ, তেজস্বিগণকে কোন কর্ম্মই স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং ইঁহাদের চরিত্র অশোভন কর্ম্মজনিত কোনও দোষদুষ্ট হয় না। অগ্নি সর্ব্ব দ্রব্যই দহন করিতে সমর্থ, অতি অশুচি দ্রব্যও অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে অগ্নি আপন দাহিকাশক্তির দ্বারা সেই অশুচি স্পর্শ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ।

ব্রহ্মার পুত্রগণ কর্তৃক উল্লিখিত শ্লোক এবং শ্রীশুকদেবের শ্লোক আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত অর্থবাচক হইলেও, মূলতঃ ইহাদের অর্থের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। বর্ত্তমান যুগে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি "তেজীয়সাং

ন দোষায়" বাক্যের দোহাই দিয়া, সাধারণ অর্থশালী অথবা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অনেক অপকর্ম্ম ক্ষালন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাই দেখা যায়, মগুপায়ী, স্ত্রৈণ, দুর্ব্বলচিত্ত লোক আজ কালবশে হয়ত 'ঋষি' পদবাচ্য হইয়া উঠিয়াছেন, দেশ-সেবা করিয়া এবং বিপুল অর্থ জনহিতকর কার্য্যে নিয়োগ করিয়া হয়ত কোনও অসংযমী, চরিত্রহীন ব্যক্তি জনগণের নিকট "মহাত্মা" বলিয়া পরিচিত হইতেছেন—যদি কেহ তাঁহাদের এই ত্রুটি প্রদর্শন করেন তখন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বলেন, "তেজীয়সাং ন দোষায়,"—ইহারা তেজস্বী পুরুষ, ইহাদের দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কিন্তু যে ভাষার দোহাই দিয়া তাঁহারা গর্হিত কর্ম্মকেও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, সেই ভাষা শুকদেব অখণ্ডসচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই ব্যবহার করিয়াছিলেন—সাধারণ জড়পিণ্ডদেহ মানুষের সম্বন্ধে নহে। এই জগতে 'তেজীয়ান্' একজনই আছেন—তিনি সেই পরম পুরুষ শ্রীভগবান। অপর যে কোনও দেবতা অথবা মানুষ সম্বন্ধে এই ভাষা ব্যবহৃত হউক না কেন, তখন ইহাকে সীমাবদ্ধ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে—কারণ মনে রাখিতে হইবে, তেজ তাঁহার নহে ; তেজীয়ানের এক কণিকামাত্র ধারণ করিয়াই তিনি জগতে তেজীয়ান্ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। এমন কি, স্বয়ং জগদ্গুরু ব্রহ্মাও গর্হিত কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইলে, সাধারণভাবে 'তেজীয়ান্' হইয়াও, নিজ পুত্রগণ কর্ত্তৃক নিন্দা হইতে মুক্ত হন নাই। যে অর্থে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'তেজীয়ান্' কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা কোনও মানুষের প্রতি প্রয়োগ করিলে, তাহাকে সুধীজনের নিকট নিন্দনীয় ও উপহাসাস্পদ হইতে হইবে।

অতঃপর ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামক বেদ চতুষ্টয় উৎপন্ন হইল, এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মা চিকিৎসাশাস্ত্র, ধনুর্ব্বিদ্যা, সঙ্গীত-শাস্ত্র, ইতিহাস-পুরাণাদি সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্মের চারিটী পাদ—শৌচ, দয়া, তপস্যা ও সত্য, এবং ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত

ও নিষাদ—এই সপ্তস্বর ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইল। কিন্তু তথাপি সৃষ্টিকার্য্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া ব্রহ্মা স্বীয় দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং সেই বিভক্ত রূপদ্বয় হইতে স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি হইল। সেই মিথুনের মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি সার্ব্বভৌম মনু, এবং যিনি স্ত্রী, তিনি মনুর শতরূপানাম্নী মহিষী নামে পরিচিত হইলেন। এই সময় হইতেই স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

কিন্তু মনু ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রজাবৃদ্ধির আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন যে সর্ব্বভূতের বাসস্থান পৃথিবী তখনও প্রলয়সলিলে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তিনি পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মাকে যত্নশীল হইতে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা পৃথিবীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছেন এমন সময় তাঁহার নাসিকাছিদ্র হইতে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত এক ক্ষুদ্র শূকর নির্গত হইল এবং দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র শূকর এক অস্বাভাবিক বৃহৎ আকার ধারণ করিল। এই বরাহরূপী শ্রীভগবান্ স্বীয় দংষ্ট্রার দ্বারা রসাতলস্থিত পৃথিবীকে উদ্ধার করিলেন এবং হিরণ্যাক্ষ নামক আদি দৈত্যকে বধ করিলেন। মৈত্রেয় ঋষির মুখে হিরণ্যাক্ষ-বধের কথা শুনিয়া, বিদুর তাহার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। মৈত্রেয় ঋষি তখন দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর অপূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

(৩)

কশ্যপ-দিতি-সংবাদ

একদিন সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলে, মরীচির পুত্র কশ্যপ অগ্নিশালায় বিষ্ণুর যজনা করিয়া সমাহিতচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী দিতি কামপ্রপীড়িতা হইয়া নিজ বাসনা চরিতার্থ

করিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। এই দিতি ভগবান্ দক্ষ প্রজাপতির অন্যতম কন্যা। দক্ষ নিজ ত্রয়োদশ কন্যার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, একই সময়ে তাহাদিগকে কশ্যপের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে দিতির অস্বাভাবিক অনুরোধ শ্রবণ করিয়া, ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত কশ্যপ ক্ষুব্ধ হইলেন এবং দিতিকে নিজ সংকল্প হইতে বিরত করিবার জন্য শাস্ত্রসম্মত বহু কথা শ্রবণ করাইলেন। কশ্যপ বলিলেন যে, দুর্গপতি যেমন দুর্গকে আশ্রয় করিয়া শত্রুগণের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া থাকে, সেইরূপ গৃহিগণ ধর্ম্মপত্নীকে আশ্রয় করিয়া দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণকে অবলীলাক্রমে জয় করিয়া থাকেন। কশ্যপ দিতিকে সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন, কিন্তু বহুভাষিণী, অতিশয় কামমোহিতা দিতি স্বামীর কোনও প্রবোধবাক্যই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন কশ্যপ দিতিকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,

এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা,
চরন্তি যস্যাং ভূতানি ভূতেশানুচরানি হ। ৩।১৪।২৩
এতস্যাং সাধ্বি সন্ধ্যায়াং ভগবান্ ভূতভাবনঃ
পরিতো ভূতপর্ষদ্ভিঃ বৃষেণাটতি ভূতরাট্॥ ৩।১৪।২৪
শ্মশানচক্রানিলধূলিধূম্র-বিকীর্ণবিদ্যোতজটাকলাপঃ,
ভস্মাবগুণ্ঠামলরুক্মদেহো দেবস্ত্রিভিঃ পশ্যতি দেবরস্তে।
৩।১৪।২৫

—অর্থাৎ, এই ঘোরতম সন্ধ্যাকাল ভয়ঙ্কর ভূত-প্রেতগণের অধিকার-ভুক্ত, এই সন্ধ্যাকালে রুদ্রদেবের অনুচর ভূতগণ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া থাকে। এই সন্ধ্যাকালে ভূতপালক ভগবান্ রুদ্রদেব ভূতগণে পরিবৃত হইয়া বৃষে আরোহণ করতঃ সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন। শ্মশানের বিঘূর্ণিত বায়ুর দ্বারা উত্থিত ধূলিরাশিতে যাঁহার বিক্ষিপ্ত ও দীপ্তিমান্ জটাসমূহ

ধূম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং যাঁহার নির্ম্মল সুবর্ণসদৃশ দেহ ভস্মদ্বারা আচ্ছাদিত, সেই রুদ্রদেব তাঁহার তিনটি চক্ষুর দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের সর্ব্বত্র সন্ধ্যাকে পরিদর্শন করিতেছেন।

এই তিনটি শ্লোকের ভাষা, ভাব এবং ছন্দ পরিলক্ষণীয়। ভাষার ভিতর অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য এবং দৃঢ়তা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। শ্লোক তিনটি ২।৩ বার উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিলেই ইহাদের ভিতরের অসাধারণ বর্ণনাকৌশল অনুভব করা যায় এবং সমগ্র চিত্রটি চক্ষের সম্মুখে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। অপূর্ব্ব বাক্য-বিন্যাসের ফলে ছন্দোবদ্ধ পংক্তিগুলি মহাসমুদ্রের তরঙ্গের মত একটির পর একটি আসিয়া পাঠক-হৃদয়ের তটভূমি স্পর্শ করে—যেন একবার শুনিলে আর ভুলিতে পারা যায় না। প্রথম দুইটি শ্লোক অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত, কিন্তু তৃতীয় শ্লোকটির ছন্দ উপজাতি। প্রথম শ্লোকটিতে ভূতপ্রেতগণের বর্ণনা,—যেন একটা স্তব্ধ ও ভীতিপূর্ণ ভাব। "ঘোর" কথাটি স্বল্পপরিসরের মধ্যে মহাকবি কশ্যপ তিনবার ব্যবহার করিয়াছেন—ছন্দ ও ভাষার ভিতর দিয়া চারিদিকে যেন একটা অস্পষ্ট বিভীষিকা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ছন্দের মন্থর গতি, সন্ধ্যাবেলার ক্ষীণ আলোক পাঠকের শঙ্কিত মনের পরিচয় প্রদান করিতেছে। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে ভয় এবং অভয় দুই ভাবই সংমিশ্রিত হইয়া ছন্দের কতকটা উদারতা আনিয়া দিয়াছে। পূর্ব্ব শ্লোকে কেবলমাত্র ভূতপ্রেতগণ ছিল, দ্বিতীয় শ্লোকে ভূতপ্রেতগণের সহিত স্বয়ং ভূতনাথও উপস্থিত। তৃতীয় শ্লোকে কেবলমাত্র মহাদেবের বর্ণনা—অনুষ্টুপ ছন্দের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে এইস্থানে উপজাতি ছন্দের স্বচ্ছন্দময় গতি আসিয়া পড়িয়াছে, আনন্দময় পুরুষের আবির্ভাব শ্লোকের ভিতর একটা আনন্দ এবং উদারতা আনিয়া দিয়াছে, পাঠক-মনের ভীতিবিহ্বল কঠিনতা কাটিয়া যাইতেছে, মহাদেবের তিনটি চক্ষুর সম্মুখে ত্রিভুবনে যেন বিস্ময়সূচক সচেতনতা প্রকাশিত হইতেছে।

এখন এই সন্ধ্যাকালে শ্মশানে ধূলির আবর্ত্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। সেই ধূলিরাশির প্রলেপ পড়িয়া মহাদেবের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জটাজাল ধূম্রবর্ণ দেখাইতেছে, মহাযোগীর আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল স্থবর্ণকান্তি দেহ ভস্মের আচ্ছাদনে শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে, শ্মশান-চিতার অস্পষ্ট অগ্নিশিখায় সন্ধ্যার অন্ধকার ভীষণতর দেখাইতেছে, তাহার ভিতর দিয়া ভূতপ্রেত বেষ্টিত মহাদেব আনন্দে বৃষভারোহণে চলিয়াছেন,— তিনটি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বতত্ত্বভেদী চক্ষু ত্রিভুবনের সমস্ত কীটপতঙ্গ, পশু ও মানুষের অন্তর ও বাহির দেখিয়া লইতেছে।

এই দিবা এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণকে শাস্ত্রে "রাক্ষসী বেলা" বলা হইয়াছে এবং এই অপূর্ব্ব সময়ে সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার করিয়া কেবলমাত্র ভগবৎ স্মরণ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।—"রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মস্থ"—এই সন্ধ্যাকাল রাক্ষসী বেলা, বিষয়কর্ম্ম এবং বিষয়-চিন্তার পক্ষে এই সময় অনুকূল নহে। এই সন্ধ্যাবেলা অন্ততঃ স্বল্পক্ষণের জন্যও ভগবৎ-চিন্তন মানবজীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই প্রাচীন গৃহিণীগণ সন্ধ্যাবেলা পুত্রকন্যাকে কোন খাদ্যদ্রব্য আহার করিতে দেন না, এমন কি শয্যাশায়ী রোগীকেও গৃহিণীগণ ক্ষণকালের জন্য বিছানার উপর বসাইয়া দিয়া থাকেন। আমাদের দেশে সন্ধ্যাবেলায় ভগবৎস্মরণ চিরদিন মানুষ অভ্যাস করিয়া আসিতেছে। এই অভ্যাসের একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে। মৃত্যুর পর যখন জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করিবে তখন অভ্যাসবশতঃ সন্ধ্যাকালে তাহার ভগবৎস্মরণ আপনা হইতেই হইবে, এবং তাহার ফলে জীবাত্মার ঊর্দ্ধগতি সহজেই সম্পাদিত হইবে। "দিনক্ষপামধ্যগতা" সন্ধ্যা আমাদের প্রতিদিনের কর্ম্মজীবনের মৃত্যু, সুতরাং সন্ধ্যাকালে ভগবৎস্মরণ অভ্যাস করিলে সমস্ত দিনের কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিরকালের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

এমনই "রাক্ষসী বেলা" সমাগত,—ঋষি কশ্যপ দেবচিন্তায় নিমগ্ন, দিতি কাম-নিপীড়িতা। একজনের মন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপের ধ্যানে সমাহিত, অপর জন তুচ্ছ বিকারশীল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য চঞ্চল। সময়টি অপূর্ব্ব—দিবা ও রাত্রির মধ্যস্থলে ক্ষণস্থায়ী সন্ধ্যা—জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে মানবদেহের উপর যেন মূর্চ্ছা ও চৈতন্যের অস্পষ্ট বিকাশ। শ্লোক কয়টির ভিতর দিয়া একবার দেখা যাইতেছে ঘোরদর্শন ভূতপ্রেতগণ, একবার দেখা যাইতেছে বৃষভবাহন মহাদেব, আবার দেখা যাইতেছে মানবদেহের পরিণতি-ভূমি শ্মশান ও শ্মশানের চিতাভস্ম। চলচ্চিত্রের মত চিত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে,—একবার হয়ত দেখা যায় দিতির রক্তমাংস-গঠিত শরীরে উদ্দাম প্রবৃত্তিনিচয়, তাঁহার কামনা-উদ্ভাসিত মাতালের মত রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল, আবার পরক্ষণেই দেখা যায় শান্ত, সমাহিত, প্রসন্নদৃষ্টি ঋষি স্বীয় আসনে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, —বহুভাষিণী, কামাতুরা দিতির কামনারাশি তরঙ্গভঙ্গের মত কশ্যপের চিন্ময় দেহের উপর দিয়া বৃথাই প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। কামনা, প্রশান্তি, সন্ধ্যার অস্পষ্টতা, ভূতপ্রেতগণ, শ্মশানের চিতাভস্ম, মহাযোগী মহেশ্বর—সব একত্র মিলিয়া একখানি বিরাট্‌ চিত্ররূপে আলোক-অন্ধকারের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহাতেও দিতি ভয় পাইলেন না, দিতির চৈতন্য হইল না, "বৃষলীব গতত্রপা"—বারবনিতার ন্যায় লজ্জাশূন্যা হইয়া ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন। কশ্যপ উপায়ান্তরবিহীন হইয়া সন্ধ্যাকালেই দিতির কামনা পূরণ করিলেন। অবশেষে রুদ্রভয়ে ভীতা ও কম্পিতা দিতিকে কশ্যপ বলিলেন যে, যেহেতু দিতি যোগ্যকালের অপেক্ষা করেন নাই, সন্ধ্যারূপ কালদোষ গ্রাহ্য করেন নাই, স্বামীর আদেশ পালন করেন নাই, দেবতাগণকে অবজ্ঞা করিয়া অপরাধ করিয়াছেন—সেইজন্য তাঁহার গর্ভে অমঙ্গলস্বরূপ অধম দুইটি যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। এই পুত্রদ্বয়

নিরপরাধ প্রাণিগণকে বিনাশ করিবে, স্ত্রীনিগ্রহ করিবে, মহাত্মাগণের কোপবৃদ্ধি করিবে এবং অবশেষে ভগবান স্বয়ং ক্রুদ্ধ হইয়া অবতার-বিগ্রহ ধারণ করতঃ উহাদিগকে বিনাশ করিবেন। অতঃপর দিতির অনুতাপে প্রসন্ন হইয়া কশ্যপ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার অসুর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজনের (হিরণ্যকশিপুর) পরম বৈষ্ণব এক পুত্র (প্রহ্লাদ) জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং এই পুত্র "অন্তর্ব্বহিশ্চামলমব্জনেত্রং" —অন্তরে এবং বাহিরে নির্ম্মল কমললোচন শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া আপনাকে এবং আপনার বংশকে পবিত্র করিবেন। প্রহ্লাদ ভগবদ্ভক্ত হইবেন শ্রবণ করিয়া দিতি আনন্দিত হইলেন। তথাপি গর্ভস্থ পুত্রদ্বয় জগতের অনিষ্ট করিবে, এই আশঙ্কায় দিতি কশ্যপের বীর্য্য শতবৎসর গর্ভে ধারণ করিলেন।

(৪)

বৈকুণ্ঠের দ্বারপালদ্বয়ের প্রতি অভিশাপ

ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠে আর একটি অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। একদিন ব্রহ্মার মানসপুত্র 'চতুঃসন্' অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার— ইঁহারা সকলে বৈকুণ্ঠে শ্রীহরিকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। বৈকুণ্ঠের সপ্তম প্রাচীর দ্বারে মনোহর বেশধারী জয় ও বিজয় নামক দুইজন দেবতা দ্বারপালের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা উলঙ্গ এবং পঞ্চম বর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রতীয়মান আত্মতত্ত্বজ্ঞ সনকাদি কুমারচতুষ্টয়কে দেখিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন না, বরং দ্বারপালের যষ্টির দ্বারা তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ প্রবেশের পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীহরির দর্শন হইতে এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে বঞ্চিত হইয়া মুনিগণের চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল এবং তাঁহারা দ্বারপালদ্বয়কে তিরস্কার করিয়া অভিশাপ প্রদান

করিলেন—"তোমরা বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া কাম-ক্রোধ-লোভ-সঙ্কুল লোকে জন্মগ্রহণ কর।" জয় ও বিজয় অভিশাপ শুনিয়া শঙ্কিত হইলেন, ভগবান্ শ্রীহরি মুনিদিগের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন অবগত হইয়া আরও কি শাস্তির বিধান করেন, এই আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অমোঘ ব্রহ্মশাপ,—ইহার বিরুদ্ধে প্রতিকার কিছুই নাই, ইহা স্মরণ করিয়া মুনিগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন—

মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎ স্মৃতিঘ্নো
মোহো ভবেদিহতু নৌ ব্রজতোরধোঽধঃ। ৩।১৫।৩৬

—অর্থাৎ আমরা স্বীয় কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত,—দয়া করিয়া অনুমতি করুন, নীচযোনি ভ্রমণ করিতে হইলেও যেন আমাদের ভগবৎস্মৃতিনাশক মোহ উপস্থিত না হয়।

ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীহরি মুনিগণের অবমাননা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে মুনিগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পদব্রজে আসিলেন—অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী স্বয়ং ভগবান্ পদব্রজে আসিলেন, লক্ষ্মীদেবীকেও পদব্রজে আসিতে হইল—শ্রীহরির নিকট ভক্তের এতই সম্মান! ভগবান্ চতুঃসন্ কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার পার্ষদদ্বয়েব প্রতি তাঁহারা যে অভিশাপরূপ দণ্ড বিধান করিয়াছেন, তাহা শ্রীহরির সম্পূর্ণ অনুমোদিত। কেবলমাত্র

ভূয়ো মমান্তিকমিতাং তদনুগ্রহো মে
যৎ কল্প্যতামচিরতো ভৃতয়োর্ব্বিবাসঃ। ৩।১৬।১২

—অর্থাৎ, আপনারা আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করুন যেন আমার এই ভৃত্যদ্বয়ের, বৈকুণ্ঠ হইতে নির্ব্বাসন শীঘ্রই সমাপ্ত হয়, ইহারা যেন অল্পকালের মধ্যে অপরাধের ফল ভোগ করিয়া আমার নিকটে ফিরিয়া আসে।

এই একটি শ্লোকের ভিতর দিয়া শ্রীহরির বিনয়, সেবকবৎসলতা, ভক্তগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সকলই প্রকাশিত হইয়াছে ;—আরও দেখা যাইতেছে তিনি কখনও "বজ্রাদপিকঠোরাণি", কখনও বা "মৃদূনি কুসুমাদপি।"

এইরূপে সনকাদিকে প্রসন্ন করিয়া ভক্তবৎসল শ্রীহরি বলিলেন যে দ্বারপালদ্বয় এইক্ষণেই অসুরজন্ম লাভ করুক, সেই অসুর জন্মে শ্রীহরির প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাহাদের চিত্তের একাগ্রতা বর্দ্ধিত হইবে এবং সেই একাগ্রতার ফলে তাহারা শীঘ্রই আবার বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। সনকাদি মুনিগণ প্রস্থান করিলে শ্রীহরি স্বীয় অনুচরদ্বয়কে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,

> ময়ি সংরম্ভযোগেন নিস্তীর্য্য ব্রহ্মহেলনম্
> প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মে কালেনাল্পীয়সা পুনঃ। ৩।১৬।৩১

—অর্থাৎ তোমরা অসুরজন্ম প্রাপ্ত হইয়া আমার প্রতি শত্রুভাব অবলম্বন করতঃ অল্পকালের মধ্যেই ব্রহ্মশাপ ভোগ করিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। সেখানে অধিককাল তোমাদের থাকিতে হইবে না, অতএব ভয় করিও না।

এদিকে ভগবানের অপূর্ব্ব বিধানে তাহাদের স্থান পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। জয় ও বিজয় কশ্যপের অমোঘ বীর্য্য অবলম্বন করিয়া দিতির গর্ভে অসুররূপে জন্মগ্রহণ করিল। কোথায় দিতির কামোন্মাদনা, কোথায় জয়-বিজয়ের সাধুনিগ্রহ! অথচ এই দুইটি অতি দূরস্থিত বিভিন্ন ঘটনা ভগবৎ ইচ্ছায় পূর্ব্ব হইতেই কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ভগবানের লীলা দেবতাগণেরও বুদ্ধির অগোচর, অথচ মানুষ সমস্ত ঘটনাই তাহার বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে করিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকে।

শতবর্ষ গর্ভধারণ করিয়া দিতি যমজ পুত্র প্রসব করিলেন—একজন হিরণ্যকশিপু, অপরজন হিরণ্যাক্ষ। এই অসুরদ্বয়ের জন্ম সময়ে স্বর্গে,

মর্ত্ত্যে ও অন্তরীক্ষে অতি ভয়াবহ উৎপাতসমূহ দৃষ্টি গোচর হইল। পৃথিবী কম্পিত হইল, উল্কাপাতের সহিত বজ্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইল, ধূমকেতুসমূহ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গরাশি গর্জ্জন করিতে লাগিল, শৃগাল ও পেচকের অমঙ্গলধ্বনি চারিদিকে উত্থিত হইল, গাভীগণের স্তন হইতে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে রুধির ক্ষরিত হইতে লাগিল। কালক্রমে হিরণ্যাক্ষ একদিন যুদ্ধ করিবার বাসনায় গদাহস্তে স্বর্গে গমন করিল এবং তাহাকে দর্শন করিয়া

ভীতা নিলিল্যিরে দেবাস্তার্ক্ষ্যত্রস্তা ইবাহয়ঃ। ৩।১৭।২২

—গরুড়কে দেখিয়া সর্পগণ যেমন ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ হিরণ্যাক্ষকে দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ পলায়ন করিলেন।

স্বর্গে যুদ্ধের পিপাসা মিটিল না দেখিয়া ক্রীড়া করিবার ইচ্ছায় হিরণ্যাক্ষ গভীর সমুদ্রে অবগাহন করিল। সেখানে বরুণদেবকে উপহাস করিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিলে বরুণদেব তাহাকে রসাতলে যাইয়া ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধের পিপাসা মিটাইবার উপদেশ প্রদান করিলেন। হিরণ্যাক্ষ নারদের নিকট হইতে রসাতল যাইবার সন্ধান সংগ্রহ করিয়া তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিল যে এক প্রকাণ্ড বরাহমূর্ত্তি দন্তাগ্রের দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করিতেছে। অতঃপর বরাহরূপী শ্রীভগবানের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ হইল এবং হিরণ্যাক্ষ পরাজিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুসময়ে মাতা দিতির হৃদয় সহসা কম্পিত এবং তাঁহার স্তন হইতে রুধির ক্ষরিত হইয়াছিল।

শ্রীশুকদেব প্রথম দিবসে শ্রীভাগবতের এই পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কর্দ্দম ঋষির সহিত দেবহুতির বিবাহ

অতঃপর বিদুর মৈত্রেয় ঋষির নিকট সজ্জনগণকর্ত্তৃক বহু প্রশংসিত স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মৈত্রেয় তখন কর্দ্দম ঋষি কর্ত্তৃক মনুকন্যা দেবহুতির পাণিগ্রহণ এবং তাঁহার গর্ভে ভগবান কপিলদেবের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং কপিলদেবের মাতা দেবহুতিকে যে সমস্ত ভক্তিযোগের কথা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাও মৈত্রেয় ঋষি ক্রমে ক্রমে ভক্ত বিদুরকে শ্রবণ করাইয়া তাঁহার কৌতূহলনিবৃত্তি করিলেন। এই কর্দ্দম-দেবহুতি এবং কপিল-দেবহুতি সংবাদ শ্রীভাগবতের এক অপূর্ব্ব আখ্যান।

মৈত্রেয় ঋষি বলিলেন যে ব্রহ্মা কর্দ্দম ঋষিকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে কর্দ্দম ঋষি প্রথমে সরস্বতী নদীর তীরে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই তপস্যায় প্রীত হইয়া স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন প্রদান করিলে তিনি পিতা ব্রহ্মার আদেশে প্রজাসৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। তখন ভগবান্ ঋষি কর্দ্দমকে বলিলেন যে সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে অবস্থান করিয়া সপ্তসাগরা ধরণী শাসন করিতেছেন, সেই সম্রাট্ মনু "আগামী পরশ্বদিন" শতরূপানাম্নী তাঁহার মহিষীর সহিত কর্দ্দমের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। মনুর দেবহুতি নাম্নী এক সুশীলা কন্যা আছে, সেই কন্যাকে কর্দ্দম ঋষির হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য মনু আগমন করিতেছেন। পুনরায় ভগবান্ শ্রীহরি কর্দ্দমকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন যে তিনি স্বয়ং অংশরূপে কর্দ্দমের পত্নী দেবহুতির গর্ভে পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন। এই কথা বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব মনু স্ত্রী ও কন্যার সহিত যথাসময়ে কর্দ্দম ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি কর্দ্দম রাজর্ষি মনুকে স্বীয় পর্ণকুটীরে সমাগত এবং পাদসমীপে প্রণত হইতে দেখিয়া

তাঁহাকে অভ্যর্থনাদির দ্বারা সম্মানিত করিলেন। মনু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া মহর্ষি কর্দ্দমের তপঃপ্রভাব অনুভব করিয়া বলিলেন—

তব সন্দর্শনাদেব ছিন্না মে সর্ব্ব সংশয়াঃ। ৩।২২।

—অর্থাৎ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের উপদেশ শ্রবণ করিলে মানবের সংশয়সমূহ ছিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু আপনার দর্শনমাত্রেই আমার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হইয়াছে। মনু আরও বলিলেন,

দিষ্ট্যা পাদরজঃ স্পৃষ্টং শীর্ষ্ণা মে ভবতঃ শিবম্। ৩।২২।

—অর্থাৎ আমার পরম সৌভাগ্যের ফলে আপনার মঙ্গলময় পদধূলি আমি মস্তকে ধারণ করিতে পারিয়াছি।

সম্রাট্ মনুর সহিত ব্রহ্মর্ষি কর্দ্দমের সাক্ষাৎকার এবং মনুর উপরোক্ত কথাগুলি ভক্ত-হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। পর্ণকুটীরনিবাসী ভিক্ষুকের নিকট সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর আসিয়াছেন। সম্রাট্ প্রার্থী—কর্দ্দমকে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। মনু বলিতেছেন যে, মনে মনে তিনি যে সমস্ত তত্ত্বকথার প্রশ্ন লইয়া কর্দ্দমের নিকট আগমন করিয়াছিলেন তাহা মুখে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, ঋষিকে দর্শন করিবামাত্রই সেই সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা হইয়া গেল। কর্দ্দম ঋষির কী অপূর্ব্ব তপঃপ্রভাব! এই রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষির সাক্ষাৎকারের মধ্যে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় রহিয়াছে। সম্রাট্ পর্ণকুটীরবাসী ঋষির পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতেছেন। যাঁহার পদধূলি স্বয়ং সম্রাট্ মস্তকে ধারণ করেন তিনি কত মহৎ ও পরমার্থবিদ্ ব্রহ্মর্ষি। আবার যিনি এই পদধূলি গ্রহণ করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছেন তাঁহার হৃদয় কত উদার এবং কত প্রগাঢ় তাঁহার ভক্তি! এই রাজর্ষি ও মহর্ষির মধ্যে যে সাক্ষাৎকার তাহা ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ বলিয়া চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়াছে।

অতঃপর মনু নিজ কন্যা দেবহুতির সহিত ব্রহ্মর্ষি কর্দ্দমের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বলিলেন—

তৎ প্রতীচ্ছ দ্বিজাগ্র্যেমাং শ্রদ্ধয়োপহৃতাং ময়া,
সর্ব্বাত্মনানুরূপাং তে গৃহমেধিষু কর্ম্মসু। ৩।২২।১১

—অর্থাৎ হে দ্বিজবর, আপনি আমার এই কন্যা দেবহুতিকে গ্রহণ করুন, আমি শ্রদ্ধার সহিত ইহাকে আপনার করে সমর্পণ করিতেছি। এই দেবহুতি আপনার গার্হস্থ্য ধর্ম্মজীবনে সর্ব্ব প্রকারে উপযুক্ত ও অনুকূল হইবে।

ঋষি কর্দ্দম দেবহুতিকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন কিন্তু মনুকে বলিলেন যে, যে পর্য্যন্ত ইহার গর্ভে সন্তান উৎপত্তি না হয় ততকাল স্বামি-স্ত্রীরূপে উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবেন এবং পরে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরমার্থ চিন্তায় দিন যাপন করিবেন। পিতা ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রজাসৃষ্টি করিবার আদেশ দিয়াছেন সত্য কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার পুত্র উৎপাদনকরতঃ দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং কর্দ্দম ভগবানের আদেশ পালন করিবেন, পিতার আজ্ঞা আজীবন পালন করিতে পারিবেন না। মনু কর্দ্দম ঋষির মনোগত অভিপ্রায় অনুমোদন করিয়া তাঁহার হস্তে কন্যা দেবহুতিকে সমর্পণ করিলেন।

অতঃপর কর্দ্দম ঋষি দেবহুতির পরিচর্য্যায় প্রীত হইয়া প্রজাবৃদ্ধির আদেশ স্মরণ করিলেন এবং নিজ বিভূতিশক্তি প্রয়োগে এক কামচারী সুবৃহৎ বিমান সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে সুখ ভোগের নানা উপকরণ সংগ্রহ করিলেন। এইরূপে সেই বিমান মধ্যে ঋষি-দম্পতির শত বর্ষ সুখে অতিবাহিত হইল। দীর্ঘকাল স্বামিসঙ্গসুখ ভোগ করিয়া দেবহুতি একই দিনে কলা, অনসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী

ও শান্তি নাম্নী নয়টী কন্যা প্রসব করিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব কথানুসারে স্বামী সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করিবেন চিন্তা করিয়া কান্তিমতী দেবহুতি বাহিরে হাস্যমুখী হইলেও অন্তরে অতিশয় ব্যাকুলা ও সন্তপ্তা হইলেন। তিনি স্বামীর নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে তিনি এতদিন স্বামীর সহিত সংসার ভোগসুখে নিমগ্ন ছিলেন, ঋষির নিকট হইতে আত্মজ্ঞান কিছুই লাভ করেন নাই; সুতরাং কর্দ্দম সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বনে গমন করিলে দেবহুতিকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত কেহই থাকিবে না। মহর্ষি কর্দ্দম দেবহুতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবানের আশ্বাসবাণী স্মরণ করিলেন এবং দেবহুতিকে বলিলেন যে তাঁহার গর্ভে পরমপুরুষ ভগবান্ শীঘ্রই অংশরূপে আবির্ভূত হইবেন।

(৬)

পুত্র কপিলদেবকর্ত্তৃক মাতা দেবহুতিকে উপদেশ প্রদান

আরও বহুকাল অতীত হইল, অবশেষে শ্রীহরি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্য দেবহুতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। কর্দ্দম নিজ জীবনের উদ্দেশ্য এখন সফলপ্রায় দর্শন করিয়া সাংসারিক জীবনের শেষ কর্ম সম্পাদন করিবার জন্য তাঁহার নয়টি কন্যাকে মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। এই কন্যাগণের মধ্যে অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্ঠ ঋষির বিবাহ হইল। অবশেষে কর্দ্দম ভগবানের অংশে জাত পুত্রের সমীপে

বিবিক্ত উপসঙ্গম্য প্রণম্য সমভাষত ৩।২৪।২৭

—একাকী গমন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন যে, ঋষি অবগত হইয়াছেন, জ্ঞানের উপায় সাংখ্যশাস্ত্র প্রচার করিতে অভিলাষী হইয়া স্বয়ং ভগবান্ অংশরূপে দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং

কর্দ্দম এখন দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মুক্তির অন্বেষণ করিবেন। তখন পুত্ররূপী ভগবান কপিল কর্দ্দমকে অনুমতি প্রদান করিয়া বলিলেন,

গচ্ছ কামং ময়া পৃষ্টো ময়ি সন্ন্যস্ত কর্ম্মণা
জিত্বা সুদুর্জ্জয়ং মৃত্যুমমৃতত্বায় মাং ভজ। ৩।২৪।৩৮
মামাত্মানং স্বয়ং জ্যোতিঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ম্
আত্মন্যেবাত্মনান্বীক্ষন্ বিশোকোঽভয়মৃচ্ছসি। ৩।২৪।৩৯

—অর্থাৎ হে মুনে, আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, তুমি আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের কারণ সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করতঃ বনে গমন কর এবং মোক্ষলাভের জন্য আমাকে ভজনা কর।

হে মহর্ষে, আমি স্বপ্রকাশ এবং পরমাত্মস্বরূপ; প্রাণিগণের অন্তরে আমি বিরাজ করিয়া থাকি। তুমি নিজের হৃদয় মধ্যে মনের দ্বারা আমাকে দর্শনকরতঃ শোকরহিত হইয়া অচিরেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে।

ভগবান্ আরও বলিলেন যে তিনি মাতা দেবহূতিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করিবেন এবং ঐ আধ্যাত্মিক বিদ্যাদ্বারা মাতা দেবহূতি মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া কর্দ্দম ঋষি সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিলেন এবং তথায় ভগবৎ-চিন্তনের দ্বারা রাগদ্বেষাদি বর্জ্জন করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন।

পিতা কর্দ্দম অরণ্যে প্রস্থান করিলে পুত্র কপিলদেবের সমগ্র মনোযোগ মাতা দেবহূতির উপর নিপতিত হইল এবং "মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া"—মাতার প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া কপিল বিন্দুসর নামক আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। মাতা দেবহূতি কিন্তু স্বামীর আশ্বাসবাণী ভুলেন নাই—"স্বয়ং ভগবান্ তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া

তোমাকে জ্ঞান উপদেশ প্রদান করিবেন।" একদিন পুত্রকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া মাতা দেবহূতি বলিলেন,

নির্ব্বিন্না নিতরাং ভূমন্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ
যেন সম্ভাব্যমানেন প্রপন্নান্ধং তমঃ প্রভো! ৩।২৫।৭

—হে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর, আমি দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াসক্তির জন্য অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি এবং তাহাদের অভিলাষ পূরণ করিতে যাইয়া অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকারে পতিত হইয়াছি।

মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র কপিল দেবহূতিকে "যোগ আধ্যাত্মিকঃ পুংসাং মতো নিঃশ্রেয়সায় মে"—জীবগণের মোক্ষ সাধনের জন্য যে পরমাত্মনিষ্ঠ ধ্যানযোগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাই মাতাকে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্থান হইতেই মাতা ও পুত্রের মধ্যে যে প্রশ্ন ও উত্তর আরম্ভ হইল তাহাতে কপিলদেবের নামের পরিবর্ত্তে তাঁহার উপদেশগুলি "শ্রীভগবান্ উবাচ" বলিয়া ভাগবতে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথমেই কপিলরূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবান্ বলিলেন,

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে। ৩।২৫।১৫

—অর্থাৎ জীবের একই চিত্ত বন্ধন ও মুক্তির কারণ হইয়া থাকে; বিষয়সমূহে আসক্ত চিত্ত বন্ধনের কারণ এবং পরমাত্মাতে আসক্ত চিত্ত মুক্তির কারণ।

কিন্তু এই চিত্তশুদ্ধির জন্য ভক্তিযোগই একমাত্র উপায়।

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে।

—৩।২৫।১৯

—অর্থাৎ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া যোগিগণের ব্রহ্মলাভের জন্য ভক্তিই উৎকৃষ্ট উপায়। ভক্তি ব্যতীত মঙ্গলময় পথ আর কিছুই নাই।

কিন্তু এই ভক্তিলাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। এই সাধুগণের লক্ষণ কপিলদেব বর্ণনা করিতেছেন—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ। ৩।২৫।২১

—এই সাধুগণ ধৈর্য্যশীল, দয়ালু, সর্ব্বজীবের সুহৃৎ, শত্রুরহিত এবং শান্ত, ইহারা সর্ব্বদাই সদাচাররূপভূষণে ভূষিত।

এই শ্রীভাগবতে সমগ্র গ্রন্থের ভিতর মানবজীবনে সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়তার সহিত বারংবার বলা হইয়াছে। দেবতাগণের ঊর্দ্ধে সাধুর স্থান শ্রীভাগবত নির্দ্দেশ করিয়াছে। "সাধবো দীনবৎসলাঃ"—সাধুগণ দীনবৎসল, "দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ"—দেবগণ স্বার্থান্বেষী কিন্তু সাধুগণ অহেতুকী কৃপাবর্ষণকারী, "দর্শনাদেব সাধবঃ"—সাধুগণের দর্শন লাভ করিলেই মানুষ সফলকাম হইতে পারে, "সঙ্গদোষহরা হি তে"—বিষয়বস্তুতে আসক্তিরূপ ব্যাধি একমাত্র সাধুসঙ্গ হইতেই আরোগ্য হইয়া থাকে। এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কৃপাও 'সাধুকৃপাবাহনা'—সাধুর কৃপাকে বাহন করিয়া মানবের নিকট আগমন করিয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান্ সাধুর পরিরক্ষণের জন্য সুদর্শন চক্র প্রেরণ করেন, সাধুর নিকট তিনি "অস্বতন্ত্রঃ"—অর্থাৎ পরাধীন। সাধুসঙ্গের এইরূপ প্রশস্তি শ্রীভাগবতের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাই কপিলদেব মাতাকে বলিলেন —সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে—দেবহুতি তাঁহার দীর্ঘকালের বিষয়াসক্তি দূর করিতে চাহিলে তাঁহাকে প্রথমেই সাধুসঙ্গ প্রার্থনা করিতে হইবে। কারণ—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ,
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনু ক্রমিষ্যতি। —৩।২৫।২৫

—অর্থাৎ সাধুসঙ্গ করিলে আমার শক্তি ও লীলা সম্বন্ধীয় হৃদয়গ্রাহী, কর্ণের তৃপ্তিকর আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায়; আমার সেই সকল

কথা শ্রবণ করিলে শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা জন্মে; শ্রদ্ধা হইতে মনে ভাগবতী কথার প্রতি রুচি আসিয়া থাকে, এবং সেই রুচি হইতে ক্রমশঃ মানব-হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়।

এই শ্লোকটি ভক্ত সমাজে অত্যন্ত সুপরিচিত, বৈষ্ণবগণ প্রায়ই ইহাকে উল্লেখ করিয়া মনে আনন্দ অনুভব করেন। ইহার ভিতর দিয়া কপিলদেব সর্ব্ব যুগের বৈষ্ণবজীবনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস যেন রাখিয়া যাইতেছেন। এই শ্লোকটিকে বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই দেখা যায় যে স্বয়ং ভগবানও তাঁহার গর্ভধারিণী জননীকে এমন কোনও কৌশল বলিয়া দিতে পারিতেছেন না, যাহার দ্বারা মুহূর্ত্তের মধ্যেই দেবহূতির ভক্তি-লাভ সম্ভবপর হইতে পারে।

দেবহূতিকে সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। এই "সাধুসঙ্গ" কথাটি মানব-সমাজে অত্যন্ত সুলভ, অথচ ইহার সম্যক্‌ ব্যঞ্জনা গৃহী মানুষেরা সাধারণতঃ ধারণা করিতে পারে না। সাধুর নিকট যাইয়া একবার মাত্র বসিলেই সাধুসঙ্গ হয় না, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেও সাধুসঙ্গ না হইতে পারে, এমন কি সাধুর সহিত একই গৃহে বাস করিলেও প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যায় না। সাধুর নিকট বসিয়া বিষয়ী মানুষ যদি মনটিকে সংহত না করিতে পারে, এবং ক্ষণে ক্ষণে মন যদি বিষয়চিন্তায় নিমগ্ন হয় তাহা হইলে সাধুর অতি নিকটে বসিয়াও সেই লোক প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত। শুধু নিকটে থাকা এবং উঠিতে বসিতে প্রণামের দ্বারাই সাধুসঙ্গ হয় না—প্রকৃত সাধুসঙ্গ মনের একটি বিশেষ অবস্থা মাত্র। সংসারীদের পক্ষে মনের এই অবস্থা দুর্ল্লভ। সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করিবার জন্য কপিলদেব বলিতেছেন, "সতাং প্রসঙ্গাৎ"—কেবলমাত্র "সতাং সঙ্গাৎ" কথাগুলি তিনি ব্যবহার করেন নাই। প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী মহাশয় 'প্রসঙ্গাৎ' কথাটির ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, "প্রকৃষ্ট

সঙ্গাৎ", অর্থাৎ সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ করিলে তবেই হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে ভক্তির উদয় হইতে পারে। কপিলদেব বলিতেছেন যে সাধুসঙ্গ করিলে সেখানে হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহা সেবন করিতে হয়, তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে হয়, জোষণাৎ অর্থাৎ 'সেবনাৎ'—এবং তবেই মনে ক্রমে ক্রমে নাম এবং নামীর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে, শ্রদ্ধা হইতে রুচি এবং রুচির পরিপাকে মনে ভক্তির উদয় হয়। সুতরাং সাধুসঙ্গ হইতে ভক্তি পর্য্যন্ত এই অতিদূর এবং বিস্তৃত পথ অতিক্রম করিতে সাধারণ মানুষের বহু বর্ষ এমন কি বহু জীবনও অতিবাহিত হইয়া যাইতে পারে।

ভগবান্ কপিলের নিকট মোক্ষলাভের উপায় অবগত হইয়া মাতা দেবহুতি ধ্যানযোগ এবং ভক্তিযোগ সম্বন্ধে আরও শ্রবণ করিবার কৌতূহল প্রকাশ করিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন,

> তদেতন্মে বিজানীহি যথাহং মন্দধীর্হরে,
> সুখং বুধ্যেয়ং দুর্ব্বোধং যোষা ভবদনুগ্রহাৎ। ৩।২৫।৩০

—অর্থাৎ হে ভগবন্, আমি অল্পবুদ্ধি নারী; অতএব তোমার অনুগ্রহে যাহাতে আমি এই দুর্ব্বোধ্য বিষয়ও সহজে বুঝিতে পারি সেইরূপ সরলভাবে এই সকল বিষয় আমাকে উপদেশ দাও।

এইরূপ বিনয় না থাকিলে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। অথচ প্রশ্নকারী জননী, জ্ঞানদাতা পুত্র, তথাপি এতই বিনয় ও দীনতা প্রকাশ। আমরা পরে পঞ্চম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাইব যে ঠিক অনুরূপ বিনয় প্রকাশ করিয়া রাজা রহুগণ ভরত মহারাজের নিকট জ্ঞান উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

> তস্মাত্তবন্তং মম সংশয়ার্থং প্রক্ষ্যামি পশ্চাদধুনা সুবোধং
> অধ্যাত্মযোগগ্রথিতং তবোক্তমাখ্যাহি কৌতূহলচেতসো মে। ৫।১২।৩

—অর্থাৎ আমার সন্দেহের বিষয় আপনাকে পরে জিজ্ঞাসা করিব। এখন আপনি যে অধ্যাত্মযোগপূর্ণ তুর্ব্বোধ্য বিষয় আমাকে বলিতেছেন তাহা সহজে যাহাতে বুঝিতে পারি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেইরূপভাবে আমাকে বলুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার চিত্ত কৌতূহলী হইয়াছে।

গীতায় জ্ঞান-অন্বেষণকারী ব্যক্তি সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে—শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্—শ্রদ্ধাশীল হইলে তবে জ্ঞান পাওয়া যায়। বিনয় ও শ্রদ্ধাই জ্ঞানপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

দেবহুতির এইরূপ মিনতিপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া কপিল তাঁহাকে "সাংখ্যং প্রোবাচ বৈ ভক্তিবিতানযোগম্"—তত্ত্বনিরূপক সাংখ্যশাস্ত্র এবং ভক্তিবর্দ্ধক ধ্যানযোগ উপদেশ করিতে লাগিলেন। কপিল বলিলেন যে সংযতচিত্ত মানবের শ্রীহরিতে যে নিষ্কাম ভক্তি তাহা মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ—'অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।' সেই পরা ভক্তি সূক্ষ্ম লিঙ্গ-শরীরকে জীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় করিয়া থাকে; সুতরাং এই ভক্তি লাভ হইলে জীবকে আর "গতাগতি পুনঃ পুনঃ" করিতে হয় না। "যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ গুরুসুহৃদো দৈবমিষ্টম্"—যাহাদের নিকট আমি আত্মার ন্যায় প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহের পাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসাস্পদ, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, আত্মীয়ের ন্যায় হিতকারী এবং ইষ্ট দেবতার ন্যায় পূজ্য সেই মৎপরায়ণ ভক্তগণ কখনও জন্মমৃত্যুর অধীন হয় না। সর্ব্বভয়হারী শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কোনও দেবতা মানুষের সংসার-ভয় দূর করিতে পারেন না, কারণ সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র তাঁহারই শক্তিতে পরিচালিত।

মদ্ভয়াৎ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি র্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ। ৩।২৫।৪২

—অর্থাৎ আমার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছে, দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছেন, অগ্নি দগ্ধ করিতেছে ও যম

সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে—আমারই শাসনের ভয়ে এই সকল দেবতাগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেছে।

এইজন্যই যোগিগণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা অনন্ত শক্তিশালী শ্রীহরির অভয়পদ আশ্রয় করিয়া থাকেন,—'ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্তি অকুতোভয়ম্'। অতঃপর কপিলদেব সাংখ্যযোগ, প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ, ধ্যানযোগ ও ঊনত্রিশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বিশদভাবে মাতার অবগতির জন্য বর্ণনা করিলেন। ভক্তিযোগ সম্বন্ধে মাতাকে উপদেশ প্রদান করিবার সময় ভগবান্ কপিল যে সমস্ত ভাষা ও ভাব-প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে ধারণা হয় যে অপর সমস্ত যোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগই তাঁহার নিজের প্রিয় ও তাঁহার মতে ভগবৎ-প্রাপ্তির সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়।

ভগবান্ কপিলদেব ভক্তিযোগ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলিলেন যে, মানবের স্বভাব ও গুণসমূহের নানাপ্রকার ভেদে "ভক্তিযোগো বহুবিধঃ"—ভক্তি-যোগও নানাপ্রকার হইয়া থাকে। তামস ভক্ত হিংসা ও ক্রোধের অধীন, রাজস ভক্ত যশ ও ঐশ্বর্য্যকামী, সাত্ত্বিক ভক্ত পাপ ক্ষয় করিবার জন্য ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করেন। এই তিন প্রকার সগুণ ভক্তিরই শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, ও আত্মনিবেদন—এই নয় প্রকার রূপে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু এই তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক ভক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভক্ত আছেন,—তিনি নির্গুণ ভক্তিযোগের অধিকারী।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেন ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণংভক্তি যোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্
অহৈতুকী অব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

—৩।২৯।১১-১২

—অর্থাৎ গঙ্গাজল যেমন অবিচ্ছিন্নগতিতে সাগর অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ আমার গুণাবলী শ্রবণমাত্রেই সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পুরুষোত্তম আমার প্রতি অবিচ্ছিন্নগতিতে ধাবিত হন এবং ফলকামনা-রহিত যে ভক্তি তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এইরূপ নির্গুণ ভক্ত

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপৈকত্বমপ্যুত,
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। ৩।২৯।১৩

—শ্রীহরির সেবা ব্যতীত অন্য কোনরূপ মুক্তি গ্রহণ করেন না। মুক্তি পাঁচ প্রকার। ভগবানের সহিত একলোকে বাসরূপ মুক্তিকে "সালোক্য" বলা হয়, "সার্ষ্টি"—ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য, "সামীপ্য"—ভগবানের নিকটে অবস্থিতি, "সারূপ্য"—ভগবানের মত সমান রূপ প্রাপ্তি, "একত্ব" —ভগবানের সহিত অভিন্নত্ব,—এই যে পাঁচ প্রকার মুক্তি তাহা শ্রীহরি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেও নির্গুণ ভক্ত সেই মুক্তি গ্রহণ করেন না, তিনি চান "মৎসেবনং"—অখণ্ড অনন্তকাল ধরিয়া শ্রীহরির চরণ সেবারূপ আনন্দ।

এইরূপ নির্গুণ ভক্ত "অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা"—সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ আমি সকল প্রাণীতেই অন্তর্য্যামিরূপে সতত অবস্থান করিতেছি, ইহা জানিয়া "মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেৎ বহুমানয়ন্",—বহু সম্মান করিয়া সকল প্রাণীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া থাকেন। এইরূপ সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই অহেতুকী ভক্তির চরম পরিণাম। ভক্তিযোগ বর্ণনা করিয়া ভগবান্ কপিলদেব ঊনত্রিশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলিতেছেন,

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালঃ অনাদিরাদিকৃৎ অব্যয়ঃ
জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্। ৩।২৯।৪৫

—মহাকালস্বরূপ ভগবান্ পিতা ও মাতার দ্বারা পুত্রোৎপত্তি করাইয়া সকলের আদিকর্ত্তারূপে চিরদিন বিদ্যমান থাকেন এবং মৃত্যুদ্বারা যমকেও বিনাশ করিয়া সকলের অন্তকারী হইয়া থাকেন। কিন্তু স্বয়ং তিনি অনাদি ও অনন্ত।

অতঃপর ভগবান্ কপিলদেব মাতার মনে তীব্র বৈরাগ্য সঞ্চার করিবার অভিপ্রায়ে তিনটি অধ্যায়ে সংসারী জীবের অধমগতি, গর্ভবাস, উর্দ্ধগতি ও পুনরাবৃত্তি বর্ণন করিয়াছেন। জীবগণ "ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাৎ গৃহক্ষেত্র-বসূনি চ"—অনিত্য দেহের আনুষঙ্গিক গৃহক্ষেত্র ও ধনসমূহকে চিরস্থায়ী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। দেহ মানুষের এতই প্রিয় যে দেহত্যাগের চিন্তায় জীব শঙ্কিত হইয়া উঠে, এবং "নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমান্ ত্যক্তুমিচ্ছতি"—পৃথিবীতে তো কথাই নাই এমন কি নরকে বাস করিতে হইলেও সেই নারকীয় দেহ জীব পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। সংসারে সুখ নাই, সংসার দুঃখময় অথচ "কুর্ব্বন্দুঃখ-প্রতীকারং সুখবৎ মন্যতে গৃহী"—গৃহিলোক দুঃখপরিপূর্ণ সংসারে দুঃখের প্রতিকার করিতে করিতে সময় অতিবাহিত করাও সুখ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। অথচ সংসারী জীবগণও সর্ব্ব সময়ে পরস্পরের প্রতি সাহায্য এবং সহানুভূতিসম্পন্ন নহে। মানুষ সমগ্র জীবন স্ত্রী-পুত্রগণের ভরণ-পোষণ করিয়া যখন জরা ও বার্দ্ধক্যবশতঃ গৃহে অবস্থান করে তখন "নাদ্রিয়ন্তে যথা পূর্ব্বং কীনাশা ইব গোজরম্"—নির্দ্দয় কৃষক বৃদ্ধ বৃষকে যেমন পূর্ব্বের মত আদর যত্ন করে না সেইরূপ বৃদ্ধ গৃহকর্ত্তার প্রতি স্ত্রী-পুত্রগণ গোজরের মতই ব্যবহার করিয়া থাকে। তথাপি বদ্ধ জীবের মনে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হয় না। তখন সে রোগগ্রস্ত, পরিপাকশক্তিবিহীন, অল্পাহারী ও আহার আহরণে অসমর্থ হইয়া "আস্তে অবমত্যা উপন্যস্তং গৃহপাল ইবাহরন্"—অবজ্ঞার সহিত প্রদত্ত অন্ন কুকুরের মত ভোজন করিয়া গৃহে অবস্থান করিতে থাকে। তাহার

মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। মৃত্যুপথযাত্রী অনাদৃত বদ্ধজীব তখন "কাস-শ্বাসকৃতায়াসঃ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে"—কাসের উপদ্রবে এবং নিশ্বাস টানিবার কষ্টে দুর্ব্বল হইয়া গলায় ঘুর্ ঘুর্ শব্দ তুলিতে থাকে। তখন আত্মীয়স্বজনে পরিবেষ্টিত জীব "বাচ্যমানোঽপি ন ব্রূতে"—কেহ ডাকিলেও কথা কহিতে পারে না। এদিকে আত্মীয় স্বজনগণ রোদন করিতেছে অথচ মৃতকল্প জীব "অন্তধীঃ"—বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। ভিতরে ভিতরে হয়ত জ্ঞান রহিয়াছে এবং সেই অন্তর্জ্ঞানের সাহায্যে "স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি"—যমদূতগণকে দেখিয়া ভয়ের চোটে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেছে। ইহাই বদ্ধজীবের শেষ জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র ও ইতিহাস।

ভগবান্ কপিলদেব মাতাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে করিতে সংসারের কী ভয়ঙ্কর চিত্র বদ্ধজীবের সম্মুখে অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা সাধুর অঙ্কিত চিত্র বলিয়া মনে হয় না, বরং যেন কোন মহাকবি সংসারের সুখদুঃখ দেখিয়া অভিজ্ঞতা ও অসামান্য কল্পনাশক্তির সাহায্যে এই ভীতিপ্রদ সংসারচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই চিত্রের ভিতর দিয়া বদ্ধজীবের দেহ-প্রীতি, বৃদ্ধাবস্থায় আত্মীয়স্বজনের অনাদর, কুকুরের মত অবজ্ঞাপ্রদত্ত এক মুষ্টি অন্নের জন্য গৃহমধ্যে অবস্থিতি, মৃত্যুকালে বাক্‌রোধ, যে আত্মীয় স্বজনগণ বৃদ্ধের শেষ জীবনে হাসিয়াও একটি কথা বলে নাই, বৃদ্ধের মৃত্যুকালে তাহাদের লোক-দেখান উচ্ছ্বসিত শোক, হয়তো বা ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন, বৃদ্ধের বহির্জ্ঞানবিলোপ অথচ যমদূত দর্শনে অন্তর্জ্ঞানপ্রসূত ভীতি,—সবই যেন অনন্তকালের বদ্ধজীবের জীবন-মৃত্যুর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

তৃতীয় স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে কপিলদেবের প্রস্থান ও দেবহুতির মুক্তি বর্ণিত হইয়াছে। মৈত্রেয় বিদুরকে বলিলেন যে, দেবহুতি কপিলদেবের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মোহশূন্য হইলেন এবং চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম

এই তিনটি তত্ত্বপূর্ণ সাংখ্যজ্ঞানের প্রবর্ত্তক কপিলদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবহুতি বলিলেন যে, "শ্বাদোঽ'পি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ"—কদাচিৎ যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন, এবং যাঁহার বন্দন ও স্মরণ করিলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হইয়া থাকে তাদৃশ ভগবানের দর্শন লাভ করিয়া দেবহুতি ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছেন। এইরূপে পূজিত হইয়া ভগবান্ কপিলদেব মাতাকে "পরাং কাষ্ঠাং অচিরাৎ অবরোৎস্যসি"—অবিলম্বে তুমি মুক্তি-প্রাপ্ত হইবে—এই আশ্বাসবাণী প্রদান করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া পিতার আশ্রম হইতে উত্তর দিকে গমন করিলেন এবং ক্রমে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সেইখানে সমাহিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে পুত্র কপিলদেব প্রস্থান করিলে "জ্ঞাততত্ত্বাপি"—তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও—দেবহুতি "কিঞ্চিৎচকার বদনং পুত্রবিশ্লেষণাতুরা"—পুত্ররূপী ভগবানের বিরহে কাতর হইয়া ম্লানমুখী হইয়া পড়িলেন। অতঃপর পুত্রোপদিষ্ট যোগ অনুষ্ঠান করিয়া দেবহুতি দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করায় তাঁহার কেশকলাপ কপিলবর্ণ এবং জটাযুক্ত হইয়াছিল; তিনি উগ্র তপস্যায় ছিন্নবস্ত্রাবৃত দেহে ধ্যানধারণায় সমাহিত হইয়া "বভৌ মলৈরবচ্ছন্নঃ সধূম ইব পাবকঃ"—ধূমাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে কপিলোক্ত সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়া অল্পকালের মধ্যেই তিনি শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলেন। যে স্থানে দেবহুতি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন সেই পুণ্যক্ষেত্র "সিদ্ধপদ" নামে ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়া আছে।

চতুর্থ স্কন্ধ

(১)

দক্ষযজ্ঞধ্বংস

পূর্ব্ব স্কন্ধের ন্যায় সমগ্র চতুর্থ স্কন্ধেও মৈত্রেয় ঋষি ভক্ত বিদুরের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নানাবিধ ধর্ম্মকথা উপদেশ করিতেছেন। প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগে কথাপ্রসঙ্গে মৈত্রেয় বলিলেন যে প্রজাপতি দক্ষের কন্যা সতী মহাদেবকে বিবাহ করিয়া পিতার অপরাধে যৌবনেই দেহত্যাগ করায় পুত্রলাভ করিতে পারেন নাই। বিদুরের কৌতূহল হইল।

কস্তং চরাচরগুরুং নির্ব্বৈরং শান্তবিগ্রহম্ ॥
আত্মারামং কথং দ্বেষ্টি জগতো দৈবতংমহৎ ॥
এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্! জামাতুঃ শ্বশুরস্য চ
বিদ্বেষস্তু যতাঃ প্রাণাং স্তত্যাজ দুস্ত্যজান্ সতী ॥ ৪।২।২।৩

—অর্থাৎ যিনি চরাচর জগতের গুরু, বৈরভাববিহীন, শান্তমূর্ত্তি আত্মারাম, জগতের পরমদেবতা, সেই মহাদেবকে প্রজাপতি দক্ষ কেন দ্বেষ করিয়াছিলেন ?

জামাতা ও শ্বশুরের যে কারণে বিদ্বেষ জন্মে এবং যে বিদ্বেষের ফলে শিবপত্নী সতীদেবী স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন।

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঋষি মৈত্রেয় বিশদভাবে শিব ও দক্ষের মধ্যে বিদ্বেষের সূত্রপাত এবং তাহার ফলে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস বর্ণনা করিলেন। এই আখ্যান ভাষা এবং ভাবসমন্বয়ে শ্রীভাগবতের এক অপূর্ব্ব অংশ।

মৈত্রেয় বলিলেন যে পুরাকালে প্রজাপতিগণের সত্র নামক যজ্ঞে ঋষিগণ, দেবগণ ও মুনিগণ সকলে সমবেত হইয়াছিলেন। এমন সময়ে

প্রজাপতি দক্ষ সেই সভাস্থলে প্রবেশ করিলে ব্রহ্মা এবং মহাদেব ব্যতীত অপর সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু সমগ্র সভাপ্রদত্ত সম্মান প্রজাপতি দক্ষকে আনন্দিত করিল না, একমাত্র মহাদেব কর্ত্তৃক তাঁহার অবমাননা লক্ষ্য করিয়া দক্ষ যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ "বামং চক্ষুর্ভ্যামভিবীক্ষ্য দহন্নিব"—বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মহাদেবকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে নিন্দাসূচক বহুবিধ কটুকথা তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন,—"অবিনয়ী এই মহাদেব সাধুগণের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে—সদ্ভিরাচরিতঃ পন্থা যেন স্তনেন দূষিতঃ।" দক্ষ আরও বলিলেন যে শিব তাঁহার পুত্র-স্থানীয়, কারণ তাঁহার সাবিত্রীতুল্য কন্যা সতীদেবীকে শিব অগ্নি এবং ব্রাহ্মণ সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। অথচ এই "মর্কটলোচনঃ"—বানরের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট শিব "প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে বাচাপ্যকৃত নোচিতম্"—পূজ্য এবং সম্মাননীয় শ্বশুরের প্রতি প্রত্যুত্থান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করা দূরের কথা, তাঁহাকে দেখিয়া নমস্কার অথবা কোনও সম্মান-সূচক কথাও ব্যবহার করেন নাই। যে শিব উলঙ্গ অবস্থায় বিকটাকার ভূতপ্রেতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্মশানে বিচরণ করিয়া থাকেন, চিতাভস্মে যাঁহার স্নান, অহি যাঁহার ভূষণ—

> তস্মৈ উন্মাদনাথায় নষ্টশৌচায় দুহৃদে
> দত্তা বত ময়া সাধ্বী চোদিতে পরমেষ্ঠিনা। ৪।২।১৬

—সেই অতিশয় উন্মাদ, শৌচাচারবর্জ্জিত, দুষ্টচিত্ত শিবের হস্তে আমি ব্রহ্মার কথায় আমার পরমগুণবতী কন্যা সতীকে সম্প্রদান করিয়াছি।

এইরূপে শিবনিন্দা করিয়া অতিশয় কুপিত প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে শাপ প্রদান করিলেন—"ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ"—দেবগণের মধ্যে এই অধম শিব দেবগণের সহিত যজ্ঞভাগ পাইবে না। এই

অভিশাপবাক্য প্রয়োগ করিয়া দক্ষ ক্রোধবশতঃ আর এক মুহূর্ত্তও সভায় অবস্থান না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। মহাদেবের নিন্দা শ্রবণ করিয়া নন্দী ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া দক্ষকে অভিশাপ প্রদান করিল, ভৃগুমুনি দক্ষের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক শিবভক্তগণকে পাষণ্ড ও স্বেচ্ছাচারী বলিয়া নিন্দা করিলেন; সভায় তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল, কিন্তু যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এত বাদানুবাদের সৃষ্টি সেই দেবাধিদেব মহেশ্বর একটি কথাও উচ্চারণ না করিয়া কেবলমাত্র "কিঞ্চিৎ বিমনা ইব"—যেন একটু অন্যমনস্কভাবে—সেই সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। মহাদেব কেন 'বিমনা' হইলেন তাহা ভাগবত স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ না করিলেও ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে মহাযোগী মহেশ্বর বহুদূরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞস্থলীতে সতীর দেহ বিসর্জ্জনের আশঙ্কায় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বহুবর্ষ অতীত হইল তথাপি শ্বশুর ও জামাতার মনোমালিন্য দূরীভূত হইল না। এদিকে যখন ব্রহ্মা প্রজাপতি দক্ষকে সকল প্রজাপতির আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন তখন দক্ষের মনে অতিশয় গর্ব্ব উপস্থিত হইল। এই গর্ব্ব দুইটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিল—একটি বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান, অপরটি মহাদেবকে সর্ব্বলোকসমক্ষে অবহেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রচেষ্টা। দক্ষ 'বৃহস্পতিসব' নামে এক বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং সেই যজ্ঞে এক মহাদেব ব্যতীত অপর দেবতাগণ, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও পিতৃগণ সকলেই নিজ নিজ পত্নীর সহিত আমন্ত্রিত হইলেন। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সে এক মহান্ উৎসব। আকাশে কলহংসের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিমানশ্রেণী চলিয়াছে, তাহাদের শব্দে সমগ্র দিক্ মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, কৈলাস শিখর হইতে দেখা যাইতেছে বিমানে অবস্থিত অপূর্ব্ব অলঙ্কারে সজ্জিত গন্ধর্ব্বললনাগণকে, আর শুনা যাইতেছে তাহাদের আনন্দের কলধ্বনি, তাহাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তা—দক্ষ প্রজাপতির প্রাসাদে

বিরাট যজ্ঞের আয়োজন। সতী কয়েকদিন ধরিয়া এই সমস্ত বিমানশ্রেণী লক্ষ্য করিলেন, বহু দেবতা সস্ত্রীক যজ্ঞে গমন করিতেছেন শুনিতে পাইলেন, আমন্ত্রিত গন্ধর্ব্ব পুরুষ ও ললনার কথাবার্ত্তায় সতীর জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইল, কল্পনাচক্ষে তিনি মাতা ও ভগ্নীগণকে সেই যজ্ঞক্ষেত্রে দর্শন করিয়া পিতৃগৃহে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। একদিন ধীরে ধীরে দাক্ষায়ণী স্বামীর নিকট গমন করিয়া পিতৃগৃহে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশায় সতী প্রথমেই মহাদেবের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,

প্রজাপতেস্তে শ্বশুরস্য সাম্প্রতং নির্ব্বাপিতো
যজ্ঞমহোৎসবঃ কিল,
বয়ঞ্চ তত্রাভিসরাম বাম ! তে যদ্যর্থিতামী
বিবুধাব্রজন্তিহি। ৪।৩।৮

—হে মহাদেব, আপনার শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞমহোৎসব সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে, ঐ দেখুন দেবগণ তথায় গমন করিতেছেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আমরাও তথায় গমন করি।

শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতির প্রতিফলিত গৌরবে জামাতা মহাদেব হয়ত পূর্ব্বের মনোমালিন্য বিস্মৃত হইতে পারেন এবং যজ্ঞক্ষেত্রে সমগ্র দেবসমাজে দক্ষের জামাতা বলিয়া পরিচিত হইয়া মহাদেব হয়ত গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করিতে পারেন—ইহাই সতী আশা করিয়াছিলেন। সতী ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে অপরাপর দেবগণ যাইতেছেন শ্রবণ করিয়া মহাদেব নিজের অনুপস্থিতিতে দেবসমাজে হীন ও নিন্দনীয় প্রতিপন্ন হইবার আশঙ্কায় হয়ত অনিমন্ত্রিত হইয়াও যজ্ঞস্থলীতে গমন করিবেন। দেবীর ভুল হইল ; জগন্মাতা স্ত্রীলোক ত, সুতরাং ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত দেবীও ভুল করিয়া বসিলেন।

কিন্তু মহাদেব নির্ব্বাক্ ও নির্ব্বিকার—যত সহজে মহাদেবের গৌরবস্পৃহা জাগ্রত করিয়া সতী নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহা হইল না। এইবার সতীকে নিজের মনের কথা সরল ভাবে প্রকাশ করিতে হইল।

তস্মিন্ ভগিন্যো মম ভর্তৃভিঃ স্বকৈঃ ধ্রুবং গমিষ্যন্তি
সুহৃদ্দিদৃক্ষবঃ,
অহঞ্চ তস্মিন্ ভবতাভিকাময়ে সহোপনীতং
পরিবর্হমর্হিতুম্। ৪।৩।৯

—অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনগণকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় আমার ভগ্নীগণও নিশ্চয়ই নিজ নিজ পতির সহিত সেই যজ্ঞে গমন করিবে। আমিও আপনার সহিত সেই মহাযজ্ঞে যাইয়া পিতৃপ্রদত্ত অলঙ্কার ও অন্যান্য উপহার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

বহুবর্ষ পূর্ব্বে প্রজাপতি দক্ষ জামাতা মহাদেবকে যে সকল কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন সতী সে সমস্ত কিছুই মহাদেবের নিকট উল্লেখ করিলেন না। তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার ভোলানাথ স্বামী এতদিনে সেই পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃত হইয়াছেন, সুতরাং সে কথার পুনরুল্লেখ না করিয়া অন্যান্য কারণের দ্বারা মহাদেবকে যজ্ঞস্থলীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত। ইহা ভাবিয়া সতী পুনরায় বলিলেন যে তিনি আত্মীয়স্বজনগণকে দর্শন করিতে সমুৎসুক, বিশেষতঃ—"দীনা দিদৃক্ষে ভব মে ভবক্ষিতিম্"—নিজ জন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য তিনি বিশেষ ইচ্ছুক হইয়াছেন। পিতৃগৃহে নিমন্ত্রণের অপেক্ষাও কন্যাগণ করেন না,— 'অনাহূতা অপ্যভিযান্তি সৌহৃদং ভর্ত্তুর্গুরোর্দেহকৃতশ্চ কেতনম্'—পতিগৃহে, গুরুগৃহে এবং পিতৃনিকেতনে অনিমন্ত্রিত হইয়াও কন্যাগণ গমন করিয়া থাকেন। ভগ্নীগণের সঙ্গে দেখাশুনা হইবে, বাবার নিকট অনেক গয়না-গাঁটি পাওয়া যাইবে, জন্মভূমি দর্শন করাও হইবে; নারী জগন্মাতা কি

এতগুলি লোভ সহজে সংবরণ করিতে পারেন! দেবীর ভিতর দিয়া চিরযুগের নারীর চিরন্তন চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুকদেব মহাকবি। সতী এইরূপে বহু মিনতি প্রকাশ করিয়া মহাদেবের নিকট পিতৃগৃহে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে মহাদেব ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং দক্ষ প্রজাপতির পূর্ব্বকৃত ব্যবহার স্মরণ করিয়া সতীকে পিতৃগৃহে যাইবার বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জামাতার প্রতি দক্ষ প্রজাপতির নিন্দা ও কটূক্তির কথা মহাদেব সতীকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। তথাপি সতীর মনের বিপরীতগতি লক্ষ্য করিয়া মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন যে একাকিনী পিতৃগৃহে যাইলেও তাঁহার সমাদর প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। পিতার অতিশয় স্নেহের পাত্রী হইলেও

তথাপি মানং ন পিতুঃ প্রপৎস্যসে মদাশ্রয়াৎ কঃ
পরিতপ্যতে যতঃ। ৪।৩।২০

—তুমি পিতার নিকট সমাদর পাইবে না, কারণ আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত সন্তপ্ত।

মহাদেব সতীকে আরও বুঝাইলেন যে "তৎ তে নিরীক্ষ্যো ন পিতাপি দেহকৃৎ দক্ষো মম দ্বিট্"—দক্ষ মহাদেবের শত্রুস্থানীয়, সুতরাং তিনি জন্মদাতা পিতা হইলেও তাঁহাকে দর্শন করা সতীর উচিত নহে। অবশেষে মহাযোগী মহেশ্বর সতীর মুখভাবে তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অমঙ্গল পরিণতির আশঙ্কায় যেন কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে তাঁহার সুচিন্তিত সাবধান-বাণী সতীকে শুনাইয়া দিলেন।

যদি ব্রজিষ্যস্যতিহায় মদ্বচো ভদ্রং ভবত্যা ন ততো ভবিষ্যতি,
সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎ পরাভবো যদা স সদ্যো মরণায়
কল্পতে। ৪।৩।২৫

—অর্থাৎ যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তুমি তথায় গমন কর তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না। সম্মান ও প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন আত্মীয়স্বজনের নিকট অবমানিত হয় তখন তাহা মরণের কারণ হইয়া থাকে।

মহাদেবের এই কঠোর বাক্যগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ভবিষ্যতে পতির অপমানে সতীর দেহত্যাগের বিষয় তখন মহাযোগীর দিব্যদৃষ্টির গোচরীভূত হইয়াছে।

মহাদেব এই বলিয়া বিরত হইলেন, কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে যদি তিনি আরও দৃঢ়ভাবে সতীকে পিতৃগৃহে যাইতে বারণ করেন তাহা হইলে অভিমানে সতী দেহত্যাগ করিবেন, পিতৃগৃহে যাইলেও পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া অপমানে তাঁহার দেহত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। তাই "এতাবদুক্ত্বা বিররাম শঙ্করঃ পত্ন্যঙ্গনাশং হ্যুভয়ত্র চিন্তয়ন্"—অর্থাৎ ভগবান্ শঙ্কর অনুমতি প্রদান অথবা দৃঢ়ভাবে নিবারণ এই উভয় ক্ষেত্রেই সতীর দেহত্যাগ আশঙ্কা করিয়া আর বিশেষ কিছু সতীকে বলিলেন না। এদিকে সতী পিতৃগৃহে যাইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পা হইয়া একবার গৃহের বাহিরে, পুনরায় স্বামীর ভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে এমন একটি ব্যাপার সংঘটিত হইল যাহাতে সতীদেবীর দোলায়মান চিত্তের চঞ্চলতা আরও বৃদ্ধি পাইল। "তত্র স্বসৃর্মে নন্থ ভর্তৃসম্মিতা"—সেই যজ্ঞস্থলীতে আমার ভগ্নীগণ নিজ নিজ পতির সহিত উপস্থিত হইবেন—এই চিন্তায় পূর্ব্ব হইতেই সতীর মন পিতৃগৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল কিন্তু তখনও বিশেষ পরিলক্ষণীয় কোনও দৃঢ়-সঙ্কল্প দেখা যায় নাই। কিন্তু আকাশমার্গে বিমানসকল দেখিয়া সতীর মন বিচলিত হইল, এবং অবশেষে যখন তাঁহার উনষাট জন ভগ্নী যজ্ঞস্থলীতে যাইবার পথে স্বভাবতই কৈলাসে অবতরণ করিয়া সতীকে সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, সেই সময় সতীর মনের প্রবল

চাঞ্চল্য সহজেই অনুমান করা যায়। শ্রীভাগবতে স্পষ্ট করিয়া এই ভগ্নীগণের আগমনের কথা উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু গ্রন্থের নানাস্থানে যে সকল কথা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে তাহা হইতে ভগ্নী ও ভগ্নীপতিগণের কৈলাসে অবতরণের ইঙ্গিত সহজেই ধারণা করা যায়। কিন্তু এই ভগ্নীগণ নিমন্ত্রিতা এবং শিবানী অনিমন্ত্রিতা—যজ্ঞস্থলীতে যাইবার ইহাই গুরুতর বাধা। মহাদেব এই স্থানে বলিতেছেন যে "প্রজাপতেঃ প্রিয়াত্মজানামসি সুভ্রু, মে মতা"—দক্ষ প্রজাপতির সমস্ত কন্যাগণের মধ্যে তুমি তাঁহার স্নেহের পাত্রী তাহা আমি জানি—তথাপি মহাদেবের সহিত সম্বন্ধ বশতঃই সতীর পিতৃগৃহে সমাদর পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই যে ভগ্নীগণের আগমন—বিশেষ করিয়া চন্দ্রমহিষী সাতাশজন দক্ষ-কন্যার অনুরোধ, সতীর মনকে পুনঃ পুনঃ দোলায়মান করিয়া তুলিল।

এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া ভক্তকর্ত্তৃক রচিত একখানি গান বাংলা দেশে বহুকাল হইতে সুপরিচিত। ভগ্নীগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অথচ স্বামীর অবমাননা আশঙ্কা করিয়া সতী বলিতেছেন,

তাই ভাবিগো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে
কেমন করে যজ্ঞে যাই বল না!
তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কথা কবে না॥
একে হলাম আমি ভিখারী-ঘরণী,
বিধাতা করেছে জনম দুঃখিনী,
পতি-অপমানে আমি অপমানী—
পতি-নিন্দা আমার কখনো সবে না॥

এই গানটির ভিতর দিয়া যেন সেদিনকার কৈলাসের সমগ্র চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাদেব পূর্ব্বেই বলিয়াছেন দক্ষ প্রজাপতি সতীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, সেই বিষয়টি একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই মহাদেবের

প্রতি দক্ষের বিদ্বেষ এবং অবজ্ঞার ভাব বুঝিতে পারা যায়। তাই সুস্থিরচিত্তে সমগ্র বিষয়টি ভাবিয়া সতী বলিতেছেন,

তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কথা কবে না।

ঠিক তাহাই হইয়াছিল,—পরে যখন সতী যজ্ঞস্থলীতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন পিতা দক্ষ তখন অবজ্ঞাভরে সতীর সহিত একটি কথাও না কহিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে শিবনিন্দা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সতী গানের ভিতর দিয়া বলিতেছেন, "একে হলাম আমি ভিখারী-ঘরণী"—এই কথাগুলি বহু পূর্ব্বে যজ্ঞস্থলীতে উচ্চারিত দক্ষের নিন্দাবাচক কথার প্রতিধ্বনি মাত্র। সতী জানেন, পতির অপমানে তাঁহার অপমান হইবে এবং "পতি-নিন্দা আমার কখনও সবে না"—ইহা যেন সতীর দিব্য চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। পতিনিন্দাও হইবে, সতী তাহা সহ্যও করিবেন না এবং ফলে তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে হইবে—এই সকলই যেন সতীর শুদ্ধাবুদ্ধির নিকট তখন স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

ভগ্নীগণ সতীর জন্য অপেক্ষা করিলেন না, পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইয়া তাঁহারা পিতৃগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এইবার যজ্ঞস্থলীতে যাইবার বাসনা নূতন করিয়া সতীর মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিল। ভগ্নীগণ সকলেই পিতৃগৃহে যাইতেছেন, তিনি একাকী কৈলাসে পড়িয়া থাকিবেন! পিতৃযজ্ঞ দর্শনের কৌতূহল, মাতা ও ভগ্নীগণের সহিত পিতৃগৃহে মিলিত হইবার বাসনা, পতিনিন্দার আশঙ্কা, মহাদেবের কঠোর আদেশ—সব একত্র হইয়া দক্ষকন্যার কোমল হৃদয়ে এক দুরন্ত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিল।

শিবানীর এই দোলায়মান চিত্ত মৈত্রেয় ঋষির বর্ণনা-কৌশলে যেন আমাদের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সতী চঞ্চল, সতী মুহূর্ত্তের

জন্যও একস্থানে সুস্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না, সতী রোদন করিতেছেন, এক একবার সেই রোদনধারার ভিতর দিয়া মহাদেবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন—সতীর অশ্রুধারা দেখিয়া যদি মহাদেবের হৃদয় কোমল হয়, যদি তাঁহাকে পিতৃগৃহে যাইবার অনুমতি প্রদান করেন। মহাদেব নিশ্চল ও নিরুত্তর হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া সতীর ক্রোধ ক্রমশঃ প্রদীপ্ত হইতেছে, তিনি কম্পিত কলেবর হইয়া

ভবং ভবান্যপ্রতিপুরুষং রুষা প্রধক্ষ্যতী বৈক্ষত জাতবেপথুঃ

—৪।৪।২

—মহাদেবকে যেন চক্ষের অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন, এইরূপ উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ইহা যেন সাধারণ গৃহস্থ-দম্পতির চিরন্তন চিত্র। পিতৃগৃহে যাইয়া মাতা ও ভগ্নীগণকে দেখিতে পাইবেন, বিরাট যজ্ঞ দেখিয়া পিতার গৌরবে কন্যা গৌরবিনী হইবেন, এই প্রবল বাসনা মনকে এমন করিয়া ধরিয়া বসিয়াছে যে সতী তখন বিবেকবুদ্ধিবিহীনা সাধারণ রমণী মাত্র,—কোথায় বা তাঁহার অনন্যসাধারণ পতিভক্তি, কোথায় বা তাঁহার সর্ব্বতত্ত্বভেদিনী দৃষ্টি, কোথায় বা তাঁহার সর্ব্বমলিনতাবর্জ্জিত শুদ্ধাবুদ্ধি! তাঁহার বস্ত্র বিপর্য্যস্ত, চক্ষে অশ্রু, স্বামীর প্রতি তাঁহার অগ্নিবর্ষণকারী দৃষ্টি। মহাদেবের মুখে কিন্তু একটীও কথা নাই, স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, সতীর অশ্রুজল তাঁহাকে বিচলিত করিতেছে না, সতীর আচরণে শিবের মনে কোনও ক্রোধের সঞ্চার হইতেছে না। পাগল মহাদেব আজ ধীর ও স্থির, আত্মবিস্মৃতা সতী আজ পাগলিনী। অবশেষে "স্ত্রৈণ্যবিমূঢ়ধীঃ"—স্ত্রী-স্বভাব হেতু হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা—সতী একাকিনী কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞস্থলীর উদ্দেশে বাহির হইলেন। শিবানীর জীবনে সে কী ভয়ঙ্কর দিন!

কৈলাস হইতে ইহজীবনের মত চিরবিদায় গ্রহণ করিবার সময় সতীর অজ্ঞাতসারেই তাঁহার হৃদয় মথিত করিয়া একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। তথাপি মহাদেব কিছু বলিলেন না, নয়নে ক্রোধ অথবা অভিমান কিছুই দেখা যাইল না, এমন কি সতীর সঙ্গে যাইবার জন্য অনুচর নন্দীর প্রতি কোন আদেশ হইল না। "দ্রুতবিক্রমাং সতীং"—দ্রুতপদবিক্ষেপে গমনকারিণী সতীকে দেখিয়া অনুচরগণ তাঁহার অনুসরণ করিল। সতী দ্রুতপদে চলিয়াছেন, মন যেন মুহূর্ত্তের মধ্যেই যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত হইতে চায়। অনুচরগণ পথিমধ্যে সতীকে বৃষভের উপর আরোহণ করাইয়া হস্তে একটি পদ্ম প্রদান করিল, মস্তকোপরি শ্বেতছত্র তুলিয়া ধরিল, গলদেশে সৌরভিত পুষ্পসমূহের মালা প্রদান করিয়া চামরহস্তে তাঁহাকে ব্যজন করিতে করিতে দুন্দুভি, শঙ্খ ও বেণুর ধ্বনিতে মুখরিত করিয়া তাঁহার সহিত দূর পথভূমি অতিক্রম করিতে লাগিল। রাজরাজেশ্বরী আজ একাকিনী পিতৃগৃহে চলিয়াছেন, অঙ্গে অলঙ্কার অথবা মহাদেবের আশীর্ব্বাদস্বরূপ মহামৃত্যুঞ্জয় রক্ষাকবচ নাই, শিবানীর সঙ্গে তাঁহার শিব নাই। মাথায় রাজছত্র, গলায় ফুলের মালা, হাতে শ্বেতশতদল ;—বাহিরে তো ভালই দেখাইতেছে, কিন্তু দেবীর ভিতরটা যেন পুড়িয়া যাইতেছে! সমস্ত পথটা সতীর মুখে কথা ছিল না, কী ভাবিতেছিলেন কে জানে!

সতী যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত হইলেন। সেই যজ্ঞভূমিতে তখন

আব্রহ্মঘোষোর্জ্জিত যজ্ঞ বৈশসং বিপ্রর্ষিজুষ্টং বিবুধৈশ্চ সর্ব্বশঃ
মৃদ্দার্ব্বয়ঃ কাঞ্চনদর্ভ চর্ম্মভিঃ সিসৃষ্ট ভাণ্ডং যজনং সমাবিশৎ। ৪।৪।৬

—যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত পশুর চীৎকারের সহিত বেদমন্ত্র সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছিল, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ও স্বয়ং দেবতারা সেখানে

উপস্থিত, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, লৌহ, কাঞ্চন, কুশ ও চর্ম্ম প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য-নির্ম্মিত পাত্রসমূহ চতুর্দ্দিকে স্থাপিত, স্বয়ং দক্ষ প্রজাপতি এই যজ্ঞস্থলীর মধ্যভাগে সগৌরবে দণ্ডায়মান। কন্যা সতী আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন। কত স্নেহের আশা করিয়া, কত মনের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া, স্বামীর আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আজ দাক্ষায়ণী পিতৃগৃহে আসিয়াছেন,—দেবঋষিবন্দিত প্রজাপতিশ্রেষ্ঠ এই পিতা দক্ষ—কিন্তু পিতা একটি স্নেহের কথা বলিয়াও সতীকে গ্রহণ করিলেন না, সতী একজন অনাহূতা, অনাদৃতা ভিক্ষুকীর মত বিরাট্ যজ্ঞস্থলীতে সমগ্র দেবঋষিব্রাহ্মণের কৌতূহলদৃষ্টির সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পিতার চক্ষু অন্য-দিকে অপসারিত, দাক্ষায়ণীর চক্ষু পিতার মুখের উপর অনিমেষদৃষ্টিতে বিন্যস্ত। এই দুর্ব্বিষহ মুহূর্ত্তের বর্ণনা স্বয়ং মৈত্রেয় ঋষিরও সাধ্যের অতীত।

সেই যজ্ঞসভায় অসংখ্য দেবঋষি ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন কিন্তু প্রজাপতি দক্ষের ভয়ে কেহই সতীকে সমাদর প্রদর্শন করিতে সাহস করিলেন না।

তামাগতাং তত্র ন কশ্চনাদ্রিয়দ বিমানিতাং যজ্ঞকৃতো ভয়াৎ
জনঃ। ৪।৪।৭

—অর্থাৎ সেই যজ্ঞস্থলে সমাগতা সতীদেবীকে দক্ষকর্ত্তৃক অনাদৃতা দেখিয়া কেহই দক্ষের ভয়ে তাঁহাকে সমাদর করিলেন না।

ইহা মানবসমাজের যুগযুগান্তরের চিত্র। প্রবল দক্ষরাজ নিজ কন্যাকে অকারণে অনাদর প্রদর্শন করিতেছেন, তথাপি দেবঋষিগণের মধ্যে কাহারও সতীকে একটি মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিবার সাহস হইল না। মানবসমাজে এইরূপ ব্যবহার অহরহঃ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু দেব সমাজের পক্ষে ইহা যেমন লজ্জাকর তেমনই বিস্ময়প্রদ। কখনও কখনও মানবসমাজে একজন স্পষ্টভাষী বিদুরকে দেখা যায়, কিন্তু দেব-ঋষি-মুনিগণের সভাতে সেদিন সত্যবাদী এবং নৈতিক বলে নির্ভীক কেহই

উপস্থিত ছিলেন না। তবে মৈত্রেয় ঋষি দেবগণের এইরূপ কলঙ্কের কথায় যেন লজ্জিত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই বিদুরকে স্মরণ করাইয়াছিলেন দক্ষের যজ্ঞস্থলীতে সেইদিন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অনুপস্থিত। তাঁহারা সতীর অবমাননা ও দেহত্যাগ এবং মহাদেবের রোষবহ্নিতে দক্ষযজ্ঞের ধ্বংস পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া সেই নিন্দিত যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত হন নাই। কিন্তু অনাদৃতা কন্যাকে দক্ষের অবজ্ঞা ও দেব-ঋষিগণের উদাসীনতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাতা অন্তঃপুর হইতে যজ্ঞসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সতীর উত্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য মাতা তাঁহার ক্রোড়ের মধ্যে সতীকে আকর্ষণ করিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। মা কিনা! সতী কিন্তু কৈলাস হইতে আসিয়া বরাবর যজ্ঞস্থলীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন—মাতা হয়ত লোকমুখে সতীর আগমন অন্তঃপুরে বসিয়াই শ্রবণ করিয়াছিলেন, হয়ত বা সে সংবাদ পান নাই। কিন্তু মায়ের স্নেহ অন্তর্য্যামী,—সংবাদ না পাইলেও মাতার বক্ষে সতীর বক্ষের বেদনা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, ব্যাকুলা জননী ত্রস্তপদে আসিয়া সতীকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। কিসের যজ্ঞস্থলী, কিসের দেবঋষির সভা, কোথায় প্রজাপতি দক্ষ!—সব ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তখন শুধু মা ও মেয়ে! মাতার সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষায়ণীর ভগ্নীগণও আসিয়াছিলেন,—তাঁহারা তো আসিবেনই, কারণ তাঁহারা নিজে কৈলাসে যাইয়া সতীর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে পিতৃভবনে আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। যজ্ঞস্থলীর সে এক অপূর্ব্ব অবস্থা ;—একদিকে দেব-ঋষি-ব্রাহ্মণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া আছেন, অপর দিকে সতীমাতা ও সতীভগ্নীগণ সতীকে ঘিরিয়া কুশল-প্রশ্ন করিতেছেন, মধ্যস্থলে যজ্ঞকর্ত্তা প্রজাপতি দক্ষ নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন—একবার তাঁহার পিতৃ-স্নেহপ্রবণ হৃদয় সতীর অবস্থা অনুভব করিয়া কোমল হইয়া আসিতেছে, পরক্ষণেই অশিষ্টাচারী জামাতার কথা

মনে পড়িয়া ক্রোধে তাঁহার হৃদয় কঠিন হইয়া যাইতেছে। বেদমন্ত্র থামিয়া গিয়াছে, পশুবধের চীৎকার আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না, সমগ্র সভায় কেবলমাত্র নারীকণ্ঠোত্থিত অস্পষ্ট কথাগুলি সভাস্থলীর নীরবতাকে ভীষণ ও দুঃসহ করিয়া তুলিতেছে। এমন সময়ে স্নেহে অভিভূতা মাতা ও ভগ্নীগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একটা বিরাট ভুল করিয়া বসিলেন। সভাস্থলীতে দক্ষপত্নী ও কন্যাগণ সকলেই মণিমাণিক্য-খচিত অলঙ্কার পরিয়া আসিয়াছেন, একমাত্র সতী নিরাভরণা। ভিখারীর স্ত্রী, একদিন তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন যে যজ্ঞস্থলীতে যাইলে তাঁহার মহামহিম পিতা বহুরত্নখচিত অলঙ্কার তাঁহাকে প্রদান করিবেন; নিরাভরণ দেহে অলঙ্কার সাজাইয়া সতী স্ত্রী-সুলভ বাসনা মিটাইবার আশা করিয়াছিলেন। স্বামী তো ভিখারী, তাঁহার তো অলঙ্কার দিবার কোনও সামর্থ্য নাই! আজ সভাস্থলীতে অলঙ্কারে আবৃতা মাতা ও ভগ্নীগণ নিরাভরণা সতীকে দেখিয়া তাঁহাকে নানাবিধ অলঙ্কার প্রদান করিয়া পিতার অনাদর ও অপমান ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। এইখানেই তাঁহাদের বিরাট ভুল হইয়া গেল।

এই পরিস্থিতি জনৈক ভক্ত কবির গানের ভিতর দিয়া সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মাতা ও ভগ্নীগণ সহানুভূতিসূচক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন যে, সতীর দেহে কোনও অলঙ্কার নাই এবং এই সহানুভূতির দ্বারা সতীকে অলঙ্কার প্রদান করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন। এই উপলক্ষ্যে রচিত একটী পুরাতন গান বাংলা দেশে সুপরিচিত—

নাই আভরণ এমন কথা মুখে এনো না মা আমার,
আমিই শুধু করতে পারি মা অলঙ্কারের অহঙ্কার।

সমগ্র গানটি যথেষ্ট বড় এবং এই গানের ভিতর দিয়া সতীর মনোভাব কবি সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। স্বয়ং মহাদেব যাঁহার

প্রাণের ভূষণ, তাঁহার আবার অন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? শিবের শ্রীহস্ত সতীর কণ্ঠসংলগ্ন, সেই শ্রীহস্তের ভাস্বর দীপ্তির নিকট মণিমাণিক্য মলিন হইয়া যাইবে; শিবের ক্রোড়ে যাঁহার আসন সেই সতী-দেহ শিবদীপ্তিতে অনুক্ষণ সমুজ্জ্বল! সতী ত্রিভুবনে শিবসীমন্তিনী বলিয়া পরিচিতা; এই পরিচয়ের উর্দ্ধে আর কোন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রয়োজন হয় না; শিবানী বলিয়া তিনি দেবমানবসমাজে চিরগৌরবিনী—এই গৌরবের কাছে অলঙ্কারের গৌরব অতি তুচ্ছ ও উপহাসাস্পদ। একদিন কৈলাসে বসিয়া স্বর্ণখচিত অলঙ্কারের জন্য দাক্ষায়ণীর চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ শিবের নিকট হইতে দূরে আসিয়া তিনি তাঁহার শিবানী নামের সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই আজ পতিনিন্দাকারী পিতার সম্মুখে মাতৃপ্রদত্ত অলঙ্কাররাশি দর্শন করিয়া সতী লজ্জিত হইলেন, একবার তাঁহার মন কৈলাসে ছুটিয়া যাইল,—তিনি মানসচক্ষে দেখিলেন, তাঁহার শিবসুন্দর স্বামী, তাঁহার আনন্দময় শিব নিরানন্দ হইয়া একাকী নীরবে বসিয়া আছেন, আর শিবনিন্দায় কলুষিত যজ্ঞস্থলীতে মাতা ও ভগ্নীগণ ভিখারিণীকে অলঙ্কারের লোভ প্রদর্শন করিতেছেন। মাতৃপ্রদত্ত অলঙ্কার আজ মহাদেবের অপমান এবং সতীর লজ্জাজনক,—এই অলঙ্কাররাশি যেন মহাদেবের সহিত সতীর চিরবিচ্ছেদের প্রতীকস্বরূপ, ইহারা যেন পতিনিন্দাকারী পিতার প্রতি আকর্ষণের একটা সম্মোহন অস্ত্র। সতী অলঙ্কার প্রত্যাখ্যান করিলেন, এতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছেন, তথাপি মাতৃপ্রদত্ত "বরমাসনঞ্চ" শ্রেষ্ঠ আসন তিনি গ্রহণ করিলেন না, মাতা ও ভগ্নীগণের স্নেহসূচক সম্ভাষণের একটি কথারও উত্তর দিলেন না। পতিনিন্দা আজ তাঁহাকে পতিচিন্তায় নিমগ্না করিয়াছে,—কোনও অলঙ্কার, কোনও সমাদর, কোনও সম্ভাষণ তাঁহার মনে লাগিতেছে না। এইবার দক্ষ নূতন করিয়া শিবনিন্দা আরম্ভ করিলেন, সতীর চক্ষু হইতে যেন অগ্নি বাহির হইতে লাগিল,

তিনি পিতার সমস্ত কথা থামাইয়া দিয়া বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে তাঁহার গর্হিত কর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন—

যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তিতৎ
পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ। ৪।৪।১৪

—অর্থাৎ, মহাদেব পবিত্রকীর্ত্তি, তাঁহার শাসন অলঙ্ঘ্যণীয়, তাঁহার পবিত্র দুইটি মাত্র অক্ষরযুক্ত 'শিব' নাম বিনা মনোযোগেও একবার উচ্চারণ করিলে মানবের জন্মজন্মান্তরের পাপ মুহূর্ত্তেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এমন পরম মঙ্গলময় মহাদেবকে পরম অমঙ্গলস্বরূপ আপনি আজ নিন্দা করিতেছেন!

পিতার প্রতি কন্যার ভাষা বড়ই কঠোর—"শিবেতরঃ",—আপনি পরম অমঙ্গল স্বরূপ। ভাষা ক্রমশঃ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল, দক্ষ স্নেহপাত্রী কন্যার মুখে নিজনিন্দাসূচক ভাষা শ্রবণ করিয়া শিবনিন্দা পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সতী পুনরায় বলিলেন, দক্ষ ব্যতীত ব্রহ্মার অপর সমস্ত পুত্রগণ শিবের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, "বিশ্ববন্ধবে"—সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের হিতকামী মহাদেবকে একমাত্র দক্ষই শত্রু বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। সতী বলিলেন, মহতের নিন্দা করা দূরের কথা, মহতের নিন্দা শ্রবণ করিলেও মহাপাপ হইয়া থাকে। মহাকবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভব নামক মহাকাব্যে উমার সহিত মহাদেবের কথোপকথনের সময় এই ভাবই এক অপূর্ব্ব ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাস লিখিয়াছেন যে, দক্ষকন্যা সতী পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়া, হিমালয়ের কন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, মহাদেবকে পুনরায় পতিরূপে পাইবার জন্য সাধনা করিতেছেন, সাধনা প্রায় সফলকল্প, এমন সময়ে স্বয়ং মহাদেব উমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উমার তপোভূমিতে প্রবেশ করিয়া শিবনিন্দা আরম্ভ করিলেন। আবার

শিবনিন্দা! একবার এই শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া উমাকে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল, আবার সেই শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া তপোভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে কি পুনরায় দেহত্যাগ করিতে হইবে? সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! উমা ব্যস্ত হইয়া শিবনিন্দা-কলুষিত স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া বলিয়াছিলেন,

> ন কেবলং যো মহদপভাষতে
> শৃণোতি তস্মাদপি যঃ সঃ পাপভাক্।

—মহতের নিন্দাকারী ব্যক্তি মহাপাপী, এবং যে মহতের নিন্দা শ্রবণ করে সেও মহাপাপী। উমার তখন পূর্ব্বজন্মের কথা,—প্রজাপতি দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ সবই মনে পড়িয়া গিয়াছে।

দক্ষরাজ কর্ত্তৃক শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া সতী বলিলেন যে মহতের নিন্দাকারী প্রবল হইলে প্রতিকারে অক্ষম শ্রোতার "কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ"—কর্ণদ্বয় হস্ত দ্বারা রুদ্ধ করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত, "ছিন্দাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেজ্জিহ্বাম্"—আর, যদি নিন্দাশ্রবণকারীর শক্তি থাকে তাহা হইলে নিন্দাকারীর জিহ্বা বলপূর্ব্বক ছেদন করাই কর্ত্তব্য এবং যদি নিন্দাকারীর সহিত শ্রোতাদের কোনও আত্মীয় সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে "অসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ",—দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই নিন্দাকারীর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলাই বিধেয়। ভাষা শ্রবণ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সতীর ক্রোধবহ্নি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, পিতার প্রতি অসংযত ভাষা—নিন্দাকারীর জিহ্বা ছিঁড়িয়া ফেলা উচিত—দক্ষের অপরিসীম অপরাধের কথাই পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অবশেষে সতী বলিলেন,

> অতস্তবোৎপন্নমিদং কলেবরং ন ধারয়িষ্যে শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ
> জগ্ধস্য মোহাদ্ধি বিশুদ্ধিমন্ধসো জুগুপ্সিতস্যোদ্ধরণং প্রচক্ষতে। ৪।৪।১৮

—অর্থাৎ, আপনি নীলকণ্ঠের নিন্দা করিয়াছেন, অতএব আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন আমার এই দেহ আমি পরিত্যাগ করিব। কারণ, অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কেহ অপবিত্র অন্ন ভক্ষণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই অপবিত্র অন্ন বমন করিয়া শরীর হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই আত্মশুদ্ধির একমাত্র উপায়।

এই অপূর্ব্ব শ্লোকটির ভিতর চিন্তা করিয়া দেখিবার অনেক বিষয়বস্তু রহিয়াছে। প্রথমেই দেখা যাইতেছে যে সতী মহাদেবকে "শিতিকণ্ঠ" অর্থাৎ "নীলকণ্ঠ" বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। মহাদেবের কণ্ঠ নীলবর্ণ হওয়ার সমগ্র ইতিহাস সতী যেন সমবেত দেব-ঋষি-ব্রাহ্মণ সকলকে এবং বিশেষ করিয়া দক্ষপ্রজাপতিকে শুনাইয়া দিতেছেন। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন, তীব্র বিষের উদ্ভব, বিষের ক্রিয়ায় সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংসের আশঙ্কা, বিষের প্রতিকার করিতে দেবগণের অসমর্থতা, ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণের মহাদেবের নিকট আগমন, বিশ্ববন্ধু আশুতোষের বিষভক্ষণ এবং চিরদিনের জন্য নীলবর্ণ বিষের চিহ্ন ও জ্বালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া ব্রহ্মার সমগ্র সৃষ্টি পরিরক্ষণ ও পরিপালন—আজ এই সমস্তই "শিতিকণ্ঠ" কথাটীর ভিতর দিয়া সভাস্থিত নির্ব্বাক্ ও নির্লজ্জ দেব-ঋষিগণকে শিব-সীমন্তিনী সতী দেহত্যাগের পূর্ব্বে একবার শুনাইয়া দিতেছেন,—দক্ষও শ্রবণ করিতেছেন; কারণ, নীলকণ্ঠের এই আত্মোৎসর্গের জন্যই আজ দক্ষরাজ পৃথিবী হইতে পশু ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এত বড় বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সতী "কলেবরং ন ধারয়িষ্যে"—এই দেহ ধারণ করিব না—বলিলেন, "প্রাণধারণ করিব না", এই ভাষা ব্যবহার করেন নাই। কারণ, দেহটাই দক্ষের দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সতী-প্রাণতো চিরদিনই শিবময়! এই শ্লোকের ভাষা, ভাব ও ছন্দ বিশেষভাবে পরিলক্ষণীয়। কয়েকবার শ্লোকটী পড়িয়া দেখিলেই ইহার বজ্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এই কি দক্ষপ্রজাপতির সেই

স্নেহময়ী কন্যা, যাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া দক্ষ ভিখারী জামাতার সংসার-পালনের অক্ষমতা একদিন সর্ব্বজনসমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন! সভামধ্যে মহাসম্মানিত দক্ষরাজকে যে কথা, যে ভাষা দেবতারাও শুনাইতে সাহস করিতেন না, সেই অপমানসূচক ভাষা আজ পিতাকে তাঁহার আদরিণী কন্যার নিকট শুনিতে হইতেছে! ভাষা শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সতীর কণ্ঠধ্বনিতে তখন নারীসুলভ কোনও কোমলতাই বর্ত্তমান ছিল না, কণ্ঠস্বর বজ্রের মত তীব্র, মৃত্যুদণ্ডের মত কঠিন। বিশেষতঃ 'গ্ধ', 'দ্ধি', 'দ্ধ' যুক্তাক্ষরগুলি একটি স্বল্পপরিসর পংক্তির ভিতর পাঁচবার ব্যবহৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর সতীকণ্ঠের নিনাদ, গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর অনুরণন, কন্যার মনের সহিত পিতার মনের একটা সংঘাত সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, ভাষার ক্রমবর্দ্ধনশীল "ঝাঁকৃরাণি"র ভিতর দিয়া সতীর মনের রুক্ষতা ও তিরস্কার সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে, ঝঙ্কারের বেগ এক একবার নামিয়া আসিতেছে, পুনরায় 'দ্ধি',-'গ্ধ'-'দ্ধ',—সহযোগে নূতন শক্তিসংগ্রহ করিয়া দক্ষপ্রজাপতির প্রতি সুতীব্র তিরস্কারে পরিণত হইতেছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, সতীর রোষকষায়িত রক্তাভ মুখের আকুঞ্চন ও প্রসারণের সম্মুখে প্রজাপতি দক্ষের বিবর্ণ ও সঙ্কুচিত দেহ, সতীবাক্যের বজ্রনির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত যজ্ঞস্থলী, একটা অস্পষ্ট বিপদের আশঙ্কায় দেব, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ চঞ্চল ও নির্ব্বাক্। অবশেষে "ব্রীড়া মমাভূৎ কুজনপ্রসঙ্গতঃ"—আপনার ন্যায় দুর্জ্জনের সহিত আমার সম্বন্ধ থাকায় আমি লজ্জিত—এই বলিয়া সতী ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক মহাদেবের ধ্যান করিতে করিতে সমাধিযোগে নিজদেহে অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। নিকটেই মাতৃপ্রদত্ত স্বর্ণখচিত আসন রহিয়াছে কিন্তু শিবানী পতিনিন্দাকলুষিত যজ্ঞস্থলীর কোনও দ্রব্যই স্পর্শ করিলেন না। "এবং স্বদেহং মহতাং মহীয়সা, মুহুঃসমারোপিতমঙ্কমাদরাৎ"—মহৎগণেরও পূজনীয় মহাদেব যে সতীদেহ সমাদর পূর্ব্বক বারংবার ক্রোড়ে গ্রহণ

করিতেন, আজ শিবের ক্রোড় শূন্য করিয়া অভিমানিনী শিবানী সেই দেহ পিতা, মাতা ও দেব-ঋষিগণের সম্মুখে মুহূর্ত্তের মধ্যেই পরিত্যাগ করিলেন। ত্রিভুবনে হাহাকার পড়িয়া গেল।

এই স্থলে পরিলক্ষণীয় যে, ভাগবতে বর্ণিত সতীর দেহত্যাগের সহিত তন্ত্রের বর্ণনায় বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। শ্রীভাগবতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যে যোগবলে সতী দেহত্যাগ করিলেন সেই যোগসমুদ্ভূত অগ্নিতে সতীর দেহ ভস্মীভূত হইয়া যাইল। কিন্তু "তন্ত্রচূড়ামণি" নামক তন্ত্র এবং "দেবীভাগবতে" শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রাণহীন সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

এদিকে কৈলাসে বসিয়া দেবর্ষি নারদের মুখে সতীর দেহত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া

> ক্রুদ্ধঃ সুদষ্টৌষ্ঠপুটঃ স ধূর্জ্জটিঃ
> জটাংতড়িদ্বহ্নিসটোগ্ররোচিষম্
> উৎকৃত্য রুদ্রঃ সহসোত্থিতো হসন্
> গম্ভীরনাদো বিসসর্জ্জ তাং ভুবি॥ ৪।৫।২

—অতিক্রুদ্ধ মহাদেব অধরোষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিদ্যুৎ ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন স্বীয় জটা ছিঁড়িয়া সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং গম্ভীর হুঙ্কারে অট্টহাস্য করিতে করিতে সেই জটা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। রুদ্রক্রোধের এক বিচিত্র চিত্র! শ্লোকটি দুই তিন-বার উচ্চকণ্ঠে পড়িলেই ভয়ঙ্কর ভাব ও দুর্জ্জয় ভাষার অপূর্ব্ব সংযোগ সহজেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

সেই নিক্ষিপ্ত জটা হইতে বিপুলকায় বীরভদ্র আবির্ভূত হইলে মহাদেব তাহাকে বলিলেন,

> দক্ষং সযজ্ঞং জহি মদ্ভটানাং ত্বমগ্রণী রুদ্র! ভটাংশকো মে।
> ৪।৫।৪

—তুমি আমার অংশে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব আমার অনুচরগণে অধিনায়ক হইয়া যজ্ঞের সহিত দক্ষকে বিনাশ কর।

তখন বীরভদ্র ভূতপ্রেত ও পিশাচগণে পরিবৃত হইয়া যজ্ঞস্থলীতে গমনপূর্ব্বক যজ্ঞীয় পাত্র সকল চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, যজ্ঞীয় অ নিভাইয়া দিলেন, এবং অবশেষে "কুণ্ডেষু অমূত্রয়ন্"—যজ্ঞকুণ্ডের ভিত মূত্রত্যাগ করিলেন। দেব ও ঋষিগণ ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিলেন কি সতীর অবমাননার সময় দক্ষরাজার ভয়ে তাঁহারা একটি প্রতিবাদবাক্য উচ্চারণ করেন নাই বলিয়া, রুদ্রের অনুচরগণ কোনও ঋষির দাড়ি ছিঁড়ি ফেলিল, কাহারও দাঁত ভাঙ্গিয়া দিল, কাহারও বা চোখ উপড়াইয়া দি এবং অবশেষে বীরভদ্র পশুবধের খড়্গ গ্রহণ করিয়া দক্ষের মস্তক দে হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং সেই দক্ষমুণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া সম যজ্ঞাগার ভস্মীভূত করিয়া অনুচরগণের সহিত কৈলাসে প্রত্যাবর্ত করিলেন।

(২)

শিবের আগমন ও দক্ষযজ্ঞ সমাপন

ইতিমধ্যে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করি দক্ষযজ্ঞধ্বংস, দেবঋষির অবমাননা, সমস্তই আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। ব্রহ্মা ও নারায়ণ এইরূপ ঘটিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন বলি যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত হন নাই। ব্রহ্মা সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন যে মহাদেবকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করায় দেবগণের অপরাধ হইয়াছে এবং এখন নীলকণ্ঠের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করাই দেবগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। অবশেষে পত্নীবিরহে শোকাকুল মহাদেবের রোষভয়ে ভীত দেবতাগণের অনুরোধে, ব্রহ্মা স্বয়ং অগ্রণী হইয়া প্রজাপতি, দেব ও পিতৃগণের সহিত গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাসে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

অধ্যায়ে কয়েকটি শ্লোকে কৈলাসের এক অপূর্ব্ব বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। সেই কৈলাস পর্ব্বতে মন্দার, পারিজাত, দেবদারু, তমাল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষ; স্বর্ণবর্ণপদ্ম, মালতী, মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্প; নানাজাতীয় বিহঙ্গ, বানর, মৃগ, সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুগণ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এই কৈলাস পর্ব্বতে অলকা নামক যক্ষপুরী দেবতাগণ দেখিতে পাইলেন,—মহাকবি কালিদাস এই অলকাপুরীকে তাঁহার "মেঘদূত" নামক মহাকাব্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। অবশেষে দেবগণ এক বিরাট বটবৃক্ষতলে "তক্ত্যামর্ষমিবান্তকম্"—ক্রোধলেশবিহীন অথচ কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর মহাদেবকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। মহাদেবের সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় ঈষৎ রক্তগৌরবর্ণ দেহে ভস্ম অবলেপিত, হস্তে তপস্বীর দণ্ড, মস্তকে উজ্জ্বল জটাভার, ললাটে চন্দ্রলেখা। তিনি তখন বটবৃক্ষমূলে কুশনির্ম্মিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেবর্ষি নারদকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতেছিলেন। যে দেবর্ষি নারদ ত্রিভুবনে দেব-ঋষি ও মানবগণকে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের কথা শুনাইয়া থাকেন, স্বয়ং ব্যাসদেব যাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন, সেই পরমজ্ঞানী ও পরমভক্ত নারদকে মহাদেব অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন! এই একটিমাত্র বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে মহাদেবের মন তখন ক্রোধলেশবিহীন, নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের মত প্রশান্ত ও গম্ভীর। এই দৃশ্যই দূর হইতে দেবতাগণকে অভয় প্রদান করিল, উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহারা নিঃসংশয় হইলেন। ব্রহ্মাকে দেখিয়া নীলকণ্ঠ আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবের স্তবস্তুতি করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, মহাদেবের কৃপায় দক্ষ পুনর্জীবিত হউন, যজ্ঞ সুসম্পন্ন হউক, এবং ক্ষতবিক্ষত দেবগণ সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়া যজ্ঞস্থলীতে গমন করুন। অবশেষে ব্রহ্মা বলিলেন,

যজ্ঞস্তে রুদ্র! ভাগেন কল্পতামগু যজ্ঞহন্। ৪।৬।৫৩

—হে যজ্ঞধ্বংসকারী মহাদেব, আপনার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া আপনি যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে কৃপা প্রদর্শন করুন।

মহাদেব হাসিলেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ আশুতোষের সেই অপূর্ব্ব হাসি দেখিয়া পুনরায় আশ্বস্ত হইলেন, এখন আর উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহাদের লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না। অতঃপর মহাদেব বলিলেন,

নাঘং প্রজেশ! বালানাং বর্ণয়ে নানুচিন্তয়ে,
দেবমায়াভিভূতানাং দণ্ডস্তত্র ধৃতো ময়া। ৪।৭।২

—হে ব্রহ্মন, অজ্ঞ লোকের অপরাধ আমি গণনা করি না, মনেও রাখি না। মায়ামোহিত অপরাধী ব্যক্তিগণের প্রতি আমি দণ্ডবিধান করিয়াছি মাত্র।

মহাদেবের অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাগণ "সাধু" "সাধু" বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের সাহস তখন বাড়িয়া গিয়াছে, তাঁহারা মহাদেবকে ছাড়িলেন না—"আপনি আসিয়া যজ্ঞসম্পাদন করুন" —বলিয়া দেবগণ মহাদেবকে ধরিয়া লইয়া ব্রহ্মার সহিত যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি দক্ষের দেহে, মহাদেবের আদেশ মত, ছাগমুণ্ড যোজনা করা হইল, দক্ষ যেন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন। সম্মুখে আশুতোষকে দেখিয়া

ভবস্তবায় কৃতধীর্নাশক্নোদনুরাগতঃ,
ঔৎকণ্ঠবাষ্পকলয়া সম্পরেতাং সুতাং স্মরন্। ৪।৭।১১

—দক্ষ তখন মহাদেবের স্তব করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মৃত কন্যা সতীদেবীকে স্মরণ করিয়া শোকজনিত বাষ্পে কণ্ঠরোধ হওয়ায় সহসা স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে মনকে কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া মহাদেবকে স্তুতিপূর্ব্বক বলিলেন,

ভূয়াননুগ্রহ অহো ভবতা কৃতো মে দণ্ডস্ত্বয়া ময়ি ভৃতো
যদপি প্রলব্ধঃ। ৪।৭।১৩

—আপনাকে আমি অপমান করিয়াছিলাম, অতএব আপনি যে শাস্তি আমাকে দিয়াছেন তাহাতে আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহই করা হইয়াছে।

মহাদেব পূর্ব্ব যজ্ঞস্থলীতে নিন্দার সময় যেমন নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিলেন এখন স্তুতিবাদের সময়ও নির্ব্বাক্। ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া দক্ষপ্রজাপতি পুনরায় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, নিবিষ্টচিত্তে শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন, তখন সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর নারায়ণ গরুড়ে আরোহণ করিয়া সেই যজ্ঞস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি না আসিলে তো কোনও যজ্ঞই সুসম্পন্ন হয় না! সেই গীতার কথা,

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেব চ।"

—আমিই সর্ব্বযজ্ঞের প্রভু, সর্ব্বযজ্ঞের ফল আমাকেই সমর্পণ করিতে হয়। তখন প্রজাপতি দক্ষ, ঋত্বিক্গণ, সদস্যগণ, স্বয়ং মহাদেব ও ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, ঋত্বিক্পত্নীগণ, সিদ্ধগণ, দক্ষপত্নী প্রসূতি, লোকপাল ও যোগেশ্বরগণ, অগ্নি, বিদ্যাধর, দেব ও ব্রাহ্মণগণ সকলে পৃথক পৃথক্ভাবে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির স্তব করিলেন। শ্রীহরি তখন পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, তিনি স্বীয় শক্তিভূতা প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন এবং এক ও অদ্বিতীয় তিনি সেই সকল কর্ম্মানুযায়ী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র নাম ধারণ করিয়া ত্রিভুবনে পরিচিত হইয়া থাকেন। শ্রীহরি আরও বলিলেন,

ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্,
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্! স শান্তিমধিগচ্ছতি। ৪।৭।৫৪

—যাঁহারা সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কোনও প্রভেদ দর্শন করেন না, তাঁহারাই পরমশান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকটির নিগূঢ় অর্থ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই শ্লোকটির ভিতর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, সর্ব্বমতবাদের সুসংহতি পরিদৃষ্ট হইতেছে। ব্রহ্মা,

বিষ্ণু ও মহেশ্বর একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু যুগে যুগে মানুষ এক অখণ্ড ও অনন্ত ঈশ্বরকে ছিন্ন ও খণ্ডিত করিয়া আপনার বুদ্ধি কৌশলের বড়াই করিয়া আসিতেছে, সমাজে দ্বন্দ্ব ও বিভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করিতেছে, অনন্ত করুণাময় ভগবানের দোহাই দিয়া হিংসা ও রক্তপাতের সূচনা করিতেছে। যদি বিভিন্ন ধর্ম্মমত থাকে তাহাতে তো কোন ক্ষতি নাই, মানুষ নিজের নিজের রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী নিজের ধর্ম্ম খুঁজিয়া লইয়া সাধন ভজন করিবে। ইহা তো ভাল। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সমস্ত খণ্ড-ভগবানকে ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করিয়া এক অখণ্ড ভগবান বিরাজ করিতেছেন—একমেবাদ্বিতীয়ং—এক এবং অদ্বিতীয়। শৈব যদি মনে করেন যে তাঁহার শিব সত্য, এবং বিষ্ণু মিথ্যা, তাহা হইলে শৈব ও বৈষ্ণবের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায়, ঈশ্বরকে ভুলিয়া মানুষ তখন আপন আপন দ্বেষ ও হিংসা প্রবৃত্তির সেবা করিতে থাকে। জগতের ইতিহাসে ঈশ্বরকে খাড়া করিয়া যত নৃশংস অত্যাচার ও নরহত্যা হইয়াছে তাহার তুলনায় যুদ্ধবিগ্রহের বিভীষিকা উপেক্ষণীয়। কিন্তু মানুষ তাহা বুঝে না, তাই গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বয়ং নারায়ণকে দক্ষের যজ্ঞস্থলীতে আগমন করিতে হইল, এবং জলদমন্দ্রস্বরে সমবেত দেবতা, ঋষি, প্রজাপতি, যক্ষ, রক্ষ সকলের সম্মুখে বলিতে হইল যে, যে মানুষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ভিতর এক দেখিতে পায় "স শান্তিমধিগচ্ছতি"—একমাত্র সেই শান্তির অধিকারী হইয়া থাকে। ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম কথা। বাস্তবিকপক্ষে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর কোথাও লেশমাত্র সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি নাই। রামায়ণ গ্রন্থ প্রধানতঃ পরমপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকাহিনী। কিন্তু সেখানেও পুণ্যকীর্ত্তি বাল্মীকি দেখাইয়াছেন, যে রাবণকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে দেবী দুর্গার পূজা করিতে হইয়াছিল। ভাগবতে দেখা যায় যে গোপীগণ দেবী কাত্যায়নীর পূজা করিয়া তবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত

পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতে দেখা যায় যে অর্জ্জুন দেবী দুর্গার স্তবস্তুতি করিয়া তবে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে জয়ী হইতে পারিয়াছিলেন। কোথাও তো সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি নাই। কিন্তু হিন্দুগণ স্ব স্ব কপোলকল্পিত বিভিন্ন ভগবানকে সৃষ্টি করিয়া আত্মঘাতী হইয়াছে, গৃহবিবাদে দেশকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে, বাহিরের শত্রুর পক্ষে ভারত আক্রমণ সহজ করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্ম্মশিক্ষা এইরূপ ভ্রান্তিমূলক নহে। আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ও মুনিঋষিগণ যুগে যুগে এই শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন যে, ভাবই ভগবৎদর্শনের মূল কথা—যেমন ভাব, তেমনই দর্শন। নিরাকারবাদী মহাকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননী-মূরতি ॥

যিনি অরূপ, বাক্য ও মনের অগোচর, যিনি সর্ব্ব জড় ও চৈতন্যশক্তির আধাররূপা, তিনি নিরাকারবাদী কবির সম্মুখে তাঁহার ভাবমূর্ত্তি, জননী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাহা হইলে আর ভেদ কোথায়—সাকার ও নিরাকার একাকার হইয়া যাইতেছে। ইহাই ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য। "যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্"—তিনিই ধন্য।

এই বিষয়ে মহাভারতের একটি বিখ্যাত ঘটনা উল্লেখ করা হইতেছে। কুরুক্ষেত্রে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ সমবেত হইয়াছে, সংঘর্ষ আসন্ন। এমন সময়ে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ মহাবীর অর্জ্জুনকে দেবী দুর্গার স্তব করিতে বলিলেন। অর্জ্জুন যদি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীদুর্গার স্তব করেন তাহা হইলে তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। কেন? অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ আজ পার্থ-সারথি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহার রথ পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য আবার শ্রীদুর্গাদেবীর স্তবস্তুতি করিতে হইবে কেন? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই

উপদেশের ভিতর দিয়া সমগ্র মানবজাতিকে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভেদবুদ্ধি আনিয়া তাহারা যেন প্রতারিত না হয়। স্বয়ং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মহাশক্তি শ্রীতুর্গার আরাধনা মানিয়া লইতেছেন, অতএব ছোটখাট কৃষ্ণ-ভক্তগণ যেন শ্রীতুর্গার প্রতি বিভেদবুদ্ধি আনয়ন করিয়া আপনাদের আধ্যাত্মিক জীবনের মূলে কুঠারাঘাত না করেন। অথচ ক্ষুদ্র ও ভ্রান্ত বৈষ্ণব এমন অনেকে আছেন যাঁহারা কালীর প্রসাদ খাইলে তাঁহাদের জাত নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়া মনে করেন, মহাকালীর প্রতি মূর্খের মত ভাষা ব্যবহার করিয়া দেবীকে "সাঁওতালী" নারীমাত্র বলিয়া অভিহিত করেন। দেবভূমি ভারতবর্ষেই ধর্ম্মবুদ্ধিতে এত ভ্রম রহিয়াছে, অন্য দেশের মানুষের তো কথাই নাই।

মহাবীর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া, যুদ্ধ জয় করিবার আশায় কুরুক্ষেত্রে নতজানু হইয়া দুর্গাদেবীর যে স্তব করিয়াছিলেন তাহা নীচে উদ্ধৃত করা হইল। এই দেবীস্তুতি মন্ত্রশক্তি অর্জ্জন করিয়াছে এবং আধিব্যাধি, বিপদ-সম্পদ, সুখ-দুঃখ সর্ব্বসময়ে এই শ্রীতুর্গাস্তব ভক্তি সহকারে পাঠ করিলে মানুষ তাহার অভীপ্সিত ফল অনায়াসে লাভ করিয়া থাকে। গভীর ভাব ও ভাষার অপূর্ব্ব সংযোজনায় এই শ্রীতুর্গাস্তব ধর্ম্মজগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

নমস্তে সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনি!
কুমারি, কালি, কাপালি, কপিলে, কৃষ্ণপিঙ্গলে। ১
ভদ্রকালি, নমস্তভ্যং মহাকালি, নমোঽস্তুতে
চণ্ডি, চণ্ডে, নমস্তভ্যং তারিণি, বরবর্ণিনি। ২
কাত্যায়ণি, মহাভাগে, করালি, বিজয়ে, জয়ে
শিখিপিচ্ছধ্বজধরে, নানাভরণভূষিতে। ৩
অট্টশূলপ্রহরণে, খড়্গখেটকধারিণি,
গোপেন্দ্রস্যানুজে, জ্যেষ্ঠে, নন্দগোপকুলোদ্ভবে। ৪

মহিষাসৃক্প্রিয়ে! নিত্যং কৌশিকি, পীতবাসিনি,
অট্টহাসে, কাকমুখি, নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে! ৫
উমে, শাকম্ভরি, শ্বেতে, কৃষ্ণে, কৈটভনাশিনি,
হিরণ্যাক্ষি, বিরূপাক্ষি, সুধূম্রাক্ষি, নমোঽস্তু তে। ৬
বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে, ব্রহ্মণ্যে, জাতবেদসি,
জম্বুকটককচৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে। ৭
ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্
স্কন্দমাতর্ভগবতি, দুর্গে, কান্তারবাসিনি। ৮
স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী,
সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যসে। ৯
স্তুতাসি ত্বং মহাদেবি! বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা,
জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎপ্রসাদাৎ রণাজিরে। ১০
কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানামালয়েষু চ
নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্। ১১
ত্বং জম্ভলী মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈব চ
সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা। ১২
তুষ্টিঃ পুষ্টি র্ধৃতি র্দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্য বিবর্দ্ধিনী
ভূতি র্ভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈঃ। ১৩

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবভক্তগণ নিজ নিজ উপাস্যদেবতায় যে সমস্ত বিভূতি আরোপ করিয়া থাকেন, সেই সমস্তই উল্লেখ করিয়া অর্জ্জুন শ্রীদুর্গাদেবীর কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন। আমাদের শাস্ত্রসমূহে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-বিরোধিতার কোন প্রশ্রয় কোথাও দেওয়া হয় নাই।

দক্ষযজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল, সকলে স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। মৈত্রেয় ঋষি সমগ্র দক্ষযজ্ঞের বিবরণ প্রদান করিয়া বিদুরকে বলিলেন যে, তিনি এই সমস্ত ঘটনা বৃহস্পতির শিষ্য পরম বৈষ্ণব উদ্ধবের নিকট শ্রবণ

করিয়াছিলেন। মহাদেব ও সতীর এই পবিত্র কাহিনী যিনি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন তাঁহার "যশস্যমায়ুষ্যমঘৌঘমর্ষণম্"—যশ ও আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশেষে বিদুরের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মৈত্রেয় তাঁহাকে বলিলেন,

এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্ব্বকলেবরম্
জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রুম। ৪।৭।৫৮

—দক্ষকন্যা সতী যজ্ঞস্থলীতে দেহত্যাগ করিয়া পরে হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহা আমি শুনিয়াছি।

(৩)

ধ্রুব-চরিত্র

দক্ষযজ্ঞধ্বংস ও তাহার পুনরনুষ্ঠান বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া মৈত্রেয় ঋষি মহাভক্ত ধ্রুবের উপাখ্যান বলিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার পুত্রগণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। সনকাদি কুমারচতুষ্টয়, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি ব্রহ্মার কতিপয় পুত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিরূপ বংশ নাই। কিন্তু ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন।

জায়ে উত্তানপাদস্য সুনীতিঃ সুরুচিস্তয়োঃ
সুরুচিঃ প্রেয়সী পত্যুর্নেতরা যৎসুতো ধ্রুবঃ। ৪।৮।৮

—অর্থাৎ, উত্তানপাদ রাজার সুরুচি ও সুনীতি নাম্নী দুই পত্নী ছিলেন; সুরুচি পতির প্রিয়তমা ছিলেন। অনাদৃতা সুনীতির গর্ভে ধ্রুব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদিন রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুনীতির পুত্র ধ্রুব পিতার ক্রোড়ে উঠিতে

আগ্রহ প্রকাশ করিলে, রাজা "অতি গর্ব্বিতা" সুরুচির ভয়ে ধ্রুবের প্রতি কোনও মনোযোগ প্রদর্শন করিতে সাহস করিলেন না। ধ্রুবের বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র। ভ্রাতা উত্তম পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া আদর যত্ন পাইতেছে, ইহা দেখিয়া বালক ধ্রুবের মনেও সেই আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই উদিত হইয়াছিল, পিতা যে স্ত্রৈণ তাহা বালকের পক্ষে ধারণাতীত ছিল। ধ্রুব পিতার অনাদরে মর্ম্মাহত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তখনও আশা করিতেছেন, পিতা উত্তানপাদ হয়ত ক্ষণকাল পরেই তাঁহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন, এমন সময়ে ধ্রুবের সমস্ত আশা নির্ম্মূল করিয়া বিমাতা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। বিমাতা সুরুচি ধ্রুবকে রুক্ষ এবং তিরস্কারসূচক কণ্ঠে বলিলেন যে, মহারাজা পিতার ক্রোড়ে বসিবার অধিকারী হইয়া ধ্রুব জন্মগ্রহণ করে নাই, সুরুচির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে তবে ধ্রুবের এইরূপ সমাদর প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিত।

অতএব

তপসারাধ্য পুরুষং তস্যৈবানুগ্রহেণ মে
গর্ভে ত্বং সাধয়াত্মানং যদীচ্ছসি নৃপাসনম্॥ ৪।৮।১৩

—রাজার ক্রোড়ে অথবা রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতে হইলে, তপস্যা দ্বারা পরম পুরুষ বাসুদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহে পুনরায় "আমার" গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

সুরুচি কথাগুলি অত্যন্ত রুক্ষভাবে বলিলেন, পরম পুরুষের আরাধনার কথাই তাঁহার মুখ্য উপদেশ নহে, তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাই বহু ভাগ্যের পরিচায়ক বলিয়া প্রধানতঃ সেই কথাই সুরুচি বলিতে চাহিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালকের পক্ষে পরম পুরুষের জন্য তপস্যা করা অসম্ভব, সুতরাং পিতৃক্রোড়ে অথবা সিংহাসনে বসিবার অধিকার লাভ করাও ধ্রুবের পক্ষে একান্ত দুরাশা। বিমাতার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপবাণী, কটু ও তীব্র কণ্ঠ সহযোগে বিষাক্ত তীরের মত বালকের

পঞ্চ-বর্ষীয় বক্ষ বিদ্ধ করিল, ক্ষত্রিয়পুত্র ধ্রুব তখন "শ্বসন্ রুষা দণ্ডহতো যথাহিঃ"—যষ্টির দ্বারা আহত সর্পের ন্যায় ক্রোধে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া "হিত্বামিষন্তং পিতরং সন্নবাচং"—নির্ব্বাক্ ও অনাদর-কারী পিতার নিকট হইতে "জগাম মাতুঃ স রুদন্ সকাশম্"—রোদন করিতে করিতে নিজ জননী সুনীতির নিকট গমন করিলেন।

অভিমানী ও অনাদৃত বালকের কী অপূর্ব্ব চিত্র! সর্ব্বযুগে সর্ব্ব-সমাজে, রাজপুত্র অথবা ভিখারী বালক সকলেরই এই চিত্র চিরদিন অঙ্কিত হইতেছে ও মুছিয়া যাইতেছে। পিতার অনাদর ও মাতার সুশীতল ক্রোড়! ক্ষুধা, অভিমান, তিরস্কার, বেদনা—সব অবস্থাতেই বালকের প্রতিকার রোদন এবং সেই রোদনের প্রতিকার মাতৃক্রোড়। পিতার ক্রোধের দিনে মাতৃক্রোড়, মাতার ক্রোধের দিনেও মাতার অঞ্চলই বালকের একমাত্র আশ্রয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ মাতা ও পুত্রের এই সুশীতল সম্বন্ধটী নিম্নলিখিত ভাষায় সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

চাহ, নাথ, চাহ,
জননী যেমন চাহে সজল নয়ানে
পিতার ক্রোধের দিনে সন্তানের পানে।

এই ক্ষেত্রেও মাতা সুনীতি সজল নয়নে রোদনশীল ও স্ফুরিতাধর ধ্রুবকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। মাতা তখনও ধ্রুবের দুঃখের কারণ জানিতে পারেন নাই—একেতো পঞ্চ বর্ষীয় বালকের ভাষা নাই, উপরন্তু ক্রোধ এবং অভিমানের যুগপৎ ঘাতপ্রতিঘাতে বয়স্ক লোকেরই ভাষা হারাইয়া যায়, বালকের তো কথাই নাই। কিন্তু মাতা ও পুত্রের প্রাণ তখন একই সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে,—ভাষার প্রয়োজন কোথায়! ইতিমধ্যে পুরবাসিগণ আসিয়া সুনীতির নিকট সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। মাতা সমস্ত শুনিলেন, পুত্রের জন্য কাঁদিলেন অথচ

ক্রোধ এবং অভিমানের বশীভূত হইয়া সপত্নী অথবা স্ত্রৈণ স্বামীর প্রতি নিন্দাসূচক কোন কটুকথা প্রয়োগ করিলেন না। সুনীতির এই অসাধারণ সংযম পরবর্ত্তী সময়ে ধ্রুবের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, মাতা যদি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রের নিকট অসংযত ভাষা ও ভাব প্রকাশ করিতেন, স্বামীনিন্দা অথবা সপত্নীনিন্দা করিতেন তাহা হইলে হয়ত ধ্রুবের সমস্ত তপস্যাই ব্যর্থ হইয়া যাইত, ধ্রুবচরিত্র আর কেহ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিত না। বালকের জীবনের উপর মাতা ও পিতার প্রভাবের এতই পার্থক্য। নিম্নলিখিত শ্লোকে সুনীতির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে,—এই শ্লোকটি চিত্রবিশেষ।

> দীর্ঘং শ্বসন্তী বৃজিনস্য পারমপশ্যতী বালকমাহ বালা
> মামঙ্গলং তাত। পরেষু মংস্থা ভুঙ্‌ক্তে জনোযৎ
> পরদুঃখদস্তৎ॥ ৪।৮।১৭

সুনীতি ভাবিয়া দেখিলেন যে, মহারাজ উত্তানপাদ এবং তদীয় প্রিয় মহিষী একযোগে বালকের প্রতি যে নিষ্ঠুর ও অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, এবং অপরোক্ষভাবে সুনীতির প্রতি যে অনাদর ও অবমাননা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা রাজপুরনিবাসিনী অনাদৃতা মাতা ও স্নেহবঞ্চিত বালকের পক্ষে প্রতিকারবিহীন। সুতরাং "বৃজিনস্য পারমপশ্যতী"— সুনীতি বুঝিলেন তাহাদের দুঃখ অকূল ও অসীম। এই চিন্তা সুনীতির মনে উদিত হইবামাত্র "দীর্ঘংশ্বসন্তী"—অর্থাৎ সুনীতির বক্ষপঞ্জর কম্পিত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল। কিন্তু আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, এই নিশ্বাস অগ্নির মত উত্তপ্ত এবং ইহার শিখাতে একদিন সুরুচি দগ্ধ হইয়া যাইবে। দুঃখের অবধি নাই বুঝিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াও সুনীতি ধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলেন না, নিজ মনকে ক্রোধের অধীন হইতে দিলেন না। সুনীতি ধ্রুবকে বলিলেন— "মামঙ্গলং তাত! পরেষু মংস্থা ভুঙক্তে জনো যৎ পরদুঃখদস্তৎ"—হে

বৎস, তুমি যেন তোমার বিমাতা বা পিতার কোনও অমঙ্গল ইচ্ছা করিও না, কারণ যে অপরের অমঙ্গল সাধন করে, অথবা অপরের কৃত অমঙ্গলের পরিবর্ত্তে অনিষ্টকারীর অমঙ্গল কামনা করে, সে নিজেই দুঃখ প্রাপ্ত হয়। ইহ সংসারে প্রত্যেক আঘাতের প্রতিঘাত আছে, সেই প্রতিঘাত কিরূপে আসিবে, কে সেই প্রতিঘাত হানিবে, কখন সেই প্রতিঘাত সংঘটিত হইবে—তাহা মনুষ্য-বুদ্ধির অগোচর কিন্তু বিশ্ববন্ধু ভগবানের ধর্ম্মজগতে প্রতি আঘাতের প্রতিঘাতই দুর্লঙ্ঘ্য বিধান। এমন কি, মনে মনেও অপরের অনিষ্ট চিন্তা করিলে তাহার প্রতিঘাত অনিষ্টচিন্তাকারীর জীবনে অবশ্যম্ভাবী। মন লইয়াই মানুষের ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম—ইন্দ্রিয়গণ তো মনের আজ্ঞাকারী ভৃত্য মাত্র। অন্তর যদি পাপ চিন্তায় কলুষিত হইয়া থাকে তাহা হইলে শুধু হস্তের দ্বারা ভগবানকে পত্র পুষ্প দিয়া পূজা করিলে সে পূজার লেশমাত্র সার্থকতা নাই। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

> পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি,
> তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

—ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্প, ফল জল দিলে তবেই ভগবান তাহা গ্রহণ করেন, নতুবা নহে। ভক্তি কথাটির উপর জোর দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দুইটী লাইনে "ভক্তি" কথাটী দুইবার ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং মনটা পরিষ্কার রাখিতে হইবে নতুবা ভগবানের পূজা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাই দেব আরাধনার প্রধান উপকরণ হইল চিত্তশুদ্ধি—অন্ততঃ সেই পূজাকালে মনটীকে অসৎ চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। "মামঙ্গলং তাত! পরেষু মংস্থা"—হে বৎস, তুমি যেন কাহারও অমঙ্গল কামনা করিও না! অপরের অনিষ্টচিন্তা করিয়া মানুষের জীবনে কতদূর ক্ষতি হইয়া যায় তাহা মানুষ জানে না, আপনার ক্ষতির কারণ খুঁজিয়া পায় না। তাই শাস্ত্রকারগণ বলেন যে সুরাপূর্ণ কুম্ভকে ছিদ্রি

আঁটিয়া যদি সহস্রবৎসর গঙ্গাজলে ডুবাইয়া রাখা হয় তাহা হইলেও সুরাকুম্ভ পরিশুদ্ধ হয় না। মনের ভিতর অসৎ চিন্তাকে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া বাহিরের সৎ ক্রিয়াকলাপ সবই নিরর্থক। আমাদের সর্ব্ববিধ পাপের ভিতর অপরের অনিষ্ট চিন্তাই সর্ব্বপেক্ষা গুরুতর পাপ। মনই যদি পচিয়া উঠিল তাহা হইলে সমগ্র মানুষটাই তো অসুস্থ হইয়া পড়িল। মন-পচা অসুস্থতার চিকিৎসা নাই।

আতিষ্ঠ তৎ তাত! বিমৎসরস্ত্ব-মুক্তং সমাত্রাপি যদব্যনীকম্
আরাধয়াধোক্ষজপাদপদ্মং যদীচ্ছসেঽধ্যাসনমুত্তমোযথা॥

৪।৮।১৯

—অর্থাৎ হে বৎস, তুমি বিমাতার প্রতি ক্রোধ না করিয়া তিনি হঠাৎ যে পরম সত্য ভগবৎ আরাধনার কথা বলিয়াছেন—'তপসারাধ্য পুরুষং' —তপস্যার দ্বারা পরম পুরুষের আরাধনা কর—সেই উপদেশ পালন কর। যদি রাজ্য প্রার্থনা কর অথবা মুক্তি প্রার্থনা কর, উভয় ক্ষেত্রেই সেই পরম পুরুষের পাদপদ্মই তোমার একমাত্র আরাধনার বস্তু। এই শ্লোকটির টীকা করিয়া শ্রীধর স্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, "সুরুচ্যা উক্তঃ যঃ পুরুষঃ স এব মুক্তিং ভুক্তিং চ উপাসকানাং দদাতীতি ফলিতোঽর্থঃ"— অর্থাৎ সুরুচি যে পুরুষের কথা বলিয়াছেন সেই পুরুষই মুক্তি অথবা বিষয়ভোগ উভয়ই উপাসককে দিতে সমর্থ,—ইহাই সারকথা। অবশেষে তিনটি শ্লোকে সুনীতি ধ্রুবকে বলিলেন যে যোগী, কর্ম্মী অথবা মুমুক্ষু সকলেরই মনোরথ পরিপূর্ণ করিবার কারণস্বরূপ সেই পরম পুরুষ। অতএব "অনন্য ভাবে নিজধর্ম্মভাবিতে মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পুরুষম্"— ঐকান্তিকভাবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেই ধ্রুবের সিদ্ধিলাভ হইবে। এইস্থানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে মাতা সুনীতি ধ্রুবকে রাজ্য কামনা করিয়া তপস্যা করিবার উপদেশ দিলেন না। নারী চরিত্রের এইরূপ মাহাত্ম্য মহাভারত ও ভাগবতে স্থানে স্থানে

অপূর্ব্ব ভাষা ও ভাবের দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মহাভারতে বর্ণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মাতা কুন্তীকে তপোবন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া রাজমাতা হইয়া হস্তিনাপুরে অবস্থান করিতে আহ্বান করিলেন, তখন কুন্তী তপস্যা ও শ্রীহরিচিন্তনই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া পুত্রগণের সহিত হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। পঞ্চ ভ্রাতার পক্ষে মাতা কর্ত্তৃক তপস্যাসাধনই পরম উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ! কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহা বুঝিলেন না, তিনি মাতাকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। কুন্তী পুত্রগণের শত্রুদমন, অসপত্ন রাজ্যভোগ, অতুল ঐশ্বর্য্য, দীর্ঘজীবন—ইহার কিছুই আশীর্ব্বাদস্বরূপে কামনা করিলেন না, কেবলমাত্র বলিলেন,

ধর্ম্মে তে ধীয়তাং বুদ্ধিঃ, মনস্তু মহদস্তু তে।

—অর্থাৎ তোমাদের বুদ্ধি চিরদিন ধর্ম্মমুখী হউক, তোমাদের পরিণত মন মহৎ হউক।

ইহাই ছিল সসাগরা ধরিত্রীর রাজমাতা মহীয়সী কুন্তীর পুত্রগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ; আবার অনুরূপ আশীর্ব্বাদই দীনহীনা, দুঃখতাপক্লিষ্টা মহীয়সী সুনীতি ধ্রুবকে করিলেন। ধ্রুব মাতার পরম উপদেশ শ্রবণ করিয়া "নিশ্চক্রাম পিতুঃ পুরাৎ"—পিতার রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন।

শ্রী মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিলেন,

নারদস্তদুপাকর্ণ্য জ্ঞাত্বা চাস্য চিকীর্ষিতম্,
স্পৃষ্ট্বা মূর্দ্ধণ্যঘঘ্নেণ পাণিনা প্রাহ বিস্মিতঃ॥ ৪।৮।২৫

—দেবর্ষি নারদ ধ্রুবের গৃহত্যাগ অবগত হইয়া ও ধ্রুবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ধ্রুবের নিকট আগমন করিলেন এবং সর্ব্বপাপবিনাশক তাঁহার শ্রীহস্ত দ্বারা ধ্রুবের মস্তক স্পর্শ করিয়া বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন।

এই শ্লোকটীর ভিতর কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। ধ্রুবের গৃহত্যাগে হঠাৎ নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন কেন? কেনই বা জীবের জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফল শোধন করিতে সমর্থ তাঁহার সেই শ্রীহস্তের দ্বারা পরম স্নেহের সহিত ধ্রুবের মস্তক স্পর্শ করিলেন? কারণ সহজেই অনুমেয়। মহর্ষি নারদের আজ আপনার পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি মনে উদিত হইয়াছে। একদিন এইরূপ অসহায় গৃহহীন অবস্থায় পিতৃমাতৃ-বিহীন পঞ্চবর্ষীয় নারদ অজানার উদ্দেশে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। ধ্রুবের পিতা থাকিয়াও নাই, রাজমহিষী মাতা রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও নারদের দাসীমাতার মতই অনাদৃতা, সেই পঞ্চ বর্ষের আশ্রয়চ্যুত বালক নারদের মত আজ শ্রীহরি দর্শনের আশায় এই বিশাল পৃথিবীর বিশালতর পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নারদের হৃদয়তন্ত্রীতে আজ আপনার পূর্ব্ব জন্মের অবস্থা ও ধ্রুবের বর্ত্তমান সর্ব্বরিক্ততা একসুরে বাজিয়া উঠিয়াছে— উভয়েই আজ সর্ব্বহারার দলে। এইরূপে সর্ব্বস্ব না হারাইলে মানব-হৃদয়ে তো সর্ব্বস্বময়ের স্থান সঙ্কুলান হয় না! নারদ আসিয়া নিজ শ্রীহস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ধ্রুবের মস্তক স্পর্শ করিলেন। এই শ্রীহস্ত যখনই ধ্রুবের মস্তক স্পর্শ করিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ধ্রুবের পরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেল। সাধুর শ্রীহস্তের এতই মাহাত্ম্য! পরে আমরা দেখিতে পাইব যে, স্বয়ং শ্রীনারায়ণ একদিন নৃসিংহ অবতার হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া যখন মুহুর্মুহু ভীষণ গর্জ্জন করিতেছিলেন তখন ব্রহ্মা, শঙ্কর ও দেবতাগণ; এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও ভীত হইয়া নৃসিংহদেবের নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। কিন্তু বালক প্রহ্লাদ নির্ভীক হৃদয়ে ভক্তবৎসলের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র নৃসিংহদেব নিজ রুধিরলিপ্ত, নখরজালমণ্ডিত, বজ্রের মত কঠিন অথচ কুসুমের মত কোমল শ্রীহস্ত প্রহ্লাদের মস্তকে প্রদান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ "সঃ তৎকরস্পর্শ-ধৃতাখিলাশুভঃ"—নৃসিংহের করস্পর্শে প্রহ্লাদের জন্ম জন্মান্তরের অশুভ

দূরীভূত হইল। সাধুর স্পর্শের এতই মাহাত্ম্য—একবার ভক্তের দে
স্পর্শ করিলেই সাধন ভজনের কার্য্য সহজ ও সফল হইয়া যায়।

নারদ ধ্রুবকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন; ক্ষত্রিয়গণের আশ্চ
তেজ, তাহারা কখনই অপমান সহ্য করিতে পারে না; এই ধ্রুব বাল
হইলেও বিমাতার দুর্ব্বাক্য-জ্বালা হৃদয়ে এখনও বহন করিতেছে। প্রভু
লীলাতেই আনন্দ, তাই নারদ ধ্রুবকে ছলনা করিয়া বলিলে,
"নাধুনাপ্যবমানং তে সম্মানঞ্চাপি পুত্রক!" —হে পুত্র, তুমি বালক,
তোমার মান ও অপমান বলিয়া কিছুই থাকা উচিত নয়। "পুত্রক"
কথাটি কী মধুর, কী কোমল, কত অভয়প্রদ! অতঃপর নারদ ধ্রুবকে
যেন পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,

অথ মাত্রোপদিষ্টেন যোগেনাবরুরুৎসসি
যৎ প্রসাদং সবৈ পুংসাং দুরারাধ্যো মতো মম॥
মুনয়ঃ পদবীং যস্য নিঃসঙ্গেনোরুজন্মভিঃ,
ন বিদুঃ মৃগয়ন্তোঽপি তীব্র যোগসমাধিনা।
অতো নিবর্ত্ততামেষ নির্ব্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ,
যতিষ্যতি ভবান্ কালে শ্রেয়সাং সমুপস্থিতে॥

—৪।৮।৩১, ৩২, ৩৩

—অর্থাৎ তুমি মাতার উপদেশ মত যাঁহার কৃপালাভ করিতে ইচ্ছা
করিয়াছ, সেই পরম পুরুষ ভগবান্ মানবগণের দুরারাধ্য বলিয়াই আমি
মনে করি। মুনিগণ জন্মে জন্মে নিষ্কাম ভক্তিযোগযুক্ত সমাধির দ্বারা
অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারেন না।

অতএব তুমি তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করিও না, তোমার এই উদ্যম
নিষ্ফল। যখন সময় হইবে তখন তুমি এই বিষয়ে যত্ন করিও।
উপনিষদের সেই পুরাতন কথা—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য
মনসা সহ"!

কথাগুলি সমস্তই সত্য, উপদেশও—"অতো নিবর্ত্ততামেষ নির্ব্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ"—সাধারণ মানুষের, বিশেষ করিয়া পঞ্চবর্ষীয় বালকের পক্ষে অতীব যুক্তিযুক্ত। কিন্তু নারদের শ্রীহস্তস্পর্শজনিত শক্তিতে ধ্রুবের বিমাতার প্রতি অভিমানরূপ কষায় কাটিয়া গিয়াছে, অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া দিব্য দৃষ্টিলাভ হইয়াছে, ভক্তির বীজ অঙ্কুরিতপ্রায় দেখা যাইতেছে। সুতরাং নারদ আপনার দয়ার দ্বারাই আপনি পরাজিত হইলেন, ধ্রুবকে ছলনা করিতে পারিলেন না। ধ্রুব নারদকে বলিলেন, "আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি, আপনি দেবর্ষি নারদ,—বিতুদন্নটতে বীণাং হিতায় জগতোঽর্কবৎ"—আপনি জগতের মঙ্গলের জন্য বীণা বাদন করিতে করিতে সূর্য্যের ন্যায় ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ধ্রুবের মনের ভাব যেন—"প্রভু, তুমি জগতের মঙ্গল সাধনে নিরত, কিন্তু আমি কি জগতের বাহিরে, যে তুমি আমাকে ছলনা করিতেছ?" মহর্ষি নিজ স্পর্শজনিত ধ্রুবের দিব্যদৃষ্টির নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছেন—ভক্তের নিকট ভগবান্ এইরূপে কতবার ধরা দিয়াছেন তাহার নির্ণয় নাই। ভক্তিবদ্ধ, স্নেহপরাজিত নারদের মুখের দিকে চাহিয়া অসহায়, সর্ব্বরিক্ত বালক নিবেদন করিলেন—

> পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধু বর্ত্ম মে.
> ব্রূহ্যস্মৎ পিতৃভির্ব্রহ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্ ॥ ৪।৮।৩৭

—হে ব্রহ্মন্, যাহা ত্রিভুবনের সম্পদ হইতেও উৎকৃষ্ট এবং যাহাতে আমার পিতৃপিতামহগণ অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই, আমি সেই পরমপদ জয় করিতে অভিলাষী, আপনি আমাকে উপায় বলিয়া দিন।

"ত্রিভুবন", "জিগীষোঃ" (জয় করিতে অভিলাষী) প্রভৃতি ভাষা ক্ষত্রিয় রাজপুত্র ধ্রুবের দৃঢ় মনোবৃত্তি সূচিত করিতেছে।

বালক ধ্রুব এইরূপে শ্রীনারদকে গুরুবরণ করিয়া আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক উপদেশ প্রার্থনা করিলে নারদ বলিলেন যে, ধ্রুবের মাতা যে-পুরুষের

উপাসনার কথা উপদেশ করিয়াছেন সেই ভগবান বাসুদেবই পুরুষার্থ-প্রদাতা, ধ্রুব তদ্গতচিত্তে তাঁহার ভজনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিবে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গরূপ নিজের যে কোনও মঙ্গল কামনা করে তাহার পক্ষে একমাত্র শ্রীহরির চরণ-সেবাই একান্ত কর্ত্তব্য। ধ্রুব কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আপনার মনোভাব মাতা অথবা নারদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নাই—শ্রীহরির সাধনা তিনি রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য অথবা মোক্ষলাভের জন্য করিবেন তাহা এখনও অপরিস্ফুট। নারদ ধ্রুবকে উপায় বলিয়া দিয়া, যে স্থান সাধন ভজনের অনুকূল তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,

তৎ তাত ! গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি,
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥ ৪।৮।৪২

—অর্থাৎ হে বৎস, তুমি যমুনাতীরস্থ পবিত্র ও শান্তিপ্রদ মথুরায় গমন কর, তোমার মঙ্গল হইবে। বৈকুণ্ঠের ন্যায় সেই মথুরায় শ্রীহরি নিত্য অবস্থান করেন।

এই মথুরায় যাইতে বলিবার উদ্দেশ্য ছিল,—এই স্থানে যুগে যুগে শ্রীহরির লীলা হইয়াছে, তাঁহার পদধূলি ইহার প্রতি ধূলিকণার সহিত সংমিশ্রিত, ভক্ত সমাজে এই স্থান চির উজ্জ্বল। নবীন ভক্তের সাধন-ভজনের অনুকূল স্থানরূপে মথুরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীধর স্বামী মহাশয় এই মধুবন সম্বন্ধে টীকা লিখিয়াছেন—"তত্র মধুবনে হরেঃ সর্ব্বব্যাপকস্যাপি নিত্যং সান্নিধ্যম্, শ্রীমথুরামণ্ডলম্ নিত্যং বৈকুণ্ঠবৎ হরিঃ প্রকটো বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। তত্র ভাগবতা অপি নিত্যং বর্ত্তন্তে নিত্যদা হরিসান্নিধ্যোপপত্তেঃ। অনেন শ্রীমথুরামণ্ডলস্য ভগবৎ প্রিয়ত্বং, সর্ব্ব তীর্থেভ্য উৎকৃষ্টত্বং, শীঘ্রং ভগবৎপ্রাপকত্বং চ দর্শিতং। তথাচ শ্রুতিঃ—মথুরায়াং স্থিতির্ব্রহ্মন্ সর্ব্বদা মে ভবিষ্যতি—ইতি।" অর্থাৎ হরি সর্ব্বত্র বিরাজমান হইলেও মথুরায় তাঁহার নিত্য প্রকাশ, এই

মথুরামণ্ডলে বৈকুণ্ঠের ন্যায় হরি সর্ব্বদা প্রকট। সেই স্থানে হরিসঙ্গ করিবার জন্য ভক্তগণও নিত্য বিরাজমান। এই উপদেশের দ্বারা মথুরার প্রতি ভগবানের প্রীতি, সর্ব্ব তীর্থের মধ্যে মথুরার শ্রেষ্ঠত্ব, মথুরায় ভজন করিলে শীঘ্র ভগবৎপ্রাপ্তি স্থচিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—হে ব্রহ্মন্, মথুরায় আমি সর্ব্বদা বাস করি। অতএব শ্রীধর স্বামীর টীকা পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি মহর্ষি নারদ কেন ধ্রুবকে বিশেষ করিয়া মথুরায় গমন করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন।

অতঃপর নারদ ধ্রুবকে যমুনার জলে ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া প্রাণায়ামের দ্বারা মনের চঞ্চলতা বিদূরিত করিয়া ধীর চিত্তে "ধ্যায়েৎ মনসা গুরুণা গুরুম্"—শ্রীগুরুর ধ্যান পূর্ব্বক শ্রীহরির ধ্যান করিতে উপদেশ দিলেন। ধ্রুবের এই গুরু যে স্বয়ং নারদ তাহা কিন্তু এখনও ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীনারদ এতক্ষণ ধ্রুবকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে পরমপুরুষের ভজন, মথুরায় গমন, যমুনার জলে অবগাহন, প্রাণায়ামের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, গুরুর ধ্যান এবং সর্ব্বশেষে হরি ভজনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই শ্রীহরির ধ্যান কিরূপে করিতে হইবে সেই মূল কথাই এখনও অভিব্যক্ত হয় নাই। এইবার সাতটি শ্লোকে দেবর্ষি নারদ শ্রীহরির চিন্ময় দেহ ও বেশভূষার অপূর্ব্ব বর্ণনা করিলেন। দেবর্ষির ভাষা, ভাব ও বর্ণনা-কৌশলে নারায়ণের রূপ যেন ভক্তের চক্ষের সম্মুখে উজ্জলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎ প্রসন্নবদনেক্ষণম্,
সুনসং সুভ্রুবং চারু-কপোলং সুরসুন্দরম্॥
তরুণং রমণীয়াঙ্গমরুণোষ্ঠেক্ষণাধরম্,
প্রণতাশ্রয়ণং নৃম্ণং শরণ্যং করুণার্ণবম্॥
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্
শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈরভিব্যক্ত চতুর্ভুজম্॥

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূরবলয়ান্বিতম্,
কৌস্তুভাভরণগ্রীবং পীত কৌশেয়বাসসম্ ॥
কাঞ্চীকলাপ পর্য্যস্তং লসৎ কাঞ্চন নূপুরম্,
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্ ॥
পদ্ভ্যাং নখমণিশ্রেণ্যা বিলসদ্ভ্যাং সমর্চ্চতাম্,
হৃৎপদ্ম কর্ণিকাধিষ্ণ্য মাক্রম্যাত্মন্যবস্থিতম্ ॥
স্ময়মানমভিধ্যায়েৎ সানুরাগাবলোকনম্
নিয়তেনৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভম্ ॥ ৪।৮।৪৫-৫১

—অর্থাৎ শ্রীহরি ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ, তাঁহার বদন ও নয়ন সর্ব্বদা প্রসন্ন এবং নাসিকা, ভ্রূ ও গণ্ডস্থল অতিশয় রমণীয়, তিনি দেবগণ হইতেও সুন্দর।

তিনি স্থির যৌবনসম্পন্ন, তাঁহার অঙ্গ রমণীয় এবং ওষ্ঠ ও নয়ন অরুণবর্ণ; তিনি ভক্তের আশ্রয় এবং অভীষ্টপ্রদ, শরণাগতপালক ও দয়ার সাগর।

তিনি মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলদেশে বনমালা এবং বাহু চতুষ্টয় শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মে সুশোভিত।

তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুসমূহে কেয়ূর ও বলয়, কণ্ঠদেশে কৌস্তুভমণি ও পরিধানে পীত পট্টবস্ত্র।

তাঁহার কটিদেশে চন্দ্রহার, চরণযুগলে স্বর্ণময় নূপুর, তিনি শান্ত ও সুন্দর, তাঁহার রূপ, মন ও নয়নের প্রীতিবর্দ্ধক।

তিনি স্বীয় উজ্জ্বল চরণযুগল ভক্তের হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের ভিতর অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করিতেছেন।

তিনি মৃদুহাস্যসমন্বিত ও অনুরাগব্যঞ্জক দৃষ্টিসমন্বিত। এইরূপ বরদশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিকে সংযত ও একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবে।

শ্রীহরির রূপ বর্ণনা করিবার সময় দেবর্ষি নারদ প্রথমেই "প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎ"—শ্রীহরি ভক্তজনকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সতত উন্মুখ—এই কথাগুলি ব্যবহার করিয়া বালক ধ্রুবকে ভজনসাধনে উৎসাহিত করিলেন

এবং রূপবর্ণনের শেষে "বরদর্ষভম্"—বরপ্রদানকারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এই ভাষা প্রয়োগ করিয়া ধ্রুবের বরলাভ ও অভীষ্ট সিদ্ধি পূর্ব্ব হইতেই সূচিত করিলেন।

অবশেষে গুরুরূপে দেবর্ষি নারদ শিষ্য ধ্রুবকে দ্বাদশাক্ষরী মন্ত্র প্রদান করিলেন,

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

—দেবর্ষি প্রদত্ত এই মহামন্ত্র শ্রীভাগবত গ্রন্থে এবং ভক্তগণের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কত শত যুগযুগান্তর ধরিয়া নারদের শ্রীমুখনিঃসৃত, ধ্রুবের সাধনায় সমুজ্জ্বল এই মহাশক্তিশালী প্রাণবান্ মন্ত্র কত ভক্তগণকে উদ্ধার করিয়াছে ও করিতেছে তাহার নির্ণয় নাই। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ যে সাতটী শ্লোকে পরমপুরুষের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহারই সার এই মন্ত্রের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষায় নিহিত রহিয়াছে। অতঃপর ধ্রুব নারদকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া পুণ্যভূমি মথুরায় প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দেবর্ষি নারদ আসিয়া রাজা উত্তানপাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন,

রাজন্, কিং ধ্যায়সে দীর্ঘং মুখেন পরিশুষ্যতা।

—হে রাজন্, আপনি ম্লানমুখে সর্ব্বদাই কি চিন্তা করিতেছেন? রাজা বলিলেন, "আমি স্ত্রৈণ ও অতিশয় নিষ্ঠুর, আমার পুত্র ধ্রুব পঞ্চম বর্ষীয় বালক মাত্র। আমি তাহাকে অনাদর দেখাইয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছি। বালক রক্ষকহীন, তাহাকে হিংস্রজন্তুগণ বিনাশ করিবে।" নারদ এই অনুশোচনাই আশা করিয়াছিলেন সুতরাং অনুতাপদগ্ধ নৃপতির প্রতি কোনও কঠোর বাক্য প্রয়োগ না করিয়া বলিলেন,

মামা শুচঃ স্বতনয়ং দেবগুপ্তং বিশাম্পতে,
তৎ প্রভাবমবিজ্ঞায় প্রাবৃঙ্‌ক্তে যদ্‌যশো জগৎ। ৪।৮।৩৮

—অর্থাৎ হে মহারাজ, আপনি পুত্রের জন্য বৃথা শোক করিবেন না, আপনার পুত্রের মৃত্যু নাই, তাহার কীর্ত্তি জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে। শ্রীহরি তাহার সহায়।

কিন্তু এখনও ধ্রুব পথ চলিতেছেন, সাধনভজন আরম্ভ করেন নাই, অথচ দেবর্ষি তাঁহার সিদ্ধি ও কীর্ত্তি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়া রাজা উত্তানপাদকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। আদর্শগুরু দেবর্ষির আত্মশক্তিতে, তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্রশক্তিতে, শিষ্যের ভজনশক্তিতে এতই দৃঢ় বিশ্বাস! এইরূপ মণিকাঞ্চনযোগ না হইলে মন্ত্রদীক্ষা গুরুর জীবিকা উপার্জ্জনের অন্যতম উপায় মাত্র, এবং ভজন সাধনবিহীন শিষ্যের নিকট ইহা আত্মপ্রবঞ্চনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। গুরুকরণ ও শিষ্যকরণ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও কাষ্ঠ সংযোগে বৃহত্তর জ্যোতির সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ একটি অখণ্ড আধ্যাত্মিক জীবন হইতে অপর একটি অখণ্ড আধ্যাত্মিক জীবনের সৃষ্টিও অবশ্যম্ভাবী।

ধ্রুব মধুবনে যাইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন; ধ্রুব সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন,—মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া আসাই পঞ্চবর্ষীয় বালকের পক্ষে সর্ব্বস্বত্যাগ, সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ত্যাগ। ধ্রুব মহাতীর্থ মথুরায় আসিয়াছেন, —মথুরার বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, অণুপরমাণু, সাধুসজ্জন সকলেই ভজন সাধনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতেছেন, ধ্রুব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ভক্ত দেবর্ষির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, একনিষ্ঠ মন লইয়া শ্রীহরির ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন।

> সর্ব্বতো মন আকৃষ্য হৃদি ভূতেন্দ্রিয়াশয়ম্,
> ধ্যায়ন্ ভগবতো রূপং নাদ্রাক্ষীৎ কিঞ্চনাপরম্। ৪।৮।৭৭

—অর্থাৎ ধ্রুব মনকে সকল বিষয়বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে ভগবানের রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং সেই রূপ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

মৈত্রেয় ঋষির এই কথাগুলি বলিবার সময় শ্রীশুকদেব একবার মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি আপাদমস্তক দৃষ্টিপাত করিলেন,—দৃষ্টির অর্থ সহজেই বুঝা যাইল। মহারাজ শ্রীশুকদেবকে বলিয়াছিলেন,

কথয়স্ব মহাভাগ, যথাহমখিলাত্মনি,
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্তক্ষ্যে কলেবরম্। ২।৮।৩

—হে মহাভাগ, আমাকে বলুন কি করিয়া আমি বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে পারি।

আজ ধ্রুবের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পরীক্ষিৎকে শুকদেব ইঙ্গিত করিতেছেন যে এই রূপেই মনকে বিষয়নির্মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিতে হয়। যাহা পঞ্চ বর্ষীয় ক্রীড়াশীল বালকের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা বয়স্ক জ্ঞানবান পরীক্ষিতের পক্ষে অসম্ভব নহে। ধ্রুবের এই তদ্ভাবভাবিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী ভক্ত গান রচনা করিয়াছেন,

কোথা পদ্মপলাশলোচন!
বলেছেন মা আমারে বনে পাব তব দরশন॥
কখন তো আমি দেখিনি তোমায়
দেখা দিয়ে আমায় রাখ রাঙ্গা পায়,
দয়াময়, প্রাণ তোমারেই চায়॥
সেবা বিনা বৃথা গিয়াছে করম,
না দেখে বৃথাই গিয়াছে জনম,
তব শ্রীচরণ (আমার) ধরম করম
কোথা পদ্মপলাশলোচন!

তপস্যা করিতে করিতে পঞ্চম মাস সমাগত হইলে ধ্রুব যখন প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাসরোধ করিয়া শ্রীহরির ধ্যান করিতেছিলেন, তখন

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেবতা ও লোকসকল শ্বাসরোধ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। দেবগণ আসিয়া শ্রীহরিকে বলিলেন,

নৈবং বিদামো ভগবন্, প্রাণরোধং চরাচরস্যাখিলসত্ত্বধাম্নঃ,
বিধেহি তন্নো, বৃজিনাদ্বিমোক্ষং প্রাপ্তা বয়ং ত্বাং শরণং শরণ্যম্।

৪।৮।৮১

—অর্থাৎ হে ভগবন্, নিখিল প্রাণি-শরীরের শ্বাসরোধ কেন হইতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি শরণাগতজনের আশ্রয় ও রক্ষক, অতএব আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাদিগকে এই ক্লেশ হইতে মুক্ত করুন!

তখন ভগবান বলিলেন,

মাভৈষ্ট বালং তপসো দুরত্যয়া-ন্নিবর্ত্তয়িষ্যে প্রতিযাত স্বধাম,
যতো হি বঃ প্রাণনিরোধ আসীদৌত্তানপাদির্ময়ি সঙ্গতাত্মা॥

৪।৮।৮২

—অর্থাৎ হে দেবগণ, উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব বিশ্বাত্মা আমাতে একীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে, আমি শ্বাসজয়ী ধ্রুবের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, সেইজন্যই তোমাদের প্রাণরোধ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা ভয় করিও না, নিজ ধামে গমন কর, আমি বালক ধ্রুবকে এই কঠোর তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিতেছি।

দেবতাগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া শ্রীহরি গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক মধুবনে গমন করিলেন। এদিকে নিরন্তর ধ্যানযোগের ফলে ষষ্ঠমাসে ধ্রুব তড়িৎ-শিখার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ভগবান্‌কে স্বীয় হৃৎপিণ্ডের মধ্যস্থলে প্রকাশিত দেখিতে পাইলেন কিন্তু তড়িৎগতিতে আবার তিরোহিত হইতে দেখিয়া নয়ন উন্মীলিত করিয়া হৃৎপদ্মে পরিদৃষ্ট পরম পুরুষকে ঠিক অনুরূপ রূপেই তাঁহার সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। এইরূপে যখন ধ্রুবের "অন্তর্বহিঃ" হরিময় হইয়া গিয়াছে তখন যেন তাঁহার প্রতি

অঙ্গ কৃষ্ণ-ক্ষুধাতুর হইয়া কৃষ্ণকে মুখের দ্বারা চুম্বন করিয়া, বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া "ববন্দতাঙ্গং বিনময্য দণ্ডবং"—দণ্ডবৎ ভূমিতে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু ধ্রুবের উদ্বেলিত মনোভাব ভাষায় প্রকাশিত হইতে চাহিতেছে অথচ বালকের ভাষা নাই—সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ তাহা বুঝিতে পারিয়া

কৃতাঞ্জলিং ব্রহ্মময়েন কম্বুনা পস্পর্শ বালং কৃপয়া কপোলে।

৪।৯।৪

—কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান বালকের গলদেশ বেদমূর্ত্তি শঙ্খের দ্বারা স্পর্শ করিলেন।

তৎক্ষণাৎ ধ্রুব "গিরং দৈবীং"—বেদরূপা বাণী প্রাপ্ত হইলেন এবং "পরিজ্ঞাত পরাত্মনির্ণয়ঃ"—পরমাত্মা ও জীবের তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া "নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যং"—বলিয়া নানা ভাবে নানা ভাষায় শ্রীহরির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীহরি ধ্রুবের মনের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। গ্রহ, নক্ষত্র ও শিশুমার নামক জ্যোতিশ্চক্রসংযুক্ত ধ্রুবলোক ধ্রুবের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল এবং শ্রীহরি আরও বলিলেন যে, উত্তানপাদ ধ্রুবকে রাজ্যপ্রদান করিয়া বনগমন করিলে ধ্রুব ছত্রিশ হাজার বৎসর রাজ্যশাসন করিবেন। সুরুচির পুত্র চিরকুমার উত্তম হিমালয়ে মৃগয়া করিতে যাইয়া বলবান্ যক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাহার মাতা সুরুচি পুত্রের অন্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। এইরূপে অসপত্নরাজ্য ভোগ করিয়া প্রচুর দক্ষিণাযুক্তযজ্ঞ সমাপন করিয়া ধ্রুব সশরীরে ধ্রুবলোকে গমন করিবেন। এই বর প্রদান করিয়া শ্রীহরি স্বধামে গমন করিলেন। ধ্রুব মহাশয় "নাতিপ্রীতোঽভ্যগাৎ পুরম্,"—অতিশয় প্রীত না হইয়া নিজপুরীর অভিমুখে গমন করিলেন। বিদুরের সন্দেহ হইল, তিনি মৈত্রেয় ঋষিকে ধ্রুবের মানসিক অপ্রসন্নতার

কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—বহুজন্মের সাধনার ফলেও যে শ্রীহরির দর্শন লাভ দুর্লভ বলিয়াই মনে হয়, তাঁহার চরণকমল একজন্মের সাধনায় প্রাপ্ত হইয়াও ধ্রুব আপনাকে অকৃতার্থ এবং অপূর্ণকাম মনে করিলেন কেন? মৈত্রেয় ঋষি বলিলেন,

মাতুঃ সপত্ন্যা বাগ্বাণৈঃ হৃদি বিদ্ধস্তু তান্ স্মরন্,
নৈচ্ছন্মুক্তিপতের্মুক্তিং পশ্চাত্তাপমুপেযিবান্। ৪।৯।২৯

—অর্থাৎ বিমাতার বাক্যবাণে ধ্রুবের হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় তাহা স্মরণ করিয়া তিনি রাজসিংহাসন কামনা করিয়াই ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন কিন্তু মুক্তিদাতা ভগবানের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করেন নাই, এইজন্যই পরে তিনি অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ধ্রুব মনে করিয়াছিলেন,

মতির্বিদূষিতা দেবৈঃ পতদ্ভিরসহিষ্ণুভিঃ
যো নারদবচস্তথ্যং নাগ্রহীষমসত্তমঃ। ৪।৯।৩২

অর্থাৎ দেবগণ আমার অক্ষয়লোক লাভের আশঙ্কায় ঈর্ষাযুক্ত হইয়া আমার মতিভ্রম ঘটাইয়াছিলেন; এই জন্যই আমি নারদের উপদেশমত মোক্ষপদ প্রার্থনা করি নাই। এইস্থানে শ্রীধরস্বামী টীকা করিয়াছেন—"দেবৈঃ বৈকুণ্ঠগমননিবারিতঃ, অনিত্যে রাজ্যসুখাকারে দুঃখে মতিদূষণদ্বারা পাতিতোঽস্মীতি ভাবঃ।"—অর্থাৎ দেবতাগণ আমার বৈকুণ্ঠ গমন নিবারণ করিয়াছেন, অনিত্য দুঃখবিষয়ে রাজ্যভোগে সুখের বিভ্রম সৃষ্টি করিয়া আমার বুদ্ধিভ্রংশ সংঘটিত করিয়াছেন—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

ধ্রুবমহারাজের রাজ্যলাভ করিয়া অনুতাপের সীমা ছিল না, তিনি আরও মনে করিলেন

স্বরাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতো বত,
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ॥ ৪।৯।৩৫

—অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তি যেমন মোহবশতঃ রাজার নিকট তুষযুক্ত চাউল প্রার্থনা করে, সেইরূপ পুণ্যবিহীন আমি মোক্ষদানে সমর্থ শ্রীহরির নিকট রাজ্য প্রার্থনা করিয়া আপনার মূঢ়তার পরিচয় দিয়াছি।

এই স্থানে শ্রীভাগবত যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা ধ্রুবমহারাজের তপঃপরিশুদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে শ্লাঘনীয় নহে, কিন্তু "হরিভক্তিসুধোদয়ং" গ্রন্থে এক বিভিন্ন নাটকীয় অবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। হরিভক্তি-সুধোদয় গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীহরি যখন দর্শন প্রদান করিয়া ধ্রুবকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ কোনও পার্থিব অথবা অপার্থিব বর কামনা করেন নাই। শ্রীহরি পুনঃ পুনঃ ধ্রুবকে প্রার্থনা করিতে বলিলেন; তিনি বলিলেন, তাঁহার দর্শন কখনও জীবের পক্ষে বৃথা হয় না। কিন্তু তথাপি ধ্রুব বলিয়াছিলেন,

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্,
কাচং বিচিন্বন্ ইব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।

—অর্থাৎ হে প্রভু, আমি রাজ্যলাভের আশায় তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু দেবমুনি-আরাধিত তোমার দর্শন লাভ করিয়াছি। এ যেন কাচ খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ রত্নপ্রাপ্তিযোগ। আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমি অপর কোনও বরের কামনা করি না।

নাটকে ধ্রুবমহাশয়ের মনের যে উচ্চাবস্থা অঙ্কিত হইয়াছে, শ্রীভাগবতে তাহা লিপিবদ্ধ নাই, তবে রাজ্যপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভের পর ধ্রুবের মনে যে অনুতাপ হইয়াছিল তাহা অবশ্যই ভক্তের তপস্যাপ্রসূত সুকৃতির ফল।

ধ্রুব রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; মৃত ব্যক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যেমন আত্মীয়গণ যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়, রাজা উত্তানপাদের মনের অবস্থাও তদ্রূপ। রাজমহিষী সুরুচি ও সুনীতি স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া পুত্র উত্তমের সহিত শিবিকায় আরোহণ করত ধ্রুবের অভিমুখে গমন করিলেন, ব্রাহ্মণ, কুলবৃদ্ধ, অমাত্য ও বন্ধুগণ বেদপাঠ, শঙ্খ ও বংশীধ্বনির দ্বারা ধ্রুবকে অভিনন্দিত করিলেন। ধ্রুব পিতার চরণযুগল বন্দনা করিয়া অবনত মস্তকে মাতা সুরুচি ও সুনীতিকে প্রণাম করিলেন, সুরুচি ধ্রুবকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহকম্পিত স্বরে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যিনি শ্রীহরির বিশ্বপ্লাবী প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার প্রতি সকলেই, এমন কি বিমাতা সুরুচিও প্রসন্ন হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি!

তাই মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিলেন যে, সুরুচির এরূপ আচরণ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই।

যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈঃ মৈত্রাদিভির্হরিঃ
তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্। ৪।৯।৪৭

—অর্থাৎ ভগবান গুণশালী যাহার প্রতি প্রসন্ন, নিম্নদেশগামী জলের ন্যায় সকল প্রাণী স্বভাবতঃই তাহার অনুকূল হয়।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন :—

বিধাতা প্রসন্ন যেথা আপনার হাতের সৃষ্টিতে
নিত্য তার অভিষেক নিখিলের আশিস্ বৃষ্টিতে॥

এইরূপে আত্মজয়ী শ্রীহরির বরপ্রাপ্ত ধ্রুবমহারাজের নিখিল জনগণের আনন্দ ও আশীর্ব্বাদে যেন অভিনবরূপে অভিষেক লইয়া গেল। অনন্তর রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবকে যৌবন প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া,

বনং বিরক্তঃ প্রাতিষ্ঠদ্ বিমৃশন্নাত্মনোগতিম্।

—বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া ঈশ্বর-চিন্তা করিবার জন্য বনগমন করিলেন।

ধ্রুব রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে হিমালয়ের উপত্যকায় অলকাপুরীর সন্নিকটে কোনও বলশালী যক্ষ কর্ত্তৃক মৃগয়াশীল রাজভ্রাতা উত্তম নিহত হইলে ধ্রুব "কোপামর্ষশুচার্পিতঃ"—ক্রোধ, ধৈর্য্যহীনতা এবং শোকের অধীন হইয়া যক্ষপুরী আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইল। রাজ্যশাসনজনিত রজোগুণের প্রভাবে পরমভক্ত ধ্রুবেরও বুদ্ধি বৈক্লব্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ধ্রুবের পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু ঋষিগণের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ধ্রুবকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন,

অলং বৎসাতিরোষেণ তমোদ্বারেণ পাপ্মনা,
যেন পুণ্যজনানেতানবধীঃ ত্বং অনাগসঃ ॥

*　　　　*　　　　*

নম্বেকস্যাপরাধেন তৎ সঙ্গাদ্বহবো হতাঃ ॥ ৪।১১।৭,৯

—অর্থাৎ, হে বৎস, যে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি নিরপরাধ এই যক্ষদিগকে বিনাশ করিতেছ, সেই ক্রোধ নরকের দ্বার ও মহাপাপস্বরূপ। তুমি এই নিন্দিত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও। তুমি একজন যক্ষের অপরাধে তৎসম্পর্কীয় বহুসংখ্যক যক্ষকে বিনাশ করিয়াছ।

স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশবাক্যসকল শ্রবণ করিয়া ধ্রুব যক্ষরাজ কুবেরের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হরিভক্তি প্রার্থনা করিয়া নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর

দদর্শাত্মনি ভূতেষু তমেবাবস্থিতং বিভুম্

—সেই এক অদ্বিতীয় পরম পুরুষকে আপনার মধ্যে এবং সর্ব্বভূতে দেখিতে পাইলেন, এবং এরূপ প্রীতি ও স্নেহের সহিত রাজ্যশাসন

করিলেন যে "মেনিরে পিতরং প্রজাঃ"—সমস্ত প্রজামণ্ডলী মহা
ধ্রুবকে পিতার ন্যায় মনে করিতে লাগিল। এইরূপে

যট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং শশাস ক্ষিতিমণ্ডলম্।
ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং কুর্ব্বন্ অভোগৈঃ অশুভক্ষয়ম্। ৪।১২।১৩

—ধ্রুব ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় ও অভোগ অর্থাৎ ব্রতনিয়ম
দ্বারা অশুভ ক্ষয় করিয়া ছত্রিশ হাজার বৎসর পৃথিবী শাসন করিলে
অবশেষে নিজপুত্র উৎকলকে রাজসিংহাসন প্রদান করিয়া এই "ভূমণ্ড
জলধিমেখলং"—সমুদ্র-মেখলা পৃথিবীকে "কালোপসৃষ্টং"—কাল
সুতরাং অনিত্য বুঝিতে পারিয়া যোগ সাধন করিবার জন্য বদরিকাশ্র
গমন করিলেন। সেই পরম রমণীয় তীর্থে সমাধিনিমগ্ন হইয়া এক
চন্দ্রের ন্যায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া একটি শ্রেষ্ঠ বিমানকে আক
হইতে অবতরণ করিতে দেখিতে পাইলেন। সেই রথমধ্যে সুনন্দ ও
নামক চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ, কমললোচন, গদাধারী দুইজন শ্রীহরির প
দৃষ্টিগোচর হইলেন। তাঁহারা বিস্মিত ধ্রুবকে বলিলেন যে "তদ্বিষ্ণো
পরমং পদম্"—অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর পরম ধামে ধ্রুবকে লইবার জন্য তাঁহা
বিমান আনয়ন করিয়াছেন। তখন ধ্রুব সেই বিমানকে অর্চ্চনা করি
প্রদক্ষিণ করিলেন এবং পার্যদদ্বয়ের বন্দনা করিয়া—"বিভ্রৎরূপং হিরণ্ময়
—হিরণ্ময় রূপ ধারণ করতঃ সশরীরে বিমানে আরোহণ করিলে
হঠাৎ ধ্রুবের আপনার জননী সুনীতিকে মনে পড়িল—তিনি দুঃখি
জননীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বিষ্ণুলোকে গমন করিতেছে
অথচ এই চির দুঃখিনী জননীর উপদেশ ও আশীর্ব্বাদের ফলেই আজ
বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইতেছেন। ধ্রুবের মনে এই চিন্তা উদিত হইবা
সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া পার্ষদদ্বয় সুনন্দ ও
ধ্রুবকে দেখাইলেন যে অগ্রেই সুনীতি দেবী বিমানে আরোহণ করি
বিষ্ণুলোকে গমন করিতেছেন।

এইরূপে সমগ্র কাহিনী বর্ণনা করিয়া ঋষি মৈত্রেয় বিদুরকে বলিলেন যে এই ধ্রুব চরিত্র

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।

—ধনাদি প্রাপ্তির হেতু, কীর্ত্তিবর্দ্ধক, আয়ুবর্দ্ধক, বিপদের শান্তিকারক, এবং মানব-হৃদয়ের পবিত্রতা সম্পাদক। অতএব

প্রযতঃ কীর্ত্তয়েৎ প্রাতঃ সমবায়ে দ্বিজন্মনাম্,
সায়ঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য ধ্রুবস্য চরিতং মহৎ॥
পৌর্ণমাস্যাং সিনীবাল্যাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণেঽথবা,
দিনক্ষয়ে ব্যতীপাতে সংক্রমে অর্কদিনেঽপিবা॥
শ্রাবয়েৎ শ্রদ্দধানানাং তীর্থপাদ পদাশ্রয়ঃ,
নেচ্ছংস্তত্রাত্মনাত্মনং সন্তুষ্ট ইতি সিধ্যতি॥ ৪।১২।৪৭-৪৯

—অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে পবিত্র হইয়া দ্বিজগণের সভায় পবিত্রকীর্ত্তি ধ্রুবের এই মহৎ চরিত্র কীর্ত্তন করিবে। পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও দ্বাদশী তিথিতে এবং শ্রবণা নক্ষত্র, তিথিক্ষয়, ব্যতীপাত যোগ, সংক্রান্তি ও রবিবারে এই ধ্রুবচরিত্র কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ভগবানের শ্রীচরণে শরণাপন্ন ও নিষ্কাম হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগকে ইহা শ্রবণ করাইলে সেই আচার্য্যের প্রতি ভগবান্ প্রীত হন এবং অনায়াসে তাঁহার ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

(৪)

রাজা বেণ ও পৃথুর উপাখ্যান

অতঃপর বিদুর মৈত্রেয় ঋষির নিকট পুনরায় ভগবৎলীলা-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মৈত্রেয় ধ্রুবের বংশাবলীর পরিচয় প্রদান করিয়া মহারাজ অঙ্গের উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন। অঙ্গের বেণ নামক

হইতে সকলের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় এবং পিতার অতিশয় মনঃকষ্ট জন্মিয়া থাকে। এই সমস্ত চিন্তা মহারাজ অঙ্গের মনে উদিত হইতে লাগিল এবং তিনি স্থির করিলেন,

কদপত্যং বরং মন্যে সদপত্যাচ্ছুচাং পদাৎ,
নির্ব্বিদ্যেত গৃহান্মর্ত্ত্যো যৎ ক্লেশনিবহা গৃহাঃ। ৪।১৩।৪৬

—সৎ পুত্র সংসারে পিতার আসক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করে, অতএব সৎপুত্র অপেক্ষা কুপুত্রই বরং ভাল। কারণ কুপুত্র হইতে সংসার দুঃখময় হইয়া পড়ে এবং সেইজন্যই মানব অনিত্য সংসারের প্রতি আসক্তিশূন্য হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন অর্দ্ধরাত্রিতে মহারাজ অঙ্গ শয্যা ত্যাগ করিয়া "বেণুসুবং প্রসুপ্তাং"—নিদ্রিতা বেণ-মাতা এবং অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিলেন।

এদিকে প্রজাগণের শুভানুধ্যায়ী মুনিগণ "প্রকৃত্যসম্মতং"—প্রজাগণের মনোমত না হইলেও বেণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। বেণ রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই "অবমেনে মহাভাগান্ স্তব্ধঃ সম্ভাবিতঃ স্বতঃ"—উদ্ধত ও অবিনয়ী হইয়া আপনাকে বড় মনে করিয়া মহৎগণের অবমাননা করিতে লাগিল। ভাগবতের অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহতের অবমাননা করিলে মানুষের আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, ইহলোক, পরলোক, এমনকি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিনষ্ট হইয়া যায়। বেণের জীবনেও সেই সমস্ত অশুভ সূচিত হইতে লাগিল। তখন মুনিগণ রাজার মৃত্যুতে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আশঙ্কা করিয়া বেণের নিকট যাইয়া সদুপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু বেণ তাহা গ্রহণ করিল না, উপরন্তু শ্রীহরির নিন্দা করিতে লাগিল। তখন মুনিগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া "নিজঘ্নুর্হুঙ্কৃতৈর্বেণং হতমচ্যুতনিন্দয়া" —শ্রীহরির নিন্দা করিয়া যে বেণ জীবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাকে হুঙ্কারের দ্বারা বধ করিলেন।

বেণের অকালমৃত্যুতে সমগ্র সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ চিন্তা করিলেন যে, মহারাজ অঙ্গের বংশ এইরূপে বিলুপ্ত হওয়া উচিত নহে; কারণ, "অমোঘবীর্য্যা হি নৃপা বংশেঽস্মিন্ কেশবাশ্রয়াঃ"—এই রাজবংশে মহাশক্তিশালী হরিভক্তিপরায়ণ বহু নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উপরন্তু, শাসকবিহীন দেশে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে শান্তপ্রকৃতি ব্রাহ্মণগণও তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না;—দেশশাসন ও দেশরক্ষণ কার্য্যে নাগরিকের কর্ত্তব্য তাঁহাদিগেরও আছে।

ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ,
স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎ পয়ো যথা ॥ ৪।১৪।৪১

—স্বভাবতঃ শান্ত এবং সমদর্শী ব্রাহ্মণও যদি প্রজাগণের বিপদে প্রতিকার না করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে ভগ্নপাত্র হইতে দুগ্ধক্ষরণের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণেরও তপোবল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়।

এইরূপ চিন্তা করিয়া মুনিগণ মৃত নৃপতি বেণের হস্তদ্বয় মন্থন করিয়া অভূতপূর্ব্ব উপায়ে এক পুত্র সৃষ্টি করিলেন এবং বলিলেন,

পৃথুর্নাম মহারাজো ভবিষ্যতি পৃথুশ্রবাঃ

—এই পুত্র বিপুলকীর্ত্তি মহারাজ পৃথু নামে জগতে পরিচিত হইবেন।

অতঃপর স্তুতিপাঠকগণ সদ্যোজাত অথচ প্রাপ্ত-যৌবন তাঁহার স্তব ও বন্দনা করিলে পৃথু লজ্জিত হইলেন; কারণ, তখনও তিনি পৃথিবীতে কোনও গৌরবময় কার্য্য করিতে সক্ষম হন নাই, কেবলমাত্র মুনিগণ তাঁহার ভবিষ্যৎ গৌরবের আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন।

সুতরাং পৃথু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,

প্রভবো হ্যাত্মনঃ স্তোত্রং জুগুপ্সন্ত্যপি বিশ্রুতাঃ,
হ্রীমন্তঃ পরমোদারাঃ পৌরুষং বা বিগর্হিতম্ ॥ ৪।১৫।২৫

—অতিশয় উদারচেতা ব্যক্তিগণ কীর্ত্তি ও গুণরাশি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেও স্বীয় স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হন এবং সেই সত্য স্তুতিবাদকেও বিগর্হিত কার্য্যের ন্যায় নিন্দা করিয়া থাকেন।

গৌরবের কার্য্য করিয়াও আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করা যখন লজ্জাকর, পৃথুর পক্ষে এখনও কোনও গৌরবের কার্য্য না করিয়া স্তুতিবাদ শ্রবণ করা নিশ্চয়ই অধিকতর লজ্জাপ্রদ। এই মনে করিয়া পৃথু স্তুতিগায়কগণকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেও তাহারা মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া গুণগান হইতে নিবৃত্ত হইল না। পৃথুর সমগ্র জীবনের একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া স্তাবকগণ পুনরায় বলিল,

> নাদণ্ড্যং দণ্ডয়ত্যেষ সুতমাত্মদ্বিষামপি,
> দণ্ডয়ত্যাত্মজমপি দণ্ড্যং ধর্ম্মপথে স্থিতঃ ॥৪।১৬।১৩
>
> ... ...
>
> মাতৃভক্তিঃ পরস্ত্রীষু পত্ন্যামর্দ্ধ ইবাত্মনঃ,
> প্রজাসু পিতৃবৎ স্নিগ্ধঃ কিঙ্করো ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥৪।১৬।১৭

—এই মহারাজ পৃথু ধর্ম্মমার্গে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় শত্রুর পুত্র নিরপরাধ হইলে তাহার কখনও দণ্ডবিধান করিবেন না, অথচ নিজপুত্রও অপরাধ করিলে তাহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিবেন। এই পৃথু পরস্ত্রীকে নিজ মাতার ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিবেন, স্বীয় পত্নীর প্রতি নিজ অর্দ্ধাঙ্গের ন্যায় প্রীতিযুক্ত হইবেন, প্রজাগণের প্রতি পিতার ন্যায় স্নেহশীল এবং ব্রহ্মজ্ঞানীগণের নিকট সেবকের ন্যায় ব্যবহার করিবেন।

অথচ সাম্রাজ্য শাসন করিবার সময় তিনি শত্রুগণের ভীতি উৎপাদন করিয়া "লাঙ্গুলমুত্থম্য যথা মৃগেন্দ্রঃ"—সিংহ যেমন নিজ লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করে, সেইরূপ বিক্রমের সহিত শত্রুগণকে দমন করিয়া রাজ্যে ধর্ম্ম ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

মহারাজ পৃথু সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, "যথাগ্নিনা কোটরস্থেন বৃক্ষাঃ"—বৃক্ষকোটরস্থিত অগ্নিতে যেমন বৃক্ষসমূহ ধীরে ধীরে দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ প্রজাগণ "জাঠরেণাভিতপ্তাঃ" ক্ষুধায় দগ্ধ হইয়া মহারাজ পৃথুর শরণাপন্ন হইল। দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পৃথু বুঝিলেন যে, পৃথিবী ওষধিবীজ সকল গ্রাস করিয়াছে, সুতরাং শস্য উৎপন্ন হইতেছে না। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে বিনাশ করিবার জন্য ধনুতে বাণ যোজনা করিলেন, পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর পৃথিবী ভীতা হইয়া স্তব করিলে পৃথু নিবৃত্ত হইলেন এবং শস্যোৎপত্তির উপায় পৃথিবীর নিকট হইতে শ্রবণ করিলেন। পৃথিবী বলিল,

সমাঞ্চকুরু মাং রাজন্, দেববৃষ্টং যথা পয়ঃ
অপর্ত্তাবপি ভদ্রং তে উপাবর্ত্তেত মে বিভো ॥৫।১৮।১১

—হে রাজন্, বর্ষাকাল অতীত হইলেও যে প্রকারে বৃষ্টির জল আমার সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিতে পারে, সেইরূপ ভাবে আপনি আমাকে সমতল করুন; হে প্রভু, তাহা হইলেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

পৃথিবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস করিয়া স্বীয় হস্তরূপ দোহনপাত্রে নিজেই পৃথিবী হইতে ওষধিবীজরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। পৃথুর দোহনকার্য্য শেষ হইলে ঋষিপ্রমুখ অপর সকলে পৃথু কর্ত্তৃক বশীভূতা পৃথিবীকে ইচ্ছামত দোহন করিলেন। এইরূপে মানব-সমাজে সোম অর্থাৎ অমৃত, অণিমাদি সিদ্ধি ও অন্যান্য সমাজরক্ষণের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি হইল।

ততো মহীপতিঃ প্রীতঃ সর্ব্বকামদুঘাং পৃথুঃ,
দুহিতৃত্বে চকারেমাং প্রেম্না দুহিতৃবৎসলঃ ॥৪।১৮।২৮

—অনন্তর মহারাজ পৃথু সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বকাম-প্রসবিনী এই পৃথিবীকে স্নেহবশতঃ কন্যারূপে গ্রহণ করিলেন।

মহারাজ পৃথুর পূর্ব্বে এই ভূমণ্ডলে গ্রাম ও নগর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তিনি গ্রাম, নগর, দুর্গ, গোষ্ঠ, সেনানিবাস, স্বর্ণাদির খনি, কৃষকপল্লী নির্ম্মাণ করিলে প্রজাগণ সুখে এবং নির্ভয়ে তথায় বাস করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারাজ পৃথু শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার অভিলাষ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার শেষ যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করিলেন। পৃথু ইন্দ্রকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা পৃথুকে নিবারণ করিলেন, এবং পৃথু ব্রহ্মার উপদেশ মত শত যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন না। তখন যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি পৃথুকে দর্শন প্রদান করিয়া উপদেশ দিলেন, এবং সনৎকুমার প্রভৃতি চারিজন মুনি আসিয়াও পৃথুকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিলেন। অতঃপর মহারাজ পৃথু তাঁহার ধর্ম্মপত্নী অর্চ্চিদেবীর সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

(৫)

প্রচেতাগণের উপাখ্যান

মৈত্রেয় ঋষি মহারাজ পৃথুর বংশাবলী বর্ণনা করিয়া পৃথুর বংশধর প্রাচীনবর্হির দশজন পুত্রের উপাখ্যান বিদুরকে শ্রবণ করাইলেন। এই দশজন পুত্র 'প্রচেতা'—এই একই নামধারী এবং একই ব্রতধারী ছিলেন। শ্রীভাগবতে ইঁহারা প্রচেতাগণ নামে পরিচিত। ইঁহারা দশজন, পিতার আদেশে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা মহাদেবের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী দশ সহস্র বৎসর তপস্যার দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান

রুদ্রদেব প্রচেতাগণকে শ্রীহরির যে স্তব শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা ভাগবতে "রুদ্র-গীত" নামে প্রসিদ্ধ। মহাদেব বলিয়াছিলেন,

ইদং যঃ কল্যে উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ,
শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েৎ মর্ত্ত্যো মুচ্যতে কর্ম্মবন্ধনৈঃ ॥৪।২৪।৭৮

—যে মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রদ্ধার সহিত এই স্তোত্র শ্রবণ করেন অথবা অপরকে শ্রবণ করান, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

এদিকে যখন প্রচেতাগণ রুদ্রবর্ণিত শ্রীহরির স্তব জপ করিতে করিতে সমুদ্রের জলমধ্যে দশহাজার বৎসর তপস্যা করিতেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ কৃপা করিয়া প্রচেতাগণের পিতা মহারাজ প্রাচীনবর্হিকে আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া তাঁহাকে মুক্তির সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ প্রাচীনবর্হি নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম বর্হিষৎ। তিনি যে স্থানে একবার যজ্ঞ করিতেন, পুনরায় তাহার সমীপবর্ত্তী স্থানে যজ্ঞ করিতেন। এইরূপে যজ্ঞ করিতে করিতে কুশসমূহের দ্বারা ধরাতল সমাচ্ছাদিত হইল বলিয়া তিনি "প্রাচীনবর্হি" নামে পৃথিবীতে পরিচিত হইলেন। দেবর্ষি নারদ প্রাচীনবর্হিকে বলিলেন,

শ্রেয়স্ত্বং কতমদ্রাজন্, কর্ম্মনাত্মন ঈহসে,
দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে ॥৪।২৫।৪

—হে রাজন্, তুমি কর্ম্মের দ্বারা আপনার কিরূপ মঙ্গল আশা করিতেছ? দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তিই পরম মঙ্গল, কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা সেই পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তখন রাজা প্রাচীনবর্হি নারদকে বলিলেন,

ন জানামি মহাভাগ, পরং কর্ম্মাপবিদ্ধধীঃ,
ব্রূহি মে বিমলং জ্ঞানং যেন মুচ্যেয় কর্ম্মভিঃ ।৪।২৫।৫

—হে মহর্ষি, আমার বুদ্ধি নানাবিধ কর্ম্মের দ্বারা বিমোহিত হইয়াছে, অতএব আমি পরম মঙ্গলস্বরূপ মোক্ষ কি তাহা জানি না; যাহার দ্বারা আমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিব, আপনি সেই নির্ম্মল জ্ঞান আমাকে উপদেশ করুন।

তখন নারদ প্রাচীনবর্হিকে বলিলেন যে, মহারাজ যজ্ঞকালে যে সকল সহস্র সহস্র পশুর প্রাণসংহার করিয়াছেন, সেই প্রাণিসমূহ রাজার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া আছে। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলেই অতিশয় ক্রুদ্ধ এই প্রাণি-সকল লৌহময় শৃঙ্গের দ্বারা তাঁহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অনন্ত যন্ত্রণা প্রদান করিবে। এই বলিয়া পুরঞ্জন নামক রাজার পুরাতন ইতিহাস দেবর্ষি বর্ণনা করিলেন।

এই পুরঞ্জনের ইতিহাস একটী রূপক। পুরঞ্জন নামে এক বিপুলকীর্ত্তি রাজা ছিলেন। তাঁহার একজন সখা ছিলেন, সেই সখার নাম বা কর্ম্ম কাহারও পরিজ্ঞাত ছিল না। রূপক অর্থ এই যে, কর্ম্মফল অনুসারে ভোগদেহ পরিগ্রহণকারী জীব পুরঞ্জন, তাঁহার সখা স্বয়ং পরমেশ্বর। কালক্রমে বলবান্ যবনগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পুরঞ্জন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইয়া তাঁহার পরমহিতৈষী পুরাতন সখাকে স্মরণ করিতে পারেন নাই। অবশেষে স্ত্রীচিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পুরঞ্জন পরজন্মে বিদর্ভদেশে রাজকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর দিগ্বিজয়ী মলয়ধ্বজ বৈদর্ভীকে বিবাহ করিলেন। পরে স্বামী মলয়ধ্বজ দেহত্যাগ করিলে যখন বৈদর্ভী সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন হঠাৎ সেই পুরাতন সখা—সনাতন পুরুষ—ব্রাহ্মণের বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া বৈদর্ভীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণবেশী ভগবান্ বলিলেন,

মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যৎ পুমাংসং স্ত্রিয়ং সতীম্,
মন্যসে নোভয়ং যদ্বৈ হংসৌ পশ্যাবয়োর্গতিম্ ॥৪।২৮।৬১

—তুমি যে-কারণে পূর্ব্বজন্মে আপনাকে পুরুষ মনে করিয়াছিলে এবং এই জন্মে আপনাকে স্ত্রী মনে করিতেছ, উহা আমারই সৃষ্ট মায়া। পুরুষত্ব অথবা স্ত্রীত্ব জীবে নাই ; জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই শুদ্ধ, সেই জীবাত্মা তোমার ও পরমাত্মা আমার স্বরূপ দর্শন কর।

এইরূপে পুরঞ্জন তাঁহার যে আত্মা ও পরমাত্মার স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন।

দেবর্ষি নারদের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহারাজ প্রাচীনবর্হি বলিলেন,

ভগবংস্তে বচোঽস্মাভির্ন সম্যগবগম্যতে,
কবয়স্তদ্বিজানন্তি ন বয়ং কর্ম্মমোহিতাঃ ৪।২৯।১

—হে ভগবন্ নারদ, আপনার বাক্যের তাৎপর্য্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না ; জ্ঞানিগণই ইহা বুঝিতে পারেন, কর্ম্মাসক্ত আমরা বুঝিতে পারি না।

প্রাচীনবর্হির এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ পুরঞ্জন উপাখ্যানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মহারাজকে শ্রবণ করাইলেন। চতুর্থ স্কন্ধের সমগ্র উনত্রিংশ অধ্যায়ে এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। মহর্ষি বলিলেন যে, স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা "পুর" অর্থাৎ শরীর সৃষ্টি হয় বলিয়া জীব "পুরঞ্জন"। এই জীব অজ্ঞানজনিত বিস্মৃতির জন্য তাহার চিরসখা ভগবান্‌কে ভুলিয়া আধ্যাত্মিক (শারীরিক ও মানসিক রোগাদি), আধিভৌতিক (হিংস্রপ্রাণী হইতে ভয়) ও আধিদৈবিক (প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা—অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প) এই নানাবিধ দুঃখের দ্বারা নিপীড়িত হইতে থাকে ; অতঃপর নারদ জীবগণের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের কারণ এবং তজ্জনিত দুঃখভোগের এক বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিলেন।

যদাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুম্,
পুরুষস্তু বিষেজ্জত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্ ॥

গুণাভিমানী স তদা কর্ম্মাণি কুরুতেঽবশঃ,
শুক্লং কৃষ্ণং লোহিতং বা যথা কর্ম্মাভিজায়তে ॥

... ...

ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়মন্ধধীঃ,
দেবো মনুষ্যস্তির্য্যগ্বা যথা কর্ম্মগুণং ভব ॥
ক্ষুৎপরীতো যথা দীনঃ সারমেয়ো গৃহং গৃহম্,
চরন্ বিন্দতি যদ্দিষ্টং দণ্ডমোদনমেব বা ॥
তথা কামাশয়ো জীব উচ্চাবচ পথা ভ্রমন্
উপর্য্যধো বা মধ্যে বা যাতি দিষ্টং প্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥

৪।২৯।২৬-৩১

—অর্থাৎ, জীব যখন পরমগুরু পরমাত্মাকে ভুলিয়া গিয়া দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া তাহাতে আসক্ত হয়, তখন ঐ জীব অবশ হইয়া কর্ম্মসমূহ করিতে থাকে এবং শুক্ল (সাত্ত্বিক), লোহিত (রাজস), কৃষ্ণ (তামস) যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তদনুসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে.........

অজ্ঞ ঐ জীব দেব, মানুষ বা পশু, কোথাও পুরুষ, কোথাও স্ত্রী, কোথাও বা নপুংসক হয় ; কর্ম্ম ও গুণ অনুসারেই এই সকল পার্থক্য হইয়া থাকে।

হতভাগ্য কুকুর যেমন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ করতঃ অদৃষ্টানুসারে কখনও বা দণ্ডতাড়না, কখনও বা অন্নগ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিষয়বাসনায় আসক্ত জীব উচ্চ বা নীচ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবদেহ, মনুষ্যদেহ অথবা পশুদেহ লাভ করিয়া, দেহে আত্মবুদ্ধি আরোপণ পূর্ব্বক অদৃষ্টানুরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

কর্ম্মাসক্ত দেহবুদ্ধি জীবের এইরূপ তুর্দ্দশার চিত্র অঙ্কিত করিয়া অবশেষে প্রাচীনবর্হিকে দেবর্ষি বলিলেন,

আস্তীর্য্য দর্ভৈঃ প্রাগগ্রৈঃ কার্ৎস্নেন ক্ষিতিমণ্ডলম্
স্তব্ধো বৃহদ্বধান্মানী কর্ম্মণাবৈষি যৎ পরম্ ॥
তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া,
হরিঃ দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ।
তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ ॥৪।২৯।৪৯-৫০

—হে রাজন্, তুমি অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বাগ্র কুশের দ্বারা ক্ষিতিমণ্ডলকে সমাচ্ছন্ন করিয়া মহাযাজ্ঞিক বলিয়া অভিমানী হইয়াছ; কারণ, যাহা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, তাহা তুমি জানিতে পার নাই।

প্রাচীনবর্হির মনে প্রশ্ন উঠিল, তাহা হইলে বিদ্যা ও কর্ম্ম কি? অন্তর্য্যামী মহর্ষি উত্তর দিলেন—যাহাতে শ্রীহরির সন্তোষ সম্পাদন হয় তাহাই কর্ম্ম, এবং যে বিদ্যার দ্বারা শ্রীহরির চরণে মতি হয় তাহাই বিদ্যা। তিনি প্রাণিগণের আত্মা ও নিয়ন্তা, তিনিই জগতের কারণ, তাঁহার নিজের কোনও কারণ নাই, ইহজগতে তাঁহার শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করাই মানবগণের মঙ্গলপ্রদ।

দেবর্ষি নারদের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহারাজ প্রাচীনবর্হি বলিলেন,

শ্রুতমন্বীক্ষিতং ব্রহ্মন্ ভগবান্ যদভাষত
নৈতজ্জানন্ত্যপাধ্যায়াঃ কিং ন ব্রূয়ুর্বিদুর্যদি ॥
৪।২৯।৫৩

—হে ব্রহ্মন্, আপনি যে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম এবং বিচার করিয়া দেখিলাম। আমার কর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্যগণ ইহা অবগত নহেন। যদি তাঁহারা ইহা জানিতেন, তবে কেন আমাকে উপদেশ প্রদান করেন নাই?

বহুবর্ষ যাবৎ কর্ম্ম করিয়া মনে কর্ম্মজনিত যে-সকল চিন্তা ও ভাবধারা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা উপদেশ শ্রবণমাত্রই বিদূরিত হয় না, সাধন-ভজনই তাহাদের একমাত্র প্রতীকার। এখন দেবর্ষির নিকট মহারাজ যে আত্মবিদ্যা শ্রবণ করিলেন তাহার সহিত তাঁহার চিরকালের আচরিত কর্ম্ম ও সংস্কারের সংঘাত হওয়ায় মনে নূতন নূতন সন্দেহের অবতারণা হইতে লাগিল। তাই প্রাচীনবর্হি পুনরায় বলিলেন,

কর্ম্মাণ্যারভতে যেন পুমানিহ বিহায় তম্,
অমুত্রান্যেন দেহেন জুষ্টানি স যদশ্নুতে ॥
ইতি বেদবিদাং বাদঃ শ্রূয়তে তত্র তত্র হ,
কর্ম্ম যৎ ক্রিয়তে প্রোক্তং পরোক্ষং ন প্রকাশতে ॥ ৪।২৯।৫৮-৫৯

—জীব যে-দেহের দ্বারা কর্ম্ম করে, সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন পূর্ব্বক অপর দেহের দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় —ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হয়? কর্ম্মকালে কর্ম্মকর্ত্তার এক দেহ, ফল ভোগকালে অপর দেহ—এই ভেদ থাকায় ফলভোগ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

জনগণ বেদোক্ত যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে সেই সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান মাত্রেই অদৃশ্য হয় ও মুহূর্ত্তকাল পরেই আর তাহাদিগকে দেখা যায় না; অতএব কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইলে লোকান্তরে কিরূপে তাহার ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে?

এই সন্দেহ নিরসনের জন্য দেবর্ষি ভাগবতের প্রসিদ্ধ কুড়িটি শ্লোকে বলিতেছেন,

যেনৈবারভতে কর্ম্ম তেনৈবামুত্র তৎ পুমান্,
ভুঙ্ক্তে হ্যব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসা স্বয়ম্ ॥ ৪।২৯।৬০

—লিঙ্গদেহ মনঃপ্রধান। স্থূলদেহ নষ্ট হইলেও লিঙ্গ দেহ বর্ত্তমান থাকে। জীব আপাতদৃষ্টিতে স্থূলদেহের দ্বারাই যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে

তাহা বাস্তবিক লিঙ্গদেহের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব কর্ত্তার দেহ ভিন্ন নহে। জীব যে দেহের দ্বারা ইহলোকে কর্ম্ম করে সেই মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীরের দ্বারাই লোকান্তরে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি স্পষ্ট করিবার জন্য দেবর্ষি দৃষ্টান্ত দিতেছেন,

শয়ানমিমমুৎসৃজ্য শ্বসন্তং পুরুষো যথা,
কর্ম্মাত্মন্যাহিতং ভুঙ্‌ক্তে তাদৃশেনেতরেণ বা॥ ৪।২৯।৬১

—অর্থাৎ স্বপ্নকালে জীব যেমন শয্যায় শয়ান ও প্রাণবিশিষ্ট এই স্থূলদেহকে ভুলিয়া যায় এবং অপর দেহের দ্বারা কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, সেইরূপ লিঙ্গদেহবিশিষ্ট জীব ইহজন্মের কর্ম্মফল জন্মান্তরে ভোগ করিয়া থাকে।

দেবর্ষি পুনরায় বলিলেন যে, দেহাভিমানী জীব মনঃপ্রধান লিঙ্গদেহের দ্বারা যে যে দেহাদি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই দেহাদিদ্বারা পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে, আবার ঐ কর্ম্মের দ্বারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, "অনেন দেহ এব আত্মা ইত্যাদয়ো ভ্রান্তিবিলসিতাবাদা নিরাকৃতাঃ"—অর্থাৎ এতদ্বারা দেহই আত্মা, ইত্যাদি ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা প্রদর্শিত হইল। কর্ম্ম নষ্ট হইলেও "প্রাগ্‌দেহজং কর্ম্ম লক্ষ্যতে চিত্তবৃত্তিভিঃ"—চিত্তবৃত্তিরূপে অর্থাৎ সংস্কাররূপে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম অপর জন্মে থাকিয়া যায়। বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য দেবর্ষি পুনরায় বলিলেন যে, ইহজন্মে দেহের দ্বারা কোথাও কখনও যাহা অনুভব, দর্শন ও শ্রবণ করা হয় নাই, এইরূপ বস্তু ইহজন্মে মনোমধ্যে কখনও কখনও স্বপ্নাদিরূপে উদিত হয়, তাহার কারণ পূর্ব্বদেহে ইহা অনুভব অথবা দর্শন অথবা শ্রবণ করা হইয়াছিল। বাসনারূপে কর্ম্ম জন্ম-জন্মান্তরেও অবস্থান করে বলিয়া অননুভূতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব বস্তু ইহজন্মেও অনুভূতি, দর্শন ও শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ মনঃপ্রধান সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট

জীবের কথা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া মহারাজকে আশ্বাস প্রদান করিবার জন্য নারদ বলিলেন—

মন এব মনুষ্যস্য পূর্ব্বরূপানি শংসতি
ভবিষ্যতশ্চ ভদ্রং তে তথৈব ন ভবিষ্যতঃ ॥ ৪।২৯।৬৬

—ইহজন্মের মনের বৃত্তি ও গতি দেখিলেই মানুষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অবস্থা অনুমান করিতে পারা যায়। ভবিষ্যতের অবস্থাও এই মনের অবস্থা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। হে রাজন্, তোমার মন দেখিয়া আমি তোমার ভাবী কল্যাণের অবস্থা অনুমান করিতে পারিতেছি।

"সর্ব্বে সমনসো জনাঃ"—সকল মানুষই মনোযুক্ত। সদসদ্বৃত্তিসম্পন্ন মন না থাকিলে দেহধারণ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না, তাই অন্যত্র ভাগবত বলিয়াছেন, "মনসোঽপি লয়াৎ মুক্তিঃ" অর্থাৎ বাসনাবিক্ষুব্ধ মনকে বাসনানির্মুক্ত করিতে পারিলেই মুক্তি হইয়া থাকে। অতএব

নাহং মমেতি ভাবোঽয়ং পুরুষে ব্যবধীয়তে,
যাবদ্বুদ্ধিমনোঽক্ষার্থ-গুণব্যূহো হ্যনাদিমান্ ॥

... ...

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥

... ...

যথা তৃণজলৌকেয়ং নাপযাত্যপযাতি চ
ন ত্যজেন্দ্রিয়মাণোঽপি প্রাগ্ দেহাভিমতিং জনঃ ॥
যাবদন্যং ন বিন্দেত ব্যবধানেন কর্ম্মণা
মন এব মনুষ্যেন্দ্র, ভূতানাং ভবভাবনম্ ॥

৪।২৯।৭০, ৭৩, ৭৬, ৭৭

—জীবের দেহে আমিত্ববুদ্ধি ও গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধিরূপ বৃথাভিমান যে পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন না হয় সেই পর্য্যন্ত তাহার পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ

সংসার বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও গুণের সমষ্টিযুক্ত সংসার অনাদিকাল ধরিয়া চলিতেছে।

স্বপ্নকালে মানুষ যেমন আপনাকে যতক্ষণ মৃগাদি বলিয়া মনে করে ততক্ষণ তাহার যেমন ব্যাঘ্রাদি হইতে ভয় থাকেই, সেইরূপ বিষয় না থাকিলেও যতক্ষণ দেহাভিমান থাকে, ততক্ষণ ঐ জীবের জন্মমরণ-প্রবাহরূপ সংসার বিলুপ্ত হয় না।

জেঁাক যেমন তৃণান্তর ধারণ না করিয়া পূর্ব্বতৃণ পরিত্যাগ করে না এবং তৃণান্তর ধারণ করিয়াই পূর্ব্বতৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পূর্ব্বদেহ বিনষ্টপ্রায় হইলেও জীব পরবর্ত্তী দেহে আত্মবুদ্ধি না করিয়া পূর্ব্বদেহের আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করে না, কিন্তু পরবর্ত্তীদেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বদেহের আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করে।

দেহাদি হইতে ভিন্ন স্বরূপ আত্মতত্ত্ব যে পর্য্যন্ত জীব না লাভ করিতে পারে সেই পর্য্যন্ত ঐ জীব দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারে না। অতএব হে মহারাজ, মনই প্রাণিগণের জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারের জনক।

এখন উপায় কি ?

অতস্তদপবাদার্থং ভজ সর্ব্বাত্মনা হরিম্,
পশ্যংস্তদাত্মকং বিশ্বং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়া যতঃ। ৪।২৯।৭৯

—হে রাজন্, তুমি জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারবন্ধন দূর করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীহরির ভজনা কর। তাঁহা হইতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। জগৎ হরিময়, ইহাই তুমি দর্শন ও উপলব্ধি কর।

মৈত্রেয় বিদুরকে বলিলেন যে, দেবর্ষি নারদ মহারাজ প্রাচীনবর্হিকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া সিদ্ধলোকে গমন করিলেন, এবং রাজর্ষি প্রাচীনবর্হি প্রজারক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া তপস্যা করিবার জন্য কপিলাশ্রমে প্রস্থান করিলেন এবং ভজনসাধনের পরিপাকে মুক্তিপ্রাপ্ত হইলেন।

চতুর্থ স্কন্ধের শেষ দুইটি অধ্যায়ে প্রচেতাগণের বরলাভ এবং বনগমন ও মুক্তিলাভ বর্ণিত হইয়াছে। বিদুর ঋষি মৈত্রেয়কে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে প্রচেতাগণের যে তপস্যার কথা মৈত্রেয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা এখনও শেষ হয় নাই এবং সেই কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ শ্রবণ করিবার জন্য বিদুর উৎসুক। তখন মৈত্রেয় বলিলেন যে, প্রচেতাগণের দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করা হইলে শ্রীহরি পরমানন্দরূপে তথায় আবির্ভূত হইয়া প্রচেতাগণকে বলিলেন, "বরং বৃণীধ্বং"—বর প্রার্থনা কর। শ্রীহরি পুনরায় বলিলেন, "প্রজাবিসর্গে আদিষ্টাঃ পিত্রা মামনুবর্ত্ততা"—তোমাদের পিতা আমার পরম ভক্ত, তিনি তোমাদিগকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিয়াছেন; সুতরাং তোমরা বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কর। দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যার পর গৃহস্থ-জীবন যাপন করিতে শ্রীহরি আদেশ করিলে প্রচেতাগণ পাছে সংসার বন্ধনের জন্য ক্ষুব্ধ হন, এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য শ্রীহরি বলিলেন,

> গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্,
> মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥ ৪।৩০।১৯

—গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেই তোমাদের বন্ধন হইবে, এইরূপ মনে করিও না। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াও যাহারা কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং আমার কথা আলোচনা করিয়া কাল যাপন করে, গৃহস্থাশ্রম তাহাদের বন্ধনের কারণ হইতে পারে না।

শ্রীহরিকে দর্শন এবং তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রচেতাগণ তাঁহার স্তবস্তুতি করিলেন এবং শ্রীহরির কথা "বরং বৃণীধ্বং"—বর প্রার্থনা কর—স্মরণ করিয়া বলিলেন,

> যাবৎ তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ,
> তাবৎ ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যাৎ নো ভবে ভবে।৪।৩০।৩৩

—আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, আমরা যতকাল আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া এই সংসারে ভ্রমণ করিব ততকাল জন্মে জন্মে আমাদের যেন আপনার ভক্তগণের সঙ্গলাভ হয়।

তখন "প্রীতস্তথেত্যাহ শরণ্যবৎসলঃ"—শরণাগতবৎসল শ্রীহরি 'তাহাই হউক' এই বলিয়া স্বীয় ধামে গমন করিলেন, এবং প্রচেতাগণ সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের তপস্যার সময় পিতা প্রাচীনবর্হি দেবর্ষি নারদের উপদেশে রাজ্যত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে পৃথিবী অরাজক হওয়ায় কৃষি-কার্য্যাদি বন্ধ হইয়াছিল এবং ভূমিসমূহ বৃক্ষলতা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া কৃষির অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তখন প্রচেতাগণ ক্রোধে মুখ হইতে অগ্নি ও বায়ু নির্গত করায় বৃক্ষসমূহ দগ্ধ হইতে লাগিল এবং তাহা দেখিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া প্রচেতাগণকে শান্ত করিলেন। প্রচেতাগণ প্রজাসৃষ্টি ও সংসার পালন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর দেবপরিমাণে সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইলে, প্রচেতাগণের বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইল, তখন তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পশ্চিমদিকে সমুদ্রতীরে আসন করিয়া তাঁহারা যখন পরব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিলেন তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদকে দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন,

> যদাদিষ্টং ভগবতা শিবেনাধোক্ষজেন চ
> তদ্‌গৃহেষু প্রসক্তানাং প্রায়শঃ ক্ষপিতং প্রভো!
> তন্নঃ প্রদ্যোতয়াধ্যাত্ম-জ্ঞানং তত্ত্বার্থ দর্শনম্
> যেনাঞ্জসা তরিষ্যামো দুস্তরং ভবসাগরম্ ॥৪।৩১।৬, ৭

—ভগবান্ মহাদেব ও ভগবান্ শ্রীহরি আমাদিগকে যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, গৃহে বহুদিন আসক্ত হইয়া আমরা তাহা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। অতএব আপনি পরমাত্মার জ্ঞান আমাদের মধ্যে

উদ্দীপিত করুন, যাহার দ্বারা আমরা অনায়াসে দুস্তর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

প্রচেতাগণের এই কথাগুলির ভিতর দিয়া জীবের উপর সংসারী-জীবনের কী অপূর্ব্ব প্রভাব প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীমহাদেবের মুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, দশ সহস্র বৎসর সমুদ্রগর্ভে তপস্যা করিয়াছিলেন, শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শজ ভোগের দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্ত হারাইতে বসিয়াছেন! দেহধারণ করিলেই বিষয়ভোগের প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক, এমন কি, আত্মবিদ্যা গ্রহণ করিয়াও চিরজীবন আত্মবিদ্যার অনুশীলন না করিলে সেই মহামূল্য ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়াও সম্পূর্ণ ফলবান্ না হইতে পারে। প্রচেতাগণের জীবন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ ধর্ম্ম-জীবনে সব পাইয়াছে মনে করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, পাইলেও স্খলন আছে, ধরিয়া রাখিতে হইলে সর্ব্বদাই স্মরণকীর্ত্তনে লাগিয়া থাকিতে হইবে, মুহূর্ত্তের জন্যও অমনোযোগী হইলে কখন যে প্রাপ্ত বস্তু হারাইয়া যাইবে তাহার নির্ণয় নাই।

প্রচেতাগণের আত্মগ্লানি শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ বলিলেন,

> তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ
> নৄণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥
>
> ৪।৩১।৯

—হে রাজকুমারগণ, মনুষ্যগণের সেই জন্মই জন্ম, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, সেই জীবনই জীবন, সেই মনই মন, সেই বাক্যই বাক্য, যাহার দ্বারা সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীহরি আরাধিত হইয়া থাকেন। ভগবৎ-সেবাবিহীন সমস্তই ব্যর্থ।

দেবর্ষি আরও বলিলেন, বেদান্ত শ্রবণ, তপস্যা, বাক্‌পটুতা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ু লাভ, বিশুদ্ধ বংশে জন্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ,

সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য—সবই বৃথা যদি এই সমস্ত বস্তু মানবের মনকে ভগবৎমুখী না করিতে পারে।

যথাতরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ,
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

৪।৩১।১৪

—অর্থাৎ যেমন বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন করিলে তাহার দ্বারা ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র, পুষ্পাদি পরিতৃপ্ত হয়, আর যেমন আহার করিলে তাহার ফলে সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের পরিপুষ্টি হয়, সেইরূপ শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বদেবতার অর্চ্চনা করা হয়, সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধি হয়,—পৃথক্‌ভাবে অপর কোন দেবতার পূজার প্রয়োজন হয় না।

অতঃপর দেবর্ষি নারদ প্রচেতাগণকে ধ্রুবচরিত ও অন্যান্য ভগবৎকথা শ্রবণ করাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং প্রচেতাগণ শ্রীহরির ধ্যান করিতে করিতে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে সমগ্র তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধে মৈত্রেয় ঋষি বিত্বরকে ভাগবতী কথা শ্রবণ করাইলে, বিত্বর ভাবে বিভোর ও অশ্রুধারায় আকুল হইয়া "মুনের্দধার মূর্দ্ধ্ন্যাচরণং হৃদা হরেঃ"—মৈত্রেয় ঋষির চরণ মস্তকে এবং শ্রীহরির চরণ হৃদয়ে ধারণ করিলেন। অতঃপর বিত্বর স্বীয় জ্ঞাতিগণকে দর্শন করিবার মানসে হৃষ্টচিত্তে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন।

শুকদেব মৈত্রেয়-বিত্বর সংবাদে রাজগণের বিষয়ভোগ করিবার পরও ভগবানে আত্ম-সমর্পণের কাহিনীসকল বর্ণনা করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎকে উৎসাহিত করিলেন—বিষয়ভোগী রাজগণের পক্ষেও শ্রীহরির আরাধনা অসম্ভব নহে, সুতরাং শ্রীহরির চরণ ধ্যান করিয়া পরীক্ষিতের সমগ্র মন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

পঞ্চম স্কন্ধ

(১)

মহারাজ প্রিয়ব্রতের আখ্যান

পঞ্চম স্কন্ধ স্থানে স্থানে ছন্দোবদ্ধ গদ্য ভাষায় রচিত। চতুর্থ স্কন্ধের শেষ ভাগে শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মনুপুত্র উত্তানপাদের বংশবর্ণনা শ্রবণ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি মনুপুত্র প্রিয়ব্রতের কাহিনী শ্রবণ করুন। রাজা প্রিয়ব্রত নারদের নিকট হইতে পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পুনরায় রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে পুত্রগণকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া ভগবৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব পুনঃপুনঃ বহু রাজর্ষিগণের রাজ্য-ভোগ এবং শেষ জীবনে সাধন ভজনের ফলে ভক্তি ও শাশ্বতস্থানপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের মনে আত্ম-বিশ্বাস আনয়ন করিতেছিলেন, এবং তাঁহার উৎসাহদীপ্ত মন যাহাতে "কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্তক্ষ্যে কলেবরম্"—অর্থাৎ যাহা পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহারই অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতেছিলেন। কিন্তু আজীবন বিষয়ভোগী মহারাজের মনে কি সহজে আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়া আসে! একবার হয়ত বিশ্বাস আসিল, পুনরায় সংশয় আসিয়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। তাই, শুকমুখে প্রিয়ব্রতের রাজ্য-ভোগ অথচ ভগবৎ-প্রাপ্তি শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ পঞ্চম স্কন্ধের প্রথম শ্লোকেই বলিলেন,

প্রিয়ব্রতো ভাগবতঃ আত্মারামঃ কথং মুনে,
গৃহেঽরমত যন্মূলঃ কর্ম্মবন্ধঃ পরাভবঃ। ৫।১।১

—হে মুনি, রাজর্ষি প্রিয়ব্রত ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পুনরায় বিষয়াদিতে কিরূপে আসক্ত হইলেন ? জীবের যে কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন ও আত্মবিস্মৃতি হয়, গৃহই তো তাহার মূল !

মহারাজের সন্দেহ হইতেছে যে প্রিয়ব্রতের হয়ত ভগবদ্‌ভক্তি লাভ হয় নাই ; যদি হইত তাহা হইলে বিষয়ে অনুরাগ ফিরিয়া আসিত না এবং বিষয়ে অনুরাগ যখন তাঁহার হইয়াছিল তখন পুনরায় শ্রীহরিতে মতি ও ভক্তি হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন, তাই অকপটে মনের সমস্ত সন্দেহ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতেছেন। মনের কোণে সন্দেহ লুকাইয়া গুরুবাক্য গ্রহণ করিবার ভান করিলে গুরুর উপদেশ নিষ্ফল এবং শিষ্যের আত্মবঞ্চনা হইয়া থাকে। তাই পরীক্ষিৎ বলিলেন,

সংশয়োঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্, দারাগারসুতাদিষু,
সক্তস্য যৎ সিদ্ধিরভূৎ কৃষ্ণে চ মতিরচ্যুতা। ৫।১।৪

—হে ব্রহ্মন্, পত্নী, পুত্র ও গৃহাদিতে আসক্ত রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের যে শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি হইয়াছিল, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

শুকদেব বলিলেন, "বাঢ়মুক্তং"—তুমি যথার্থ বলিয়াছ, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়াসক্ত মন ভগবৎমুখী হইতে চাহে না, কিন্তু,

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাৎ যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ,
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতে বুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিংনু করোত্যবদ্যম্। ৫।১।১৭

—গৃহে থাকিলেই সংসারবন্ধন হয় এবং বনে বাস করিলেই মুক্তি হয়, এইরূপ তুমি মনে করিও না। বনে গমন করিলেও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির সংসারবন্ধনের ভয় থাকে ; কারণ, সেই ব্যক্তি ষড়্‌রিপুর সহিত—মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—একত্র অবস্থান করে। কিন্তু বিবেকী ও ইন্দ্রিয়জয়ী

হওয়ায় যিনি আত্মারাম, গৃহস্থাশ্রম কি তাঁহার কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারে? নিশ্চয়ই না।

এই প্রিয়ব্রত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব ভূমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ যখন আলোকিত করেন তখন অপরার্দ্ধভাগ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে দেখিয়া প্রিয়ব্রত সঙ্কল্প করিলেন যে, রাত্রিকেও তিনি দিনের ন্যায় আলোকমণ্ডিত করিবেন। এই সঙ্কল্পের বশীভূত হইয়া তিনি দীপ্তিশালী রথে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাত বার মেরু প্রদক্ষিণ করিলেন। তাঁহার রথচক্রের ঘর্ষণে যে সাতটি গর্ত্ত হইয়াছিল তাহাই সপ্ত সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। অবশেষে তিনি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আপনার পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। এইরূপে নিজ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ সাম্রাজ্য ভোগ করিতে করিতে নারদের কৃপায় তাঁহার মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হইল এবং তিনি "বনিতায়াঃ বিনোদমৃগং মাং ধিক্ ধিক্ ইতি গর্হয়াঞ্চকার"—স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগ আমাকে শত ধিক্,—ইহা বলিয়া আপনার আত্মগ্লানি প্রকাশ করিলেন। মনের এইরূপ বৈরাগ্যের অবস্থায় বিষয় ভোগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইলে, তিনি স্বীয় পুত্রগণকে পৃথিবী যথাযথরূপে বিভাগ করিয়া দিয়া "ভুক্তভোগাঞ্চ মহিষীং মৃতকমিব সহমহাবিভূতিমপহায় স্বয়ং নিহিতনির্ব্বেদঃ হৃদি গৃহীত হরি বিহারানুভাবো ভগবতো নারদস্য পদবীং পুনরেবানুসসার"—উপভুক্তা সাম্রাজ্যলক্ষ্মী ও মহিষীকে মৃত শরীরের মত পরিত্যাগ করিয়া, দেবর্ষি নারদের শ্রীচরণচিহ্নিত পথ অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ পুনরায় অনুসরণ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে—

যাত্রা-তরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্ত্তচক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে,
জীবন-ভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।

সাধারণ লোক বিষয় ভোগ করে, আবার অতিবৃদ্ধ বয়সে, এমন কি,

মৃত্যু-সময়েও উচ্ছিষ্ট কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি পিছু ফিরিয়া পুনঃপুনঃ লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। হয়ত জরা ও বার্দ্ধক্যবশতঃ বিষয় ভোগ করিবার শক্তি নাই অথচ অভ্যাসবশতঃ লোভ থাকিয়া গিয়াছে! মহামায়ার এমনই লীলা!

প্রিয়ব্রতের পর তাঁহার পুত্র আগ্নীধ্র ও তাঁহার পর নাভি রাজ্যশাসন করিলেন। আগ্নীধ্রপুত্র নাভি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া পুত্রকামনায় শ্রীহরির প্রীতির অন্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞের ফলে শ্রীহরি দর্শন প্রদান করিয়া নাভির পুত্ররূপে অংশকলায় স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। অতঃপর নাভির পুত্র ঋষভদেব অবতীর্ণ হইয়া লোক-শিক্ষার জন্য গুরুগৃহে বাস এবং গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া গুরুর অনুমতিক্রমে ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তীকে বিবাহ করিলেন। জয়ন্তীর গর্ভে তাঁহার একশত পুত্র হইল। ঐ পুত্রগণের মধ্যে মহাযোগী ভরত যোগে ও গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে এই দেশ "ভারতবর্ষ" নামে জগতে পরিচিত হইয়াছে। ভগবান্ ঋষভদেব সমদর্শী, প্রশান্ত ও হিতকারী হইয়াও জীবগণের শিক্ষার জন্য গৃহস্থাশ্রমের সর্ব্ববিধ আচরণ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কারণ,

যদ্ যৎ শীর্ষণ্যাচরিতং তৎ তৎ অনুবর্ত্ততে লোকঃ। ৫।৪।১৫

—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোকসমূহ তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।

গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে ঠিক অনুরূপ অর্থযুক্ত একটি শ্লোক আছে—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ,
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাহাই অনুকরণ করে। তাঁহারা যাহা প্রামাণিক বলিয়া অনুষ্ঠান করেন, অন্য লোকে তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকে।

অতঃপর ঋষভদেব পুত্রগণের প্রতি উপদেশ প্রদান করিয়া গৃহত্যাগ করেন। সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে পুত্রগণের প্রতি ঋষভদেবের উপদেশ নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঋষভদেব প্রথম শ্লোকেই পুত্রগণকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন,

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে,
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুধ্যেদ্ যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যন্ত্বনন্তম্ ॥

৫।৫।১

—অর্থাৎ হে পুত্রগণ, বিষয়সমূহ পরিণামে দুঃখপ্রদ। মনুষ্যদেহ বিষয় ভোগ করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। বিষ্ঠাভোজী শূকর যে সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিয়া থাকে, মানুষ তাহার অধিক আর কোন ইন্দ্রিয়-সুখ প্রাপ্ত হয় না। মানবদেহ ভগবৎভজনের জন্য, ঐ ভজনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং ভজনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

সাধুসঙ্গই মুক্তির প্রথম ও প্রধান উপায়,—"মহৎ সেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তেঃ, তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্"—মহৎলোকের সেবা করিলে মুক্তিলাভ হয়, স্ত্রীলোকের সঙ্গকারী লোকের সঙ্গ হইতে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ হইতে বাসুদেবে প্রীতি হয় বলিয়াই সাধুসঙ্গ বাঞ্ছনীয়,—প্রীতির্ন যাবৎ ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ—অর্থাৎ যতদিন বাসুদেবের প্রতি ভক্তিভাব উৎপন্ন না হয় ততদিন দেহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে। অতএব,

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ,
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥

৫।৫।১৮

—যিনি সংসার-রূপ মৃত্যুর কবলে পতিত জীবকে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতে না পারেন, তিনি গুরু হইয়া শিষ্য করিবেন না,

পিতা হইয়া পুত্র উৎপাদন করিবেন না, জননী হইয়া সন্তান প্রস করিবেন না, দেবতা হইয়া উপাসকের পূজা গ্রহণ করিবেন না, পতি হইয়া পত্নী গ্রহণ করিবেন না, এবং স্বজন হইয়া আত্মীয়তা করিবেন না।

এই শেষ উপদেশ প্রদান করিয়া ঋষভদেব গৃহ হইতে নির্গত হইলে এবং মৌনব্রত অবলম্বন করতঃ অপরের নিকট জড়, অন্ধ, মূক, বধির, পিশাচ ও উন্মাদের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দুর্জ্জনগণ তাঁহাকে প্রহার, গাত্রে মূত্রত্যাগ, থুথু-ধূলি-শিলা-বিষ্ঠা নিক্ষেপ, কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেও তিনি মদস্রাবী বন্যহস্তী যেমন ভ্রমর-কুলের উৎপীড়ন গ্রাহ্য করে না, সেইরূপ ঋষভদেব সংসারে উদাসীন ও আপনার আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া একাকী স্বাধীনভাবে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় নিরন্তর ভগবৎ-চিন্তনের ফলে তাঁহার নানাবিধ যোগৈশ্বর্য্য উপস্থিত হইল।

'সিদ্ধ সমস্তার্থ পরিপূর্ণো যোগৈশ্বর্য্যাণি বৈহায়স-মনোজবান্তর্দ্ধান-পরকায়প্রবেশ—দূরগ্রহণাদীনি যদৃচ্ছয়া উপগতানি নাঞ্জসা নৃপ! হৃদয়েন অভ্যনন্দৎ।' ৫।৫।৩৫

—অর্থাৎ ঋষভদেব স্বতঃসিদ্ধ ও পরিপূর্ণকাম হইলেন। তাঁহার এই অবস্থায় আকাশ গমন, মনের ন্যায় বেগে দেহের গমন, অন্তর্দ্ধান, পরশরীরে প্রবেশ ও দূর দর্শন প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্যসমূহ যদৃচ্ছাক্রমে অনায়াসে উপস্থিত হইলেও তিনি ঐ সকলকে মনের মধ্যে স্থান দিতেন না।

সাধকের এই বিভূতিলাভ কামনা না করিলেও আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাকে 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'—শ্রেয়কার্য্য বিঘ্ন-বহুল বলিয়াই সাধকগণ গ্রহণ করেন। এই বিভূতিলাভ হইলে যদি সাধকের দৃষ্টি সেই দিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা হইলে

ভগবৎ-প্রাপ্তি তদনুপাতেই দূরে সরিয়া যায়। বিশেষতঃ অপক্কযোগিগণের পক্ষে বিভূতিলাভ সাধনভজনের চরম বিঘ্ন—বিভূতি প্রদর্শনের কণ্ডুয়ন একবার যোগিগণকে অধিকার করিলে যোগভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। হঠাৎ ধর্ম্মকার্য্যের সহায়করূপে অনেক সাধুসন্ন্যাসীকে এই বিভূতিশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে দেখা যায়; কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইলেই তাহারা বিভূতিশক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। বিশেষতঃ বিভূতিশক্তির পরিচালনা করিলেই বিভূতিশক্তি ক্ষয় এবং কালক্রমে লোপ প্রাপ্ত হয়—ইহাও সাধক-জীবনে অনেক ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার ঋষভদেব বিভূতিশক্তি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন—এই কথা বলিয়া শ্রীশুকদেব গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট সহস্র সহস্র যোগী ঋষিগণকে সাবধান করিয়া দিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের মন কিন্তু প্রসন্ন ও সন্দেহমুক্ত হইল না। তাঁহার অবচেতন মনের কোন কোণে হয়ত এখনও আশা প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সমবেত সহস্র সহস্র মুনিঋষির মধ্যে কেহ মহারাজের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া নিজ বিভূতিশক্তি প্রয়োগে তাঁহাকে ব্রহ্মশাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। মহারাজ তাই শুকদেবকে বলিলেন, যে যোগৈশ্বর্য্যসমূহ নিশ্চয়ই যোগিগণের পুনরায় ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারে না; সুতরাং ঋষভদেব ঐ যোগসিদ্ধিসমূহের সমাদর কেন করিলেন না, তাহা বুঝা যাইতেছে না। তখন শুকদেব বলিলেন যে, খল ব্যাধকে যেমন পশুগণ পূর্ব্বস্বভাব পরিত্যাগ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারে না, সেইরূপ কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পূর্ব্বস্বভাব পরিত্যাগ বিষয়ে চঞ্চল মনের প্রতি সাক্ষাৎ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না।

> নিত্যং দদাতি কামস্য ছিদ্রং তমনু যেঽরয়ঃ,
> যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্য পত্যুর্জায়েব পুংশ্চলী॥ ৫।৬।৪

—কোনও চরিত্রহীনা পত্নী যেমন স্বামীর অতিরিক্ত বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া উপপতিকে নিজ স্বামীর অনিষ্ট সাধন করিবার সুবিধা প্রদান করে,

সেইরূপ কোনও যোগী আপনার মনকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিলে, মন ইন্দ্রিয়গণকে অনর্থ উৎপাদন করিবার সুযোগ প্রদান করে।

এইজন্য ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ঋষভদেব স্বীয় যোগৈশ্বর্য্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে কূটক পর্ব্বতের উপবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় বায়ুবেগে কম্পিত বেণু-বৃক্ষসমূহের সংঘর্ষে উগ্র দাবানল উৎপন্ন হইয়া ঋষভদেবের সহিত সেই বনকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

(২)

মহারাজ ভরতের তিনটি জন্মের ঘটনাবলী

অতঃপর শ্রীশুকদেব সপ্তম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ অধ্যায় পর্য্যন্ত আটটি অধ্যায়ে ঋষভদেবের পুত্র মহারাজ ভরতের তিনটি জন্মের অপূর্ব্ব ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন,—প্রথম জন্মে মহারাজ, দ্বিতীয় জন্মে হরিণ-শাবক, তৃতীয় জন্মে ব্রাহ্মণপুত্র। এই মহারাজ ভরতের নাম হইতেই আমাদের দেশ 'ভারতবর্ষ' নামে বিখ্যাত। এই আটটি অধ্যায় গদ্য এবং পদ্য উভয় ছন্দেই রচিত।

ঋষভদেব রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভরত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া "প্রজাঃ স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তমানঃ পর্য্যপালয়ৎ"—রাজোচিত ধর্ম্মসাধন পূর্ব্বক প্রজাগণকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি যজ্ঞ ও ক্রতুস্বরূপ ভগবান্‌কে বহু যজ্ঞ ও ক্রতুর দ্বারা যজনা করিয়াছিলেন। যে যজ্ঞে পশুবধের বিধান নাই, তাহা 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত, এবং যাহাতে পশুবলি দিতে হয়, তাহাই 'ক্রতু' নামে পরিচিত। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে করিতে "কর্ম্ম-

বিশুদ্ধয়া বিশুদ্ধসত্ত্বস্য ভগবতি বাসুদেবে উচ্চৈস্তরাং ভক্তিরনুদিন-মেধমানরয়াজায়ত"—মহারাজ ভরতের চিত্ত পরিশুদ্ধ হইল এবং ভগবান্ বাসুদেবে তাঁহার ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল ভক্তি উৎপন্ন হইল। এইরূপে বহু বর্ষ রাজ্যপালন ও ক্ষত্রিয়জনোচিত ধর্ম্ম সাধন করিয়া মহারাজ ভরত পুত্রগণকে যথাযথরূপে ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক "সকলসম্পন্নিকেতাৎ স্বনিকেতাৎ পুলহাশ্রমং প্রবব্রাজ"—সকল সম্পদের নিলয় নিজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির ক্ষেত্র পুলহাশ্রমে গমন করিলেন। সেই আশ্রমে শালগ্রামশিলাবিরাজিত গণ্ডকী নদী প্রবাহিত হইয়া আশ্রমস্থানটিকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করিতেছিল। এই পুলহাশ্রমের উপবনে সর্ব্বত্যাগী ভরত একাকী নানাবিধ পুষ্প, নব পল্লব, তুলসী জল ও ফলমূলাদি উপহারের দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিলে তাঁহার বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত ও শমগুণ বর্দ্ধিত হইল এবং তিনি তখন পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এই সাধন সময়ে মহাত্মা ভরতের পরিধানে মৃগচর্ম্ম এবং ত্রিসন্ধ্যায় স্নান হেতু তাঁহার জটাকলাপ কপিশবর্ণ ও বক্র হইয়া গিয়াছিল, তিনি ঋকৃমন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে প্রকাশিত হিরণ্ময় পুরুষ ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে বলিলেন,

পরোরজঃ সবিতুর্জাতবেদো দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজান,
স্বরেতসাদঃ পুনরাবিশ্য চষ্টে হংসং গৃধ্রাণং নৃষদ্রিঙ্গিরামিমঃ ॥

৫।৭।১৪

—অর্থাৎ যিনি স্বীয় ইচ্ছার দ্বারাই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যিনি অন্তর্য্যামীরূপে পুনরায় এই বিশ্বে প্রবিষ্ট হইয়া রক্ষাকামী জীব-সমূহকে পালন করিতেছেন, সেই স্বপ্রকাশ ভগবান্ বাসুদেবের হিরণ্ময় রূপের শরণাপন্ন হইলাম। এবংবিধ রূপ অপ্রাকৃত, জীবের কর্ম্মফলপ্রদ ও মানবগণের বুদ্ধির প্রবর্ত্তক।

এই শ্লোকের টীকা করিয়া শ্রীধরস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—"অয়ং শ্লোকঃ গায়ত্র্যর্থ প্রকাশকঃ"—অর্থাৎ এই শ্লোক গায়ত্রীর নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

অষ্টম অধ্যায়ে মহাভাগবত সন্ন্যাসব্রতধারী ভরতের মৃগযোনিপ্রাপ্তি এবং মৃগদেহ ত্যাগের বিচিত্র আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাত্মা ভরত 'মহানদ্যাং'—অর্থাৎ গণ্ডকী নদীতে স্নান ও নিত্তনৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাপন করিয়া প্রণবমন্ত্র জপ করিতে করিতে "মুহূর্ত্ত-ত্রয়ং উদকান্তে উপবিবেশ"—ক্ষণকাল নদীতীরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আসন্নপ্রসবা এক হরিণী জলপান করিবার ইচ্ছায় নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত. হইল। অত্যন্ত পিপাসিতা কৃষ্ণসারমৃগী আগ্রহভরে জলপান করিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময়ে "অবিদূরেণ নদতো মৃগপতেঃ উন্নাদো লোকভয়ঙ্কর উদপতৎ"—নিকটেই কোনও সিংহের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন উত্থিত হইল। স্বভাবতঃ শঙ্কিতা হরিণী সিংহনাদে চকিতা হইয়া নদী পার হইবার জন্য যথাশক্তি লম্ফ প্রদান করিলে মহাভয়ে এবং শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার গর্ভ স্খলিত হইয়া মৃগশিশু নদীতে পতিত হইল। মাতা কৃষ্ণসারমৃগী নদী অতিক্রম করিয়া গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল।

নদীতীরে উপবিষ্ট হইয়া ভরত মহাশয় ঘটনাবলী দেখিতেছিলেন; অতি দ্রুতগতিতে সমস্তই সংঘটিত হইল, হরিণ-মাতাকে অভয় দিবার অথবা রক্ষা করিবার কোন অবসরই তিনি পাইলেন না। অবশেষে নদী-স্রোতে পতিত হরিণ-শিশুটি ভাসিয়া যাইতেছে লক্ষ্য করিয়া ভরতের মনে এক অপূর্ব্ব মমতার উদয় হইল, তিনি দ্রুতগতিতে সাঁতার দিয়া হরিণ-শাবককে তীরে উঠাইয়া স্বীয় আশ্রমে লইয়া আসিলেন। সেদিন তাঁহার আর জপ ধ্যান ধারণা কিছুই হইল না, সমস্ত সময় হরিণ-শিশুর সেবা ও প্রাণরক্ষার চেষ্টাতেই কাটিয়া গেল। অতুল ঐশ্বর্য্য ও

রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া যে মহারাজ নির্জ্জন বনপ্রদেশে সাধন ভজন আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহার অখণ্ড ভগবৎস্মরণ ও চিন্তনকে খণ্ডিত করিয়া সেদিন একটি ক্ষুদ্র পশু তাঁহার অন্তর ও বাহির অধিকার করিয়া বসিল। ধীরে ধীরে নিজ মনের অগোচরে ভরত মহাশয় মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

দিন চলিতে লাগিল, ভরত মহাশয়ের সময়মত সাধন ভজন হয় না। হরিণশিশুটি আমার,—এই মমতাবুদ্ধি তাঁহার মন অধিকার করিল, তিনি ইহার জন্য কোমল তৃণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, হিংস্র পশুগণের আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন, কখনও বা তাহার গা চুলকাইয়া এবং স্নেহভরে চুম্বন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। এইরূপে তিনি "কৃতানুষঙ্গ আসনশয়নাটনস্নানাশনাদিষু সহ মৃগজহুনা স্নেহানুবদ্ধহৃদয় আসীৎ—অর্থাৎ ঐ মৃগশিশুর উপরে তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান ও ভোজনাদি ব্যাপারে মৃগশিশুর সহিত অনুক্ষণ একত্র থাকিয়া স্নেহবশতঃ তিনি সর্ব্বদাই মৃগশিশুর চিন্তা করিতে লাগিলেন। কুশ, পুষ্প, যজ্ঞকাষ্ঠ, জল প্রভৃতি আহরণ করিতে যাইবার সময় পশুটির অনিষ্টের আশঙ্কায় তাহাকে একাকী আশ্রম মধ্যে না রাখিয়া সঙ্গে করিয়া বনে লইয়া যাইতেন, পথিমধ্যে হরিণশাবক তৃণ ভক্ষণের লোভে স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া যাইলে ভরত মহাশয় তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিতেন; কখনও বা "উৎসঙ্গে উরসি চাধায় উপলায়লন্ মুদং পরমামবাপ"—তাহাকে ক্রোড়ে অথবা বক্ষস্থলে স্থাপন করিয়া আদর করিতে করিতে পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। সসাগরা ধরিত্রীর ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর হরিণশাবককে স্কন্ধে বহন করিতেছেন—মহামায়ার কী অপূর্ব্ব লীলা! "ক্রিয়ায়াং অনির্ব্বর্ত্ত্যমানায়াম্ অন্তরা অপি উত্থায় উত্থায় যদৈনমভিচক্ষীত"—নিজের ভগবৎ-সেবাদি কার্য্য আরম্ভ করিয়া শেষ হইতে না হইতেই মধ্যে মধ্যে

উঠিয়া গিয়া হরিণশিশুটিকে দেখিয়া আসিতেন। হরিণশাবকটি ইতস্ততঃ তৃণভক্ষণ করিতে যাইলে ভরত মহারাজের মন ক্ষণকালের জন্যও মায়ামুক্ত হইত না, শাবকটির কোনও অনিষ্ট হইতে পারে এই চিন্তায় তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন। সন্ধ্যার পর কোন দিন শাবকটি আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে দেরী করিলে তাহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত এবং তিনি ধ্যানে বসিয়াও ভাবিতেন—'ক্ষ্বেলিকায়াং মাং মৃষাসমাধিনা আমীলিতদৃশং প্রেমসংরম্ভেণ চকিতচকিতঃ আবৃত্য পৃষদপুরুষবিষাণাগ্রেণ লুঠতি'—তাহার খেলা করিবার সময় আমি সমাধির ভান করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলে সে রাগ করিয়া আমার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার অতিশয় কোমল শৃঙ্গের দ্বারা আমার গাত্র ঘর্ষণ করিয়া থাকে। কখনও বা ভরত মহারাজের মনে পড়িত যে তিনি কুশের উপর হোমের দ্রব্যাদি রাখিলে হরিণশাবক দাঁত দিয়া তাহা কাটিয়া ফেলে, তখন শাবকটিকে তিরস্কার করিলে সে অতিশয় ভীত হইয়া খেলা পরিত্যাগ করিয়া ঋষি-কুমারের ন্যায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকে। এইরূপে মায়া-বিজড়িত হইয়া, আশ্রিতের পালনই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম মনে করিয়া রাজর্ষি ভরত দিন দিন পরমধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিলেন অথচ মোহবশতঃ নিজে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যে মহারাজ তীব্র বৈরাগ্যের জন্য বিপুল সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য-ভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, নিজ পুত্রকলত্রাদির প্রতি মোহবন্ধন ছেদন করিয়াছিলেন, তাঁহারই হৃদয়ের এক প্রান্তে অতি ক্ষুদ্র এক ছিদ্রপথ অবলম্বন করিয়া মৃগশিশুরূপে মহামোহ তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল, বিশাল সাম্রাজ্যের পরিবর্তে এক ক্ষুদ্র হরিণশিশু তাঁহার হৃদয়ে বিষয়-পিপাসা অনুক্ষণ জাগ্রত করিয়া রাখিল। এইরূপে কঠোর তপস্বী ভরতের দয়ায় পতন হইল।

বহু সন্ন্যাসীর জীবনে এইরূপ পতন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী হয়ত নিজ গৃহের কোমল আবেষ্টনী পরিত্যাগ করিয়াছেন, পিতার ঐশ্বর্য্য,

মাতার ক্রন্দন সবই উপেক্ষা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন, অথচ একটি মঠ নির্ম্মাণের কার্য্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়াছে, তিনি তাঁহার জীবনের পরম মূল্যবান্ সময় ইট, কাঠ ও চূণের পশ্চাতে অপব্যয়িত করিতেছেন; কখনও বা শিষ্যগণের ভরণপোষণের জন্য, আশ্রম পরিচালনার জন্য কিছু চাঁদা তুলিবার আশায় ধনী গৃহস্থের দ্বারদেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া আছেন, অনুগত শিষ্যের ব্যাধির জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতেছেন। ইহা এক সংসারের পরিবর্ত্তে অপর সংসারের মোহে আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী তাই সতর্কবাণী প্রদান করিয়াছিলেন—"শুধু গেরুয়া প'রে নাম বদলালেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, মহামায়ার হাত এড়ান বড়ই কঠিন।" ভরত মহারাজের জীবন বিষয়াসক্ত গৃহস্থ ও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী উভয়ের পক্ষেই সমভাবে শিক্ষাপ্রদ।

এইরূপে জ্ঞান ও ভক্তিযোগ সাধনশীল রাজর্ষি ভরত "অঘটমান-মনোরথাকুলহৃদয়ঃ"—অসম্ভাবিত মনোরথে ব্যাকুল চিত্ত হইয়া মৃগশিশুরূপে প্রকাশমান স্বীয় প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারা তপশ্চর্য্যা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া কাল যাপন করিতে করিতে একদিন তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। "তদানীমপি পার্শ্ববর্ত্তিনং আত্মজং ইব অনুশোচন্তং অভিবীক্ষমানো মৃগে এব অভিনিবেশিতমনা বিসৃজ্য লোকমিমং সহ মৃগেন কলেবরং মৃতমনু ন মৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরবৎ মৃগশরীরমবাপ।" এই অপূর্ব্ব ভাবসমন্বিত শুক-মুখ নির্গত পংক্তিগুলির মধ্যে মানবজীবনের এক বিশদ চিত্র সন্নিহিত রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, যিনি একদিন সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি ছিলেন, তিনি আজ ভূমিতে তাঁহার পর্ণকুটিরে দীনহীনের মত ভূতলে পড়িয়া আছেন, জীবনের যে উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়া এতদিন পিঙ্গল জটাভার বহন করিয়াছেন, 'স্বয়ং দাসাস্তপস্বিনঃ'—আপনিই আপনার দাস হইয়া ফলমূল পত্র পুষ্প আহরণ

করিয়াছেন, সর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্য উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্রের মত পরিত্যাগ করিয়াছেন, একবারও বনভূমি হইতে সেদিকে ফিরিয়া চাহেন নাই, তিনি আজ আত্মবিস্মৃত হইয়া বদ্ধজীবের ন্যায় মায়াময় সংসারচিন্তার মধ্যে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বেই মৃগশিশু শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে—ঠিক যেমন বদ্ধ গৃহীর মৃত্যুশয্যা-প্রান্তে তাহার মোহাচ্ছন্ন পুত্র-কন্যাগণ বসিয়া থাকে।

ভরত মহারাজের সমগ্র মন এখন মৃগশিশুর চিন্তায় নিমগ্ন—তাঁহার মৃত্যু হইলে এই মৃগশিশুকে কে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে! মৃত্যুপথযাত্রী সংসারী-জীবনের অপূর্ব্ব চিত্র! রাজপ্রাসাদের পরিবর্ত্তে পর্ণকুটির, পুত্র-কন্যার পরিবর্ত্তে মৃগশাবক, সেবাপরায়ণ দাসদাসীর পরিবর্ত্তে স্বয়ং আপনার মৃত্যুকালীন পরিচর্য্যা! প্রভেদ সামান্যই, মায়া-মোহাচ্ছন্ন মনের চিরকালের সেই একই অবস্থা। মৃত্যুকবলিত ক্ষীণ দৃষ্টিতে মৃগের প্রতি চাহিয়া ও মৃগের ভবিষ্যৎ জীবনের দুশ্চিন্তা বহন করিতে করিতে ভরত মহারাজের শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

> যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্,
> তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

—হে কৌন্তেয়, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে যাহা চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সেই চিন্তায় অভিভূত মন লইয়া মৃতব্যক্তি সেই চিন্তানুযায়ী দেহপ্রাপ্ত হয়।

ভরত মহারাজেরও ঠিক তাহাই হইল,—তিনি মৃগশরীর প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু একটি বহুমূল্য সম্পদ্ তাঁহার মৃগ-জন্মেও রহিয়া গেল—পূর্ব্বজন্মের সাধনভজন, মোহপ্রাপ্তি, মৃত্যু সময়ে হরিণ-শাবকের চিন্তা—এই সমস্ত বিষয়ের স্মৃতি তাঁহার মৃগদেহেও বিলুপ্ত হইল না। ইহার কারণ ছিল। ভগবান কপিলদেব তাঁহার মাতাকে

বলিয়াছেন—"অমোঘা ভগবৎসেবা নেতরেতিমতির্মম"—অর্থাৎ ভগবৎ-ভজন যতটুকু করা যায় ততটুকুই সার্থক—ভগবৎভজনের ফল কখনও কোনও অবস্থাতেই বিলোপ প্রাপ্ত হয় না। ভরত মহাশয় চিরজীবন যে ভক্তি ও জ্ঞানসাধন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কিছুদিনের মোহ-প্রাপ্তিও সম্পূর্ণরূপে চাপা দিতে পারিল না,—তিনি ভক্তি ও জ্ঞান-প্রভাবে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লইয়া পরজন্মে জাতিস্মর হইয়া মৃগদেহ প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ও ব্যর্থতা তাঁহাকে কণ্টকের মত বিদ্ধ করিতে লাগিল, তিনি মৃগী-মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ জন্মস্থান কালঞ্জর নামক পর্ব্বত হইতে দূরে বহুদূরে চলিয়া যাইলেন এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইলে মৃগশরীর পরিত্যাগ করিলেন।

নবম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত চারিটি অধ্যায়ে মৃগরূপী ভরত মহাশয়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ, রাজা রহুগণের সহিত কথোপকথন এবং তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশুকদেব বলিলেন যে আঙ্গিরসগোত্রজ জনৈক বেদনিষ্ঠ স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণের গৃহে ভরত মহাশয় জন্মগ্রহণ করিলেন। এই ব্রাহ্মণের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে নয়টি পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,—এই পুত্রটি স্বয়ং ভরত মহাশয়। ব্রাহ্মণ-জন্মেও তাঁহার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি বর্ত্তমান ছিল বলিয়া আত্মীয়স্বজনের সঙ্গ হইতে পুনরায় সংসারে আসক্তি জন্মিতে পারে এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎস্মরণ ও চিন্তন করিয়া ভরত মহাশয় "আত্মানং উন্মত্ত জড়অন্ধবধির স্বরূপেণ দর্শয়ামাস লোকস্য"—সাধারণ লোকের নিকট উন্মত্ত, জড়, অন্ধ ও বধিররূপে প্রতীয়মান হইতেন। ব্রাহ্মণ-পিতা সন্তানের প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং যথাকালে তাঁহার উপনয়ন বিধান করিলেন। পিতার ইচ্ছা ছিল যে শ্রাবণ মাস হইতে পুত্র ভরতকে বেদ অধ্যয়ন করাইবেন কিন্তু চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ

ও আষাঢ় এই চারিমাসের মধ্যে পিতার চেষ্টা সত্ত্বেও ভরত গায়ত্রী মন্ত্র আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। স্নেহশীল পিতা আশা ছাড়িলেন না, বহুবিধ চেষ্টা করিলেন কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ভরতের মাতা স্বীর পুত্র ও কন্যাকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামীর সহিত সহমরণে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ভরতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ কর্ম্মাসক্ত ছিলেন, আত্মবিদ্যা তাঁহারা বুঝিতেন না, সুতরাং পিতা পরলোক গমন করিলে তাঁহারা ভরতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া তাহার শিক্ষার জন্য আর কোনও চেষ্টা করিলেন না, ভরত তাঁহাদের আদেশমত গৃহস্থালী কাজকর্ম্ম করিয়া মনে মনে ভগবৎস্মরণ করিতে করিতে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশুকদেব বলিলেন যে 'প্রাকৃতৈঃ দ্বিপদপশুভিঃ'—দুইপদ বিশিষ্ট জন্তুগণ কর্তৃক—ভরত যেরূপ আদিষ্ট হইতেন বিনা পারিশ্রমিকে অথবা অল্প পারিশ্রমিকে ভরত তাহাদের সেই কার্য্য বিনা আপত্তিতে করিয়া দিতেন। 'প্রাকৃতৈঃ দ্বিপদপশুভিঃ'—কথাগুলি পরিলক্ষণীয়। যে-সমস্ত মানুষ ভগবৎ চিন্তন করে না, শুধু 'আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ' লইয়াই আছে, তাহারা পশুশ্রেণীভুক্ত—সাধারণ পশুর চারিটি পদ, এই সব বিশিষ্ট পশুর দুইটী পদ—ইহাই মাত্র প্রভেদ। মনুষ্যদেহে ভগবৎ ভজন করিলে তবে সে মানুষ, নতুবা সাধারণ পশু মাত্র। এই পশুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আদেশ পালন করিয়া শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ অন্ন সমভাবেই গ্রহণ করিয়া, বাসুদেবকে হৃদয়ে স্মরণ করিতে করিতে পরামানন্দে ভরতের দিন কাটিয়া যাইতেছিল। তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, দেহ পুষ্ট এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কঠিন ছিল; তিনি ভূমিতে যত্রতত্র শয়ন করিতেন, দেহের প্রতি তাঁহার কোনও যত্ন ছিল না এবং নিয়মিত স্নানের অভাবে দেহ কর্দ্দমলিপ্ত হওয়ায় তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্রহ্মতেজ সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইত না, কটিদেশে অতি মলিন একখণ্ড বস্ত্র ব্রাহ্মণ সমাজের লজ্জা নিবারণ করিত,

গলদেশে লম্বমান ভ্রাতৃপ্রদত্ত মলিন যজ্ঞোপবীত দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ব্রাহ্মণাধম বলিয়া অবজ্ঞা করিত। অপরে তাঁহাকে অন্নমুষ্টিমাত্র ভোজ্য প্রদান করিয়া তাঁহার দ্বারা নানাবিধ কৃষিকার্য্য করাইয়া লইত, ভ্রাতৃগণও কর্দ্দমাক্ত মাঠে ক্ষেত্র সমতল করিবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিত এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ক্ষুদ, তুষ, কীটদষ্ট মাসকলাই, রন্ধনপাত্র সংলগ্ন দগ্ধ অন্ন তাহাকে খাইতে দিত। ভরত মহাশয় বিনা আপত্তিতে আগ্রহ সহকারে সেই কদন্ন অমৃতবোধে ভক্ষণ করিতেন।

ভরত মহাশয়ের এইরূপ জীবনযাত্রাপ্রণালী উল্লেখ করিয়া বিষ্ণুপুরাণে তাঁহাকে "আহারবেতনঃ"—অর্থাৎ আহারমাত্রই বেতন যাঁহার—বলা হইয়াছে।

তিনি "শীতোষ্ণবাতবর্ষেষু বৃষ ইব অনাবৃতাঙ্গঃ"—শীত, গ্রীষ্ম, ঝড়, বৃষ্টিতে অনাবৃত দেহে বৃষের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন। শ্রীশুকদেব বলিলেন যে এইরূপ মলিন দেহ ও আচার ব্যবহারের ফলে ভরত মহাশয় "মহামণিরিব অনভিব্যক্ত ব্রহ্মবর্চ্চসঃ"—মহামণির উপর কর্দ্দমের প্রলেপ পড়িলে যেমন মণি বলিয়া চিনিতে পারা যায় না, সেইরূপ তাঁহার আত্মার অপূর্ব্ব জ্যোতি সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইত না। তিনি জনগণ প্রদত্ত "জড়ভরত" নামে সমাজে পরিচিত হইলেন।

মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহারের এইরূপ বর্ণনাই আছে—

যেন কেনচিৎ আচ্ছন্নো যেন কেনচিৎ আশিতঃ
যত্র ক্বচন শায়ী স্যাৎ তং দেবাঃ ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

—অর্থাৎ যিনি যে কোনরূপ বস্ত্রের দ্বারা শরীর আবৃত করেন, যে কোন খাদ্যদ্রব্য ভোজন করেন এবং যে কোন স্থানে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করেন, অর্থাৎ দেহ, খাদ্য দ্রব্য, শয্যাদ্রব্য সম্বন্ধে যাঁহার কোন রুচি-বিচার নাই, তাঁহাকেই দেবতাগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন ॥

এইরূপে দিন চলিতে চলিতে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইল। কোন এক শূদ্রপতি সন্তান কামনা করিয়া দেবী ভদ্রকালীর প্রীতির জন্য নরবলি প্রদান করিবার আয়োজন করিয়াছিল। যে মানুষটিকে বলি দিবার জন্য তাহারা সংগ্রহ করিয়াছিল সে কোনরূপে বন্ধনমুক্ত হইয়া নিশিদ্বিপ্রহরের অন্ধকারের মধ্যে পলায়ন করিল। তখন পূজার স্থানে মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল এবং শূদ্রপতির অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়া "পুরুষপশুর" সন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু তাহাকে কোথাও পাওয়া যাইল না। নিস্তব্ধ নিশীথের জমাটবাঁধা অন্ধকার খণ্ড বিখণ্ড করিয়া এক একবার মদোন্মত্ত অনুচরগণের ভীষণ চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইতেছে, কখনও বা তাহারা নিঃশব্দে অন্ধকার ভেদ করিয়া দূর দূরান্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়াছে, তাহাদের পদশব্দে রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন আরও ভীষণতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, কখনও বা তাহারা প্রাণভয়ে পলায়নপর মানুষ-পশুর গতিবিধি অথবা পদশব্দ নিরূপণ করিবার জন্য স্থির হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া আছে। নিকটস্থ একটি ধান্যক্ষেত্রে ভরত মহাশয় এক উচ্চ মঞ্চের উপর সতর্ক হইয়া বসিয়া আছেন, এক একবার শব্দ করিয়া মৃগ ও বরাহ হইতে শস্য রক্ষা করিতেছেন। এইরূপে অবস্থিত মহাভাবগত, সতত ইষ্টচিন্তায় প্রবৃত্ত ভরত মহাশয় সহজেই দস্যুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। দস্যুগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নিশীথিনীর ভীতি উৎপাদন করিয়া সমস্বরে কণ্ঠে বিকট আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল,—যে মানুষ-পশু পূর্ব্বে পলাইয়া ছিল তাহার পরিবর্ত্তে আরও অধিকতর সুলক্ষণযুক্ত বলির জন্য অপর মানুষ পাওয়া গিয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট, বাধামাত্র প্রদানে পরাঙ্মুখ এরূপ নিরীহ ব্রাহ্মণ-পশুকে দেখিয়া তাহারা দেবীর দয়া বলিয়া গ্রহণ করিল এবং "মুদাবিকসিতবদনাঃ"—আনন্দে সমস্ত দন্তপংক্তি বাহির করিয়া ভরত মহাশয়কে সুদৃঢ় রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিয়া বনের ভিতর দিয়া পূজা-

মণ্ডপের দিকে লইয়া চলিল। সে কী অপূর্ব্ব দৃশ্য! একদিকে যমদূতের মত বিকটাকৃতি মাতাল, তমোগুণে আচ্ছন্ন দস্যুগণের মনের আনন্দ মুহুর্মুহুঃ চীৎকারের ভিতর দিয়া দূর দূরান্তরের বনভূমি প্রকম্পিত করিতেছে, বন্য পশুগণ ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে, অন্য দিকে শান্ত, সৌম্য, নির্ব্বিকার ব্রহ্মর্ষি অনুক্ষণ ভগবৎস্মরণ ও চিন্তা করিতে করিতে রজ্জুবদ্ধ পশুর মত ধীরে ধীরে বনভূমি অতিক্রম করিতেছেন। নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া সম্মুখে পশ্চাতে উভয় পার্শ্বে মূর্ত্তিমান্ তমো-গুণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া নিরাসক্ত নির্ভয়হৃদয়ে চলিয়াছে এক অপূর্ব্ব সত্ত্বগুণময়ী ব্রাহ্মণমূর্ত্তি,—দস্যুগণের মত্ত আকর্ষণে কখনও বা হস্তদ্বয় ব্যথিত হইতেছে, কণ্টকাকীর্ণ পথে হয়ত পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, চক্ষের সম্মুখ দিয়া মৃত্যু পুনঃপুনঃ আসিতেছে আবার চলিয়া যাইতেছে! ভীষণা প্রকৃতি, ভীষণতর দস্যুগণ, মৃত্যুর করালমূর্ত্তি,—তাহারই সহিত চলিয়াছেন শান্ত অকম্পিতহৃদয় ব্রহ্মর্ষি—যিনি 'ভীষণং ভীষণানাং' তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ভদ্রকালীর পূজামণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সে দিন রাত্রিতে সে কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

ঐ চণ্ডিকার পূজামণ্ডপ! দস্যুগণ এইবার নিশ্চিন্ত হইয়া দেবী-প্রতিমার উভয় পার্শ্বে বসিয়াছে, পুরোহিত আসনে সমাসীন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে শাণিত খড়্গ, খড়্গের অতি নিকটে বন্ধনমুক্ত ভরত মহাশয়, অবিদূরে বলির যূপকাষ্ঠ, দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান পুত্রকামী শূদ্ররাজ। ভদ্রকালীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, মূর্ত্তিতে দেবী আবির্ভূতা হইয়াছেন, চৌররাজ, পুরোহিত, দস্যুগণ সকলে চণ্ডীতে বর্ণিত চণ্ডিকার রূপের দিকে কতকটা বিস্ময়মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যেমন একদিন চণ্ডমুণ্ড দেখিয়াছিল সেইরূপ ইহারও দেখিতেছে,

ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা॥

ভ্রূকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাৎ দ্রুতম্,
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা,
দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানা শুষ্ক মাংসাতিভৈরবা ॥
অতি বিস্তারবদনা জিহ্বা ললনভীষণা,
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌ মুখা ॥

—যে দেবী এতক্ষণ প্রসন্ন মূর্ত্তিতে পূজার আয়োজন দেখিতেছিলেন, সেই ভক্তবৎসলা যূপকাষ্ঠের নিকট আবদ্ধ ভক্ত সন্তানকে তাঁহার প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি দেখিয়া হঠাৎ ভীষণ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়াছেন, তাঁহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ভ্রূকুটী-কুটিল ললাটদেশ হইতে খড়্গ ও পাশহস্তা ভীষণবদনা কালীমূর্ত্তি বাহিরে মুহুর্মুহুঃ প্রকাশিত হইতেছে, সেই চিন্ময়ী কালীমূর্ত্তির গলদেশে নরকঙ্কালের মালা, তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তাঁহার বিশাল মুখমণ্ডল হইতে লোলজিহ্বা প্রসারিত হইয়াছে, তাঁবার কোটরগত আরক্ত ঘূর্ণমান চক্ষুদ্বয়, তিনি বিকটশব্দে যেন সমগ্র দিক্‌মণ্ডল মোহিত ও প্রতিধ্বনিত করিতেছেন।

আর দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার শ্রীচরণে দেহ প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া ভক্ত ভরত দেখিতেছেন,

রূপহীন, জ্ঞানাতীত, ভীষণ শকতি
ধরেছে তাঁহার কাছে জননী মূরতি।

—একজন দেখিতেছে বরাভয়প্রদা অতি কোমলা, জন্মজন্মান্তরের সুপরিচিতা ভক্তবৎসলা জননী, শুনিতেছে মাতার স্নেহময় কণ্ঠের চিরদিনের "মাভৈঃ" ধ্বনি, বুক জুড়াইয়া যাইতেছে। অপরে দেখিতেছে ভীষণ হইতেও ভীষণতরা অদৃষ্টপূর্ব্বা রুদ্র মূর্ত্তি, শুনিতেছে, স্বর্গ-মর্ত্ত পাতালভেদী বিকট চীৎকার, ভয়ে বক্ষ দুরু দুরু কম্পিত হইতেছে।

ইহাই চণ্ডিকা মূর্ত্তি,—যাঁহাকে চণ্ডীতে "অতি সৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ"—অতি সৌম্য, অথচ অতি রৌদ্র বলিয়া দেবগণ একদিন স্তব করিয়াছিলেন।

দস্যুগণ বিধি অনুসারে ভরতকে স্নান করাইয়া, নতুন বস্ত্র পরিধান করাইল এবং ভূষণ, মাল্য ও তিলকাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ভোজন করাইল। ভরত মহাশয় অপর দিনের মতই ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করিলেন, বলিদানের খড়্গের পার্শ্বে বসিয়াও ভয়ে তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের কোনও ব্যাঘাত ঘটিল না। শূদ্রপতির নিকট এই ভূষণ মাল্য ও তিলকের অলঙ্কার দেবীর পূজার উপকরণ মাত্র, দেবীর নিকট ইহা ভক্তের প্রতি প্রসাদচিহ্ন, ভরতের মনে ইহা বলির মৃত্যুচিহ্ন অথবা স্নেহের অলঙ্কার কোনটাই নহে,—তিনি দেবীর দিকে চাহিয়া তদ্গতচিত্ত হইয়া বসিয়া আছেন, ভয় অথবা অভয়, সম্মান অথবা অসম্মান, জীবন অথবা মৃত্যু কোন চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। দস্যুগণ দেবীর সম্মুখে ধূপ, দীপ, মাল্য, খৈ, নবপল্লব, অঙ্কুর, ফল উপহার প্রদান করিয়া গীত, স্তুতি এবং মৃদঙ্গধ্বনি করিতে লাগিল। "অথ বৃষলরাজ-পণিঃ পুরুষপশোরসৃগাসবেন দেবীং ভদ্রকালীং যক্ষ্যমানঃ তদভিমন্ত্রিতং অসিং অতিকরালং নিশিতং উপাদদে।"—অর্থাৎ চৌররাজের পুরোহিত তখন ঐ পুরুষ-পশু ভরতের শোণিতে ভদ্রকালীর তর্পণ করিবার জন্য মন্ত্র দ্বারা শোধিত করিয়া অতি ভয়ানক শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিল।

কী ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত! শূদ্ররাজের মনে উৎকট আনন্দ, তাহার পুত্র-কামনা সফল হইতেছে, পুরোহিত পূজার শেষ বিধি সমাপন করিবার জন্য খড়্গ গ্রহণ করিয়াছে, চতুর্দ্দিকে ভীষণাকৃতি দস্যুগণ নীরব ও নিশ্চল, যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ ভরত মহাশয়ের মুখে চিরদিনের অপূর্ব্ব প্রসন্নতা, ভক্তের অনিষ্ট আশঙ্কায় দেবীর মন চঞ্চল। গভীর নিশীথের নিবিড় অন্ধকারের ভীষণ নিস্তব্ধতা চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, পূজাবিধি চলিতেছে কিন্তু কোনও শব্দ নাই—এ যেন প্রলয় ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির নিষ্ঠুর ও

নিঃশব্দ পরিহাস। মুহূর্ত্তের মধ্যেই ভরতের ছিন্নমুণ্ড ভূতলে পতিত হইবে। এইবার "ব্রহ্মভূতস্য সাক্ষাৎ নির্ব্বৈরস্য সর্ব্বভূতসুহৃদঃ"—সাক্ষাৎ ব্রহ্মসদৃশ সর্ব্বদা বৈরভাবশূন্য ও সর্ব্বজীবের সুহৃদ্ মহাত্মা ভরতের মস্তকে তীক্ষ্ণধার খড়্গ উত্তোলিত হইতে দেখিয়া "সহসা উচ্চচাট সৈব দেবী ভদ্রকালী"—হঠাৎ দেবী ভদ্রকালী প্রতিমার ভিতর হইতে চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ "হন্তকামা ইবেদং মহাট্টহাসমতি সংরম্ভেণ বিমুঞ্চন্তী"—ভয়ঙ্কর ক্রোধে উচ্চনাদে অট্টহাস্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণধার খড়্গ পুরোহিতের হস্ত হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া সেই খড়্গের দ্বারা দুষ্ট শূদ্রগণের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, "গলাৎ স্রবন্তং অসৃগাসবং অত্যুষ্ণং নিপীয়"—তাহাদের গলদেশ হইতে অজস্রধারায় নির্গত অতি উষ্ণ রুধির পান করিলেন, ছিন্নমুণ্ড সমূহকে লইয়া কন্দুকের মত ক্রীড়া করিলেন, তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যে ধরণী কম্পিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুৎ-বেগে সমস্ত সংঘটিত হইল। চতুর্দ্দিকে নরমুণ্ড, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ রুধিরের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, দেবী নৃত্যপরায়ণা, ভরত একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সবই দেখিতেছেন—সেখানে আর কেহই নাই,—ভক্তবৎসলা জ্যোতির্ম্ময়ী জ্ঞানাতীত ভীষণ শক্তি তখন ভক্তের চক্ষের সম্মুখে একটি ছোট মা হইয়া ভক্তের প্রতি শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। করুণাময়ী একখানি ছোট মাতৃমূর্ত্তি, কিন্তু ছোট হইয়াও ভক্তের সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া ভিতর-বাহির আচ্ছাদন করিয়া মা দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিতে দেখিতে এই ছোট মাতৃ-মূর্ত্তির মাথায় সোনার মুকুট গগন স্পর্শ করিতেছে, জ্যোতিতে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভাসিয়া যাইতেছে, হস্তধৃত রুধিরলিপ্ত অসি ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়া ধরণীর বক্ষ স্পর্শ করিয়াছে। সেখানে আর কেহ নাই, শুধু মা ও ছেলে! ধীরে ধীরে মাতা অন্তর্হিতা হইলেন, ভরত মহাশয় পুনরায় কৃষি ক্ষেত্রে যাইয়া উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিলেন।

দেবীর এই অপূর্ব্ব লীলা বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকদেব বলিলেন—

এবমেব খলু মহদভিচারাতিক্রমঃ কার্ৎস্ন্যেনাত্মনে ফলতি।

৫।৯।১৯

—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহাজনের প্রতি হিংসা পূর্ব্বক কোনও অপরাধ করিলে ঐ অপরাধ ফিরিয়া আসিয়া সম্পূর্ণরূপে অপরাধীর নিজের উপরই অনিষ্ট আনিয়া দেয়।

পরীক্ষিৎ তখনও বিস্মিত হইয়া শ্রীশুকদেবের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন,—সংশয়াচ্ছন্ন মন এইরূপ সশরীরে দেবীর আবির্ভাব-কাহিনী সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, উপরন্তু শঙ্কিত হইতেছে যে মহতের অবমাননা তো তিনিও করিয়াছেন, তবে তাঁহার কি রক্ষার উপায় নাই? অন্তর্য্যামী শ্রীশুকদেব মহারাজের সন্দিগ্ধ অথচ কাতর দৃষ্টির মর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং অভয় প্রদান করিবার জন্য তাঁহাকে "বিষ্ণুদত্ত" বলিয়া সম্বোধন করিলেন,—অর্থাৎ তুমি বিষ্ণুর কৃপাপ্রাপ্ত এবং কৃপারক্ষিত, তুমি ভয় করিও না, তোমার বিনাশ নাই। দেবীর লীলাকথা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম পরীক্ষিতের সংশয় নিরসন করিবার জন্য শুকদেব বলিলেন যে, যাঁহার দেহে আত্মবুদ্ধি নাই, যিনি কোনও জীবের প্রতি বৈরভাব মনে পোষণ করেন না, ভগবানের প্রতি সতত নির্ভরশীল, এমন কি নিজ শিরশ্ছেদ উপস্থিত হইলেও লেশমাত্র বিচলিত হন না, সেই ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান ভদ্রকালী-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভরতকে রক্ষা করিয়াছিলেন—ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। এই কথা বলিয়া শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের মনের সংশয় ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় ভরত মহাশয়ের জীবনের অপর কথা শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিলেন।

দশম অধ্যায়ে জড়ভরত এবং সিন্ধু ও সৌবীর দেশের অধিপতি রহূগণের সংবাদ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আখ্যান ভাগবতের এক

অপূর্ব্ব অংশ ; জ্ঞান ও ভক্তি প্রবাহে ইহা সংসারী জীবের মনের সমস্ত সন্দেহ ও কলুষ অহরহ দূর করিয়া থাকে।

অনেক দিন পরের কথা। সিন্ধু ও সৌবীরদেশের অধিপতি মহারাজ রহুগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে শিবিকায় আরোহণ করিয়া কপিলাশ্রমে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে হঠাৎ অসুস্থতা অথবা অন্য কোনও কারণে একজন বাহকের অভাব ঘটিলে প্রধান বাহক চতুর্দ্দিকে লোক অন্বেষণ করিতে লাগিল। ইক্ষুমতী নদীতীরে ভরত মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া সে হৃষ্টচিত্ত হইয়া মনে মনে ভাবিল, "এষ পীবা যুবা সংহননাঙ্গঃ গোখরবৎ ধুরং বোঢ়ুং অলং"—এই মাংসল ও সুদৃঢ়পেশীযুক্ত যুবক নিশ্চয়ই বৃষ এবং গর্দ্দভের ন্যায় ভার বহন করিতে সমর্থ ; এবং তৎক্ষণাৎ ভরত মহাশয়কে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাজার শিবিকা বহন করিবার জন্য লইয়া গেল। শিবিকাবহন কার্য্যে ভরতের অভ্যাস ছিল না, তথাপি বিনা প্রতিবাদে তিনি অপর বাহকগণের সহিত শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। একে তো অভ্যাস নাই, উপরন্তু পাছে পদদলিত হইয়া কোনও প্রাণি-হিংসা ঘটিয়া যায় এই আশঙ্কায় ভরত মহাশয় সতর্ক হইয়া দেখিয়া শুনিয়া পদ-বিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহার ফলে অন্যান্য বাহকগণের সহিত তাঁহার গতির তাল নষ্ট হইতেছিল সুতরাং শিবিকার ভিতরে বসিয়া রাজা রহুগণ মধ্যে মধ্যে ঝাঁকুনি অনুভব করিতেছিলেন। রাজা বিরক্ত হইয়া বাহকগণকে তিরস্কার করিলে রাজরোষভয়ে শঙ্কিত হইয়া বাহকগণ বলিল যে, নূতন নিযুক্ত বাহকটি পরিশ্রান্ত না হইয়াও দ্রুত চলিতে পারিতেছে না, সুতরাং রাজার অসুবিধার জন্য নূতন বাহকটিই সম্পূর্ণ দায়ী। রাজা বুঝিলেন "সাংসর্গিকো দোষ এব নূনমেকস্যাপি সর্ব্বেষাং সাংসর্গিকানাং ভবিতুমর্হতি"—একজনের সংসর্গজনিত দোষ অপর সকলেরই ঘটিতে পারে এবং সেইজন্য নূতন বাহকের প্রতি রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধ হইতে সমুদ্ভূত রজোগুণ

তাঁহার স্বচ্ছ বুদ্ধিকে আবৃত করিল, তিনি "অবিস্পষ্ট-ব্রহ্মতেজসং জাত-বেদসমিব রজসাবৃতমতিরাহ"—ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় অলক্ষ্য ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন ভরতকে ব্যঙ্গচ্ছলে তিরস্কার করিতে লাগিলেন,—তুমি নিশ্চয়ই অত্যধিক পরিশ্রান্ত হইয়া দীর্ঘপথ একাকীই শিবিকা বহন করিয়া আনিয়াছ, তুমি অতি কৃশ, অঙ্গসমূহও দুর্ব্বল, অনেক বয়সও হইয়াছে, উপরন্তু অন্য বাহকেরা তোমার সহিত তাল রাখিয়া হাঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাই বোধ হয় শিবিকা সমভাবে চলিতেছে না। স্থান কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া আশ্রিতের প্রতি হাল্‌কা হাসিঠাট্টার প্রয়োগ মানুষের নীচ অন্তঃকরণের পরিচায়ক; সুতরাং রজোগুণদৃপ্ত মহারাজের এই বিদ্রূপবাণী স্বাভাবিক হইলেও আত্মারাম ভরত মহাশয় "ব্রহ্মভূতঃ তুষ্ণীং শিবিকাং পূর্ব্ববৎ উবাহ"—ব্রহ্মচিন্তনে নিমগ্ন হইয়া উদাসীনের মত পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দে শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। শিবিকা অসমান ভাবেই চলিতেছে দেখিয়া এইবার রাজা রহুগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও তিরস্কার পরিত্যাগ করিয়া তীব্র ভাষায় ভরতকে শাস্তি প্রদান করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "কিমিদং অরে ত্বং জীবন্মৃতোঽসি মাং কদর্থীকৃত্য ভর্ত্তৃশাসনমতিচরসি, প্রমত্তস্য চ তে করোমি চিকিৎসাং দণ্ডপাণিরিব জনতায়াঃ যথা স্বাং প্রকৃতিং ভজিষ্যসীতি"—"এহি! তুই কি প্রাণ থাকিতেও মরিয়া আছিস? আমি তোর প্রভু, অথচ তুই আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছিস? যমরাজ যেমন জীবগণের শাস্তি বিধান করেন, ঠিক সেইরূপ আমিও তোর শাস্তি বিধান করিলে তবে তুই সাবধান হইবি।" রহুগণের অপমানসূচক কথাগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রভু বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট আত্মাভিমান আছে, দাস বলিয়া ভরতের প্রতি তাঁহার মনে অবজ্ঞার সঞ্চার হইয়াছে, যমরাজের মত তিনিও দণ্ডপ্রদান করিতে সমর্থ বলিয়া তাঁহার মনে নিজশক্তির প্রতি একটা

অস্বাভাবিক অহঙ্কার উপস্থিত হইয়াছে, ক্রোধে কলুষিত জিহ্বা হইতে অসংযত পরুষবাক্য নির্গত হইতেছে।

আজ কিন্তু রাজা রহুগণের পরম শুভদিন, কপিলাশ্রমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে যাইবার উদ্দেশ্য তাঁহার পথিমধ্যেই সফল হইয়া চলিয়াছে। বিধাতার বিধানে অভূতপূর্ব্ব উপায়ে কতকগুলি ঘটনা একত্র সংযোজিত হইয়া রাজা রহুগণের ভাগ্যোদয় পূর্ব্ব হইতেই সূচিত করিতেছিল—আশ্রমে যাইবার সঙ্কল্প, একজন বাহকের অভাব, ঠিক সেই সময়ে ইক্ষুমতী নদী-তীরে স্বেচ্ছায় বিচরণশীল ভরত মহাশয়ের উপস্থিতি। রাজার কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরতের ক্রোধ হইল না, তিনি দীনহীন বদ্ধজীব রাজার প্রতি দয়াপরবশ হইলেন। শুকদেব ভাগবতের অপর স্থলে বলিয়াছেন, "সাধবো দীনবৎসলাঃ"—সাধুগণ দীনবৎসল। তাই আজ জড়দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ রাজাকে দয়া করিবার জন্য ভরত মহাশয় সমুৎসুক। তিনি সাধারণতঃ অধিক কথা কহিতেন না, এমন কি বলিদানের সময় যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়াও তিনি নির্ব্বাক্, অথচ আজ রাজা রহুগণের বক্র উক্তির উত্তর প্রদান করিবার সময় পরমার্থ-জ্ঞানপ্রদ বহু ভাষা ব্যবহার করিয়া ফেলিলেন। ভরত বলিলেন,—"হে রাজন্, আপনি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমার পরিশ্রম হয় নাই, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করি নাই,—আপনার এই কথা মিথ্যা বা উপহাস নহে! চিদানন্দময় আত্মার ভার অথবা পথ কিছুই নাই, অতএব সত্যসত্যই আমার পরিশ্রম কিছুই হয় নাই। আর আপনি যে বলিয়াছেন, আমি স্থূল, তাহাও আপনার ভুল, সুতরাং আপনার সেই উক্তি আমাকে স্পর্শ করে না, পাঞ্চভৌতিক বিনাশশীল দেহই স্থূল অথবা কৃশ হয়, চিরজীবী আত্মার প্রতি এইরূপ ভাষা সম্পূর্ণ অর্থহীন।" ভরত মহাশয় শিবিকা বহন করিতে করিতে বলিতেছেন,

স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ ক্ষুৎ-তৃট্-ভয়ং কলিঃ ইচ্ছা জরা চ,
নিদ্রা রতিঃ মন্যুঃ অহংমদঃ শুচো দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি ॥
—৫।১০।১০

—স্থূলতা, কৃশতা, শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, ইচ্ছা, বার্দ্ধক্য, নিদ্রা, রতি, ক্রোধ, অহঙ্কার, মত্ততা ও শোক দেহাভিমানী জীবেরই হইয়া থাকে, আমি তো এই সমস্ত কিছুই অনুভব করিতে পারি না।

রাজা রহুগণ ভরত মহাশয়কে "জীবন্মৃত" বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন, ভরত সেই কথার উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন যে, জীবন ও মৃত্যু কথাগুলি দেহের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ; আত্মা জন্মমৃত্যুরহিত, সুতরাং রাজার কথাগুলি ভরত মহাশয়ের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি ঠিক প্রযোজ্য নহে। প্রভু বলিয়া রাজা রহুগণ অহঙ্কার করিয়াছিলেন, সেই কথার উল্লেখ করিয়া ভরত বলিলেন, "কঃ ঈশ্বরস্তত্র কিম্ ঈশিতব্যং"—প্রভুই বা কে, প্রভুত্বই বা কাহার উপর খাটিবে,—উভয়েই কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে, পার্থক্য কিছুই নাই, এবং কর্ম্মফল ক্ষয়শীল বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হইলেও, তাহা অনিত্য, সুতরাং সহজেই বিনাশশীল। অবশেষে রহুগণের দম্ভসূচক শাস্তিপ্রদান করিবার কথাগুলির প্রসঙ্গে ভরত মহাশয় বলিলেন যে, রাজা রহুগণ তো দেখিতেছেন, তাঁহার বাহক উন্মত্ত এবং জড়প্রকৃতিসম্পন্ন। এরূপ লোককে শাস্তির ভয় প্রদর্শন অথবা শাস্তি প্রদান উভয়ই বৃথা—"অর্থঃ কিয়ান্ ভবতা শিক্ষিতেন স্তব্ধপ্রমত্তস্য চ পিণ্ডপেষঃ"—যেমন পিষ্টবস্তুকে পুনরায় পেষণ করা বৃথা, তেমনই জড়বুদ্ধি মানুষকে শাস্তি দিয়া শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টাও নিরর্থক।

পূর্ব্বে শিবিকার ভিতর হইতে একবার নূতন বাহকের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া রাজা তাহাকে স্থূল ও যুবক বলিয়া দেখিয়া লইয়াছিলেন,

এতক্ষণ তাঁহার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে ভরতের প্রতি রাজা রহূগণ বিস্মিত ও কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন নূতন বাহকটি যেন কালো পাথরে কাটা দেবতার মূর্ত্তি, শিবিকাবহনের অপমানকে প্রতিপদে অতিক্রম করিয়া সে চলিয়াছে,—যেমন ছিন্নশিকল পায়ে লইয়া খাঁচায় দীর্ঘকাল আবদ্ধ পাখী অনন্ত আকাশে উড়িয়া যায়। মলিন দেহ ভেদ করিয়া ব্রহ্মজ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, আত্মার সৌন্দর্য্য বাহকের দেহে সুদূরতার সম্মান আনিয়া দিয়াছে! মহারাজ রহূগণ এতক্ষণ ভরত মহাশয়ের কথা শুনিয়া যেন স্তব্ধবৎ বসিয়া ছিলেন। ভরত মহাশয় নীরব হইলে, হঠাৎ রাজার চৈতন্য হইল, "হৃদয়গ্রন্থি বিমোচনং দ্বিজবচঃ আশ্রুত্য বহু যোগগ্রন্থসম্মতং ত্বরয়া অবরুহ্য শিরসা তৎপাদমূলং উপসৃতঃ ক্ষমাপয়ন্ বিগতনৃপদেবস্ময়ঃ উবাচ"—তিনি হৃদয়ের গ্রন্থিনাশক, বহুযোগশাস্ত্রসম্মত দ্বিজবচন শ্রবণ করিয়া দ্রুতগতিতে শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সমস্ত রাজগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ভরত মহাশয়ের পদতলে নিজমস্তক অবনত করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে বলিলেন,—"কে আপনি গুপ্তবেশে বিচরণ করিতেছেন? আমি যাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যাইতেছি, আপনি কি সেই কপিলদেব পথিমধ্যে আসিয়া আমাকে ছলনা করিয়াছেন?" রাজা দীনতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,

বচাংসি যোগগ্রথিতানি সাধো! ন নঃ ক্ষমন্তে
মনসাপিভেত্তু ম্।—৫।১০।১৮

—হে সাধো, আপনার জ্ঞান ও ভক্তিযোগ বিষয়ক কথাগুলি আমি সহজে ধারণা করিতে পারিতেছি না।

কেন পারিতেছেন না, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া রাজা রহূগণ পুনরায় বলিলেন,

যোগেশ্বরাণাং গতিমন্ধবুদ্ধিঃ কথং বিচক্ষীত গৃহানুবন্ধঃ।—৫।১০।১৯

—কি করিয়া আপনাকে চিনিতে অথবা আপনার কথা বুঝিতে পারিব! আমার মত বদ্ধজীবের বুদ্ধি আপনার মত যোগেশ্বরের কথা ও স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ।

এইরূপে আপনার দীনতা ও ধর্ম্ম-পিপাসা প্রকাশ করিয়া রাজা রহুগণ পুনরায় ভরত মহাশয়কে বলিলেন যে, যাহা তিনি শিবিকাতে বসিয়াই শ্রবণ করিয়াছেন, সেই অমৃততুল্য বাক্য তাঁহার সংসার-পিপাসা-নিপীড়িত মনে শান্তি প্রদান করিয়াছে। কিন্তু যোগেশ্বর ব্রাহ্মণের কথাগুলির সমগ্র অর্থ তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই। সন্দেহ তাঁহার অনেক রহিয়াছে, সে সন্দেহ ভঞ্জনের কথা পরে রাজা নিবেদন করিবেন, আপাততঃ যাহা ব্রাহ্মণমহাশয় বলিয়াছেন, তাহা আরও সহজ-ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানাইতেছেন। নীচে উদ্ধৃত রাজা রহুগণের দুইটি শ্লোক ভাগবতে বিখ্যাত—এই শ্লোক দুইটি সাধু এবং তত্ত্বপিপাসু বদ্ধজীবের মধ্যে আদর্শ সম্বন্ধ প্রকাশিত করিতেছে। সাধু দীনবৎসল ও নীরব, ভক্ত ব্যাকুল ও বহুভাষী।

জরাময়ার্ত্তস্য যথাগদং সৎ-নিদাঘদগ্ধস্য যথাহিমাম্ভঃ
কুদেহমানাহি বিদষ্টদৃষ্টেঃ, ব্রহ্মন্, বচস্তেঽমৃতমৌষধং মে ॥
তস্মাদ্ভবন্তং মম সংশয়ার্থং প্রক্ষ্যামি পশ্চাদধুনাসুবোধং
অধ্যাত্মযোগগ্রথিতং তবোক্তং আখ্যাহিকৌতূহলচেতসো মে।

৫।১২।২,৩

—অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্, 'দেহই আমি' এই কুবুদ্ধিরূপ সর্প আমাকে দংশন করিয়াছে, আমি বিবেকদৃষ্টি হারাইয়া ফেলিয়াছি। জ্বর রোগে কাতর ব্যক্তির পক্ষে চিকিৎসকের সুচিন্তিত ঔষধ যেমন অমৃতের মত কার্য্যকরী, প্রখর সূর্য্যতাপে পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে সুশীতল জল যেমন তৃপ্তিপ্রদ, দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন আমার পক্ষে আপনার কথাগুলি ঠিক সেইরূপই শান্তি ও কল্যাণপ্রদ হইয়াছে।

আমার সন্দেহের বিষয় আপনাকে পরে জিজ্ঞাসা করিব। এক্ষণে আপনি যে অধ্যাত্মযোগপূর্ণ দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা যাহাতে আমি সহজে বুঝিতে পারি, সেইরূপভাবে আমাকে বলুন। আপনার কথা শ্রবণ করিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত উৎসুক।

রাজা রহুগণ আজ ব্যাকুল হইয়া ভরত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছেন, শিবিকা দূরে পড়িয়া আছে, বিস্মিত বাহকগণ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রাজাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পদতলে আর্ত্তহৃদয়ে বসিতে দেখিয়া বিস্মিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া তাকাইয়া আছে, ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণ নিস্তরঙ্গ মহাসিন্ধুর মত শান্ত ও গম্ভীর। রাজার প্রাণ ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত, আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিবার জন্য, সাধুর দয়া পাইবার আশায় ভাষা স্রোতের মত প্রবাহিত হইতেছে, শুধু আত্মনিবেদন করিয়াও ভাষা শেষ হইতেছে না,—মহারাজ সর্পদষ্ট হইয়া অন্ধ হইয়াছেন, তাঁ জ্বরে তাঁহার দেহ উত্তপ্ত, প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে তিনি উৎপীড়িত। এইরূপ ভাষাবহুল বিভিন্ন চিত্রের দ্বারা আপনার মনের একই অবস্থা প্রকাশ করিতে রহুগণ সমুৎসুক। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই যে অহঙ্কারপ্রদীপ্ত রাজা নিজের রাজশক্তি ও পাণ্ডিত্যের বড়াই করিয়াছিলেন, আপনাকে যমরাজের মত প্রচণ্ড এবং শাস্তি প্রদানে সমর্থ বলিয়া গৌরব করিতে ছিলেন, দীনহীন বাহকের কয়েকটি কথাতেই সে মিথ্যা অহঙ্কার কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে—এখন তাঁহার ভাষায় আত্মনিবেদন, তাঁহার চক্ষে কাতর দৃষ্টি! অপূর্ব্ব পরশমণি লোহাকে ভাল করিয়া স্পর্শ করিতে না করিতে লোহা সোনা হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

এইবার ব্রাহ্মণ পুনরায় কথা কহিলেন। শ্রীভাগবতে এইস্থলে 'শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ'—ব্রাহ্মণ বলিলেন—এই ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে। রাজা রহুগণের চক্ষে ভরত মহাশয় এখনও যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ মাত্র— তাঁহার সম্যক্ পরিচয় এখনও রাজার অগোচর। ভরত মহাশয় রাজাকে

বলিলেন যে, মানবদেহ পার্থিব উপাদানের বিকারমাত্র, তাঁহার স্কন্ধদেশে অধিষ্ঠিত কাষ্ঠময় শিবিকাও পার্থিব, আবার শিবিকার ভিতর সৌবীররাজ নামে যে দেহ রহিয়াছে এবং যে দেহ "আমি সিন্ধু দেশের রাজা" এইরূপ দুরহঙ্কারে অন্ধ হইয়াছে, তাহাও ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব উপাদানে সংগঠিত। এইস্থানে ব্রাহ্মণ ভরতের ভাষা বড় চমৎকার।

অংসেঽধিদার্ব্বী শিবিকা চ যস্যাং সৌবীররাজেত্যপদেশ আস্তে
যস্মিন্ ভবান্ রূঢ়নিজাভিমানো রাজাস্মি সিন্ধুষ্বিতিদুর্ম্মদান্ধঃ ৫।১২।৬

—এই শ্লোকটির ভিতর কয়েকটি কথা পরিলক্ষণীয়। 'সৌবীররাজঃ ইতি অপদেশঃ'—অর্থাৎ সৌবীররাজ নামে যে একটি দেহ, 'রূঢ়-নিজাভিমানঃ'—অর্থাৎ যে নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধ আত্মা দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছে, 'দুর্ম্মদান্ধঃ'—যিনি উৎকট অহঙ্কারে অন্ধ হইয়াছেন—এই কয়েকটি কথার অপূর্ব্ব সংযোগে মূর্খ, অভিমানী ও বিবেকবুদ্ধি বিহীন রাজাকে ভরত মহাশয় অহঙ্কারের উচ্চ আসন হইতে টানিয়া আনিয়া একেবারে একখণ্ড মাংসপিণ্ডের শ্রেণীভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ভাষার ভিতর আপাতদৃষ্টিতে যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও তিরস্কার নিহিত রহিয়াছে, তাহা রহুগণের চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য দীনবৎসল ভরত মহাশয়ের অসীম দয়া মাত্র। ব্রাহ্মণ ভরত পুনরায় বলিলেন যে, রাজা বলিয়া রহুগণের যে অহঙ্কার রহিয়াছে, অন্য দিক্ দিয়া বিচার করিলেও তাহা সম্পূর্ণ অর্থহীন বলিয়া মনে হইবে। রাজার কার্য্য করিলে হয়ত রাজ্যা-ভিমানী রহুগণের অহঙ্কার অন্ততঃ মানুষের চক্ষে কতকটা সমীচীন হইত, কিন্তু সেদিক দিয়াও রহুগণ কর্ত্তব্য পালন হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন।

শোচ্যান্ ইমাংস্ত্বং হ্যধিকষ্টদীনান্ বিষ্ট্যানিগৃহ্নন্ নিরনুগ্রহোঽসি,
জনস্য গোপ্তাস্মি বিকত্থমানো ন শোভসে বৃদ্ধসভাসু ধৃষ্টঃ। ৫।১২।৭

—অর্থাৎ এই বাহকগণ বহুক্ষণ শিবিকাবহন করিয়া অত্যন্ত কাতর ও শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—রাজা হইয়াও আশ্রিত প্রজার প্রতি

আপনার মনে কোনও দয়ার উদ্রেক হয় নাই। ইহারা স্বেচ্ছায় ভার বহন করিতে আসে নাই, আপনি বলপূর্ব্বক ইহাদিগকে অনিচ্ছায় গুরুভার বহনে নিযুক্ত করিয়া নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন অথচ প্রজাপালক বলিয়া আত্মশ্লাঘা আপনার যথেষ্টই আছে অতএব আপনি নির্লজ্জ, জ্ঞানীগণের সভায় আপনার কোনও সমাদর নাই।

এই তীব্র ভাষা যেন রাজার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান যুগের কোনও নির্য্যাতিত শ্রমিকসঙ্ঘের গুরুতর অভিযোগ। এই একটি শ্লোকের ভিতর দিয়াই রাজা রহুগণের দোষত্রুটি বিশ্লেষণ করিয়া অপর দেশের রাজগণকে কে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রজার উপর অত্যাচার করিলে কেবলমাত্র যে ধর্ম্মের চক্ষেই পতিত হইতে হয় তাহা নহে, মানুষের সভাতেও সেই রাজার কোনও সমাদর নাই। 'বিষ্টি' অর্থাৎ বলপূর্ব্বক, 'নিগৃহ্নন্' অর্থাৎ অত্যাচার করিয়া, 'নিরনুগ্রহঃ' অর্থাৎ নিষ্ঠুর, 'বিকত্থমানঃ' অর্থাৎ রাজা বলিয়া আত্মশ্লাঘাকারী, 'ধৃষ্টঃ' অর্থাৎ নির্লজ্জ—এই সমস্ত কথাগুলি প্রত্যেকটি কঠোর নিন্দাসূচক ভাষা, সব কথাগুলি একত্র হইয়া রাজা রহুগণের রাজ্যশাসন কার্য্যের উপর এক তীব্র নিন্দা ও অভিযোগ আনয়ন করিতেছে, সুস্পষ্ট নিন্দাসূচক কথাগুলির সংঘাতে তাঁহার (রাজার) আত্মাভিমান ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, ধর্ম্মের বাণী গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় স্বচ্ছ ও পবিত্র হইতেছে। তিনি সমস্ত অপরাধ নীরবে স্বীকার করিয়া অধোবদনে বসিয়া আছেন। বিকারগ্রস্ত উচ্ছৃঙ্খল রোগী এখন শান্ত ও সচেতন হইয়া চিকিৎসকপ্রদত্ত তিক্ত ঔষধ আগ্রহের সহিত সেবন করিতেছে।

এইরূপে যখন রহুগণের হৃদয় আত্মাভিমানরূপ মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন ভরত মহাশয় কৃপা করিয়া ভগবানের স্বরূপ রহুগণের নিকট প্রকাশিত করিতেছেন।

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকং অনন্তরন্ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্,

প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবংকবয়োবদন্তি। ৫।১২।১১

—অর্থাৎ যাঁহাকে জ্ঞানীগণ বাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তন করেন তিনিই বেদে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া পরিচিত; তিনি এক এবং অদ্বিতীয় ভগবান্, তিনি সকলের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজিত, তিনি সত্যস্বরূপ, জীব তাঁহা হইতেই পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

এইরূপে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার একমাত্র উপায় বলিয়া দিতেছেন,

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাৎ গৃহাদ্বা,

ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ বিনা মহৎ পাদরজোঽভিষেকম্॥

৫।১২।১২

—হে রহূগণ, বেদে উক্ত সেই ব্রহ্মকে, ভক্তবৎসল সেই বাসুদেবকে তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অন্নদানের দ্বারা অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বেদ পাঠ করিলেও হয় না, জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনা করিলেও সেই বাসুদেবকে হৃদয়ে অনুভব করা যায় না। তবে কিরূপে তাঁহাকে জানা যায়?—মহাপুরুষগণের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলে, সাধুকৃপায় ভগবৎ-ভক্তি লাভ হইতে পারে।

এই বিখ্যাত শ্লোকটির নিগূঢ় অর্থব্যঞ্জনা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভরত মহাশয় রাজা রহূগণকে এই প্রথম "রহূগণ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া রাজা ও সাধুর মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল, এতক্ষণ ভরত মহাশয় রহূগণকে 'রাজন্' বলিয়াই সম্বোধন করিতেছিলেন। এই 'রাজন্' শব্দটি উভয়ের মধ্যে দূরত্ব রক্ষা করিতেছিল, ভরত মহাশয় যেন শিষ্টাচারের আশ্রয়

লইয়া রহুগণকে এতক্ষণ দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এখন তাঁহাকে 'রহুগণ' নাম ধরিয়া সম্বোধন করাতে বুঝা যাইল যে, রহুগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার আত্মনিবেদন সাধুর মনে দয়ার উদ্রেক করিয়াছে, ভরত মহাশয় যেন রহুগণকে কাছে টানিয়া বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। এই শিষ্টাচারবর্জ্জিত, অশেষ স্নেহসূচক রাজা-উপাধি-বিহীন 'রহুগণ' নামটি মাত্র ব্যবহার করিয়া ভরত মহাশয় রহুগণের প্রতি অশেষ কৃপা প্রদর্শন করিলেন। রাজা রহুগণ গৃহীলোক, অজস্র দাসদাসী তাঁহার আদেশ পালন করিতে উন্মুখ, তিনি শাস্ত্রজ্ঞানে পণ্ডিত, সুতরাং তাঁহার মনের কোণে কোথাও হয় ত আশা প্রচ্ছন্ন ছিল যে অন্নদান, যজ্ঞসম্পাদন, অথবা বেদপাঠ করিলেই তিনি অনায়াসে ভগবৎ-প্রসাদ প্রাপ্ত হইবেন। ভরত মহাশয় তাঁহার এই ভ্রান্তি দূর করিয়া দিলেন। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একদিন অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া ঠিক এই কথাই শুনাইয়াছিলেন।—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহং এবংবিধোঽর্জ্জুন,
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুংচ পরন্তপ॥

—অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলে তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, গো-সুবর্ণাদি দান অথবা যজ্ঞ সম্পাদনের দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না।

অনন্যা ভক্তির দ্বারা আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করিতে, এবং আমাতে প্রবেশরূপ মোক্ষলাভ করিতে ভক্ত সমর্থ হয়—অন্য কোনও উপায়ে নহে। যে ভক্তি লাভ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা সতত ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুরই উপলব্ধি হয় না, তাহাই অনন্যা ভক্তি।

রহূগণের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিয়াছিল, যজ্ঞ, দান, বেদপাঠের দ্বারা যদি ভগবৎ-দর্শন না হয় তবে কি করিয়া ভগবৎ-দর্শন হইবে? অন্তর্য্যামী ভরত তাহার উত্তর দিতেছেন—"বিনা মহৎপাদরজোঽ-ভিষেকম্"—মহতের কৃপা ব্যতীত ভগবৎ-কৃপালাভ সম্ভবপর নহে। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, "সাধুকৃপাবাহনা ভগবৎ-কৃপা"—অর্থাৎ সাধুর কৃপাকে অবলম্বন করিয়া তবে ভগবৎ-কৃপা আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগৌরাঙ্গ এই এক কথাই বলিয়াছেন ঃ

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন্ ভাগ্যবান্ জীব
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥

—ভক্তিলতাবীজ সাধনভজন সাপেক্ষ নহে, শাস্ত্রপাঠ হইতেও আসে না, একমাত্র কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণরূপী গুরুর দয়ায় এই ভক্তিবীজ-প্রাপ্তি মানব-জীবনে সম্ভবপর হইয়া থাকে। ধর্ম্মজীবনে সাধুকৃপার এত প্রয়োজন!

ভরত মহাশয় 'মহৎপাদরজোঽভিষেকম্' এই সন্ধান প্রদান করিয়া আপনার কৃপাতে আপনি ভক্ত রহূগণের নিকট ধরা পড়িয়াছেন। বহু পূর্ব্বেই শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া রহূগণ মহতের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, এখনও মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে কৃপামূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান। যে তিনটি বস্তু জীবের পক্ষে দুর্ল্লভ, সেই 'মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষুত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ'—মনুষ্যজীবন, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং মহাপুরুষের আশ্রয় —তিনটিই রহূগণের ভাগ্যে উপস্থিত হইয়াছে। মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ হইতে কিরূপে ভগবৎভক্তি মানবহৃদয়ে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়, তাহা এইবার ভরত মহাশয় বর্ণনা করিতেছেন ঃ

যত্রোত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ,
নিষেব্যমানোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥
৫।১২।১৩

—অর্থাৎ যে সাধুর মুখে "গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ" গ্রাম্য কথাবার্ত্তা স্থান পায় না, যিনি পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের লীলাকথা অনুক্ষণ স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনিই মহাপুরুষ। এই মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিলে অহরহ ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করিতে করিতে বাসুদেবের প্রতি মুমুক্ষু ব্যক্তির শ্রদ্ধা ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতনকে উপদেশ দিবার সময় ধর্ম্মলাভের এই সহজ উপায়ই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্যকথা না কহিবে ॥

এই 'গ্রাম্যকথা' কি? শ্রীধর স্বামী মহাশয় ইহার টীকা করিয়া বলিয়াছেন—যেষু মহৎসু গ্রাম্যাণাং যা কথা শিশ্নোদরনিমিত্তা বার্ত্তা তস্যা বিঘাতো যস্মাৎ সঃ উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে—অর্থাৎ মহৎ-লোকের মধ্যে শিশ্নোদর নিমিত্ত কথাবার্ত্তা হয় না, কেবলমাত্র ভগবানের গুণগান হইয়া থাকে। সাধারণ বিষয়ী লোক শিশ্নোদরপরায়ণ, সর্ব্বদা সেই চিন্তাই করে; সুতরাং তাহারা একত্র হইলেই সেই বিষয়-ভোগ বিজড়িত কথাবার্ত্তাই হইয়া থাকে। কিন্তু—

শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।

বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে কাশীতে যাইয়া সেই মহাতীর্থস্থানেও বিষয় সম্পত্তি, মামলামকর্দ্দমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, "মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুরই ওঠে"—বিষয়ী লোক সর্ব্বদাই বিষয় ভোগ করে বলিয়া সমস্ত দিন, স্থান কাল নির্ব্বিশেষে তাহাদের বিষয়-গন্ধসূচক উদ্গার হইয়া থাকে। ইহাই গ্রাম্য কথা, ইহার সঙ্গে লীলাকথা একত্র থাকিতে পারে না, সুতরাং "উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ"—পবিত্র কীর্ত্তি ভগবানের লীলা-কথা এবং "গ্রাম্য কথাবিঘাতঃ"—গ্রাম্য কথার 'পরিহার—একসঙ্গেই হইয়া যায়। অবিরত যাহারা বিষয়চিন্তা করে, তাহাদের মনে কৃষ্ণকথার

ছোপ ধরে না, আবার কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে বিষয়কথা আলুনি হইয়া আসে। উভয়রূপ চিন্তার মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ।

রহুগণ এই সমস্ত কথা শুনিয়া কৃতার্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার একটা কৌতূহল এখনও রহিয়া গিয়াছে—কে এই মহাপুরুষ, যিনি মলিন বস্ত্র ও মলিন উপবীত ধারণ করিয়া আজ শাস্ত্রের মহৎ তত্ত্বগুলি এরূপ অনায়াসে সহজবোধ্যরূপে রহুগণের নিকট প্রকাশ করিতেছেন? রহুগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন "অধুনা সুবোধং আখ্যাহি"—সহজ করিয়া বলুন, আমার ভজন সাধন নাই, আমি শাস্ত্রের নিগূঢ় কথা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না—সেই কথার উত্তরে অতি সহজ ও সরলভাবে শাস্ত্র ও সাধুসম্মত ধর্ম্মপথের উপায় ব্রাহ্মণ মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু শুধু বর্ণাশ্রমধর্ম্মী মানুষ কখনও এত সহজরূপে ধর্ম্মের জটিল কথা প্রকাশ করিতে পারে না, ইহা একমাত্র অনুভূতিসম্পন্ন সাধু মহাত্মাদের পক্ষেই সম্ভবপর। অন্তর্যামী ভরত মহাশয় রহুগণের সেই কৌতূহল জানিতে পারিয়াছেন, তাই ভক্তবৎসল ব্রাহ্মণ বলিলেন,

অহং পুরা ভরতো নাম রাজা বিমুক্তদৃষ্টশ্রুতসঙ্গবন্ধঃ
আরাধনং ভগবত ঈহমানো মৃগোঽভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ ॥
স মাং স্মৃতির্ম্মৃগদেহেঽপি বীর! কৃষ্ণার্চ্চনপ্রভবা নো জহাতি,
অথো অহং জনসঙ্গাদসঙ্গো বিশঙ্কমানোঽবিবৃতশ্চরামি ॥

৫।১২।১৪,১৫

—অর্থাৎ আমি পূর্ব্ব এক জন্মে ভরত নামে রাজা ছিলাম। তখন সর্ব্বপ্রকার মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া ভগবানের আরাধনা করিতে থাকিলেও একটি মৃগের সঙ্গবশতঃ তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মৃগজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

হে বীর, আমি যে পূর্ব্বজন্মে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছিলাম তাহার ফলে পূর্ব্বজন্মবিষয়ক স্মৃতি মৃগদেহেও পরিত্যাগ করে নাই। মৃগজন্মের

পর আবার এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, বিষয়ী লোকের সঙ্গ হইতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে—এই আশঙ্কায় নিঃসঙ্গ ও পরিচয়বিহীন হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছি।

এই শ্লোক দুইটির ভিতর দিয়া দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হইল। প্রথমতঃ, রহূগণের কৌতূহল নিবৃত্ত হইল, তিনি বুঝিলেন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান মহাপুরুষ কে। দ্বিতীয়তঃ, ভরত মহাশয় যেন রাজা রহূগণের সমস্ত গর্ব্ব ও ভবিষ্যতে পুনরায় বিষয়াসক্ত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা দূর করিবার জন্য বলিলেন যে, রহূগণ ক্ষুদ্র সিন্ধু ও সৌবীর দেশের অধিপতি হইয়া মদগর্ব্বে অভিভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু "অহং পুরা ভরতো নাম রাজা"—এই ব্রাহ্মণ এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন, অথচ সসাগরা ধরিত্রীর সেই ভোগসুখ তিনি জীর্ণ পত্রের মত একদিন পরিত্যাগ করিয়া দীন হীন বেশে বনে আসিয়া ভগবৎ-চিন্তনে কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিষয়সুখ এতই তুচ্ছ! কিন্তু এইরূপে কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াও তাঁহার নিষ্কৃতি হয় নাই,—কোন্ এক সামান্য ছিদ্রপথ দিয়া মায়া তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জন্মজন্মান্তর ভ্রমণ করাইতেছে। সুতরাং রহূগণ সতর্ক হউন, সামান্য একটু সিন্ধু ও সৌবীর দেশের জমিদার হইয়াই মদান্ধ হওয়া উচিত নহে এবং যদি এখন ভরত মহাশয়ের কথা শুনিয়া রহূগণের হৃদয়ে বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাতেও রাজার আত্ম-প্রসাদের কোনও কারণ নাই। অহরহ শ্রীহরি স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিতে হইবে, একটু অসাবধান হইলেই কোন্ ছিদ্রপথে কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া মহামায়া পুনরায় রহূগণকে জীবনমৃত্যুর অধীন করিবেন, তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। মহাভাগবত ভরত মহাশয় যখন মৃগশিশুরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন তখন অন্যাপরে কা কথা!

ভরত মহাশয় নিবৃত্ত হইলে, রাজা রহূগণ উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিলেন, "অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং"—সকল জন্মের মধ্যে,—এমন কি দেবজন্ম

অপেক্ষাও মনুষ্যজন্ম উৎকৃষ্ট, কারণ মনুষ্যদেহ ভজন সাধনের উপযোগী এবং মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া সাধুগণ বিচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক সময় সাধুকে চিনিতে পারা যায় না,—যেমন ভরত মহাশয়কে রাজা রহুগণ পূর্ব্বে চিনিতে পারেন নাই। মহাজনগণ অনেক ভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন, অতএব রহুগণ বলিলেন,

নমো মহদ্ভ্যোঽস্তু নমঃ শিশুভ্যো নমো যুবভ্যো নম আবটুভ্যঃ,
যে ব্রাহ্মণা গামবধূতলিঙ্গাশ্চরন্তি তেভ্যঃশিবমস্তু রাজ্ঞাম্ ॥

৫।১৩।২৩

—বৃদ্ধগণকে নমস্কার, শিশুগণকে নমস্কার, যুবকগণ ও ব্রাহ্মণ বালকগণকে নমস্কার। যে-সকল ব্রাহ্মণ অবধূত বেশে এই ক্ষিতিতলে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে পৃথিবীর রাজগণের কল্যাণ হউক।

আজ রহুগণের নিজের আচরণে অন্যান্য রাজগণের দুর্ভাগ্যের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং তিনি বিশেষ করিয়া তাঁহার মত বদ্ধজীব রাজগণের কল্যাণ কামনা করিতেছেন।

অতঃপর ভরত মহাশয় সংসাররূপ অরণ্যের এক বিশদ বর্ণনা করিয়া তাহার ব্যাখ্যা রহুগণকে শ্রবণ করাইলেন এবং উভয়ে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন।

শ্রীশুকদেব দ্বিতীয় দিবসে শ্রীভাগবতের এই পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীশুকদেব এইরূপে মহারাজ পরীক্ষিৎকে ভরত-উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া, তাঁহাকে তাঁহার আসন্ন মৃত্যুকালে সাবধান করিয়া দিলেন। রাজা রহুগণ রাজপদে আরূঢ় হইয়া মদোন্মত্ত অবস্থায় মহতের অবমাননা করিয়া ইহজীবন ও পরজীবন হারাইতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে অনুশোচনার দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া মহতের দয়াপ্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ

হইয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎও রহুগণের মত অপরাধী, অনুশোচনশীল এবং অবশেষে মহাভাগবত শুকদেবের কৃপাপ্রাপ্ত। সুতরাং তাঁহার বিনাশ নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু সমাগত, এই সময়ে তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চিন্তায় দেহত্যাগ করিতে পারিলেই পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন। যদি চিরদিনের অভ্যাসবশতঃ মৃত্যুকালে ভরতের মত বিষয় চিন্তা করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। এইরূপে ভরত-উপাখ্যানের ভিতর দিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎকে সাবধান অথচ অভয়-প্রদান করিয়া শ্রীশুকদেব বিষয়ান্তরের অবতারণা করিলেন।

———

ষষ্ঠ স্কন্ধ

(১)

অজামিলের উপাখ্যান

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বলিলেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে নিবৃত্তিমার্গ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পরীক্ষিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, সাংসারিক স্বভাবসম্পন্ন জীবের জন্মমরণ প্রবাহ যাহা হইতে চলিতে থাকে সেই প্রবৃত্তিলক্ষণযুক্ত ধর্ম্মও শ্রীশুকদেব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ ভাগে শ্রীশুকদেব নানাবিধ দুঃসহ যাতনাপূর্ণ নরক-সমূহের বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করিয়া পরীক্ষিৎ বলিলেন, যে উপায়ে মানবগণ নরকযন্ত্রণা ভোগ হইতে রক্ষা পাইতে পারে সেই উপায় শুনিবার জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ আগ্রহশীল। একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হইয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন, তখন হয়ত কত অন্যায়, ভোগবিলাস ও অত্যাচার করিয়াছেন, আজ শ্রীশুকদেবের কথা শুনিয়া নরকযন্ত্রণার বিভীষিকা তাঁহার মনকে অধিকার করিয়াছে, তাই মৃত্যুকালে নরকযন্ত্রণা এড়াইবার উপায় শ্রবণ করিতে পরীক্ষিৎ এতই উৎসুক! শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের মর্ম্মকথা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,

নচেদিহৈবাপচিতিং যথাংহসঃ কৃতস্য
কূর্য্যাৎ মন-উক্তি পাণিভিঃ
ধ্রুবং স বৈ প্রেত্য নরকানুপৈতি যে কীর্ত্তিতা
মে ভবতস্তিগ্মযাতনাঃ। ৬।১।৭

—অর্থাৎ মানুষ মন, বাক্য, ও শরীরের দ্বারা পাপাচরণ করিয়া যদি ইহলোকেই তাহার যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহা হইলে

আপনার নিকট যে সমস্ত তীব্র যাতনাময় নরকের কথা বলিয়াছি, সে সমস্ত নরক ভোগ ঐ সকল পাপাচারী মানুষের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী।

অতএব যেমন 'ভিষক্ চিকিৎসেত রুজাং নিদানবিৎ'—অর্থাৎ চিকিৎসক যেমন রোগের ঔষধ সময়মত প্রদান করেন—সেইরূপ ইহজীবনে পূর্ব্ব হইতেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সংসারী মানুষের নরকগমন হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করা উচিত। প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের মনে নানাবিধ সংশয় উপস্থিত হইল। তিনি অভিজ্ঞ গৃহী, সুতরাং জানেন যে প্রায়শ্চিত্ত করা মানুষের একটা লোক-দেখান ধর্ম্মমাত্র, কারণ, প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও লোকে প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই পাপকার্য্যই জীবনে করিয়া থাকে। এই সংশয় দূর করিবার জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বলিলেন,

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্ ॥
ক্বচিৎ নিবর্ত্ততে ভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ
প্রায়শ্চিত্ত মথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ৬।১।৯,১০

—অর্থাৎ পাপের ফলে রাজদণ্ড হইতে দেখা যায়, নরকগমনও হয় ইহা শুনা যায়, অথচ পাপ অনিষ্টজনক জানিয়াও কামাদি রিপুর অধীন হইয়া মানুষ পুনরায় পাপকার্য্য করিয়া থাকে। অতএব প্রায়শ্চিত্তও নিষ্পাপত্বের কারণ হইতে পারে না। মানুষ কখন কখন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু সেই মানুষই আবার তদ্রূপ পাপাচরণ করিয়া থাকে। অতএব, হস্তী স্নান করিয়া যেমন আবার ধূলির দ্বারা দেহকে মলিন করিয়া স্নানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেয়, সেইরূপ মানুষের মনের ভিতর পাপ-বীজ লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার সকল প্রায়শ্চিত্তকে ব্যর্থ করিয়া ফেলে।

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, পরীক্ষিৎ যাহা সন্দেহ করিয়াছেন তাহা বহুলাংশে সত্য ; তবে পাপক্ষয় এবং নরক নিবারণের অন্য অব্যর্থ উপায়ও আছে। পাপের বীজ বাসনা, বাসনার বীজ অবিদ্যা। প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্মের দ্বারা পাপকর্ম্মের আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, কারণ কর্ম্মের অধিকারী জীব বাসনা-প্রপীড়িত এবং দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন। তথাপি প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ নিরর্থক নহে। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপের আত্যন্তিক বিনাশ না হইলেও আপাততঃ উপশম হইয়া থাকে। মানুষ লক্ষ লক্ষ জন্মের ভিতর দিয়া যে পাপস্রোত ইহজীবনে টানিয়া আনিয়াছে সেই পুঞ্জীভূত পাপরাশিকে শাস্ত্র দূরত্ব ভেদে চারিটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন,—অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ ও প্রারব্ধ পাপ। যে পাপ এখনও ফলোন্মুখ নহে, এখনও কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই—তাহা "অপ্রারব্ধ পাপ" ; যে পাপ বীজ-উন্মুখ, তাহা "কূট" পাপ ; যে পাপ প্রারব্ধ-উন্মুখ, তাহা "বীজ" পাপ এবং যে পাপের ফলে মানুষ আধি-ব্যাধি যুক্ত বর্ত্তমান দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই "প্রারব্ধ" পাপ।

জ্ঞানীগণ বলেন যে, জ্ঞান ও সাধনার দ্বারা অপ্রারব্ধ, কূট ও বীজ পাপ নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারা যায় কিন্তু প্রারব্ধ পাপ অর্থাৎ যে পাপ পরিপক্ক হইয়া জীবের বর্ত্তমান দেহ সৃষ্টি করিয়াছে সেই প্রারব্ধ পাপ কোনও সাধন ভজনই বিনষ্ট করিতে পারে না, সেই প্রারব্ধ পাপের ফল ইহদেহে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ইহজীবনে ইহদেহে কৃত পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায় ; সুতরাং পরজন্মে আর ইহজন্মের পাপের বকেয়া টানিতে হয় না। প্রায়শ্চিত্তের অন্য উপকারও আছে। মানুষের জীবিত অথবা মৃত দেহ যতক্ষণ অগ্নির দ্বারা পরিশুদ্ধ না হয় ততক্ষণ ইহদেহে কৃত পাপরাশি দেহকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। সেই দেহ স্পর্শ করিলে পাপকলুষিত দেহস্পর্শের ফলে মানুষের মনে পাপের বাসনা সূক্ষ্মভাবে সংক্রমিত হইয়া যায়।

সেইজন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত করিলে দুর্ব্বল মন আর নূত পাপসঙ্কল্প করিতে পারে না, মৃত্যুর পর প্রায়শ্চিত্ত করিলে মৃতদেহ শু দগ্ধের ন্যায় পরিশুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং মৃতদেহ-স্পর্শকারীকে কলুষি করিতে পারে না। তাই মৃত্যুর পূর্ব্বে, অন্যথায় মৃত্যুর পরে প্রায়শ্চি করার বিধান আছে। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত সমগ্র পাপরাশিকে নৌ করিতে না পারিলেও কিয়ৎ পরিমাণে পাপের উপশম করিয়া থাকে।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত জন্মজন্মান্তরের পাপক্ষ করিতে পারে না, অতএব জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ আত্মা, অনাত্ম ও পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে দেহাত্মাভিমান থাকে না, সুতরাং পাপের মূল বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান লাভ সুদুষ্কর, তাই শ্রীশুকদে জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি নষ্ট করিবার জন্য অন্য উপায় নির্দে করিলেন।

> তপসা ব্রহ্মচর্য্যেন শমেন চ দমেন চ,
> ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা ॥
> দেহবাগ্‌ বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
> ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ ॥ ৬।১।১৩,১৪

—অর্থাৎ অগ্নি যেমন বাঁশঝাড়কে সমূলে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ ধী ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তপস্যা অর্থাৎ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি ব্রত, ব্রহ্মচর্য মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, সত্য, গঙ্গাস্নানাদি শৌচ, অহিংসাদি যম এবং জপাদি নিয়মের দ্বারা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক গুরুত পাপকেও দূর করিয়া থাকেন।

কিন্তু জ্ঞানদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সাধন যেমন কঠিন, পূর্ব্বোক্ত ব্রত নিয়মাদির দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত প্রায় সেইরূপই কঠিন। সহজ উপায় কি। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ
অঘংধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ।
ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্, পূয়েত তপ-আদিভিঃ,
যথা কৃষ্ণার্পিত-প্রাণঃ তৎপুরুষ নিষেবয়া॥ ৬।১।১৫,১৬

—হে রাজন্, প্রচণ্ড সূর্য্য যেমন শিশিরবিন্দুকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে, সেইরূপ বাসুদেবপরায়ণ ভক্তগণ পূর্ব্বোক্ত তপস্যাদি অবলম্বন না করিয়া কেবল ভক্তির দ্বারাই সমুদয় পাপরাশি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া থাকেন।

পাপীপুরুষগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ সমর্পণ করিয়া যেরূপ পবিত্র হইয়া থাকেন, তপস্যাদির দ্বারা সেইরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে।

এই শ্লোকের টীকা করিয়া শ্রীধর স্বামীমহাশয় জ্ঞান ও তপস্যা উভয়েরই দুষ্করতা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন,—"ভগবান্ বাদরায়ণিঃ সুদৃঢ়ং সর্ব্বপুরুষার্থদং সর্ব্বসাধনাঙ্গীভূতং সর্ব্বশাস্ত্রসারং সর্ব্বদুরিতঘ্নং শ্রীকৃষ্ণভজনমাহ"—অর্থাৎ ভগবান্ বাদরায়ণি সুদৃঢ় অর্থাৎ যাহা কখনও বিফল হয় না, সকল কামনাবাসনার সিদ্ধিপ্রদ, সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা, সকল শাস্ত্রের সারমর্ম্ম, সর্ব্বপাপবিনাশকারী সেই শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা বলিতেছেন।

শ্রীপদ্মপুরাণেও সেই একই কথা বলা হইয়াছে।

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং, বীজং ফলোন্মুখম্,
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥

—অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ ও প্রারব্ধ পাপ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ লোকের নষ্ট হইয়া যায়।

অতএব শ্রীকৃষ্ণভজনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত; কারণ, শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতীত মানুষ সহস্র প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ হইতে পারে না।

সহজে বুঝিতে পারিবার জন্য শ্রীশুকদেব উদাহরণ দিয়া বলিলেন যে, ঢাকনীর দ্বারা বন্ধ মদের কলসীকে গঙ্গাজলে সহস্র বৎসর ডুবাইয়া রাখিলেও যেমন সেই সুরাকুম্ভ পবিত্র হয় না, সেইরূপ কামনা বাসনা অবিদ্যা পরিপূর্ণ বদ্ধজীবকে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শোধন করিতে পারে না। অথচ মৃত্যুকালে একবারমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নামস্মরণ করিয়া মহাপাপী কিরূপে যমদূত-বন্ধন ও তাড়না হইতে রক্ষা পাইয়াছিল সেই "ইতিহাসং পুরাতনম্"—পুরাতন ইতিহাস শুকদেব বর্ণনা করিতেছেন :

কান্যকুব্জে দ্বিজঃ কশ্চিৎ দাসীপতিরজামিলঃ,
নাম্না নষ্টসদাচারো দাস্যাঃ সংসর্গদূষিতঃ ॥ ৬।১।২১

—কান্যকুব্জ দেশে অজামিল নামে একজন দাসীপতি ব্রাহ্মণ বাস করিত, দাসীর সংসর্গে তাহার সমুদয় সদাচার বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই অজামিল জুয়াখেলা, অপরকে বঞ্চনা ও চুরির দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া সেই দাসী ও তাহার দশটি পুত্রকে ভরণপোষণ করিত। এইরূপে তাহার জীবনের অষ্ট-আশী বৎসর অতিবাহিত হইল। এই ব্রাহ্মণাধমের দীর্ঘ আয়ু বিড়ম্বনামাত্র হইয়াছিল, ভগবৎ-চিন্তন বিহীন পশুজীবন যাপন করিতে করিতে তাহার পাপভার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। দাসীর গর্ভজাত তাহার দশটি পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ "নারায়ণ" নামক বালকটিই পিতামাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং মোহাচ্ছন্ন সাধারণ গৃহীমানুষের জীবনে যাহা সচরাচর পরিদৃষ্ট হয়—সেই স্নেহের বন্ধনে অজামিল দিন দিন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া মানবজীবনের উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া জড়ের ন্যায় দিন যাপন করিতেছিল। একে বৃদ্ধবয়সের পুত্র, উপরন্তু মোহগ্রস্ত ভগবৎ-স্মরণ বিহীন বদ্ধজীব, সুতরাং জরা ও বার্দ্ধক্য বশতঃ মনের শক্তি হারাইয়া, ব্রাহ্মণ-জন্মের স্মৃতিভ্রংশ হইয়া সংপথে ফিরিয়া আসিবার সঙ্কল্পও কখনও তাহার মনে উদিত হইত না। সাধারণ গৃহী মানুষের অপূর্ব্ব চিত্র ;—দীর্ঘজীবন অভিশাপমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে,

মৃত্যু অতি নিকটে আগত, তথাপি চৈতন্যের উদয় হইতেছে না! বালক নারায়ণ আধ আধ ভাষায় কথা বলিতে বলিতে গৃহ-প্রাঙ্গণে খেলা করে, বৃদ্ধ অজামিল তাহা বসিয়া বসিয়া দেখে ও আনন্দ পায়; আপনার আহারের সময় অজামিল পুত্রকে কাছে ডাকিয়া বসায়, একপাত্রে তাহার সহিত আহার করিয়া তাহার মুখে অন্নব্যঞ্জন তুলিয়া দিয়া, দুগ্ধপানের কিঞ্চিৎ অবশিষ্টাংশ বালককে পান করাইয়া পরম আনন্দ অনুভব করে।

অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত। মৃত্যুকালে সাধারণ বদ্ধজীবের অবস্থা ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

আগে তাই সকলের সব সেবা প্রভু,
শেষ করে দিতে দিতে কেটে যায় কাল,
শূন্য পড়ে থাকে হায় তব পূজা-থাল॥

—অজামিলেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে। সে উপপত্নী দাসীর সেবা করিয়াছে, দশ পুত্রের সেবা—বিশেষ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের সেবা করিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের সেবা, কুপথগামী মনের সেবা করিতে করিতে আজ সে অষ্ট-আশী বৎসর বয়সে উপনীত,—ব্রাহ্মণপুত্র বক্ষোমাঝে যে পূজার থালি লইয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিবার জন্য ইহজগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই পূজার থালিতে আজ অষ্ট-আশী বৎসরের মধ্যে একটি ফুল, একবিন্দু চন্দনও সংগৃহীত হয় নাই। মৃত্যুর সময়ে দেখা যাইতেছে সকলের সব সেবা করিতে করিতে তাহার সর্ব্বস্ব হারাইয়া গিয়াছে, পরমাত্মার পূজার জন্য একটি কড়িও সে সঞ্চয় করিতে পারে নাই। সাধারণ গৃহীর চিত্র—উপপত্নীর স্থানে উপভোগ-পত্নী—ইহাই একমাত্র প্রভেদ, কিন্তু শতবর্ষ আয়ুর পর সম্মুখে যে অনন্ত জীবন বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে সে জীবনের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি,—সে জীবনের জন্য কোনও পাথেয় সংগ্রহ করি নাই, ইহজীবনের শতবর্ষই আমাদের নিকট পরম সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সেবা তো আছেই,

আবার কেহ-বা আপিসের সেবা, কেহ বা স্কুল-কলেজের সেবা, বিচারালয়ের সেবা, অথবা বাণিজ্য-মন্দিরের সেবা করিতেছি, জনসেবার নামে আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছি—এই সেবার সময় সত্য মিথ্যার প্রভেদ ভুলিয়া যাইতেছি, ইহজীবনের কার্য্যের দ্বারা চিরজীবনের বিচারকের অস্তিত্ব প্রতিমুহূর্ত্তে অস্বীকার করিতেছি।

কবির ভাষায় প্রতি মানবের জীবনে

আগে তাই সকলের সব সেবা প্রভু,
শেষ করে দিতে দিতে কেটে যায় কাল,
শূন্য পড়ে থাকে হায় তব পূজা-থাল ॥

কে পুত্র নারায়ণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, কে পিতার মত স্নেহ করিবে, কি করিয়া সে মানুষ হইবে, এই সব কথা বৃদ্ধ অজামিল মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতেছে। পুত্র নারায়ণ কিন্তু মৃত্যু-পথযাত্রী পিতার প্রতি উদাসীন, দূরে সঙ্গী-পরিবেষ্টিত হইয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। বৃদ্ধ পিতা পুত্র নারায়ণের চিন্তায় নিমগ্ন, বালক পুত্রের নিকট বৃদ্ধ ও অক্ষম পিতা অপেক্ষা ক্রীড়াই অধিকতর সত্য ও আনন্দ-দায়ক। হঠাৎ অজামিল দেখিল, পাশহস্তে অতি ভীষণ তিনটি যমদূত তাহার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যমদূতগুলির বক্র ভীষণ মুখ, এবং ঊর্দ্ধগামী রোমসমূহ দর্শন করিয়া অজামিল ভীত হইয়া অভ্যাসবশতঃ "নারায়ণ" "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিয়া বালক পুত্রকে কাছে ডাকিতে লাগিল। কোথায় তাহার নারায়ণ! সে'তো দূরে খেলা করিতেছে, হয়তো বৃদ্ধের কথা তাহার কর্ণগোচর হয় নাই, হইলেও বৃদ্ধ পিতার আহ্বান গ্রাহ্য করিবার মত তাহার কোন আগ্রহও নাই। ভয়ে মৃত্যু-কবলিত ব্রাহ্মণের প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছে, চোখের কোণে জল দেখা দিয়াছে, অষ্ট-আশী বৎসরের মোহগ্রস্ত মনের উপর দিয়া পুঞ্জীভূত জুয়াখেলা, বঞ্চনা ও চুরির স্মৃতি বিদ্যুতের মত খেলিয়া

যাইতেছে; আশার রেখামাত্র নাই, বৃদ্ধের অন্তরে ও বাহিরে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আসিতেছে। ক্ষীণ কণ্ঠে ভয়ে ভয়ে 'নারায়ণ' ডাক উঠিতেছে;—তাহার পুত্র নারায়ণ আসিল না, কিন্তু বিশ্বপিতা নারায়ণ সাড়া দিলেন।

বিকর্ষতোঽন্তহৃদয়াৎ দাসীপতিমজামিলম্,
যমপ্রেষ্যান্ বিষ্ণুদূতা বারয়ামাসুরোজসা। ৬।১।৩১

—যখন যমদূতগণ দাসীপতি অজামিলের হৃদয়াভ্যন্তর হইতে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছিল ঠিক সেই সময়ে অজামিল বিস্ময়বিহ্বল চক্ষে দেখিল, বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া বলপূর্ব্বক যমদূতগণকে স্বকার্য্য সাধনে বাধা প্রদান করিতেছেন। অজামিল দেখিল,

সর্ব্বে পদ্মপলাশাক্ষাঃ পীতকৌষেয়বাসসঃ,
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো লসৎ পুষ্করমালিনঃ॥
সর্ব্বে চ নূত্নবয়সঃ সর্ব্বে চারু চতুর্ভুজাঃ,
ধনুর্নিষঙ্গাসিগদা শঙ্খচক্রাম্বুজশ্রিয়ঃ॥
দিশো বিতিমিরালোকাঃ কুর্ব্বন্তঃ স্বেন তেজসা॥ ৬।১।৩৪,৩৫

—সমস্ত বিষ্ণুদূতগণের চক্ষু পদ্মপলাশতুল্য, তাঁহাদের পরিধানে পীত কৌষেয় বসন, মস্তকে কিরীট, কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল, গলদেশে পদ্মের মালা, সকলেরই নব যৌবন, সকলেই মনোহর চতুর্ভুজধারী, হস্তে ধনু, তূণ, অসি, গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্ম। তাঁহাদের তেজে দিক্‌সমূহের অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে, দিনের আলোকও প্রভাবিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

এই বিষ্ণুদূতগণ শ্রীবিষ্ণুর মতই পরম সুন্দর ও বেশভূষাসম্পন্ন। মৃত্যুকালে অজামিলের নারায়ণ নামের উচ্চারণমাত্রই স্বয়ং নারায়ণ তাঁহার স্ব-রূপ ও স্ব-স্বভাবসম্পন্ন পার্ষদগণকে অজামিলের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

যমদূতগণ বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক স্বকার্য্যসাধনে নিবারিত হইয়া বলিল,

কে যূয়ং প্রতিষেদ্ধারো ধর্ম্মরাজস্য শাসনম্। ৬।১।৩২

—কে আপনারা যে স্বয়ং ধর্ম্মরাজের শাসনকার্য্যে বাধাপ্রদান করিতে সাহসী হইয়াছেন?

তখন বিষ্ণুদূতগণ ও যমদূতগণের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ হইল এবং প্রসঙ্গক্রমে যমদূতগণ বলিল যে, 'দেহবান্ ন হ্যকর্ম্মকৃৎ' —কোনও দেহী কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, এবং কর্ম্ম করিলেই পাপ পুণ্যের অধীন হইতে হয়। জীব পঞ্চভূতময় দেহ অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম্ম করিয়া সুখ, দুঃখ ও সুখ দুঃখের মিশ্রণ, হর্ষ, শোক ও ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বয়ং জীব কিন্তু ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন,—জীব চেতনাসম্পন্ন এবং সকলের অধিষ্ঠাতা। এই জীব অর্থাৎ লিঙ্গদেহ কর্ম্মাসক্তির জন্য পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণের অধীন হইয়া থাকে। এই সমস্ত কথা বলিয়া যমদূতগণ বলিল,

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম গুণৈঃ স্বাভাবিকৈঃ বলাৎ। ৬।১।৫১

—অর্থাৎ কেহ কখনও ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার হইতে উদ্ভূত রাগদ্বেষাদিই বলপূর্ব্বক তদধীন জীবকে কর্ম্ম করাইয়া থাকে। শ্রীগীতায় সামান্য প্রভেদযুক্ত কিন্তু অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট একটি শ্লোক আছে।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ॥ ৩।৫

এইরূপে কর্ম্মাধীন জীবের জন্মমৃত্যু প্রবাহের উল্লেখ করিয়া যমদূতগণ বলিল যে, ধর্ম্মরাজ যমদেবের আদেশে কর্ম্মাধীন অজামিলকে গ্রহণ করিবার জন্য তাহারা আগমন করিয়াছে এবং তাহাদিগকে বাধা দেওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য। অজামিল ব্রাহ্মণ-পিতার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন

করিয়াছিল এবং নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা পিতার আজ্ঞা পালন করিত। একদিন সে পিতার আজ্ঞায় বনে যাইয়া ফল, পুষ্প, সমিধ ও কুশ আহরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় দেখিতে পাইল যে জনৈক শূদ্র মদপান করিয়া এক দাসীর সহিত বিহার করিতেছে। এই একটি দৃশ্যই মুহূর্ত্তের মধ্যে অজামিলের শাস্ত্রজ্ঞান ও সদ্‌গুণরাশিকে পঙ্গু করিয়া দিয়া তাহার মনে দারুণ কামের সঞ্চার করিল। তখন সে সেই দাসীকে বশীভূত করিয়া তাহার সঙ্গিনী করিল এবং তাহার বিলাসিতার জন্য পিতার কষ্টোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া দাসীর ক্রীতদাস হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিল। এই দুষ্ট সংসর্গের ফলে অন্যান্য পাপসমূহ একে একে আসিয়া অজামিলকে আশ্রয় করিল,—সে তাহার ব্রাহ্মণী সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিল, অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া দাসী ও দাসীপুত্রগণের ভরণপোষণ করিতে লাগিল। যমদূতগণ আরও বলিল,

যদসৌ শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্য স্বৈরচার্য্যতিগর্হিতঃ,
অবর্ত্তত চিরং কালং অঘায়ুরশুচির্মলাৎ ॥
তত এনং দণ্ডপাণেঃ সকাশং কৃতকিল্বিষম্,
নেষ্যামোঽকৃতনির্ব্বেশং যত্র দণ্ডেন শুধ্যতি ॥ ৬।১।৬৭,৬৮

—অর্থাৎ যেহেতু এই অতি নিন্দিত ও পাপজীবী অজামিল শাস্ত্রবিধি উলঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া দাসীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করতঃ অপবিত্র হইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছে, অথচ কোন প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, সেই কারণে আমরা এই পাপাচারীকে দণ্ডধর ধর্ম্মরাজের নিকট লইয়া যাইব এবং তথায় দণ্ডভোগ করিয়া এই পাপী শুদ্ধ হইবে।

যমদূতগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুদূতগণ সেইকথা খণ্ডন করিবার মানসে বলিলেন যে, আজ যমদূতগণ মোহগ্রস্ত হইয়া ধর্ম্মরাজের নামে অধর্ম্মাচরণ করিতেছে। ধর্ম্মরাজের ন্যায়বিধানের উপর বিশ্বাস স্থাপন

করিয়া জীবগণ সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছে;—সেই দয়ালু যমরাজ কখনও অন্যায়বিধান করিতে পারেন না। কিন্তু,

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ৬।২।৭

—এই অজামিল মৃত্যুকালে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া তাহার কোটি জন্মকৃত পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। সুতরাং বিষ্ণুবুদ্ধিতে না হইলেও আভাসমাত্রে "নারায়ণ" এই চতুরক্ষর উচ্চারণ করিয়া অজামিল পাপমুক্ত হইয়াছে। অতএব সে যমদূতগণের দণ্ডার্হ নহে। কারণ,

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ,
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে।
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ ৬।২।৯,১০

—চোর, সুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রাহ্মণঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহন্তা, গো-বধকারী, ভগ্নব্রত ও কৃতঘ্ন যে সমস্ত পাতকী আছে, সেই সমস্ত পাতকীর পক্ষে বিষ্ণুনামই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত; কারণ, নাম উচ্চারণের ফলে সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীহরির দয়া উপস্থিত হয়।

যমদূতগণের মনে সন্দেহ হইল যে, অজামিল "নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণ করিলেও, তাহার পুত্র নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল—পরমাত্মা নারয়ণকে সে স্মরণ করে নাই। এই সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য বিষ্ণুদূতগণ যে শ্লোকটি বলিলেন তাহা শ্রীভাগবতে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে এবং বৈষ্ণবগণ নামমাহাত্ম্য প্রচার করিবার সময় এই শ্লোকটি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া থাকেন।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা,
বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ॥ ৬।২।১৪

—অর্থাৎ পুত্রাদির নামচ্ছলেই হউক, পরিহাসচ্ছলেই হউক, গীতালাপের পরিপূরণার্থেই হউক, অথবা অবজ্ঞা পূর্ব্বকই হউক, ভগবান্ শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিলেই উহা সকল পাপ বিনষ্ট করিয়া দেয়।

এই নাম-মাহাত্ম্য ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুদূতগণ পুনরায় বলিলেন,

অজ্ঞানাৎ অথবা জ্ঞানাৎ উত্তমঃশ্লোকনাম যৎ
সঙ্কীর্ত্তিত মঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ ৬।২।১৮

—অগ্নিপ্রদানকারী জ্ঞানী অথবা অজ্ঞানীই হউক, তাহাকর্ত্তৃক সংযোজিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, ভগবানের নাম উচ্চারিত হইলে উহা পুরুষের পাপসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, অজামিল নিজপুত্রের নাম 'নারায়ণ' রাখিয়াছিল, তাহা কি একটা আকস্মিক অর্থবিহীন ঘটনা মাত্র,—শুধু মনের খেয়াল? অথবা এই নামকরণের পশ্চাতে কোনও নিগূঢ় সংস্কার কার্য্য করিতেছিল? অজামিল কর্ত্তৃক নিজপুত্রের এইরূপ নামকরণ সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখিবার অনেক বিষয়বস্তু রহিয়াছে। প্রথমতঃই দেখা যায় যে, এই অজামিল সৎব্রাহ্মণের পুত্র; সুতরাং তাহার রক্তে ভগবৎসাধনপ্রবৃত্তি স্বভাবতঃই প্রবাহিত ছিল এবং কালক্রমে অসদাচরণের দ্বারা সেই প্রবৃত্তি চাপা পড়িলেও কখনই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নাই—অবচেতন মনে তাহার প্রভাব প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া গিয়াছিল, ইহার প্রমাণ আছে। যখন তাহার বহুবর্ষব্যাপী দাসী-সংসর্গ হইয়া গিয়াছে তখনও দেখা যাইতেছে যে, সে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'নারায়ণ' রাখিয়াছে। কেন? যে-লোক বঞ্চনা ও জুয়াখেলার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, পুত্রের 'নারায়ণ' নাম রাখিবার প্রবৃত্তি তাহার মনে সহজে উদিত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। অথচ পাপের মধ্যে ডুবিয়া

থাকিয়াও সে 'ডাকু' 'বিচ্ছু' 'খ্যাঁদা' ইত্যাদি যে কোনও একটি সংস্কারবিহীন নাম না রাখিয়া, 'নারায়ণ' নামটিই নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। ইহজন্মের অথবা পূর্ব্বজন্মের একটা ভাব না থাকিলে পুত্রের 'নারায়ণ' নামটি তাহার মনে স্থান পাইত না। আর একটি বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। মৃত্যুকালে সে 'নারায়ণ' বলিয়া না ডাকিয়া তাহার দাসী উপপত্নীর নাম ধরিয়াও ডাকিতে পারিত অথবা ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নির্ব্বাক্‌বিস্ময়ে যমদূতগণের প্রতি ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে পারিত, অথবা ঘোরদর্শন যমদূতগুলিকে দেখিয়া বিকট চীৎকার মাত্র করিতে করিতে বালকের মত রোদন করিতে পারিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সে সাধারণ গৃহীর মত মৃত্যুকালে এই সকল স্বাভাবিক আচরণের মধ্যে কোনটিও করে নাই,—ঠিক্ কনিষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়া তাহার পরকালের পরম সহায়স্বরূপ 'নারায়ণ' শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছিল। ইহা আকস্মিক নহে। এই 'নারায়ণ' ডাকের পশ্চাতে হয়তো তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতি ছিল, যাহার ফলে সে জন্মজন্মান্তরের সংস্কারবশতঃ পুত্রের নারায়ণ নাম রাখিয়াছিল এবং মৃত্যুকালে অবশ হইয়াও সহস্র নামের মধ্যে একমাত্র সেই পরমার্থপ্রদ 'নারায়ণ' নামটিই উচ্চারণ করিয়াছিল। মানব জীবনে সংস্কার ও অভ্যাসের এতই প্রয়োজন। পূর্ব্বজন্মসংস্কার গৃহীদের জীবনে বহুক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ভোগবিলাসী গৃহস্থের বাড়িতে দেখা গিয়াছে যে, সব পুত্রকন্যাগুলিই আমিষ ভক্ষণে লোলুপ, কিন্তু সেই বাড়ির মধ্যে সেই ভোগবিলাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিতপালিত হইয়াও একটি ছেলে হয়ত নিরামিষ-ভোজী—আমিষ দ্রব্যের প্রতি তাহার প্রবল ঘৃণা, —পিতামাতা জোর করিয়া খাওয়াইতে গেলেও হয়ত ভুক্তদ্রব্য বমন করিয়া ফেলে। সেই বালকের এই আহার শুদ্ধি পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। অভ্যাসও ধর্ম্মজীবনে প্রবল সহায়। অহরহঃ

ভগবানের নাম গ্রহণ, সম্ভবপর হইলে সর্ব্বদা তদ্‌ভাবিত হইয়া থাকিলে মৃত্যুকালেও অভ্যাসবশতঃ নাম সহজেই মনে উদিত হইবে। সেইজন্য বৈষ্ণবগণ বলেন যে, রস না পাইলেও নাম গ্রহণের অভ্যাস সাধন করিতে হয়, এবং তাহাই মানবমনের উপর শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে। নামে রুচি বহুদূরের কথা, নামে রুচি হইলে তো মানবজীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়া যাইল। তবে নিয়মিত অভ্যাস না করিয়া লোক-দেখান সৌখীন নামগ্রহণ করিলে মৃত্যুকালে মানুষের টিয়াপাখীর মতই অবস্থা উপস্থিত হয়। টিয়াপাখী দাঁড়ে বসিয়া হয়তো হরিধ্বনি তুলিতেছে, কিন্তু বিড়াল তাহাকে ধরিলে সে হরি নাম ভুলিয়া ট্যাঁ, ট্যাঁ, করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। তাই অজামিলের জীবনের ভিতর দিয়া আমরা সংস্কার ও অভ্যাসের প্রবল শক্তি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

বিষ্ণুদূতগণ নারায়ণ নাম গ্রহণের ফল বর্ণনা করিয়া অজামিলকে যম-পাশের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং যমদূতগণ তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজের নিকট প্রস্থান করিল। তখন অজামিল ভয়শূন্য ও প্রকৃতিস্থ হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিবামাত্র হঠাৎ বিষ্ণুদূতগণকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া ভাবিল,

'কিমিদং স্বপ্ন আহোস্বিৎ সাক্ষাদ্দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্'—এই অদ্ভুত ব্যাপার যে আমি দেখিলাম ইহা কি স্বপ্ন অথবা জাগ্রত অবস্থারই সুস্পষ্ট ঘটনা!

মনে মনে এই সমস্ত আলোচনা করিতে করিতে তাহার তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল। শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, "ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু"—ক্ষণকাল সাধুসঙ্গের ফলে অজামিলের মনে চৈতন্য ও বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল এবং সে গৃহের প্রতি আসক্তিশূন্য হইয়া গঙ্গাদ্বারে প্রস্থান পূর্ব্বক ভজন-সাধনে সমাহিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইল।

এদিকে যমদূতগণ ভীত ও বিস্মিত হইয়া নিজ প্রভু যমরাজের নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। তাহারা সমস্ত জীব-জগতের একজন মহারাজাকেই জানে—তিনি স্বয়ং যমরাজ। সুতরাং যাঁহার নাম উচ্চারণমাত্রেই পাপী পাপভার নিক্ষেপ করিয়া সহজেই মুক্ত হইয়া যায়, সেই মহারাজাধিরাজ নারায়ণের সম্বন্ধে বিষ্ণুদূতগণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা যমদূতগণ বুঝিতে পারে নাই। তাহারা যমরাজের নিকট যাইয়া বিস্মিতহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিল,

কতি সন্তীহ শাস্তারো জীবলোকস্য বৈ প্রভো! ৬৷৩৷৪

—হে প্রভো, ত্রিভুবনে কয়জন শাসনকর্ত্তা আছেন ?

মহারাজ পরীক্ষিতের মনেও অনুরূপ সন্দেহ উদিত হইয়াছিল। তিনি শুকদেবকে বলিলেন,

যমস্য দেবস্য ন দণ্ডভঙ্গঃ কুতশ্চনর্ষে! শ্রুতপূর্ব্ব আসীৎ। ৬৷৩৷২

—হে ঋষি, ধর্ম্মরাজ যমের শাসনদণ্ড ব্যর্থ হইয়াছে—এইরূপ কাহারও মুখে পূর্ব্বে তো শোনা যায় নাই!

শ্রীশুকদেব তখন বলিলেন যে, যমদূতগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাহাদের সংশয় মোচন করিবার জন্য—'প্রীতঃ স্বদূতান্ প্রত্যাহ স্মরন্ পাদাম্বুজং হরেঃ'—শ্রীহরির চরণকমল চিন্তা করিতে করিতে যমরাজ প্রসন্নচিত্তে স্বীয় দূতগণকে বলিলেন যে, মনুষ্য যেমন রজ্জুদ্বারা বলদসমূহকে বন্ধন করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে, সেইরূপ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যিনি স্বীয় শাসনসূত্রে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যমরাজ হইতে বিভিন্ন, এবং যমরাজ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান দেবতাগণ, প্রজাপতিগণ ও মহর্ষিগণ সকলেই সেই পরমপুরুষের অধীন। সেই ভগবানের স্বরূপ ও সেই ভগবৎধর্ম্ম সাধারণ মানুষের অগোচর।

কেবলমাত্র

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ,
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো, বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমোধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥ ৬।৩।২০,২১

—ব্রহ্মা, নারদ, শিব, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলিরাজ, শুকদেব ও আমি—এই আমরা দ্বাদশজন ভাগবত ধর্ম্ম অবগত আছি। অতি পবিত্র, গুহ্য ও দুর্ব্বোধ এই ভাগবত ধর্ম্ম অবগত হইয়া জীব মোক্ষলাভ করিয়া থাকে।

যমরাজ যে দ্বাদশজন আত্মবিদ্যাজ্ঞানীর নাম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীশুকদেবের নাম পরিলক্ষণীয়। স্বয়ং শুকদেব ইহা মহারাজ পরীক্ষিতের সম্মুখে বর্ণনা করিতেছেন,—যখন দ্বাদশজন মহাভাগবতের প্রসঙ্গে শুকদেব নিজের নামও উল্লেখ করিলেন তখনও তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও উদাসীন—যেন অপর কাহারও নাম গণনা করিতেছেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এইরূপ দেহজ্ঞানবিহীন, পরমাত্মাচিন্তনে নিমগ্ন, সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসী না হইলে তিনি কখনও মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যুভয় নিবারণ করিতে পারিতেন না,—তখন হয়তো সেই মহতী সভায় শাস্ত্রপাঠ হইত, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার হইত না। কিন্তু তখনও যমদূতগণ বিস্মিত ও নির্ব্বাক্,—আবার কে মহারাজা আছেন যিনি সর্ব্বজীবনিয়ন্তা যমরাজ অপেক্ষাও পরাক্রমশালী। তখন প্রভু যমরাজ নিজ অনুচরগণের সকল সন্দেহ নিরসন করিয়া পুনরায় বলিলেন,

নামোচ্চারণ মাহাত্ম্যং হরেঃ পশ্যত পুত্রকাঃ।
অজামিলোঽপি যেনৈব মৃত্যুপাশাদমুচ্যত ॥ ৭।৩।২৩

—হে বৎসগণ, শ্রীহরির নাম উচ্চারণের মাহাত্ম্য দেখ, হরিনাম উচ্চারণ করিয়া পাপী অজামিল যমপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিল।

১৫

বিক্ষুব্ধ নিজ অনুচরগণকে অতি কোমল ভাষায় 'পুত্রক' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহাদের মনের গ্লানি ও সন্দেহ দূর করিবার জন্য বড়ই স্নেহভরে বলিলেন যে, সেই রাজাধিরাজ 'নারায়ণ' এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক, অদ্বিতীয় ও তুলনা রহিত। ক্ষুদ্র রাজাগণ দর্শন ও সেবার দ্বারাই অনুগত জনের ইষ্টসিদ্ধি করিয়া থাকেন, অসাক্ষাতে অথবা স্মরণমাত্রেই কোন ইষ্টসাধন করিবার শক্তি তাঁহাদের কাহারও নাই। কিন্তু 'নারায়ণে' প্রতি ভক্তি বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ দর্শন দূরের কথা, কেমলমাত্র তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলেই জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত কর্ম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মানুষ অভয়পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ নাম ও নামীর মধ্যে প্রভেদমাত্রশূন্য মহাপরাক্রান্ত রাজাধিরাজের তুলনা কোথায়! "নৈবে বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে"—ভগবদ্ভক্ত ও নামগ্রহণকারী লোকের দণ্ডবিধানে স্বয়ং যমরাজ অথবা কাল কেহই সমর্থ নহেন। অতএব হে পুত্রগণ, তোমরা ক্ষুব্ধ হইও না; অজামিলের মুক্তিতে তোমাদের অথবা তোমাদের প্রভুর অধিকার বিলুপ্ত অথবা তাঁহার অসম্মান হয় নাই। এই বলিয়া যমরাজ নিজ কঠোর শাসনাধীন ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিতেছেন,

> জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
> কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোঽকৃত
> বিষ্ণুকৃত্যান্॥ ৬।৩।২৯

—যাহাদের জিহ্বা ভগবানের গুণ ও নাম কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত ভগবানের চরণ-কমল স্মরণ করে না, যাঁহাদের মস্তক কখনও কৃষ্ণকে প্রণাম করে না এবং যাহারা ভগবৎ-ব্রত আচরণ করে না, তাদৃশ হতভাগ্য বদ্ধজীবকে শাস্তির জন্য আমার নিকট আনয়ন করিবে।

• অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট একটি শ্লোক মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বলিয়াছিলেন। ভগবৎকথা শ্রবণের ফলে তখন পরীক্ষিতের চৈতন্য উদিত হইয়াছে,—তিনি বলিতেছেন,

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ,
স্মরেৎ বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাং স কর্ণঃ॥ ১০।৮।৩

—অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের গুণসমূহ কীর্ত্তন করা হয় তাহাই সার্থক বাক্য, অপর বাক্য সকল বৃথা; যে হস্ত তাঁহার পূজা অর্চ্চনাদি কর্ম্ম করে তাহাই প্রকৃত হস্ত, অন্য বিষয়কর্ম্মকারী হস্ত জড়পিণ্ডমাত্র; যে মন তাঁহাকে সমস্ত স্থাবর জঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া জানে তাহাই প্রকৃত মন; যে কর্ণ তাঁহার পবিত্র লীলাকথা শ্রবণ করে তাহাই প্রকৃত কর্ণ।

সর্ব্বজীবনিয়ন্তা প্রভু যমরাজ নিজ দূতগণকে এইরূপে সান্ত্বনা দিয়া এবং তত্ত্বকথা শুনাইয়া অবশেষে দূতগণ-কর্ত্তৃক পাপবিহীন জনকে আকর্ষণ ও তাহাদের মনে ভগবৎনামের প্রতি সন্দেহের ফলে যে পাপ উদ্ভূত হইয়াছে এবং দূতগণ-কৃত যে পাপ তাহাদের প্রভু বলিয়া যমরাজকেও স্পর্শ করিয়াছে, সেই পাপস্খালনের জন্য শ্রীহরির নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন।

তৎক্ষম্যতাং স ভগবান্ পুরুষঃ পুরাণো নারায়ণঃ
স্বপুরুষৈঃ যদসৎ কৃতং নঃ। ৬।৩।৩০

—আমার দূতগণ যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, সনাতন পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ তাহা ক্ষমা করুন।

দণ্ডধর যমরাজকে এইরূপে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে দেখিয়া এবং তাঁহার সমস্ত কথা শুনিয়া যমদূতগণের বিস্ময় ও সন্দেহ দূরীভূত হইল এবং সেইদিন হইতে

নৈবাচ্যুতাশ্রয়জনং প্রতিশঙ্কমানা দ্রষ্টুঞ্চবিভ্যতি ততঃ প্রভৃতি
স্ম রাজন্॥ ৬।৩।৩৪

—যমদূতগণ শ্রীকৃষ্ণশরণাগত ব্যক্তিকে দর্শন করিতেও ভয় পাইয়া থাকে, নিকটে যাইয়া পাশবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা।

এইরূপে অজামিলের অপূর্ব্ব আখ্যান শেষ করিয়া শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন,

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্,
অজামিলো ঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৬।২।৪৯

—মুমূর্ষু অবস্থায় শ্রদ্ধাবিহীন পাতকী অজামিল পুত্রকে আহ্বান করিতে গিয়া শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়া ভগবৎ-ধামে গমন করিয়াছিল ; কিন্তু কোনও লোক যদি মৃত্যুকালে শ্রদ্ধার সহিত শ্রীহরির নাম গ্রহণ করে সে যে বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হইবে এবিষয়ে আর সন্দেহ কি!

প্রত্যেক আখ্যানের সহিত মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপগ্রস্ত আসন্ন মৃত্যু জীবনের একটা সম্বন্ধ শ্রীশুকদেব স্থাপন করিয়াছেন। অজামিলের কথাপ্রসঙ্গেও শুকদেব মহারাজকে উৎসাহিত করিয়া বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ মহারাজ পরীক্ষিতের নামে রুচি উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং মৃত্যুকালে শ্রদ্ধার সহিত শ্রীহরির নাম গ্রহণ করিলে তাঁহার পরমপদপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। মহারাজের কানে বাজিতে লাগিল—"কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্"—"কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্"!

(২)

দক্ষপুত্রগণের তপস্যা এবং নারদের প্রতি দক্ষের অভিশাপ

ষষ্ঠ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত অজামিল-উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকদেব চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রজাসৃষ্টি ও প্রজাবৃদ্ধি বর্ণনা করিতেছেন। চতুর্থ স্কন্ধে বর্ণিত প্রাচীনবর্হির দশপুত্র প্রচেতাগণ সমুদ্র মধ্যে তপস্যা করিয়া যখন তথা হইতে উত্থিত হইলেন তখন দেখিলেন যে, সমগ্র পৃথিবী বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন, সুতরাং মানবগণের বাসের অযোগ্য। তখন প্রচেতাগণ বৃক্ষলতাগুল্ম প্রভৃতি দগ্ধ করিবার মানসে তপস্যাবলে

মুখ হইতে অগ্নি ও বায়ুর সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে যখন বায়ুর সহায়ে দুরন্ত অগ্নি উত্থিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে মরুভূমিতে পরিণত করিবার উপক্রম করিয়াছে তখন বনস্পতিগণের রাজা সোম প্রচেতাগণকে ক্রোধ-সংবরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীহরি প্রচেতাগণকে প্রজাসৃষ্টি ও প্রজারক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রচেতাগণ যদি বৃক্ষলতাদি ধ্বংস করিয়া ফেলেন তাহা হইলে জীবগণ অন্ন হইতে বঞ্চিত হইবে এবং জীবসৃষ্টি হইলেও প্রাণধারণযোগ্য আহার্য্যদ্রব্যের অভাবে সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। রাজা সোম আরও বলিলেন,

আতিষ্ঠত সতাং মার্গং কোপং যচ্ছত দীপিতম্
পিত্রা পিতামহেনাপি জুষ্টং বঃ প্রপিতামহৈঃ। ৬।৪।১১

—অর্থাৎ আপনাদের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহগণ যে পথের অনুসরণ করিয়াছেন, আপনারা সেই শান্তির পথ অবলম্বন করুন এবং উদ্দীপিত ক্রোধ সংযত করুন।

এই বলিয়া রাজা সোম প্রচেতাগণকে বৃক্ষগণের পালিতা কন্যা প্রদান করিলেন এবং সেই কন্যার গর্ভে প্রচেতাগণের পুত্র দক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রজাপতি দক্ষ জীবসৃষ্টি করিয়াও ইচ্ছানুরূপ প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে না দেখিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের সন্নিহিত এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতে যাইয়া দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শ্রীহরিকে হংসগুহ্য নামক স্তোত্রের দ্বারা আরাধনা করিলেন। এই হংসগুহ্য নামক স্তোত্র চতুর্থ অধ্যায়ে (শ্লোক সংখ্যা তেইশ হইতে চৌত্রিশ পর্য্যন্ত) বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষ বলিলেন,

নমঃ পরায়া বিতথানুভূতয়ে গুণত্রয়া ভাস নিমিত্ত বন্ধবে,
অদৃষ্টধাম্নে গুণতত্ত্ববুদ্ধিভিঃ নিবৃত্তমানা বধয়ে স্বয়ম্ভুবে॥ ৬।৪।২৩

—অর্থাৎ যাহা হইতে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের প্রকাশ হইয়া থাকে, যিনি প্রকৃতি ও কালের নিয়ন্তা, যাঁহার রূপ ও গুণের সীমা নাই, যিনি

ভক্তের নিকট প্রকাশিত কিন্তু বিষয়ীর নিকট অপ্রকাশিত, যিনি স্বপ্রকাশ, সেই পরমপুরুষকে আমি নমস্কার করি।

এইরূপে দ্বাদশটি শ্লোকে শ্রীহরির স্তব করিলে শ্রীহরি দক্ষের নিকট আবির্ভূত হইলেন। দক্ষ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া দেখিলেন

কৃতপাদঃ সুপর্ণাংসে প্রলম্বাষ্ট মহাভুজঃ,
চক্রশঙ্খাসিচর্ম্মেষু ধনুষ্পাশ গদাধরঃ ॥
পীতবাসা ঘনশ্যামঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ
বনমালা নিবীতাঙ্গো লসৎ শ্রীবৎসকৌস্তভঃ ॥
মহাকিরীটকটকঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ
কাঞ্চ্যঙ্গুলীয়বলয় নূপুরাঙ্গদভূষিতঃ ॥ ৬।৪।৩৬-৩৮

—অর্থাৎ শ্রীহরি গরুড়ের স্কন্ধদেশে চরণযুগল স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার আজানুলম্বিত অষ্ট মহাবাহু, অষ্টবাহুতে চক্র, শঙ্খ, অসি, চর্ম, বাণ, ধনু, পাশ ও গদা বিরাজিত।

তিনি পীতবসনধারী ও মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তাঁহার বদনমণ্ডল ও দৃষ্টি প্রসন্ন, কণ্ঠ হইতে চরণ পর্য্যন্ত বনমালায় পরিব্যাপ্ত এবং বক্ষস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তভমণি শোভিত ছিল। তাঁহার মস্তকে মহাকিরীট, চরণে নূপুর ও কর্ণে কুণ্ডল ছিল, এবং তিনি চন্দ্রহার, অঙ্গুরীয়, হস্তে বলয়, নূপুর ও অঙ্গদে বিভুষিত ছিলেন।

তখন প্রজাপতি দক্ষ

রূপং তন্মহদাশ্চর্য্যং বিচক্ষ্যাগতসাধ্বসঃ
ননাম দণ্ডবৎ ভূমৌ প্রহৃষ্টাত্মা প্রজাপতিঃ। ৬।৪।৩৯

—সেই অত্যাশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

আনন্দে পরিপূর্ণ দক্ষ শ্রীহরিকে কিছুই বলিতে পারিলেন না,—কিন্তু অন্তর্য্যামী ভগবান্ দক্ষকে বলিলেন যে, তাঁহার তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে

এবং তাঁহার সঙ্কল্পানুযায়ী উত্তরোত্তর প্রজাবৃদ্ধি হইবে। এই কথা বলিয়া "স্বপ্নোপলব্ধার্থ ইব" অর্থাৎ স্বপ্নলব্ধ বস্তুর ন্যায় শ্রীহরি হঠাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর নারদের উপদেশে দক্ষপুত্রগণ প্রজাসৃষ্টি না করিয়া মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিলে দক্ষ কুপিত হইয়া নারদ ঋষিকে যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। প্রজাপতি দক্ষ শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তাঁহার হর্য্যশ্ব নামক সমধর্ম্ম ও সমভাববিশিষ্ট অযুতসংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। পিতার আদেশে প্রজাসৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধির জন্য তাঁহারা সকলে সিন্ধুনদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে নারায়ণসর নামক তীর্থে যাইয়া উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবর্ষি নারদ তাহা জানিতে পারিয়া একদিন তথায় আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, "যূয়ং বালিশাঃ"—"তোমরা মূর্খ,—সম্যক্‌রূপে পরমাত্মাকে না জানিয়া প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে।" দেবর্ষি নানাবিধ যুক্তিতর্কের দ্বারা হর্য্যশ্বগণের মনে কর্ম্মপ্রধান প্রবৃত্তিমার্গের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করিলে হর্য্যশ্বগণ

একচেতসঃ প্রষযুস্তং পরিক্রম্য পন্থানমনিবর্ত্তনম্—৬।৫।২১

—নারদ ঋষির বাক্য সত্য বলিয়া সকলে একমত হইলেন এবং ঋষিকে প্রদক্ষিণ করতঃ, যাহা অবলম্বন করিলে সংসারে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না সেই নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিলেন। প্রজাপতি দক্ষের তপস্যা ও প্রজাবৃদ্ধির উদ্দেশ্য নারদ ঋষির চক্রান্তে ব্যর্থ হইয়া যাইল।

দক্ষ প্রজাপতি যখন হর্য্যশ্বগণের মোক্ষমার্গ অবলম্বনের সংবাদ শুনিলেন তখন

নাশং নিশম্য পুত্রাণাং নারদাচ্ছীলশালিনাম্,
অন্বতপ্যত কঃ শোচন্ সুপ্রজস্ত্বং শুচাং পদম্। ৬।৫।২৩

—শোক করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন-কারী সুপুত্রগণও পিতার দুঃখের কারণ হইল। সুপুত্রই যখন অবস্থা-বিশেষে দুঃখের কারণ হইয়া থাকে তখন কুপুত্র যে গৃহীর অশেষ দুঃখের সৃষ্টি করিয়া থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মা আসিয়া দক্ষকে সান্ত্বনা দিলেন এবং দক্ষ পুনরায় স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে সবলাশ্ব নামক সহস্র সংখ্যক পুত্র উৎপাদন করিলেন। পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সবলাশ্বগণ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত নারায়ণসর নামক তীর্থে গমন করিলেন। তথায় তীর্থের জল স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ ও সমাহিত চিত্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে
বিশুদ্ধসত্ত্বধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহি ॥ ৬।৫।২৬

—নারায়ণকে নমস্কার করি। যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আশ্রয় এবং স্বয়ং পরমবিশুদ্ধ, সেই পরমাত্মা পরমপুরুষকে চিন্তা করি।

আবার দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত। নানাবিধ যুক্তি তর্কের দ্বারা নিবৃত্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া ঋষি বলিলেন

দাক্ষায়ণাঃ সংশৃনুত গদতো নিগমং মম,
অন্বিচ্ছতানুপদবীং ভ্রাতৄণাং ভ্রাতৃবৎসলাঃ ॥ ৬।৫।৩

—হে দক্ষপুত্রগণ, আমি যে উপদেশ করিতেছি তাহা শ্রবণ কর। তোমরা সকলে তোমাদের অগ্রজ হর্য্যশ্বগণের অনুসৃত মোক্ষমার্গ অনুসরণ কর।

এই উপদেশের অনুরূপ ফলই হইল—সবলাশ্বগণ প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন।

এতাবদুক্ত্বা প্রযযৌ নারদঃ অমোঘদর্শনঃ,
তেঽপি চান্বগমন্মার্গং ভ্রাতৄণামেব মারিষ ! ৬।৫।৩২

—হে আর্য্য, দেবর্ষি নারদ অমোঘদর্শন, তাঁহার দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না। তিনি এইরূপ মোক্ষমার্গের প্রশংসা করিয়া প্রস্থান

করিলে সবলাশ্বগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের অনুসৃত মোক্ষমার্গই অবলম্বন করিলেন।

এই স্থানে "অমোঘদর্শনঃ" কথাটি চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। দেবর্ষি "অমোঘদর্শনঃ"। তিনি অমোঘদর্শন ও অমোঘবাক্—তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া দীনচিত্ত মানবগণকে দর্শন প্রদান করেন এবং যে হরিকথা তাঁহাদিগকে শ্রবণ করান, তাহা অব্যর্থ ফলপ্রসূ। সত্যদর্শী, সত্যসন্ধী, সত্যভাষী নারদ বৃথা বাক্য বলেন না, উদ্দেশ্যবিহীন দর্শন প্রদান করেন না। এই সেই দেবর্ষি যিনি যুগে যুগে ভক্তগণকে শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নিত পথ প্রদর্শন করিতেছেন, যাঁহার চিন্ময়দেহে শ্রীহরির নাম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, যিনি পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুবকে বনপথে অসহায় দেখিয়া তাহার মস্তকে পরমসুশীতল সর্ব্বঅমঙ্গলবিনাশন শ্রীহস্ত অর্পণ করিয়াছিলেন; ইনি সেই দীনদয়াল মানববন্ধু নারদ যিনি কুবেরের কামোন্মত্ত জড়পিণ্ড পুত্রদ্বয়কে অশেষ দয়া করিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি মাতৃগর্ভস্থ শিশু প্রহ্লাদকে হরিকথা শুনাইয়া দৈত্য পিতার দৈত্যকুলের সমগ্র বিপরীত প্রভাব বিনষ্ট করিয়া প্রহ্লাদকে ভক্তশিরোমণি করিয়াছিলেন—ইনি সেই দীনবন্ধু ভক্তসখা দেবর্ষি নারদ। তিনি "অমোঘদর্শনঃ"—তিনি একবার যাহাকে দর্শন দেন তাহার জন্মজন্মান্তরের কষায় কাটিয়া যায়, এই চর্ম্মচক্ষুতে তাঁহার দর্শন লাভ না হইলেও হৃদয়ে তাঁহার রূপ ধ্যান করিলেও তিনি "অমোঘদর্শনঃ"। স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হইয়া যে তপস্যারত দক্ষকে প্রজাসৃষ্টির অভীপ্সিত বরপ্রদান করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণের আশীর্ব্বচনও যেন মহর্ষির কথায় ও দর্শনে আজ ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছে! সুতরাং তিনি যে অমোঘবাক্, তিনি যে অমোঘদর্শন এবিষয়ে আর সন্দেহ কি!

এদিকে প্রজাপতি দক্ষ বহুবিধ অমঙ্গলসূচক উৎপাত দর্শন করিতে লাগিলেন এবং "নারদকৃতং পুত্রনাশমুপাশৃণোৎ"—নারদ কর্ত্তৃক পুত্র

সবলাশ্বগণের বিনাশ শ্রবণ করিলেন। "পুত্রনাশং" অর্থাৎ পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়াছে—প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে পুত্রগণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই পুত্রগণ নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন—পুত্রগণের এইরূপ বিপরীত ধর্ম্মপথগ্রহণ দক্ষের নিকট পুত্রগণের মৃত্যু বলিয়াই মনে হইতেছে।

চুক্রোধ নারদায়াসৌ পুত্রশোক বিমূর্চ্ছিতঃ
দেবর্ষিমুপলভ্যাহ রোষাৎ বিস্ফুরিতাধরঃ ॥ ৬।৫।৩৫

—প্রজাপতি দক্ষ পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং নারদের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন সর্ব্বজ্ঞ নারদ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তথায় আগমন করিলেন। দেবর্ষিকে দেখিয়া ক্রোধে দক্ষের ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল।

তখন দক্ষ নারদকে বলিলেন,

অহো অসাধো সাধূনাং সাধুলিঙ্গেন নস্ত্বয়া,
অসাধ্বকার্য্যর্ভকানাং ভিক্ষোর্মার্গঃ প্রদর্শিতঃ ॥
ঋণৈস্ত্রিভিরবিমুক্তা নাম মীমাংসিত কর্ম্মণাম্,
বিঘাতঃ শ্রেয়সঃ পাপ, লোকয়োরুভয়োঃ কৃতঃ ॥
এবং ত্বং নিরনুক্রোশো বালানাং মতিভিদ্ধরেঃ,
পার্ষদমধ্যে চরসি যশোহা নিরপত্রপঃ ॥
ননু ভাগবতা নিত্যং ভূতানুগ্রহকাতরাঃ,
ঋতে ত্বাং সৌহৃদঘ্নং বৈ বৈরঙ্করমবৈরিণাম্ ॥
নেত্থং পুংসাং বিরাগঃ সাৎ ত্বয়া কেবলিনাম্বৃষা
মন্যসে যদ্যুপশমং স্নেহপাশনিকৃন্তনম্ ॥
নানুভূয় ন জানাতি পুমান্ বিষয়তীক্ষ্ণতাম্,
নির্ব্বিদ্যতে স্বয়ং তস্মাৎ ন তথা ভিন্নধীঃ পরৈঃ ॥
যন্নস্ত্বং কর্ম্মসন্ধানাং সাধূনাং গৃহমেধিনাম্,
কৃতবানসি দুর্ম্মর্ষং বিপ্রিয়ং তব মর্ষিতম্ ॥

তন্তুকৃন্তন! যন্নস্ত্বমভদ্রমচরঃ পুনঃ,

তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ়, ন ভবেদ্ ভ্রমতঃ পদম্ ॥—৬।৫।৩৬-৪৩

—হে অসাধো, সাধুদের বেশ ধারণ করিয়া তুমি আমার স্বধর্ম্মনিরত পুত্রগণকে ভিক্ষুর পথ অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ উপদেশ করিয়াছ—ইহা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।

হে পাপিষ্ঠ, আমার পুত্রগণ বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করে নাই, অতএব ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও দেব-ঋণ হইতে মুক্ত হয় নাই, এই অবস্থায় তাহাদিগকে নিবৃত্তিমার্গ উপদেশ দিয়া তুমি তাহাদের ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই নষ্ট করিয়াছ।

তুমি বালকদিগের মতিভেদ সৃষ্টি করিয়া শ্রীহরির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া তাঁহার যশ নষ্ট করিয়াছ, অথচ তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তুমি নির্লজ্জ।

তুমি সুহৃদের অনিষ্টকর এবং যে তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করে না, তুমি তাহার প্রতিও শত্রুতাচরণ কর। তুমি ব্যতীত সকল ভক্তই প্রজাগণের বৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন।

তুমি বিষয় পরিত্যাগ করাকেই বৈরাগ্য মনে করিতেছ; কিন্তু জ্ঞানহীন সাধুবেশধারী তুমি লোকের বুদ্ধিভেদ ঘটাইলেই লোকের বৈরাগ্য হইবে না,—লোকে বিষয়ভোগ না করিয়া বিষয় সমূহের পরিণাম যে দুঃখ তাহা বুঝিতে পারে না। বিষয়ভোগ করিয়া তাহার পরিণাম বুঝিলে তবে আপনা হইতেই মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়।

আমরা গৃহস্থ, কর্ম্মনিষ্ঠ এবং সাধুস্বভাব। তুমি আমাদের যে দুঃসহ অপকার করিয়াছ তাহা অবশ্যই আমাকে সহ্য করিতে হইবে।

কিন্তু হে মূর্খ, হে আমার বংশনাশক, আমার পুনঃ পুনঃ অপকার করায় তোমার যে পরিণাম হইবে তাহা শ্রবণ কর,—তোমাকে অহরহঃ ত্রিলোক ভ্রমণ করিতে হইবে, অথচ কোথাও তোমার স্থান হইবে না।

এইরূপে প্রজাপতি দক্ষ দেবর্ষি নারদকে তীব্র তিরস্কার করিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন—শোকে এবং ক্রোধে বহুভাষী দক্ষের কথাগুলি দেবর্ষি নীরব হইয়া শ্রবণ করিলেন, একটি কথা বলিয়াও তাহার প্রতিবাদ করিলেন না। শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, দেবর্ষি প্রস্থান করিবার সময় "বাঢ়ং"—তাহাই হউক—এই বলিয়া সেই অভিশাপবাক্য বরণ করিয়া লইলেন। আজ গৃহী ও সন্ন্যাসী আমরা সকলেই দক্ষের এই অভিশাপ-বাক্যকে পরম সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। তিনি যদি নারদকে এই অভিশাপবাক্য প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে অহেতুকী কৃপার পরিচয় জগদ্বাসী পাইত না; শ্রীনারদ যদি বিশ্রাম পাইতেন, তাহা হইলে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নলকুবর ও মণিগ্রীব কেহই উদ্ধার হইতেন না;—আজিও অহরহঃ নারদের বীণা এই পৃথিবীতে হরিনাম ঝঙ্কার করিতেছে—কোন কোন ভাগ্যবান্ তাহা আজিও শুনিতে পাইতেছেন। দেবর্ষির হরিনামেই আনন্দ, তিনি মূর্ত্ত হরিনাম-স্বরূপ সুতরাং এই অভিশাপ তিনি আনন্দে গ্রহণ করিলেন; দেবর্ষি দীনদয়াল, তাই তিনি ত্রিভুবনের দেব-ঋষি সন্ন্যাসী গৃহী কীটপতঙ্গ সকলের কল্যাণ কামনায় তাঁহার বিরামবিহীন হরিনামবিতরণরূপ ব্রত সাদরে বরণ করিয়া লইলেন। তাই দক্ষের অভিশাপের নিকট ত্রিভুবনবাসী আমরা সকলেই ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

অতঃপর দক্ষ প্রজাপতি পুত্রগণের দ্বারা প্রজাসৃষ্টির আশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ষাটজন কন্যার সাহায্যে প্রজাবৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করিলেন। এই ষাটজন কন্যাকে উপযুক্ত জামাতার হস্তে প্রদান করিয়া দক্ষ নিশ্চিন্ত হইলেন এবং এই সমস্ত কন্যার গর্ভে যে সমস্ত সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করিল তাহারাই অতঃপর বংশবৃদ্ধি করিয়া—'লোকা আপূরিতা স্ত্রয়ঃ'—পুত্র-পৌত্রাদিতে ত্রিভুবন পূর্ণ করিয়া—দক্ষের অভিলাষ ও শ্রীকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ সফল করিল।

(৩)

দেবগণ-কর্ত্তৃক বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ

সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে ইন্দ্রের অপরাধে দেবগুরু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দেবতাগণের পৌরোহিত্য পরিত্যাগ এবং দেবগণ কর্ত্তৃক ঋষি বিশ্বরূপকে পুরোহিতরূপে বরণ এবং বিশ্বরূপ-কর্ত্তৃক ইন্দ্রকে নারায়ণকবচ প্রদান বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, একদিন দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাগণে পরিবৃত হইয়া শচীর সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন এমন সময় দেবগুরু বৃহস্পতি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

স যদা পরমাচার্য্যং দেবানামাত্মনশ্চহ
নাভ্যনন্দত সংপ্রাপ্তং প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ॥
বাচস্পতিং মুনিবরং সুরাসুর নমস্কৃতম্
নোচ্চচালাসনাদিন্দ্রঃ পশ্যন্নপি সভাগতম্ ॥
ততো নির্গত্য সহসা কবিরাঙ্গিরসঃ প্রভুঃ
আযযৌ স্বগৃহং তূষ্ণীং বিদ্বান্ শ্রীমদবিক্রিয়াম্ ॥ ৬।৭।৭-৯

—অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র তখন নিজ ও দেবতাগণের পরমগুরু-বৃহস্পতিকে আসন প্রদান করিলেন না, অভিনন্দন করিলেন না, নিজ সিংহাসন হইতে উঠিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। তখন বৃহস্পতি ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যমদে চিত্তবিকার হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন এবং অপমানের প্রতিবিধানে সমর্থ হইয়াও তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সহসা সেই সভা হইতে নির্গত হইয়া স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন।

গুরুর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রের চৈতন্য হইল, এবং তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, ঋষি-ক্রোধে ঐশ্বর্য্যনাশের আশঙ্কায় সভামধ্যে সকলের শ্রুতিগোচর করিয়া বলিলেন,

অথাহমমরাচার্য্যমগাধধিষণং দ্বিজম্,
প্রসাদয়িষ্যে নিশঠঃ শীর্ষ্ণা তচ্চরণং স্পৃশন্ ॥ ৬।৭।১৫

—আমি অপরাধ করিয়াছি, অতএব অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন দেবগুরু শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির চরণে আমার মাথা রাখিয়া আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিব।

কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের এই সঙ্কল্প অবগত হইয়া তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য অন্তর্দ্ধান-শক্তির প্রভাবে নিজগৃহ হইতে অদৃশ্য হইলেন। ইন্দ্র বৃহস্পতির দর্শন না পাইয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে অসুরগণ যখন শুনিল যে, বৃহস্পতি দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ রক্ষা-কবচ আর দেবতাগণকে বল, বীর্য্য ও প্রাণ প্রদান করিতেছে না, তখন তাহারা "আশ্রিত্যৌশনসং মতম্"—শত্রুগণের বিপদ হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে,—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের এই নীতি অবলম্বন করিয়া নানাবিধ অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড বিক্রমে দেবতাগণকে আক্রমণ করিল। গুরুপরিত্যক্ত দেবতাগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন দেহে পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির অবমাননা করার জন্য ব্রহ্মা দেবতাগণকে তিরস্কার করিলেন এবং তপস্বী ব্রাহ্মণ ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে গুরুপদে বরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু এই বিশ্বরূপের মাতামহকুল অসুরগণ; সুতরাং দেবতাগণের প্রতি তাঁহার অবিভক্ত স্নেহ ও প্রীতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে। তথাপি দেবতাগণ গুরুরূপ রক্ষক হইতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা বিশ্বরূপকেই গুরু বরণ করিতে মনস্থ করিলেন। দেবগণ বিশ্বরূপের নিকট যাইয়া বলিলেন,

বৃণীমহে ত্বোপাধ্যায়ং ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং গুরুম্,
যথাঞ্জসা বিজেষ্যামঃ সপত্নাংস্তব তেজসা ॥ ৬।৭।৩২

—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আপনাকে আমরা আচার্য্যরূপে বরণ করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ করিলে আমরা অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিব।

বিশ্বরূপ বেদজ্ঞ ও সাধক ছিলেন, তিনি দেবগণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত দেবগণ তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে আসেন নাই, অতি নীচ স্বার্থসিদ্ধির মনোবৃত্তি লইয়াই তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন। তাই তিনি প্রথমেই দেবতাগণকে বলিলেন,—"বিগর্হিতং ধর্ম্মশীলৈঃ ব্রহ্মবর্চ্চ উপব্যয়ম্"—ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ পৌরোহিত্য কর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু দেবতাগণ তাঁহার পিতৃপুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ, সুতরাং বিশ্বরূপ তাঁহাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। বিশ্বরূপ দেবতাগণের পুরোহিতরূপে বৃত হইয়া শত্রুবিজয় করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে নারায়ণকবচরূপ বৈষ্ণবী বিদ্যা প্রদান করিলেন।

এদিকে মহারাজ পরীক্ষিৎ শত্রুবিজয়ের অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ নারায়ণ-কবচের কথা শ্রবণ করিয়া কৌতূহলী হইয়া শ্রীশুকদেবের নিকট নারায়ণ-কবচের রহস্য ও সবিস্তার বর্ণনা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

> ভগবন্ তন্মমাখ্যাহি বর্ম্ম নারায়ণাত্মকম্
> যথা ততায়িনঃ শত্রূন্ যেন গুপ্তোঽজয়ন্মৃধে॥ ৬।৮।২

—হে ভগবন্ শুকদেব, যে নারায়ণকবচের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ইন্দ্র যুদ্ধে শস্ত্রপাণি শত্রু অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন, সেই নারায়ণকবচের কথা আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন।

আজ ক্ষত্রিয় মহারাজা পরীক্ষিৎ মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিয়াছেন; তথাপি, যে কবচের শক্তিতে শত্রুদমন করা যায় তাহা শ্রবণ করিবার জন্য সমুৎসুক! আজ শত্রুবিজয় করিবার কৌশল শিখিয়া তাঁহার কি লাভ হইবে! কিন্তু স্বভাব দুরতিক্রমণীয়—ক্ষত্রিয় রাজা সহজে স্বভাবকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না।

কিন্তু প্রভু শুকদেব আজ শরণাগত শিষ্যের সমস্ত বাসনা কামনা চরিতার্থ করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচরণে মতি দিবার জন্য আসিয়াছেন;

সুতরাং দয়ালু শুকদেব শিষ্যের প্রার্থনা পূরণ করিয়া সবিস্তারে নারায়ণ-কবচের রহস্য বর্ণনা করিলেন। ভয় উপস্থিত হইলে জয়কামী মানুষ স্নান সমাপন করিয়া পুনরায় হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক উত্তরমুখ হইয়া আসনে উপবেশন করিবে এবং কুশহস্তে আচমন করিয়া বাক্যসংযম পূর্ব্বক অষ্টাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর নারায়ণ মন্ত্রের দ্বারা যথাক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবার পর নারায়ণকবচ ধারণ করিবে। অষ্টাক্ষর মন্ত্র—'ওঁ নমো নারায়ণায়' এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র—'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' অতঃপর নিম্নলিখিত কবচমন্ত্র জপ করিতে হইবে।

ওঁ হরির্বিদধ্যান্মম সর্ব্বরক্ষাং ন্যস্তাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
পতগেন্দ্র পৃষ্ঠে,
দরারি চর্ম্মাসিগদেষু চাপপাশান্ দধানোঽষ্ট
গুণোঽষ্ট বাহুঃ ॥ ৬৮।১২

—গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে যাঁহার পাদপদ্ম বিন্যস্ত রহিয়াছে, যিনি অষ্টবাহু সমন্বিত, যিনি ঐ অষ্টবাহুতে শঙ্খ, চক্র, চর্ম্ম, অসি, গদা, বাণ, ধনু ও পাশ ধারণ করিয়া আছেন, এবং যিনি অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা শ্রীহরি আমার সর্ব্বপ্রকার রক্ষার বিধান করুন।

অতঃপর মৎস্যমূর্ত্তি, বটুবামন, নৃসিংহদেব, বরাহদেব, পরশুরাম, রামচন্দ্র প্রভৃতিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্মরণ করিতে হইবে। এইরূপে সমগ্র নারায়ণকবচের বিদ্যা অভ্যাস করিবার ফলে দেবগণ অসুরদিগকে পরাজিত করিতে পারিবেন। এই কবচ ধারণ করিলে

ন কুতশ্চিদ্ভয়ং তস্য বিদ্যাং ধারয়তো ভবেৎ
রাজদস্যুগ্রহাদিভ্যো ব্যাধ্যাদিভ্যশ্চ কর্হিচিৎ ॥ ৬৮।৩৭

—রাজা, দস্যু, গ্রহাদি এবং ব্যাধি প্রভৃতি কোনও কিছু হইতেই কখনও ভয় উপস্থিত হয় না। এমন কি, এই নারায়ণকবচ শ্রবণ করিলেও

জীব সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপের নিকট নারায়ণকবচ নামক বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে অসুরগণকে পরাজিত করতঃ ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিলেন।

(৪)

বৃত্রাসুরের উৎপত্তি, ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ ও বৃত্রাসুরের মৃত্যু

এই ষষ্ঠ স্কন্ধে নবম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বৃত্রাসুরের উৎপত্তি এবং তাহার সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ ও বজ্রের আঘাতে বৃত্রাসুরের মৃত্যু বর্ণনা করা হইয়াছে।

বিশ্বরূপ দেবতাগণের পুরোহিত হইয়া ইন্দ্রকে নারায়ণকবচ প্রদান করিলে দেবগণ যুদ্ধে জয়ী হইলেন এবং পরাজিত অসুরগণকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন—ইহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। পুরোহিত বিশ্বরূপ কিন্তু তাঁহার মাতামহকুলসম্ভূত অসুরগণকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তিনি যজ্ঞ করিবার সময় দেবগণের কল্যাণ কামনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন, অথচ অসুরগণের প্রতি অনুরাগ বশতঃ গোপনে তাঁহাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। পুরোহিতের এই কপটতা ইন্দ্র জানিতে পারিলেন এবং অসুরগণের শক্তিবৃদ্ধির আশঙ্কায় অনন্য-উপায় হইয়া বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল—এই বিচ্ছিন্ন তিনটি মস্তকের একটি চাতক পক্ষী এবং অপরটি চটক পক্ষী এবং তৃতীয়টি তিত্তির পক্ষী হইল। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা করিয়া এক বৎসর সেই পাপভার বহন করিলেন এবং তাহার পর ভূমি, বৃক্ষ, জল ও স্ত্রীগণকে সেই পাপভার সমভাবে ভাগ করিয়া দিয়া নিজে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত

হইলেন। এই পাপভার গ্রহণের ফলে পৃথিবীর স্থানে স্থানে মরুভূমি পরিদৃষ্ট হয়, বৃক্ষসমূহ হইতে নির্য্যাস নির্গত হয়, জলমধ্যে বুদবুদ ও ফেন দেখা যায় ও স্ত্রীলোকগণ প্রতিমাসে রজস্বলা হইয়া থাকে। ইন্দ্র পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন, কিন্তু বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা নিজ পুত্রের হত্যাকারী ইন্দ্রকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে ত্বষ্টা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন :

ইন্দ্রশত্রো! বিবর্দ্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বিষম্ ।৬।৯।১১

—হে ইন্দ্রবিনাশক, তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও এবং শীঘ্র শত্রুকে বিনাশ কর।

কিন্তু ত্বষ্টার উচ্চারণভেদ হওয়ায় ফল বিপরীত হইল,—যে বৃত্র নামক অসুর যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইল, সে ইন্দ্রকে বধ না করিয়া নিজেই নিহত হইল। যজ্ঞের এই বিপরীত ফল কেন হইল, তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "ইন্দ্রশত্রো"—এই সম্বোধন পদটির আদ্যস্বর যদি উদাত্ত অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে শব্দটি বহুব্রীহি সমাসভুক্ত হইয়া "ইন্দ্র যাহার শত্রু" এইরূপ অর্থ হয়; যদি আদ্যস্বর অনুদাত্ত অর্থাৎ ক্ষীণস্বরে উচ্চারিত হয় তাহা হইলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসভুক্ত হইয়া "ইন্দ্রের শত্রু" এইরূপ অর্থ হইয়া যায়। কিন্তু ত্বষ্টার উচ্চারণে ভুল হইল, তিনি উদাত্ত স্বরে পদটি উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন এবং এই বিরুদ্ধ উচ্চারণের ফলে অর্থের বিভিন্নতা ঘটিয়া যাইল। ত্বষ্টার উদ্দেশ্য ছিল "ইন্দ্রশত্রো" অর্থাৎ ইন্দ্রের শত্রু—তুমি ইন্দ্রকে বিনাশ কর, কিন্তু উচ্চারণের দোষে অর্থ হইয়া গেল—"ইন্দ্র যাহার শত্রু" অর্থাৎ "ইন্দ্র যাহার বিনাশক" সেই ইন্দ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের শত্রুকে নিহত করুক। যজ্ঞ অথবা পূজার সময় মন্ত্রের বিশুদ্ধ উচ্চারণের এতই প্রয়োজন। শ্রীধর স্বামী মহাশয় এই শ্লোকের টীকা করিয়া যাজক ও যজমান উভয়কেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।

—মন্ত্র যদি স্বর অথবা বর্ণের উচ্চারণের দোষে উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বজ্রসম মন্ত্র যজমানের কল্যাণ সাধন না করিয়া তাহাকেই নিধন করিয়া ফেলে,—যেমন 'ইন্দ্রশত্রু' কথাটির উচ্চারণের দোষে যজমানের অনিষ্ট হইয়াছিল।

এইরূপে উদ্দেশ্যবিচলিত মন্ত্র উচ্চারণের ফলে হোমাগ্নি হইতে কৃতান্তের ন্যায় এক ভীষণাকার অসুর উত্থিত হইল। ত্বষ্টার তপস্যা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া এই কৃষ্ণবর্ণ অসুরদেহে প্রকাশিত হইল এবং স্বীয় দেহ ও বীর্য্যের দ্বারা লোকসমূহ আবৃত করিয়া ফেলায় সেই অসুর ত্রিভুবনে বৃত্রাসুর নামে পরিচিত হইল। তখন ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ বৃত্রাসুরের প্রতি ধাবিত হইয়া তাহাকে নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু বৃত্রাসুর সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র অনায়াসে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন দেবতাগণ "বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বিষণ্ণাঃ গ্রস্ততেজসঃ"—বিস্মিত, বিষণ্ণ ও হতপ্রভ হইয়া পরমপুরুষ ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া দেবগণকে অথর্ব্ব মুনির পুত্র দধীচির শরণাপন্ন হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। দধীচি মুনি প্রসন্ন হইয়া যদি দেবগণকে তাঁহার অস্থি প্রদান করেন, তাহা হইলে সেই অস্থি হইতে নির্ম্মিত বজ্রের দ্বারা দেবতাগণ বৃত্রাসুরকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন।

ভগবান্ শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলে দেবগণ মহাত্মা দধীচির নিকট গমন করিয়া তাঁহার অস্থিসমূহ প্রার্থনা করিলে ঋষি দধীচি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিলেন। ঋষিপ্রদত্ত অস্থি দিয়া বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিলে ইন্দ্র ঐ বজ্র গ্রহণ করিয়া বৃত্রাসুরকে আক্রমণ করিলেন। তখন দুইদলে বিভক্ত ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ এবং বৃত্রপ্রমুখ অসুরগণের মধ্যে

ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু অসুরগণ প্রবল হইলেও তাহাদের জয়ের চেষ্টা বিফল হইয়া গেল।

সর্ব্বে প্রয়াসা অভবন্ বিমোঘাঃ কৃতাঃ কৃতা দেবগণেষু দৈত্যৈঃ
কৃষ্ণানুকূলেষু যথা মহৎসু ক্ষুদ্রৈঃ প্রযুক্তা রুষতী রূক্ষবাচঃ। ৬।১০।২৮

—মহৎ ব্যক্তিগণের প্রতি ক্ষুদ্রব্যক্তিগণ রোষযুক্ত কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা যেমন মহতের কোনও চিত্তবিকার সৃষ্টি করিতে পারে না, সুতরাং কর্কশবাক্য যেমন নিষ্ফল হইয়া যায়, সেইরূপ দেবগণের বিনাশের নিমিত্ত দৈত্যগণের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কারণ দেবতারা "কৃষ্ণানুকূলেষু"—দেবতাগণের প্রতি কৃষ্ণ অনুকূল ছিলেন।

এইরূপে বারংবার অসুরগণের প্রয়াস ব্যর্থ হইলে তাহারা হতাশ ও ধৈর্য্যহীন হইয়া বৃত্রাসুরকে পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ঋষি ত্বষ্টার পুত্রস্বরূপ এবং যজ্ঞ হইতে সমুত্থিত বৃত্রাসুর তখন পলায়নপর অসুরগণকে উদ্দেশ্য করিয়া তিরস্কারসূচক অথচ জ্ঞানগর্ভ নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। বৃত্রাসুর বলিল,

জাতস্য মৃত্যুর্ধ্রুব এব সর্ব্বতঃ প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহ কৢপ্তা।

—যে জন্মগ্রহণ করে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী,—কোন প্রকারেই ঐ মৃত্যুর প্রতিকার করা যায় না। অতএব প্রাণভয়ে পলায়ন করার মত মূর্খতা আর কিছুই নাই।

অথচ মৃত্যুকে উপযুক্তভাবে বরণ করিয়া লইলে সাধারণ পশুর মত জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু অধিকতর গৌরবের বিষয় হইয়া থাকে। বৃত্র বলিল,

দ্বৌ সম্মতাবিহ মৃত্যু দুরাপৌ যদ্ব্রহ্মসন্ধারণয়া জিতাসুঃ,
কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্ যদগ্রণীর্বীরশয়ে নিবৃত্তঃ। ৬।১০।৩৩

—এই সংসারে দুই প্রকার মৃত্যু শাস্ত্রসম্মত ও দুর্লভ। প্রথমতঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করিয়া যোগমার্গে ব্রহ্মধারণার দ্বারা কলেবর

পরিত্যাগ করা ; দ্বিতীয়তঃ, অগ্রণী হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুকে বরণ করা—এই দুই প্রকার মৃত্যুই পশুর ন্যায় প্রাণ ধারণ করা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রশংসনীয়।

এইরূপে মহাবীর ও মহাজ্ঞানী বৃত্রাসুর সারগর্ভ কথা বলিলেও তাহার অসুর অনুচরগণ সেই বাক্য গ্রহণ করিল না, প্রাণভয়ে ধাবমান পশুর মত তাহারা দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। অসংখ্য দেবতাগণ-পরিবৃত বৃত্রাসুর তখন যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী। বৃত্র দেখিল যে দেবগণ ভীত ও পলায়নপর অসুর-গণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। বৃত্রাসুর তখন দেবতাগণকে বলিল,

ন হি ভীতবধঃ শ্লাঘ্যো ন স্বর্গ্যঃ শূরমানিনাম্। ৬।১১।৪

—যাহারা আপনাকে বীর বলিয়া মনে করে তাহাদের পক্ষে ভীত ব্যক্তিকে বধ করা প্রশংসনীয় নহে এবং স্বর্গপ্রাপকও নহে। এই বলিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া বৃত্রাসুর দেবগণকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিল। তখন

তেন দেবগণাঃ সর্ব্বে বৃত্রবিস্ফোটনেন বৈ
নিপেতু র্মূর্চ্ছিতাঃ ভূমৌ যথৈবাশনিনা হতাঃ ॥
মমর্দ্দ পদ্ভ্যাং সুরসৈন্যমাতুরং নিমীলিতাক্ষং রণরঙ্গদুর্ম্মদঃ
গাং কম্পয়ন্নুদ্যতশূলঃ ওজসা নালং বনং যূথপতির্যথোন্মদঃ ॥

৬।১১।৭,৮

—অর্থাৎ বৃত্রাসুরের সেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জন ও আস্ফালনসূচক হাত-তালির শব্দে দেবগণ বজ্রাহতের মত মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

গজরাজ যেমন মদমত্ত হইয়া নলবনকে বিমর্দ্দিত করে, সেইরূপ বৃত্রাসুর রণরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া শূল উত্তোলন পূর্ব্বক সবলে পৃথিবীকে

ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু অসুরগণ প্রবল হইলেও তাহাদের জয়ের চেষ্টা বিফল হইয়া গেল।

সর্ব্বে প্রয়াসা অভবন্ বিমোঘাঃ কৃতাঃ কৃতা দেবগণেষু দৈত্যৈঃ
কৃষ্ণানুকূলেষু যথা মহৎসু ক্ষুদ্রৈঃ প্রযুক্তা রুষতী রূক্ষবাচঃ। ৬।১০।২৮

—মহৎ ব্যক্তিগণের প্রতি ক্ষুদ্রব্যক্তিগণ রোষযুক্ত কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা যেমন মহতের কোনও চিত্তবিকার সৃষ্টি করিতে পারে না, সুতরাং কর্কশবাক্য যেমন নিষ্ফল হইয়া যায়, সেইরূপ দেবগণের বিনাশের নিমিত্ত দৈত্যগণের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কারণ দেবতাগণ "কৃষ্ণানুকূলেষু"—দেবতাগণের প্রতি কৃষ্ণ অনুকূল ছিলেন।

এইরূপে বারংবার অসুরগণের প্রয়াস ব্যর্থ হইলে তাহারা হতাশ ও ধৈর্য্যহীন হইয়া বৃত্রাসুরকে পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ঋষি ত্বষ্টার পুত্রস্বরূপ এবং যজ্ঞ হইতে সমুত্থিত বৃত্রাসুর তখন পলায়নপর অসুরগণকে উদ্দেশ্য করিয়া তিরস্কারসূচক অথচ জ্ঞানগর্ভ নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। বৃত্রাসুর বলিল,

জাতস্য মৃত্যুর্ধ্রুব এব সর্ব্বতঃ প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহ কৢপ্তা।

—যে জন্মগ্রহণ করে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী,—কোন প্রকারেই ঐ মৃত্যুর প্রতিকার করা যায় না। অতএব প্রাণভয়ে পলায়ন করার মত মূর্খতা আর কিছুই নাই।

অথচ মৃত্যুকে উপযুক্তভাবে বরণ করিয়া লইলে সাধারণ পশুর মত জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু অধিকতর গৌরবের বিষয় হইয়া থাকে। বৃত্র বলিল,

দ্বৌ সম্মতাবিহ মৃত্যূ দুরাপৌ যদ্ব্রহ্মসন্ধারণয়া জিতাসুঃ,
কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্ যদগ্রণীর্বীরশয়ে নিবৃত্তঃ। ৬।১০।৩৩

—এই সংসারে দুই প্রকার মৃত্যু শাস্ত্রসম্মত ও দুর্ল্লভ। প্রথমতঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করিয়া যোগমার্গে ব্রহ্মধারণার দ্বারা কলেবর

পরিত্যাগ করা; দ্বিতীয়তঃ, অগ্রণী হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুকে বরণ করা—এই দুই প্রকার মৃত্যুই পশুর ন্যায় প্রাণ ধারণ করা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রশংসনীয়।

এইরূপে মহাবীর ও মহাজ্ঞানী বৃত্রাসুর সারগর্ভ কথা বলিলেও তাহার অসুর অনুচরগণ সেই বাক্য গ্রহণ করিল না, প্রাণভয়ে ধাবমান পশুর মত তাহারা দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। অসংখ্য দেবতাগণ-পরিবৃত বৃত্রাসুর তখন যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী। বৃত্র দেখিল যে দেবগণ ভীত ও পলায়নপর অসুর-গণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। বৃত্রাসুর তখন দেবতাগণকে বলিল,

ন হি ভীতবধঃ শ্লাঘ্যো ন স্বর্গ্যঃ শূরমানিনাম্। ৬।১১।৪

—যাহারা আপনাকে বীর বলিয়া মনে করে তাহাদের পক্ষে ভীত ব্যক্তিকে বধ করা প্রশংসনীয় নহে এবং স্বর্গপ্রাপকও নহে। এই বলিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া বৃত্রাসুর দেবগণকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিল। তখন

তেন দেবগণাঃ সর্ব্বে বৃত্রবিস্ফোটনেন বৈ
নিপেতু র্মূর্চ্ছিতাঃ ভূমৌ যথৈবাশনিনা হতাঃ ॥
মমর্দ্দ পদ্ভ্যাং সুরসৈন্যমাতুরং নিমীলিতাক্ষং রণরঙ্গদুর্ম্মদঃ
গাং কম্পয়ন্নুদ্যতশূলঃ ওজসা নালং বনং যূথপতির্যথোন্মদঃ ॥
৬।১১।৭,৮

—অর্থাৎ বৃত্রাসুরের সেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জন ও আস্ফালনসূচক হাত-তালির শব্দে দেবগণ বজ্রাহতের মত মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

গজরাজ যেমন মদমত্ত হইয়া নলবনকে বিমর্দ্দিত করে, সেইরূপ বৃত্রাসুর রণরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া শূল উত্তোলন পূর্ব্বক সবলে পৃথিবীকে

কম্পিত করিয়া মূর্চ্ছায় মুদ্রিতনয়ন ও কাতর দেবসৈন্যগণকে পদদ্বয়ের দ্বারা মর্দ্দন করিতে লাগিল।

দেবতাগণকে এইরূপ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্র ঐরাবতে চড়িয়া বৃত্রাসুরকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু বৃত্রাসুরের গদার আঘাতে ঐরাবতের মুখ ফাটিয়া গেল এবং সে রক্ত বমন করিতে করিতে আটাশ হাত দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। ইন্দ্রের এই বিপদের সময় কিন্তু বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে পুনরায় আঘাত করিল না। এই স্থলে শ্রীশুকদেব বৃত্রাসুরকে "মহাত্মা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইন্দ্রকে পুনরায় যুদ্ধে আহ্বান করিয়া বৃত্রাসুর স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিয়া শ্রীহরির দর্শনলাভের আশায় সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া বলিল,

অহং হরে, তব পাদৈকমূল-দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ,
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতি কায়ঃ ॥
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাতিপত্যম্,
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস, ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥
অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণাঃ মনোঽরবিন্দাক্ষ !
দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥ ৬।১১।২৪-২৬

—হে হরি, আমি পুনরায় আপনার চরণাশ্রিত দাসগণের দাস হইব। আমার প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের অধিপতি আপনার গুণসমূহ আমার মন অহরহ স্মরণ করুক, বাক্ আপনার গুণসমূহ কীর্ত্তন করুক, এবং এই শরীর আপনার পূজা করুক।

হে সর্ব্বসৌভাগ্যস্বরূপ, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ধ্রুবলোক, ব্রহ্মলোক, সাম্রাজ্য, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধিসমূহ এবং মুক্তি —এই সকলের কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না।

—হে কমললোচন, অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া যেমন মাতার দর্শন কামনা করে, রজ্জুবদ্ধ গোবৎসগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া যেমন স্তন্য পানের অভিলাষ করে, পতিবিরহে দুঃখিতা স্ত্রীলোক যেমন দূরদেশগত পতির সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ আমার মন আপনাকে দর্শন করিতে ব্যাকুল হইয়াছে।

এই শ্লোকটির ভিতর দিয়া ত্বষ্টার যজ্ঞসমুৎপন্ন পুণ্যশক্তি, বৃত্রাসুরের দেহ পরিগ্রহ করিয়া, শুদ্ধাভক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছে। দেখা যাইতেছে, বৃত্রাসুরের দেহে আত্মবুদ্ধি নাই; জয়-পরাজয়, জীবন-মৃত্যু সমান হইয়া গিয়াছে; একমাত্র পরমপুরুষ ভগবান্ তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

ইহাই শুদ্ধা ভক্তি, ইহাই অহেতুকী ভক্তি। এই ভক্তির উজ্জ্বল প্রকাশে ক্ষতবিক্ষতদেহ বৃত্রাসুর যুদ্ধক্ষেত্র আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দেবরাজ ইন্দ্র তাহার সম্মুখে ম্লান হইতেও ম্লানতর হইয়া গিয়াছেন।

এইরূপে ভগবৎ-প্রাপ্তির আশায় ব্যাকুল হইয়া বৃত্রাসুর ক্ষণকাল পরে চিন্তা করিয়া দেখিল যে, যুদ্ধে জয়ী হইলে ভগবৎ-প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটিয়া যাইবে, মৃত্যুই তাহার পক্ষে শীঘ্র ভগবৎ-প্রাপ্তির সহায়ক—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বৃত্রাসুর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ইন্দ্রকে পুনরায় যুদ্ধে আহ্বান করিল। তখন ইন্দ্র বজ্রের আঘাতে বৃত্রাসুরের একটি হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বৃত্র অপর হস্তের দ্বারা লৌহ নির্ম্মিত মুদ্গর নিক্ষেপ করিলে—"বজ্রঞ্চ হস্তাৎ ন্যপতৎ মঘোনঃ"—ইন্দ্রের হস্ত হইতে বজ্র স্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইল। ইন্দ্রের এই দুরবস্থা দেখিয়া দেবগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। লজ্জায় ইন্দ্র পুনরায় অস্ত্র গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া মহাবীর বৃত্রাসুর গভীর জ্ঞানসম্ভূত নানাবিধ তত্ত্বকথা ইন্দ্রকে বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিল। বৃত্র বলিল,

যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ
এবম্ভূতানি মঘবন্ ঈশতন্ত্রানি বিদ্ধি ভোঃ ॥
আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যমাশিষঃ পুরুষস্য যাঃ,
ভবন্ত্যেব হি তৎকালে যথানিচ্ছোর্বিপর্য্যয়াঃ ॥
তস্মাদকীর্ত্তি যশসোর্জয়াপজয়য়োরপি,
সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুজীবিতয়োস্তথা ॥
পশ্য মাং নির্জ্জিতং শক্র ! বৃক্নায়ুধভুজং মৃধে
ঘটমানং যথাশক্তি তব প্রাণজিহীর্ষয়া ॥ ৬।১২।১০-১৬

—হে ইন্দ্র, যেমন কাষ্ঠ-নির্ম্মিত নারীপ্রতিমা পরাধীন, পত্র-নির্ম্মিত পশু যেমন পরাধীন, সেইরূপ প্রাণিগণকে মহাকালস্বরূপ ভগবানের অধীন বলিয়া জানিবে।

সেই পরমপুরুষ ভগবানের অনুগ্রহেই জীবের আয়ু, শ্রী, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে, আবার তাঁহারই ইচ্ছায় জীবের দুর্ভাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। যেহেতু সকলই ঈশ্বরাধীন, অতএব কীর্ত্তি-অকীর্ত্তি, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ এবং জীবন-মরণেও জীবের হর্ষ-বিষাদ পরিত্যাগ করা উচিত।

হে ইন্দ্র, আমাকে দেখ ;—আমার অস্ত্র ও বাহু ছিন্ন হইয়াছে, আমি তোমাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি,—তথাপি যুদ্ধে তোমার প্রাণসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি। অতএব তুমি আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন হইয়া যুদ্ধে উদ্যম প্রকাশ কর।

বৃত্রাসুরের এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের চৈতন্য হইল এবং তিনি নিজের মনোভাবে লজ্জিত হইয়া বলিলেন,

ভবান্ অতার্ষীন্মায়াং বৈ বৈষ্ণবীং জনমোহিনীম্,
যদ্বিহায়াসুরং ভাবং মহাপুরুষতাং গতঃ ॥

খল্বিদং মহদাশ্চর্য্যং যদ্রজঃ প্রকৃতেস্তব
বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বাত্মনি দৃঢ়া মতিঃ ॥
যস্য ভক্তির্ভগবতে হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে,
বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ ॥

৬।১২।২০-২২

—হে বৃত্র, যেহেতু তুমি আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া ভাগবতগণের স্বভাব লাভ করিয়াছ, অতএব তুমি জনমোহিনী বৈষ্ণবীমায়াকে অতিক্রম করিয়াছ।

ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তুমি রাজসিক স্বভাব সম্পন্ন হইলেও তোমার মতি সত্ত্বময় ভগবান্ বাসুদেবে দৃঢ় হইয়াছে।

মুক্তিপ্রদ ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি যাহার ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার ক্ষুদ্র স্বর্গাদি সুখে প্রয়োজন কি? অমৃতসমুদ্রে ক্রীড়াকারী ব্যক্তির ছোট খানাডোবার জলে প্রয়োজন কি?

এই শ্লোকগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভক্তিপরায়ণ বৃত্রাসুরের সঙ্গজাত সৌভাগ্য হইতে স্বর্গকামী ও স্বর্গভোগী দেবরাজ ইন্দ্র জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন এবং হরিভক্তিপরায়ণ ছিন্নবিচ্ছিন্নদেহ বৃত্রাসুর যে বজ্রধর দেবরাজ হইতেও মহৎ, তাহা ইন্দ্র উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। অতঃপর দুইজনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তখন

বৃত্রস্য দেহাৎ নিষ্ক্রান্তং আত্মজ্যোতিররিন্দম!
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং অলোকং সমপদ্যত ॥ ৬।১২।৩৫

—হে শত্রুদমন পরীক্ষিৎ, তখন বৃত্রের দেহ হইতে নির্গত জীবনামক জ্যোতিঃ দেবগণের সমক্ষে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব ইন্দ্রের বৃত্রাসুর হত্যা জনিত পাপ, পাপভয়ে পলায়ন এবং পাপমুক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব বলিলেন

যে, প্রথমতঃ ব্রহ্মহত্যার ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিতে সম্মত হন নাই। ঋষিগণ ও দেবগণ বৃত্রাসুরের বিক্রমে উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার বধের নিমিত্ত ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিলে ইন্দ্র বলিয়াছিলেন,

স্ত্রী-ভূদ্রুমজলৈঃ এনঃ বিশ্বরূপবধোদ্ভবম্
বিভক্তমনুগৃহ্ণদ্ভিঃ বৃত্রহত্যাং ক্ব মার্জ্‌ম্যহম্ ॥ ৬।১৩।৫

—অর্থাৎ একবার বিশ্বরূপকে বধ করায় আমার যে ব্রহ্মহত্যা-পাপ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্ত্রী, ভূমি, বৃক্ষ ও জল অনুগ্রহপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এখন আবার বৃত্রকে হত্যা করিলে সেই পাপ আমি কোথায় প্রক্ষালন করিব ?

তখন ইন্দ্রকে সাহস দিয়া ঋষিগণ বলিয়াছিলেন,

যাজয়িষ্যাম ভদ্রং তে হয়মেধেন মাস্ম ভৈঃ ॥ ১৬।১৩।৬

—হে ইন্দ্র, তুমি ভয় করিও না, তোমার মঙ্গল হইবে। আমরা তোমাকে দিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইব।

কিন্তু বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ইন্দ্র মনে শান্তি পাইলেন না।—একে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ, উপরন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবীর বৃত্রাসুরের জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি ইন্দ্রের স্মৃতিগোচর হওয়ায়, তিনি পরমভাগবত বৃত্রাসুরকে হত্যা করিয়া অনুক্ষণ অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এদিকে মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মহত্যা চণ্ডালীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া ইন্দ্রকে অহরহ অনুসরণ করিতে লাগিল। ব্রহ্মহত্যার যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা ভীষণ এবং ভয়প্রদ।

তাং দদর্শানুধাবন্তীং চণ্ডালীমিব রূপিনীম্,
জরয়া বেপমানাঙ্গীং যক্ষ্মগ্রস্তামসৃক্‌পটাম্ ॥
বিকীর্য্য পলিতান্ কেশাংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষিণীম্
মীনগন্ধ্যসুগন্ধেন কুর্ব্বতীং মার্গদূষণম্ ॥ ৬।১৩।১২,১৩

—ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন,—ঐ ব্রহ্মহত্যা মূর্ত্তিমতী চণ্ডালীর ন্যায় তাঁহার অনুধাবন করিতেছে, ঐ চণ্ডালীরূপিণী ব্রহ্মহত্যার শরীর জরা হেতু কম্পিত হইতেছে; সে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, সুতরাং অস্বাভাবিক বিবর্ণ, এবং তাহার পরিধেয় বসন রক্তময়।

ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন যে, ঐ চণ্ডালী ব্রহ্মহত্যা নিজ শুভ্রকেশ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া "দাঁড়াও, দাঁড়াও" বলিয়া চীৎকার করিতেছে এবং মাছের গায়ের গন্ধের মত তাহার নিশ্বাসবায়ুর গন্ধে সমস্ত স্থান দুর্গন্ধে দূষিত হইয়া উঠিতেছে।

কি ভয়ঙ্কর চিত্র! মহাকবি শ্রীশুকদেব ব্যতীত নরহত্যার এরূপ ত্রাসজনক এবং বিভীষিকাময় চিত্র অপর কাহারও পক্ষে অঙ্কন করা সম্ভবপর ছিল না। শব্দযোজনা, ভাববিন্যাস ও ছন্দসামঞ্জস্যে এই শ্লোকগুলি যেন জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক অখণ্ড বীভৎসরসের সৃষ্টি করিয়াছে। ইন্দ্র এই ভীষণা মূর্ত্তিকে দর্শন করিয়া পরিত্রাণের জন্য মানস সরোবরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় অলক্ষিত ভাবে পদ্মনালের তন্তুকে আশ্রয় করিয়া হৃদয়ে ভগবৎচিন্তন করিতে করিতে সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

এই দীর্ঘকাল স্বর্গের শূন্য সিংহাসন "বিদ্যাতপোযোগবলানুভাবঃ"— বিদ্যা, তপস্যা ও যোগবল প্রভাবসম্পন্ন নহুষ অধিকার করিয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অতুলসম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের মত্ততায় তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইল। এইখানে শ্রীশুকদেব ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, বিদ্যা, তপস্যা ও যোগবল সবই অপক্কবুদ্ধি মানব ও যোগীর পক্ষে নিশ্রেয়সকর হয় না, মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় দীর্ঘকালের সমস্ত সাধনাই হয়ত ভাসিয়া যায়। ঐশ্বর্য্য-ভোগ হইতে স্বভাবতঃই সমুৎপন্ন রূপপিপাসা নহুষের দৃষ্টিকে ইন্দ্রমহিষী শচীর প্রতি আকৃষ্ট করিল এবং তাহার ফলে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া নহুষ সর্পযোনি প্রাপ্ত হইলেন। ঘটনাটি এইরূপ ঃ

রাজার অভাবে স্বর্গধামে বিশৃঙ্খলা দেখিয়া দেব ও ঋষিগণ খ্যাতনামা, বিদ্বান্ ও যোগীবর নহুষকে দেবরাজের পদে বরণ করিলেন। ঐশ্বর্য্যের কি অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি ! স্বর্গের রাজা হইয়াই নহুষ আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া হিতাহিত বিবেকজ্ঞান হারাইয়া একদিন শচীদেবীকে একান্তে বলিলেন—আমিই ইন্দ্র, আমাকে ভজনা কর। নহুষের বাক্যে ভীতা হইয়া শচীদেবী দেবগুরু বৃহস্পতিকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। পরে বৃহস্পতির পরামর্শে শচীদেবী নহুষকে বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণ বহন করে এইরূপ শিবিকায় আরোহণ করিয়া আপনি আগমন করিলে আমি আপনাকে ভজনা করিব। নহুষ আনন্দিত হইলেন এবং অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণকে শিবিকাবহনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং শিবিকায় আরোহণ করতঃ শচীসমীপে আসিতে লাগিলেন। নহুষের তখন লেশমাত্র বিলম্ব সহ্য হইতেছে না, সুতরাং দ্রুতগমনের জন্য অধৈর্য্য হইয়া পথিমধ্যে "শীঘ্রং সর্প সর্প" অর্থাৎ দ্রুত চল, বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে তাড়না করিলেন এবং অগস্ত্যকে নিকটে পাইয়া তাঁহাকে নিজপদের দ্বারা আঘাত করিয়া শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন অগস্ত্য কুপিত হইয়া "তুমি সর্প হও"—এই বলিয়া নহুষকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ নহুষ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া বৃহৎ অজগররূপ ধারণ করিয়া দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে সহস্রবৎসর তপস্যা ও ভগবৎ স্মরণের দ্বারা ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্র পুনরায় স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলেন।

(৫)

বৃত্রাসুরের পূর্ব্বজন্মের কাহিনী

এই ষষ্ঠ স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত রাজা চিত্রকেতুর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।—এই বৃত্রাসুর পূর্ব্বজন্মে রাজা চিত্রকেতুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বৃত্রাসুরের ভগবৎ-ভক্তি ও জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল; তিনি শুকদেবকে বলিলেন,

> রজস্তমঃ স্বভাবস্য ব্রহ্মন্! বৃত্রস্য পাপ্মনঃ,
> নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্দৃঢ়া মতিঃ ॥
> দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাম্,
> ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥ ৬।১৪।১,২

—হে ব্রহ্মন্! রাজস ও তামসপ্রকৃতি পাপী বৃত্রাসুরের ভগবান্ নারায়ণে কি প্রকারে দৃঢ়া মতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল ?

অসুরের তো দূরের কথা, শুদ্ধচিত্ত দেবগণের এবং নির্ম্মলান্তঃকরণ ঋষিগণেরও নারায়ণের চরণে প্রায়ই এরূপ ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের মধ্যে কৌতূহল তো আছেই, উপরন্তু প্রচ্ছন্ন আশাও রহিয়াছে যে, অসুরের হৃদয়ে যদি নারায়ণের প্রতি ভক্তিসঞ্চার হইতে পারে, তাহা হইলে বিষয়ভোগী পরীক্ষিৎও হয়ত মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া মুক্তির অধিকারী হইতে পারিবেন।

রাজা পরীক্ষিতের এই স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার জন্য শ্রীশুকদেব রাজা চন্দ্রকেতুর উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া বলিলেন,

আসীদ্রাজা সার্ব্বভৌমঃ শূরসেনেষু বৈ নৃপ!
চিত্রকেতুরিতি খ্যাতো যস্যাসীৎ কামধুঙ্‌মহী॥ ৬।১৪।১০

—হে রাজন্, শূরসেনদেশে চিত্রকেতু নামে বিখ্যাত এক সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে পৃথিবী সমস্ত কাম্য বস্তু প্রদান করিত, সুতরাং প্রজাগণের কোন অভাব বা অভিযোগ ছিল না।

এই চিত্রকেতুর অসংখ্য ভার্য্যা ছিল, অথচ দৈবযোগে তাঁহার সকল পত্নীই বন্ধ্যা বলিয়া তাঁহার কোন সন্তান হইল না। সুতরাং "সম্পন্নস্য গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ চিন্তা বন্ধ্যাপতেরভূৎ"—সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও বন্ধ্যা রমণীগণের পতি হওয়ায় রাজার মনে দুশ্চিন্তার উদয় হইল এবং

ন তস্য সম্পদঃ সর্ব্বাঃ মহিষ্যো বামলোচনাঃ
সার্ব্বভৌমস্য ভূশ্চেয়মভবন্ প্রীতিহেতবঃ॥ ৬।১৪।১৩

—সকল সম্পদ, সুলোচনা মহিষীগণ ও এই সসাগরা পৃথিবী সেই সার্ব্বভৌম রাজার প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিল না।

এইরূপে মনোদুঃখে দিন যাপন করিতে করিতে একদিন রাজার সৌভাগ্যোদয় হইল,—তাঁহার প্রাসাদে ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতির দ্বারা সুপূজিত হইয়া ঋষি সুখাসীন হইলেন এবং রাজাকে কুশল প্রশ্নাদি করিয়া বলিলেন,

যস্যাত্মানুবশশ্চেৎ স্যাৎ সর্ব্বে তদ্বশগা ইমে,
লোকাঃ সপালাঃ যচ্ছন্তি সর্ব্বে বলিমতন্দ্রিতাঃ॥
আত্মনঃ প্রীয়তে নাত্মা পরতঃ স্বত এব বা,
লক্ষয়েঽলব্ধকামং ত্বাং চিন্তয়া শবলং মুখম্॥ ৬।১৪।২০-২১

—হে রাজন্, তোমার মন বশীভূত আছে ত? যাহার নিজের মন বশীভূত থাকে, সেই রাজার স্ত্রী, প্রজা, অমাত্য, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই বশীভূত হয়। সমস্ত লোকপালগণ এরূপ রাজার পূজা করিয়া থাকে।

কিন্তু আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, তোমার মুখ চিন্তায় বিবর্ণ, তুমি অভিলষিত বস্তু হইতে বঞ্চিত বলিয়া মনে হইতেছে। তোমার মনের এই অশান্তি স্বভাবতঃই হইয়াছে, অথবা অপর কোনও বাহিরের কারণে হইয়াছে, তাহা আমাকে বল।

ঋষি সবই জানিতেন, তথাপি রাজার মুখ হইতে কারণটি শুনিবার জন্য এই প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। রাজা জ্ঞানী ছিলেন সুতরাং বলিলেন, "কিং ন বিদিতং তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ"—তপস্যা, জ্ঞান ও সমাধির দ্বারা ঋষি সমস্তই অবগত আছেন, তথাপি রাজা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, "সাম্রাজ্যৈশ্বর্য্যসম্পদঃ ন নন্দয়ন্ত্যপ্রজং মাং ক্ষুত্তৃট্কামমিবাপরে"—ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তিকে যেমন মাল্য-চন্দনাদি আনন্দ প্রদান করিতে পারে না, সেইরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যও অপুত্রক রাজাকে সুখ প্রদান করিতে পারিতেছে না। অতএব "যথা তরেম দুষ্পারং প্রজয়া তদ্বিধেহি নঃ" —যাহাতে পুত্রের দ্বারা রাজা পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন, ঋষি অনুগ্রহ করিয়া তাহার বিধান করুন। রাজার এই কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া দীনবৎসল অঙ্গিরা ঋষি চরুপাক করিলেন এবং রাজার প্রথমা পত্নী কৃতদ্যুতিকে সেই চরুর কিয়দংশ ভোজন করিতে দিলেন। অতঃপর সর্ব্বজ্ঞ ঋষি প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে রাজাকে বলিয়া যাইলেন—"ভবিতৈকভবাত্মজঃ হর্ষশোকপ্রদস্তভ্যং"—রাজন্, তোমার একটি পুত্র হইবে এবং সেই পুত্রটি তোমাকে হর্ষ এবং শোক উভয়ই প্রদান করিবে। এই নিগূঢ় বাক্যের দ্বারা ভগবান্ অঙ্গিরা ইহাই ইঙ্গিত করিলেন যে, পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া রাজাকে আনন্দ প্রদান করিবে, কিন্তু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সেই পুত্রই রাজার শোকের কারণ হইবে। কিন্তু আমরা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব যে, ঋষির এই বাক্যগুলি সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশে সাধারণ বিষয়ভোগী লোকের মনের ও জীবনের অবস্থা প্রকাশিত করিতেছে। গৃহীর কুটীরে অথবা রাজার প্রাসাদে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেই

শঙ্খের আনন্দধ্বনির দ্বারা গৃহীর মনের আনন্দ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়া থাকে—ইহাই সংসারের নিত্যকালের চিত্র। আবার, অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই আনন্দদায়ক পুত্র কালক্রমে অশেষ দুঃখ ও অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হয়ত উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করিল না, পিতামাতার অবাধ্য হইল, সমাজে নিন্দনীয় হইয়া প্রতিবাসিগণের উৎকণ্ঠার কারণ হইল, চিররুগ্ন হইয়া পিতামাতাকে অনুক্ষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিল, অথবা অকালমৃত্যুতে পতিত হইয়া আত্মীয় স্বজনকে শোকে অভিভূত করিল। ইহার মধ্যে যে কোন একটি কারণ গৃহীর সংসারে প্রায়ই আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং ঋষির কথাগুলি—"তবাত্মজঃ হর্ষ-শোকপ্রদস্তভ্যং"—তোমার পুত্র তোমাকে হর্ষ ও শোক উভয়ই প্রদান করিবে—আমরা সকলেই আপেক্ষিক কম বা অধিক মাত্রায় আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রযোজ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষি চলিয়া যাইলেন, কৃতদ্যুতি গর্ভধারণ করিলেন, এবং যথাসময়ে পিতা ও মাতার আনন্দবর্দ্ধন করিয়া এক সুকুমার পুত্র জন্মগ্রহন করিল। "যথা নিঃস্বস্য কৃচ্ছ্রাপ্তে ধনে স্নেহোঽন্ববর্দ্ধত"—বহুকষ্টে উপার্জ্জিত ধনের প্রতি দরিদ্র ব্যক্তির আসক্তি যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেইরূপ রাজর্ষি চিত্রকেতুও দিন দিন পুত্রের প্রতি অধিকতর আসক্ত হইয়া পড়িলেন। এই স্থানে শুকদেব চিত্রকেতুকে রাজর্ষি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—এই "রাজর্ষি" শব্দের ব্যঞ্জনা সহজেই অনুমেয়। যিনি অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ঋষি, গুরু ও দেবতার প্রতি ভক্তিমান্, সেই রাজর্ষিও পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া দিন দিন সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িতেছেন,—অন্যাপরে কা কথা। পুত্রস্নেহ এতই অন্ধ ও মোহজনক!

দিন কাটিতে লাগিল—রাজা ও রাণীর আনন্দের সীমা নাই। এদিকে চিত্রকেতুর অন্যান্য মহিষীগণ কৃতদ্যুতির পুত্র ও তজ্জনিত আনন্দ লক্ষ্য করিয়া অতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইল এবং একদিন গোপনে "গরং দদুঃ

কুমারায়”—বালককে বিষপ্রদান করিয়া মারিয়া ফেলিল। রাজকুমারকে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া চতুর্দ্দিকে মহান্ কোলাহল ও বিলাপধ্বনি উত্থিত হইল, এবং কৃতদ্যুতির সপত্নীগণও গভীর দুঃখের ভান করিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সমগ্র রাজপ্রাসাদে দেখা দিল কী দীনতা ও শোকের অভিব্যক্তি! রাজা চিত্রকেতু পুত্রশোকে চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার কেশ ও বসন স্খলিত হইল, তিনি ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মৃতবালকের পাদমূলে পতিত হইলেন। রাণী কৃতদ্যুতি শোকে জ্ঞানহারা হইয়া বিধাতাকে নিন্দা করিয়া বলিলেন,

অহোবিধাতস্ত্বমতীব বালিশো যস্ত্বাত্মসৃষ্ট্যপ্রতিরূপমীহসে,
পরে নু জীবত্যপরস্য যা মৃতির্ব্বিপর্য্যয়শ্চেৎ ত্বমসি ধ্রুবঃ পরঃ ॥

৬।১৪।৫৪

—হে বিধাতা, তুমি নিশ্চয়ই অতিশয় মূর্খ, কারণ তুমি নিজ সৃষ্টির প্রতিকূল আচরণ করিয়া জীব সৃষ্টি করিয়াই শৈশবে তাহাকে বিনাশ করিতেছ। পিতামাতা জীবিত থাকিতে সন্তানের যে মৃত্যু হয় তাহা তোমার মূর্খতা অথবা প্রাণিগণের প্রতি শত্রুতা—এই দুইটির যে কোনও একটি কারণে ঘটিয়া থাকে।

এইরূপে শোকে অন্ধ হইয়া বিধাতাকে দোষ দিয়া রাণী কৃতদ্যুতি মৃত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া দীনের ন্যায় করুণ বচনে বলিতে লাগিলেন,

ত্বং তাত! নার্হসি চ মাং কৃপণামনাথাং ত্যক্তুং
বিচক্ষ্ব পিতরং তব শোকতপ্তম্,
অঞ্জস্তরেম ভবতাপ্রজদুস্তরং য-দ্ধান্তং ন যাহ্যকরুণেন যমেন দূরম্ ॥
উত্তিষ্ঠ তাত! তে ইমে শিশবো বয়স্যাঃ ত্বামাহ্বয়ন্তি নৃপনন্দন!
সংবিহর্ত্তুম্,
সুপ্তশ্চিরং হ্যশনয়া চ ভবান্ পরীতো ভুঙ্ক্ষ্ব স্তনং পিব
শুচো হর নঃ স্বকানাম্ ॥ ৬।১৪।৫৬,৫৭

—হে পুত্র, আমি দীনা ও অনাথা, আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। হে বৎস, তোমার শোকসন্তপ্ত পিতার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। পুত্রহীন জনগণের দুস্তরণীয় যে পুন্নাম নরক তাহা তোমার দ্বারা আমরা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব। অতএব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুর যমের সহিত দূরে যাইও না।

হে বৎস, গাত্রোত্থান কর; তোমার বয়স্য বালকগণ খেলা করিবার জন্য তোমাকে ডাকিতেছে। হে রাজকুমার, বহুক্ষণ শয়ন করিয়া আছ, তুমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছ, কিছু আহার কর, অথবা আমার স্তন পান কর। তুমি উঠিয়া আমাদের শোক দূর কর।

এইরূপে শোকে লুপ্তধৈর্য্য ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া রাজা ও রাণী রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে

এবং কশ্মলমাপন্নং নষ্টসংজ্ঞমনায়কম্,
জ্ঞাত্বাঙ্গিরা নাম ঋষিরাজগাম সনারদঃ ॥ ৬।১৪।৬১

—এইরূপে সকলকে শোকগ্রস্ত, অসহায় ও বিবেকবুদ্ধিহীন বুঝিতে পারিয়া ঋষি অঙ্গিরা দেবর্ষি নারদের সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে ঋষি অঙ্গিরা ও নারদকর্তৃক চিত্রকেতুর শোক অপনোদন ও তাঁহাকে উপদেশ প্রদান বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমেই ঋষিদ্বয় চিত্রকেতুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

কোঽয়ং স্যাৎ তব রাজেন্দ্র! ভবান্ যমনুশোচতি,
ত্বঞ্চাস্য কতমঃ সৃষ্টৌ পুরেদানীমতঃ পরম্ ॥
যথা প্রযান্তি সংযান্তি স্রোতোবেগেন বালুকাঃ
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ॥
বয়ঞ্চ ত্বঞ্চ যে চেমে তুল্যকালাশ্চরা চরাঃ
জন্মমৃত্যোর্যথা পশ্চাৎ প্রাঙ্‌নৈবমধুনাপি ভোঃ ॥৬।১৫।২-৫

—হে রাজেন্দ্র, তুমি যাহার জন্য শোক করিতেছ সেই মৃত শিশুর পূর্ব্ব জন্মে, বর্ত্তমান জন্মে ও ভবিষ্যৎ জন্মে তোমার সহিত কোনও সম্বন্ধ ছিল না এবং থাকিবে না। এই শিশু তোমার কেহ নয় এবং তুমিও তাহার কেহ নহ।

হে রাজন্, যেমন স্রোতের বেগে বালুকারাশি মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ কালের বেগে জীবগণ জীবনে একত্র ও মৃত্যুতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

হে রাজন্, আমরা, তুমি ও চরাচর ভূতগণ সকলে যেমন বর্ত্তমানকালে বিদ্যমান আছি, সেইরূপ জন্মের পূর্ব্বেও ছিলাম, মৃত্যুর পরেও থাকিব। শরীর অনিত্য, জীব নিত্য। জীবের বিনাশ নাই, অতএব শোক করা উচিত নহে।

রাজা চিত্রকেতু এখনও ঋষিদ্বয়কে চিনিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন— "কৌ যুবাং জ্ঞানসম্পন্নৌ মহিষ্ঠৌ চ মহীয়সাম্"—আপনাদিগকে দেখিয়া জ্ঞানী এবং মহীয়ান অপেক্ষাও মহত্তর বলিয়া মনে হইতেছে। আপনারা দুইজন কে?

চিত্রকেতু আরও বলিলেন যে, "মাদৃশাং গ্রাম্যবুদ্ধীনাং বোধায়"— আমার মত গ্রাম্য বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণকে জ্ঞান প্রদান করিবার জন্য ঋষিগণ পৃথিবীতে যদৃচ্ছায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই বলিয়া দ্বাদশ শ্লোক হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত চারিটি শ্লোকে চিত্রকেতু এইরূপ দীনদয়াল মানববন্ধু যে সকল ঋষিগণের নাম করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে নারদ এবং অঙ্গিরাও উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চিত্রকেতু পরিচয় না পাইয়াও নারদ ও অঙ্গিরা ঋষির আগমন কল্পনা করিতে পারিয়াছেন।

কুমারো নারদঃ ঋভুরঙ্গিরা দেবলোঽসিতঃ
অপান্তরতমাঃ ব্যাসো মার্কণ্ডেয়োঽথ গৌতমঃ ॥

বশিষ্ঠো ভগবান্ রামঃ কপিলো বাদরায়ণিঃ
দুর্ব্বাসাঃ যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জাতুকর্ণস্তথারুণিঃ ॥
রোমশশ্চ্যবনো দত্ত আসুরিঃ সপতঞ্জলিঃ
ঋষির্ব্বেদশিরা ধৌম্যো মুনিঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ শ্রুতদেবঃ ঋতধ্বজঃ
এতে পরে চ সিদ্ধেশাশ্চরন্তি জ্ঞানহেতবঃ ॥ ৬।১৫।১২-১৫

এই যে চারিটি শ্লোকে মানবগণের প্রতি দয়াশীল ঋষিগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ভাষা, শব্দঝঙ্কার এবং ধর্ম্মজীবনের ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা-প্রভাবে অপূর্ব্ব ভাব এবং সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছে। ইঁহাদের নাম উচ্চারণ মাত্রেই পাপক্ষয় হইতেছে এবং ইঁহাদের ধর্ম্মসাধনার পুণ্যময় স্মৃতি শ্রোতার হৃদয়ে ধর্ম্মানুভূতির বিশুদ্ধ কৌতূহল সৃষ্টি করিতেছে। চিত্রকেতুর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ঋষি অঙ্গিরা তাঁহাদের উভয়ের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পূর্ব্বে ঋষি অঙ্গিরা একবার আসিয়া তাঁহার পুত্র কামনা সফল করিয়া গিয়াছিলেন। ঋষি বলিলেন,

তদৈব তে পরং জ্ঞানং দদামি গৃহমাগতঃ
জ্ঞাত্বান্যাভিনিবেশং তে পুত্রমেব দদাম্যহম্ ॥ ৬।১৫।২০

—পূর্ব্বে আমি যখন তোমাদের গৃহে আগমন করিয়াছিলাম, তখনই আমি তোমাকে পরমজ্ঞান প্রদান করিতাম; কিন্তু আমি তোমার পুত্র লাভ বিষয়ে আসক্তি আছে' বুঝিতে পারিয়া তখন পুত্রই প্রদান করিয়াছিলাম।

ঋষি অঙ্গিরার এই কথাগুলি প্রণিধান যোগ্য। আমরা অনেক সময় আপনার প্রকৃত কল্যাণ বুঝি না; সাধুদর্শন বা দেবদর্শন হইলে এমন একটা তুচ্ছ জিনিষ প্রার্থনা করিয়া বসি যে সারাজীবন হয় ত বঞ্চিত এবং অনুতপ্ত হইতে হয়।

অনেক তত্ত্বজ্ঞানসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়াও যখন পুত্রস্নেহে অন্ধ চিত্রকেতুর চিত্ত স্থির হইল না, দারুণ পুত্রশোকে আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার মন কোনও তত্ত্বকথাই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিল না, তখন দেবর্ষি নারদ এক অপূর্ব্ব উপায় অবলম্বন করিয়া রাজা চিত্রকেতুর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। দেবর্ষি নারদ যোগবলে মৃত পুত্রের সূক্ষ্মদেহ আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে সেই জীবাত্মাকে প্রদর্শন করাইলেন এবং তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,

জীবাত্মন্, পশ্য ভদ্রং তে, মাতরং পিতরঞ্চ তে
সুহৃদো বান্ধবাংস্তপ্তান্ শুচা ত্বৎকৃতয়া ভৃশম্ ॥ ৬।১৬।২

—হে জীবাত্মা, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি তোমার পিতামাতাকে এবং শোকে অতিশয় সন্তপ্ত বান্ধবগণকে অবলোকন কর।

জীবাত্মা কিন্তু পিতামাতাকে চিনিতে পারিল না। সে বিস্মিত হইয়া দেবর্ষি নারদকে যাহা বলিল তাহা জীবন এবং মরণ এই উভয় অবস্থায় মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধরহস্য অতি সহজ ভাবে প্রকাশিত করিতেছে।

জীব বলিল,

কস্মিন্ জন্মন্যমী মহ্যং পিতরো মাতরোঽভবন্,
কর্ম্মভি র্ভ্রাম্যমানস্য দেবতির্য্যঙ্‌নৃ-যোনিষু ॥
বন্ধুজ্ঞাত্যরিমধ্যস্থ মিত্রোদাসীন বিদ্বিষঃ,
সর্ব্বে এব হি সর্ব্বেষাং ভবন্তি ক্রমশোমিথঃ ॥
যথা বস্তূনি পণ্যানি হেমাদীনি ততস্ততঃ,
পর্য্যটন্তি নরেষ্বেবং জীবো যোনিষু কর্ত্তৃষু ॥
নিত্যস্যার্থস্য সম্বন্ধো হ্যনিত্যো দৃশ্যতে নৃষু,
যাবদ্ যস্য হি সম্বন্ধো মমত্বং তাবদেব হি ॥

এবং যোনিগতো জীবঃ সঃ নিত্যো নিরহঙ্কৃতঃ
যাবদ্ যত্রোপলভ্যেত তাবৎ স্বত্বং হি তস্য তৎ॥ ৬।১৬।৪-৮

—হে দেবর্ষি, স্বীয় কর্ম্মবশে আমি দেব, পশুপক্ষী ও মনুষ্যযোনিতে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছি। ইঁহারা কোন্ জন্মে আমার পিতামাতা ছিলেন তাহা আমি জানি না, সুতরাং ইঁহাদিগকে চিনিতে পারিতেছি না।

অনেক জন্ম ভ্রমণ করিতে করিতে সকলেই সকলের বন্ধু, জ্ঞাতি, শত্রু, মিত্র, উদাসীন ও বিদ্বেষ্টা হইয়া পড়ে। অতএব এই জন্মে আমি যেমন ইঁহাদের পুত্র ছিলাম সেইরূপ অপর জন্মে হয়ত ইঁহাদের শত্রুও ছিলাম। অতএব ইঁহারা পুত্র বলিয়া শোক না করিয়া শত্রু বলিয়া আমার মৃত্যুতে আনন্দিত হইতেও পারেন।

পণ্যদ্রব্যসমূহ যেমন ক্রয়-বিক্রয়কারী জনগণের এক হস্ত হইতে অপর হস্তে ভ্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ জীবও দেব-মনুষ্যাদি নানাবিধ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

মনুষ্যগণের মধ্যে ভৃত্য ও প্রভুর সম্বন্ধ—তাহাও অনিত্য বলিয়া দেখা যায়,—অর্থ ও অন্নাদির বিনিময়ে যে ব্যক্তি আজ একজনের ভৃত্য, সেই ব্যক্তিই অন্যদিন অপরের ভৃত্য হইয়া থাকে এবং যতদিন একজনের অপরের সহিত প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ থাকে, ততদিনই উভয়ের মধ্যে মমত্ববুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে। প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে উভয়ের মমত্ববুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়।

সেইরূপ ঐ নিত্যজীব স্বরূপতঃ মমত্ববুদ্ধিবর্জ্জিত হইলেও সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া যে পর্য্যন্ত যাহার নিকট পুত্রাদিরূপে থাকে, সেই পর্য্যন্তই তাহার প্রতি মমত্ববুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে,—মৃত্যুর পর পাঞ্চভৌতিক দেহমুক্ত জীবের কাহারও প্রতি কোনও মমত্ববুদ্ধিই সম্ভবপর নহে।

এই বলিয়া রাজপুত্রের জীবাত্মা তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং রাজা, রাণী ও আত্মীয়স্বজনগণ মোহমুক্ত হইয়া বালকের দেহের সংকার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তখন রাজা চিত্রকেতু "প্রতিবুদ্ধাত্মা" অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া "গৃহান্ধকূপাৎ নিষ্ক্রান্তঃ সরঃপঙ্কাদিব দ্বিপঃ"—পঙ্কে নিমজ্জমান হস্তী যেমন মুক্ত হইয়া সরোবর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ তিনি গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে বাহির হইয়া কালিন্দী নদীতে স্নান করিয়া ভগবান নারদের নিকট নূতন বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। সাতদিন একাগ্রচিত্তে নারদ প্রদত্ত বিদ্যা ধারণা করিবার ফলে রাজা চিত্রকেতু বিদ্যাধরগণের অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অতঃপর এই বিদ্যার প্রভাবে প্রদীপ্ত মনোগতি লাভ করিয়া চিত্রকেতু ভগবান্ সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

এই স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে উমার শাপে চিত্রকেতুর অসুরকুলে বৃত্রাসুর হইয়া জন্মগ্রহণের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

আকাশবিহারী চিত্রকেতু বিষ্ণুপ্রদত্ত সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন সিদ্ধচারণগণে পরিবেষ্টিত মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন।

আলিঙ্গ্যাঙ্কীকৃতাং দেবীং বাহুনা মুনিসংসদি,
উবাচ দেব্যাঃ শৃণ্বন্ত্যাঃ জহাসোচ্চৈ স্তদন্তিকে ॥ ৬।১৭।৫

—মুনিগণের সভায় সকলের সমক্ষে স্বীয় ক্রোড়ে মহাদেব পার্ব্বতীকে স্থাপন করতঃ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত ছিলেন, এই অবস্থা দেখিয়া চিত্রকেতু মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া অবজ্ঞাভরে উচ্চহাস্য করিলেন এবং দেবী পার্ব্বতীকে শুনাইয়া বলিলেন,

এষঃ লোকগুরুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মং বক্তা শরীরিণাম্
আস্তে মুখ্যঃ সভায়াং বৈ মিথুনীভূয় ভার্য্যয়া ॥

জটাধরস্তীব্রতপাঃ ব্রহ্মবাদী সভাপতিঃ
অঙ্কীকৃত্য স্ত্রিয়ঞ্চাস্তে গতহ্রীঃ প্রাকৃতো যথা ॥
প্রায়শঃ প্রাকৃতাশ্চাপি স্ত্রিয়ং রহসি বিভ্রতি,
অয়ং মহাব্রতধরো বিভর্ত্তি সদসি স্ত্রিয়ম্ ॥ ৬।১৭।৬-৮

—যিনি লোকগুরু এবং জীবগণের প্রতি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের উপদেষ্টা, তাদৃশ এই মহাদেবই সভামধ্যে ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

ইনি জটাধারী কঠোর তপস্বী, ব্রহ্মবাদী এবং সভাপতি হইয়াও নির্লজ্জ সাধারণ মানুষের ন্যায় স্ত্রীকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন।

—সাধারণ মানুষেরাও প্রায় নির্জ্জনেই স্ত্রী লইয়া অবস্থান করে, কিন্তু ইনি মহাব্রতধারী হইয়াও জনসভা মধ্যে স্ত্রীকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন।

বিভূতিপ্রভাবে চিত্রকেতুর বুদ্ধিবৈক্লব্য উপস্থিত হইয়াছিল; সুতরাং দেবাধিদেব মহাদেবের অসাধারণ আচরণ সাধারণ মানুষের আচরণ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিবার মত দৃষ্টিশক্তি তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। মহাযোগী মহেশ্বর চিত্রকেতুর বিভূতি-মত্ততা বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং হাস্য করতঃ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং সভামধ্যস্থ সভ্যগণও চিত্রকেতুর ধৃষ্টতা দেখিয়া লজ্জায় নীরব হইয়া রহিলেন। কিন্তু দেবী পার্ব্বতী এই পাষণ্ডকে ক্ষমা করিলেন না। চিত্রকেতুকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া দেবী বলিলেন,

অতঃ পাপীয়সীং যোনিমাসুরীং যাহি দুর্ম্মতে!
যথেহ ভূয়ো মহতাং ন কর্ত্তা পুত্র! কিল্বিষম্ ॥ ৬।১৭।১৫

—অতএব রে দুষ্টবুদ্ধি পুত্র! তুই পাপীয়সী অসুর যোনিতে যাইয়া জন্মগ্রহণ কর। তাহার ফলে তুই এই জগতে আর মহাজনগণের নিন্দা করিয়া অপরাধী হইবি না।

দেবীর এই অভিশাপের মধ্যে "পুত্র" কথাটি পরিলক্ষণীয়। এই একটি মাত্র কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে দেবীর ক্রোধ বাহিরের ছলনামাত্র, পাপীর ভীতি উৎপাদন করিয়া তাহাকে কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার উপায় মাত্র, চিরদিন অবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের মত করুণাময় হৃদয়ে ক্রোধের আবির্ভাব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। উমাদেবী পুত্র শব্দটি ব্যবহার করিয়া অল্পবুদ্ধি চিত্রকেতুকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, পিতামাতার নিগূঢ় আচরণের সমালোচনা করা পুত্রের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। দেবী অশেষ কৃপা করিয়া পুত্রস্থানীয় চিত্রকেতুকে অভিশাপ প্রদান করিতেছেন—অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার চৈতন্য হইবে এবং চিরদিনের মত মহতের অবমাননা পরিত্যাগ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। দেবীর অভিশাপবাক্য বজ্রধ্বনির মত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াই চিত্রকেতুকে কিয়ৎ পরিমাণে সচেতন করিল এবং চিত্রকেতু দেবী পার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

প্রতিগৃহ্লামি তে শাপমাত্মনোঽঞ্জলিনাম্বিকে!
দেবৈর্ম্মর্ত্ত্যায় যৎ প্রোক্তং পূর্ব্বদিষ্টং হি তস্য তৎ॥
অথ প্রসাদয়ে ন ত্বাং শাপমোক্ষায় ভামিনি!
যন্মন্যসে হ্যসাধূক্তং মম তৎ ক্ষম্যতাং সতি!॥ ৬।১৭।১৭,২৪

—হে মাতঃ, আপনার প্রদত্ত অভিশাপ আমি অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিলাম। দেবগণ মানবগণের উদ্দেশ্যে যাহা কিছু অভিশাপ প্রদান করেন তাহা মানবগণের প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল।

হে দেবি, শাপ-বিমুক্তির জন্য আমি আপনার প্রসন্নতা সম্পাদন করিতেছি না; আপনি আমার যে কথাগুলি অন্যায় মনে করিয়াছেন তাহাই আপনি ক্ষমা করুন।

এইরূপে "প্রসাদ্য গিরিশৌ"—মহাদেব ও পার্ব্বতীকে প্রসন্ন করিয়া চিত্রকেতু স্বীয় বিমানযোগে তথা হইতে চলিয়া যাইলেন।

এই সমগ্র ঘটনা বিবৃত করিয়া শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিলেন,

জজ্ঞে ত্বষ্টুর্দ্দক্ষিণাগ্নৌ দানবীং যোনিমাশ্রিতঃ
বৃত্র ইত্যভিবিখ্যাতো জ্ঞান বিজ্ঞান সংযুতঃ ॥
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি,
বৃত্রস্যাসুর জাতেশ্চ কারণং ভগবন্মতেঃ ॥ ৬।১৭।৩৮-৩৯

—জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ঐ চিত্রকেতুই দানবকুল আশ্রয় করিয়া ত্বষ্টার যজ্ঞীয় অগ্নিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বৃত্রাসুর নামে পরিচিত হন।

হে রাজন্, আপনি আমাকে যে বৃত্রের অসুরভাবের উৎপত্তি ও ভগবদ্ভক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সেই সমস্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের মুখে বৃত্রাসুরের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার জ্ঞানগর্ভ বাক্য সমূহের কারণ বুঝিতে পারিলেন, এবং অসুর হইয়াও তাহার পূর্ব্বজন্মসংস্কার বশতঃ হরিভক্তি হইয়াছিল জানিতে পারিয়া রাজার কৌতূহলনিবৃত্তি হইল।

———

সপ্তম স্কন্ধ

(১)

হিরণ্যকশিপু

ষষ্ঠ স্কন্ধের শেষভাগে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রের সহায়স্বরূপ বিষ্ণুকর্তৃক দিতির পুত্রগণ নিহত হইলে দৈত্যজননী দিতি শোকে অধীর হইয়া নানাবিধ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিতের মনে সন্দেহ হইল এবং তিনি সপ্তম স্কন্ধের প্রথমেই শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিলেন,

সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ব্রহ্মন্! ভূতানাং ভগবান্ স্বয়ং,
ইন্দ্রস্যার্থে কথং দৈত্যানবধীদ্বিষমো যথা ॥ ৭।১।১
ইতি নঃ সুমহাভাগ! নারায়ণ গুণান্ প্রতি
সংশয়ং সুমহান্ জাতস্তদ্ভবাং শ্ছেত্তুমর্হতি ॥ ৭।১।৩

—হে ব্রহ্মন্, ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং সর্ব্বত্র সমভাবসম্পন্ন এবং সর্ব্বভূতের প্রিয় ও সুহৃদ্; তবে তিনি কি প্রকারে পক্ষপাত-দোষযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় ইন্দ্রের নিমিত্ত দৈত্যগণকে বধ করিলেন ?

—হে মহাভাগ, দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ ও অসুরগণের প্রতি নিগ্রহরূপ নারায়ণের বৈষম্যদৃষ্টি বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি ব্যতীত আমার সেই মহাসংশয় অপর কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না।

পরীক্ষিতের এইরূপ সন্দেহ দূর করিবার জন্য শ্রীশুকদেব সপ্তম স্কন্ধের প্রথম দশটি অধ্যায়ে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু ও তৎপুত্র ভক্ত প্রহ্লাদের চরিত্র বর্ণনা করিয়া, পরের পাঁচটি অধ্যায়ে আশ্রমোক্ত কর্ত্তব্যসমূহ বর্ণনা করিতেছেন। প্রথমেই পরীক্ষিতের সন্দেহ দূর করিবার জন্য শুকদেব

অপরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণলীলা পরম পবিত্র এবং উহা নারদাদি ঋষিগণ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি কখনও বৈষম্য দোষদুষ্ট হইতে পারে না; অতএব "নত্বা কৃষ্ণায় মুনয়ে কথয়িষ্যে হরেঃ কথাম্"—শ্রীশুকদেব মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে প্রণাম করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, শ্রীহরি সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের অধীন নহেন, আদি এবং অন্ত রহিত, চিৎ এবং অচিদাত্মক জগৎ হইতে বিভিন্ন এবং দেবাসুরের যুদ্ধে বিভিন্ন ফলপ্রদ হইয়াও তিনি স্বয়ং সমভাবাপন্ন। ভগবান্ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করিলেও তাহাদের গুণদোষাদি ভগবান্‌কে স্পর্শ করে না। জীবগণের কর্ম্মানুসারে কালশক্তি ক্ষুভিত হইয়া গুণগত বৈষম্য ঘটিলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির সময় জীব অনুগ্রহ এবং রজ ও তমোগুণের বৃদ্ধির সময় নিগ্রহ ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং জীব আপন কর্ম্মফল গ্রহণ করে এবং ইহাই সাধারণ মানুষের চক্ষে ভগবানের অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বসুহৃদ্, তিনি বৈষম্যাদি দোষযুক্ত নহেন। ভগবান্ দ্বেষাদি রহিত হইয়াও কেন দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন এই বিষয়ে একটি ইতিহাস আছে। পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইলে নারদ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে সেই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছিলেন। পরীক্ষিতের সন্দেহ নিরসনের জন্য শুকদেব সেই ইতিহাস বর্ণনা করিতেছেন।

রাজসূয় মহাযজ্ঞে চেদিরাজ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াও সাযুজ্যরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন দেখিয়া যুধিষ্ঠির বিস্মিত হইয়া নারদকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, দমঘোষপুত্র শিশুপাল বাল্যকাল হইতেই গোবিন্দের প্রতি বিদ্বেষী ছিল অথচ পরব্রহ্মবিষ্ণুর প্রতি পুনঃ পুনঃ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াও "শ্বিত্রো ন জাতো জিহ্বায়াং নান্ধং বিবিশতুস্তমঃ"—তাহার জিহ্বায় কুষ্ঠ হইল না—ঘোর নরকেও পতিত হইল না। সন্দেহটি

কিন্তু কেবলমাত্র যুধিষ্ঠিরের নহে, রাজসূয় সভায় উপস্থিত সমগ্র সভ্যমণ্ডলীর মনেও ঐ একই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং "শৃন্বন্ত্যাস্তৎ সদঃ কথাঃ"—সমগ্র সভার শ্রুতিগোচর করিয়া নারদ বলিলেন যে, নিন্দা করিয়া ভগবান্‌কে ব্যথা দেওয়া যায় না; কিন্তু ভগবৎ স্মরণ করিলে নানাবিধ কল্যাণ হইয়া থাকে। অতএব নিরন্তর শত্রুতা, ভক্তিযোগ, ভয়, স্নেহ অথবা কাম —এই যে কোনও ভাবের দ্বারা অহরহ ভগবৎ স্মরণ হইলেই মানুষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং তাহার ফলে অশেষবিধ কল্যাণ হইয়া থাকে। দেবর্ষি পুনরায় যুধিষ্ঠিরের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া বলিলেন,

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ,
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৭।১।২৬

—মানুষ শত্রুভাব পোষণ করিয়া তাহার দ্বারা ভগবানের প্রতি যেরূপ তন্ময়তা লাভ করিতে পারে, এমন কি ভক্তিযোগের দ্বারাও সেইরূপ সহজে সম্ভবপর নহে,—ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা।

সেইজন্য কৃষ্ণবিদ্বেষী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুতা নিবন্ধন নিরন্তর তাঁহার চিন্তা করিতে করিতে নিষ্পাপ হইয়া শিশুপাল তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ধারণা রাজা যুধিষ্ঠিরের মনে সুদৃঢ় করিবার জন্য দেবর্ষি নারদ নিম্নলিখিত শ্লোকটি বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকটি বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত এবং বহুসমাদৃত।

গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ
সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ! ৭।১।৩০

—হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের দ্বারা গোপীগণ, ভয়বশতঃ কংস, দ্বেষহেতু শিশুপাল, সম্বন্ধ জনিত স্নেহহেতু বৃষ্ণিগণ ও আপনারা, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির জন্য আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীনারদ পুনরায় বলিলেন যে, কেবলমাত্র কাম, ভয়, দ্বেষ, স্নেহ ও ভক্তি—এই পঞ্চবিধ ভাবে ভাবিত হইয়া ভগবৎ চিন্তা করিলেই যে মুক্তি হয় তাহা নহে, "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"—যে কোনও প্রসঙ্গে—জ্ঞান, কর্ম্ম, নামগ্রহণ প্রভৃতি যে কোনও উপায় অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে মন নিবেশিত করিতে পারিলেই মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য সফল হইয়া থাকে।

রাজা যুধিষ্ঠিরের মনের সন্দেহ এইরূপে নিরসন করিয়া তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া দেবর্ষি বলিলেন যে যুধিষ্ঠিরের মাস্‌তুতো ভাই শিশুপাল ও দন্তবক্র ভগবান্ বিষ্ণুর প্রধান পার্ষদদ্বয়; তাঁহারা ব্রহ্মশাপে বৈকুণ্ঠভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির নারদের কথায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন,

কীদৃশঃ কস্য বা শাপো হরিদাসাভিমর্শনঃ,
অশ্রদ্ধেয় ইবাভাতি হরেরেকান্তিনাং ভবঃ ॥
দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্
দেহসম্বন্ধ সম্বন্ধমেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৭।১।৩৩-৩৪

—হে দেবর্ষি, যে শাপ প্রধান বিষ্ণুভক্তদ্বয়কেও অভিভূত করিয়াছিল সেই শাপ কিরূপ? এবং কাহার? শ্রীহরির একান্ত ভক্তগণের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার কথা আমি সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

বৈকুণ্ঠপুরবাসিগণের প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ নাই, তাঁহারা অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহধারী। তাঁহাদের জন্মমরণশীল প্রাকৃতদেহ ধারণ কিরূপে সম্ভবপর হইল তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন।

যুধিষ্ঠিরের এই স্বাভাবিক কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য দেবর্ষি নারদ, শিশুপাল ও দন্তবক্র এই দুই ভ্রাতার জন্মবিষয়ক আনুপূর্ব্বিক ঘটনাবলী বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার পুত্র চতুঃসন্ অর্থাৎ সনক, সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার ঋষিচতুষ্টয় ত্রিভুবন বিচরণ করিতে করিতে একদিন

যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ঋষিগণ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের অগ্রজ হইলেও দেখিতে পঞ্চম বা ষষ্ঠবর্ষীয় বালকের ন্যায় উলঙ্গ ছিলেন। তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করিলে অবজ্ঞাভরে ভগবানের দ্বারপালদ্বয়—জয় ও বিজয়—ঋষিগণকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে বাধা প্রদান করিলেন। তখন চতুঃসন্ কুপিত হইয়া বলিলেন, "তোমরা বৈকুণ্ঠলোকে বাস করিবার উপযুক্ত নহ; তোমরা মূর্খ, অতএব তোমরা পাপিষ্ঠ অসুর যোনিতে যাইয়া জন্মগ্রহণ কর।" এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া বিষ্ণুর দ্বারপালদ্বয় যখন বৈকুণ্ঠ হইতে অধঃপতিত হইতে-ছিলেন, তখন দীনবৎসল ঋষিগণ কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে তিন জন্ম পরে তাঁহারা পুনরায় বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবেন। দেবর্ষি বলিলেন যে, জয় ও বিজয় নামক পার্ষদদ্বয় প্রথম জন্মে যমজ ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দৈত্যদানববন্দিত দিতিপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু নিজ হরিভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে নানাবিধ যন্ত্রণা দেওয়ায় শ্রীহরি নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বধ করেন এবং বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারের সময়ে শ্রীহরি হিরণ্যাক্ষকে পূর্ব্বেই বধ করিয়াছিলেন। অনন্তর জয় ও বিজয় দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। তৃতীয় জন্মে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের মাতৃষ্বসার পুত্র হইয়া শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চক্রাঘাতে নিহত হইয়া ব্রহ্মশাপমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন।

এই কাহিনী শ্রবণানন্তর প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুর জীবন-বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য রাজা যুধিষ্ঠিরের বিশেষ কৌতূহল হইল। প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর প্রিয়পুত্র ছিলেন অথচ পিতা তাঁহার উপর দ্বেষ করিলেন কেন? দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রহ্লাদের মনে ভগবৎ-ভক্তির সঞ্চার কিরূপে হইল? যুধিষ্ঠিরের মনের এই কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার

জন্য দেবর্ষিনারদ ভক্তকুল-শিরোমণি প্রহ্লাদের অপূর্ব্ব কাহিনী বর্ণনা করিলেন।

এই সপ্তম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভ্রাতৃশোকে অধীর ও কোপান্বিত হিরণ্যকশিপু-কর্ত্তৃক লোকসমূহের উৎপীড়ন এবং তত্ত্বোপদেশের দ্বারা মাতা দিতি, ভ্রাতৃবধূ রুষাভানু ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের শোকাপনোদন বর্ণিত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে, বরাহমূর্ত্তিধারী শ্রীহরি হিরণ্যাক্ষকে বধ করিলে হিরণ্যকশিপু "রুষা পূর্ণঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ" —ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে—অন্যান্য দৈত্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

মচ্ছূল ভিন্নগ্রীবস্য ভূরিণারুধিরেণ বৈ
অসৃক্‌প্রিয়ং তর্পয়িষ্যে ভ্রাতরং মে গতব্যথঃ॥
তস্মিন্ কূটেঽহিতে নষ্টে কৃত্তমূলে বনস্পতৌ,
বিটপা ইব শুষ্যন্তি বিষ্ণুপ্রাণাঃ দিবৌকসঃ॥
তাবদ্ যাত ভুবং যূযং ব্রহ্মক্ষত্রসমেধিতাম্
সূদয়ধ্বং তপোযজ্ঞ-স্বাধ্যায় ব্রতদানিনঃ॥
যত্র যত্র দ্বিজো গাবো বেদাঃ বর্ণাশ্রমক্রিয়াঃ
তং তং জনপদং যাত সন্দীপয়ত বৃশ্চত॥ ৭।২।৮,১০-১২

—আমি শূলের দ্বারা হরির গ্রীবাদেশ বিদীর্ণ করিয়া তাহার প্রচুর শোণিতে আমার শোণিতপ্রিয় ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের তর্পণ করিয়া আমার মনোদুঃখ দূর করিব।

বৃক্ষের মূলদেশ ছেদন করিলে তাহার শাখা-প্রশাখা যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ ঐ কপট শত্রু হরি বিনষ্ট হইলে দেবগণও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কারণ বিষ্ণুই দেবগণের প্রাণ-স্বরূপ।

আমি হরির বধসাধনের উপায় করিতেছি, তোমরা ইতিমধ্যে পৃথিবীতে যাইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ কর, কারণ তাহারা

তপস্যা, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, ব্রত ও দান প্রভৃতির দ্বারা বিষ্ণুর ভজনা করিয়া থাকে।

অতএব যে যে স্থানে ব্রাহ্মণ, গো, বেদ ও বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াসমূহ বর্ত্তমান আছে, তোমরা সেই সেই দেশে গমন কর এবং ঐ সকল দেশ দগ্ধ কর ও দেশবাসীকে ছেদন কর।

হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সেই হিংসাপ্রিয় দানবগণ প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রজানিপীড়ন ও প্রজাবধ আরম্ভ করিয়া দিল।

এইবার হিরণ্যকশিপুর দৃষ্টি নিজের অন্তঃপুরে নিপতিত হইল। সে দেখিল যে, তাহার প্রাসাদে মাতা দিতি ও অন্যান্য রমণীগণ শোকে অধীর হইয়া রোদন করিতেছে। তখন হিরণ্যকশিপু জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে নানাবিধ সারগর্ভ কথা বলিয়া সকলকে শোকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই হিরণ্যকশিপু পূর্ব্ব জন্মে ভগবান্ শ্রীহরির পার্ষদ ছিল, সুতরাং জন্মগত সংস্কাররূপে সে অশেষ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু নিজে বীর, সুতরাং ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধে বীরোচিত মৃত্যুর কথাই তাহার প্রথম মনে পড়িল এবং সে বলিল, "রিপোরভিমুখে শ্লাঘ্যঃ শূরাণাং বধ ঈপ্সিতঃ"—বীরগণের শত্রুর সহিত সম্মুখসমরে দেহত্যাগ করাই প্রশংসনীয় ও অভিলষিত, সুতরাং ভ্রাতার মৃত্যুতে কাহারও শোক করিবার কারণ নাই। বিশেষ করিয়া মাতা দিতিকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল,

ভূতানামিহ সংবাসঃ প্রপায়ামিব সুব্রতে,
দৈবেনৈকত্র নীতানামুন্নীতানাং স্বকর্ম্মভিঃ ॥
নিত্যঃ আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্ববিৎ পরঃ ॥
ধত্তেঽসাবাত্মনো লিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্ ॥ ৭।২।২১,২২

—হে মাতঃ, প্রাক্তন কর্ম্মবশে জীবগণ দেহলাভ করিয়া মাতা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রী প্রভৃতিরূপে মিলিত হইয়া থাকে এবং পুনরায় নিজ নিজ

১৮

কর্ম্মানুসারেই তাহারা সেই দেহ পরিত্যাগ করতঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এতাদৃশ জীবগণের ইহলোকে অবস্থান জলসত্রে জলপিপাসু জনগণের মিলিত হওয়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী।

কিন্তু দেহ বিনষ্ট হইলেও শোকের কোন কারণ নাই, যেহেতু আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণাদি হইতে বিভিন্ন। এতাদৃশ অবিনাশী আত্মা পরবর্ত্তী স্থূলদেহ লাভ করিবার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী স্থূলদেহ পরিত্যাগ করতঃ অজ্ঞানের দ্বারা লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

এইরূপ জ্ঞানগর্ভ কথা মাতাকে শুনাইয়া যখন মাতার শোক অপনোদন করিতে পারিল না, তখন সুযজ্ঞ নামে এক বিখ্যাত নরপতির মৃত্যুর পর স্বয়ং যমরাজ নরপতির মহিষীগণকে যে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই হিরণ্যকশিপু মাতা দিতিকে শুনাইয়া দিল। হিরণ্যকশিপু বলিল যে, পুরাকালে উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি শত্রুগণকর্ত্তৃক নিহত হইলে রাজমহিষীগণ শোকার্ত্তা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এবং বিলপতীনাং বৈ পরিগৃহ্য মৃতং পতিম্,
অনিচ্ছতীনাং নির্হারমর্কোঽস্তং সংন্যবর্ত্তত ॥
তত্র হ প্রেতবন্ধূনামাশ্রুত্য পরিদেবিতম্,
আহ তান্ বালকো ভূত্বা যমঃ স্বয়মুপাগতঃ ॥ ৭।২।৩৫,৩৬

—মৃত পতিকে বেষ্টন করিয়া মহিষীগণ এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, তথাপি তাঁহারা মৃতদেহ দাহ করিবার কোনও ব্যবস্থাই করিলেন না।

ইতিমধ্যে স্বয়ং যমরাজ নিজপুরীতে থাকিয়াই তাহাদের রোদনধ্বনি শুনিয়া বালক-বেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় আসিয়া মহিষীগণকে জীবন-মৃত্যুর রহস্যের কথা শ্রবণ করাইলেন।

মৃত্যুরাজ বলিলেন যে, জীবন এবং মৃত্যু শ্রীহরির ইচ্ছায় হইয়া থাকে,—'স রক্ষিতা রক্ষতি যো হি গর্ভে'—যে পরমেশ্বর শিশুকে মাতৃগর্ভে রক্ষা করেন, তিনিই মানুষের অনন্ত জীবনের রক্ষক। জীব ভগবানের অধীন, কারণ "জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতো বনে গৃহেঽভিগুপ্তোঽস্যহতো ন জীবতি"—পরমেশ্বর রক্ষা করিলে অসহায় ব্যক্তিও বনে জীবন ধারণ করিতে পারে, এবং তিনি বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলে গৃহে সুরক্ষিত হইয়া থাকিলেও মৃত্যু হইতে পারে। অথচ আত্মা চিরজীবী এবং দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যমরাজ আরও বলিলেন,

সুযজ্ঞো নন্বয়ং শেতে মূঢ়া যমনুশোচথ,
যঃ শ্রোতা যোঽনুবক্তেহ স ন দৃশ্যেত কর্হিচিৎ॥ ৭।২।৪৪

—হে মূঢ় নারীগণ, তোমরা যাহার জন্য শোক করিতেছ সেই সুযজ্ঞ নামধারী দেহরূপ পদার্থটি ত এই শয়ন করিয়া আছে, তবে শোক করিতেছ কেন? এই দেহে যিনি শ্রোতা এবং প্রত্যুত্তরপ্রদাতা ছিলেন, তিনি মৃত্যুর অধীন নহেন এবং তিনি কখনই দৃষ্টিগোচর হন না, সুতরাং তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নহে।

অতঃপর হিরণ্যকশিপু বলিল যে, যমরাজের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া রাজমহিষীগণের চৈতন্য হইল এবং তাহারা শোক পরিত্যাগ করিল। সুতরাং আত্মা স্বতন্ত্র, জন্মমৃত্যুরহিত, ইহা বুঝিতে পারিয়া মাতা দিতির শোক পরিত্যাগ করা উচিত।

ইতি দৈত্যপতের্ব্বাক্যং দিতিরাকর্ণ্য সস্নুষা,
পুত্রশোকং ক্ষণাৎ ত্যক্ত্বা তত্ত্বে চিত্তমধারয়ৎ॥ ৭।২।৬১

—দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে, হিরণ্যকশিপুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রবধূর সহিত দিতি তৎক্ষণাৎ পুত্রশোক পরিত্যাগ করতঃ ভগবানের প্রতি চিত্ত নিবেশিত করিলেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে অজেয় হইবার অভিলাষে হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যা, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক তাহাকে বরপ্রদান, হিরণ্যকশিপুর লোকপীড়ন ও প্রহ্লাদের ভগবদ্ভক্তি বর্ণনা করা হইয়াছে।

হিরণ্যকশিপু আপনাকে অজেয়, অজর, অমর ও অদ্বিতীয় শক্তিশালী করিবার আশায় মন্দর পর্ব্বতের উপত্যকায় ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ অতিশয় কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার ভ্রাতৃহত্যাকারী বিষ্ণুকে পরাভূত করাই তাহার তপস্যার একমাত্র উদ্দেশ্য। হিরণ্যকশিপুর এইরূপ উগ্র তপস্যা দেখিয়া দেবগণ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "দৈতেন্দ্রতপসা তপ্তাঃ দিবি স্থাতুং ন শক্নুমঃ"—দৈত্যরাজের তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়া আমরা স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। তখন ব্রহ্মা মুনিগণে পরিবৃত হইয়া হিরণ্যকশিপুর আশ্রমে যাইয়া "পিপীলিকাভিরাচীর্ণমেদস্ত্বঙ্মাংসশোণিতম্"—পিপীলিকাসমূহ তাহার মেদ, ত্বক্, মাংস ও রক্ত ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে দেখিতে পাইলেন। তখন ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুর উগ্র তপস্যা দর্শন করিয়া প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলেন,

ততস্ত আশিষঃ সর্ব্বাং দদাম্যসুরপুঙ্গব।
মর্ত্তস্য তে হ্যমর্ত্তস্য দর্শনং নাফলং মম॥ ৭।৩।২১

—হে অসুরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমি অভিলষিত বস্তু প্রদান করিব; তুমি মরণশীল, আমি অমর,—তোমার পক্ষে আমার দর্শন কখনই নিষ্ফল হইবে না।

ব্রহ্মা দেবগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু তাহার তপস্যা দেখিয়া উদ্দেশ্য-বিচলিত হইয়া দেবতাগণের অকল্যাণজনক কার্য্য করিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মা নিজ কমণ্ডলু হইতে অব্যর্থ শক্তিসম্পন্ন জল হিরণ্যকশিপুর মস্তকে প্রদান করিলে কঙ্কালসার তপস্যারত দৈত্যপতি মনঃশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি

ও দেহ শক্তি-সমন্বিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবাপুরুষে পরিণত হইল, তাহার অঙ্গসমূহ বজ্রের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠিল। তখন ভক্তিসহকারে ব্রহ্মার স্তব করিয়া হিরণ্যকশিপু তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিল ঃ

যদি দাস্যস্যভিমতান্ বরান্মে বরদোত্তম !
ভূতেভ্যস্ত্বদ্বিসৃষ্টেভ্যো মৃত্যুর্মাভূন্মম প্রভো ! ॥
নান্তর্ব্বহি র্দিবা নক্তমন্যস্মাদপি চায়ুধৈঃ,
ন ভূমৌ নাম্বরে মৃত্যুর্ন নরৈ র্ন মৃগৈরপি ॥
ব্যসুভির্বাসুমদ্ভির্ব্বা সুরাসুরমহোরগৈঃ
অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং যুদ্ধে ঐকপত্যঞ্চ দেহিনাম্ ॥
সর্ব্বেষাং লোকপালানাং মহিমানং যথাত্মনঃ
তপোযোগ প্রভাবাণাং যন্ন রিষ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৭।৩।৩৫-৩৮

—হে প্রভো, হে বরদাতাগণের শ্রেষ্ঠ, যদি আপনি আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন ঃ আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে যেন আমার মৃত্যু না হয়, গৃহাদির অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে, দিবাভাগে অথবা রাত্রিতে, আপনার মত ব্যক্তি হইতে এবং অস্ত্রশস্ত্রাদির দ্বারা ভূমি অথবা আকাশে, নরগণ, পশুগণ, প্রাণী, অপ্রাণী, দেব, অসুর অথবা মহাসর্প হইতে যেন আমার মৃত্যু না হয়। যুদ্ধে কেহ যেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতে পারে, দেহিগণের উপর যেন আমার একাধিপত্য হয়। যে মহিমা লাভ হইলে কখনও আর বিনষ্ট হয় না এবং যে মহিমা লোকপালগণের, যোগ-প্রভাবশালী মুনিগণের ও আপনার আছে, তাদৃশ মহিমা আমাকে প্রদান করুন।

তখন ব্রহ্মা বলিলেন,

তাত ! ইমে দুর্ল্লভাঃ পুংসাং যান্ বৃণীষে বরান্ মম,
তথাপি বিতরাম্যঙ্গ। বরান্ যদ্যপি দুর্ল্লভান্ ॥ ৭।৪।২

—হে বৎস, তুমি যে সকল বর আমার নিকট প্রার্থনা করিলে, যদিও জীবগণের নিকট তাহা দুর্ল্লভ, তথাপি আমি তোমাকে সেই সকল বর প্রদান করিলাম।

এবং লব্ধবরো দৈত্যঃ বিভ্রদ্ধেমময়ং বপুঃ,
ভগবত্যকরোৎ দ্বেষং ভ্রাতুর্ব্বধমনুস্মরন্॥ ৭।৪।৪

—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এইরূপে বরপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল দেহ ধারণ করতঃ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের বধ স্মরণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিল।

অতঃপর দৈত্যরাজ স্বর্গ জয় করিয়া ইন্দ্রকে বিদূরিত করিল, ইন্দ্রের প্রাসাদে বাস করিতে লাগিল, সর্ব্বদাই সুরাপানে মত্ত থাকিয়া দেবতাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞভাগ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে লাগিল, এমন কি, দেবতারাও ভীত হইয়া তাহার চরণ বন্দনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে যখন হিরণ্যকশিপু "উর্জ্জিতচণ্ডশাসনঃ"—তাহার শাসন অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল,—তখন দেবতাগণ "অন্যত্রালব্ধশরণাঃ শরণং যযুরচ্যুতম্"—অন্য কোনও রক্ষক না পাইয়া ভগবান্ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন। চিরকাল এইরূপই হইয়া আসিতেছে—জীব, আর্ত্ত ও অসহায় না হইলে সাধারণতঃ ভগবানকে স্মরণ করে না। তাই সংসারে বিপদের মত মানববন্ধু আর কিছুই নাই—ঐশ্বর্য্যে আত্মবিস্মৃতি, দুঃখে ধ্রুবাস্মৃতি—ইহাই অনাদি অনন্তকালের বিধান। দেবতাগণ এইরূপে অনন্যোপায় হইয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলে,

তেষামাবিরভূদ্বাণী অরূপা মেঘনিস্বনা,
সন্নাদয়ন্তী ককুভঃ সাধূনামভয়ঙ্করী॥
মাভৈষ্ট বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ! সর্ব্বেষাং ভদ্রমস্তুবঃ,
মদ্দর্শনং হি ভূতানাং সর্ব্বশ্রেয়োপপত্তয়ে॥

জ্ঞাতমেতস্য দৌরাত্ম্যং দৈতেয়াপসদস্য যৎ,
তস্য শান্তিং করিষ্যামি কালং তাবৎ প্রতীক্ষত ॥
যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু,
ধর্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বৈ আশু বিনশ্যতি ॥
নির্ব্বৈরায় প্রশান্তায় স্বসুতায় মহাত্মনে,
প্রহ্লাদায় যদা দ্রুহ্যেৎ হনিষ্যেঽপি বরোর্জ্জিতম্ ॥ ৭।৪।২৪-২৮

—চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া সাধুজনের অভয়জনক এবং মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর দৈববাণী দেবগণের নিকটে উত্থিত হইল।

হে দেবগণ, তোমরা ভয় করিও না, তোমাদের সকলের মঙ্গল হউক, কারণ আমার দর্শন জীবগণের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণলাভের নিমিত্তই হইয়া থাকে।

এই দৈত্যাধমের অত্যাচার আমি অবগত আছি; আমি তাহার প্রতিবিধান করিব। তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর।

দেবতা, বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, সাধু, ধর্ম্ম ও আমার প্রতি যখন কোন ব্যক্তির বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় তখনই অতি সত্বর সেই ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যখন এই হিরণ্যকশিপু বৈরভাববিহীন ও প্রশান্ত স্বীয় পুত্র মহাত্মা প্রহ্লাদের প্রতি হিংসাসূচক আচরণ করিবে তখনই ব্রহ্মার বরে বলবান্ হইলেও তাহাকে আমি বধ করিব।

শ্রীহরির এইরূপ মেঘমন্দ্র অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাগণ নিশ্চিন্ত হইলেন এবং স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(২)

প্রহ্লাদ চরিত্র

প্রসঙ্গক্রমে দেবর্ষি নারদ এখন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট ভক্তশিরোমণি প্রহ্লাদের চরিত্র বর্ণনা করিতেছেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও প্রহ্লাদ নামে চারিজন পুত্র ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ গুণে শ্রেষ্ঠ এবং মহাজনগণের ভক্ত ছিলেন। প্রহ্লাদ "নোদ্বিগ্নচিত্তো ব্যসনেষু নিস্পৃহঃ"—বিপদে উদ্বিগ্ন চিত্ত হইতেন না, এবং বিষয়াসক্তি বর্জ্জিত ছিলেন, "বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ"—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার স্বাভাবিকী প্রীতি ছিল, উপবেশন, পরিভ্রমণ, ভোজন, শয়ন, পান ও বাক্যোচ্চারণ প্রভৃতি সমস্ত সময়েই তিনি "গোবিন্দ পরিরম্ভিতঃ"—ভগবানে সমাহিতচিত্ত হইয়া বিরাজ করিতেন। দৈত্যবংশজাত ভক্ত প্রহ্লাদের এইরূপ অপূর্ব্ব চরিত্রের বর্ণনা করিয়া দেবর্ষি নারদ বলিলেন,

> তস্মিন্ মহাভাগবতে মহাভাগে মহাত্মনি,
> হিরণ্যকশিপুঃ রাজন্ অকরোৎ অঘমাত্মজে ॥ ৭।৪।৪৩

—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, হিরণ্যকশিপু এতাদৃশ পরমবৈষ্ণব, অতি সৌভাগ্যশালী ও মহাত্মা পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠিরের কৌতূহল হইল—এমন পরম ভাগবতের প্রতি পিতা হইয়াও হিরণ্যকশিপু কেন দ্বেষ করিল, তাহা বর্ণনা করিবার জন্য তিনি দেবর্ষি নারদকে অনুরোধ জানাইলেন। নারদ বলিলেন যে, দৈত্যকুল-পুরোহিত শুক্রাচার্য্যের শণ্ড ও অমর্ক নামে দুই পুত্র রাজপ্রাসাদের নিকটে বাস করিতেন,—বালক প্রহ্লাদের শিক্ষার জন্য দৈত্যরাজ তাহাকে এই শিক্ষকদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করিল। শিক্ষকদ্বয় অন্যান্য

অসুরবালকগণের সহিত প্রহ্লাদকে দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিন্তু নানাবিধ ভেদাভেদ পরিপূর্ণ রাজনীতি সমদর্শী প্রহ্লাদের রুচিকর হইল না। কিছুদিন গুরুগৃহে অবস্থানের পর যখন প্রহ্লাদ অবকাশের সময় পিতৃগৃহে আগমন করিলেন, তখন রাজা হিরণ্যকশিপু স্নেহভরে পুত্র প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে লইয়া, তিনি যাহা উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা বর্ণনা করিতে আদেশ করিল। পিতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট প্রহ্লাদ বলিলেন,

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য! দেহিনাং সদা
সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ,
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনংগতো
যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥ ৭।৫।৫

—হে অসুরশ্রেষ্ঠ পিতা, দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ দেহীগণ সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া থাকে। অন্ধকূপতুল্য গৃহে বিষয়াসক্ত জীবন যাপন করিয়া আত্মার অধোগতি হয়, সুতরাং গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনগমন পূর্ব্বক শ্রীহরিকে আশ্রয় করাই আমি উত্তম বলিয়া মনে করি।

বিনামেঘে বজ্রপাত হইলেও হয়ত হিরণ্যকশিপু এতটা বিস্মিত হইত না,—স্নেহাস্পদ পুত্র পিতার পরম শত্রুকে ভজনা করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ বলিয়া মনে করিতেছে! দৈত্যরাজ মনে করিল যে অপরের কুমন্ত্রণায় বালক প্রহ্লাদের এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। হিরণ্যকশিপু ঈষৎ হাস্য করিল এবং দৈত্যসৈন্যের দ্বারা পরিবৃত করিয়া প্রহ্লাদকে পুনরায় গুরুগৃহে প্রেরণ করিল। সঙ্গী দৈত্যগণকে দৃঢ়কণ্ঠে হিরণ্যকশিপু বলিয়া দিল—"বিষ্ণুপক্ষৈঃ প্রতিচ্ছন্নৈর্ন ভিদ্যেতাস্য ধীর্যথা"—পথে কোন ছদ্মবেশী বৈষ্ণব প্রহ্লাদের সহিত মিশিয়া যেন বালকের বুদ্ধিভ্রম ঘটাইতে না পারে। দৈত্যরাজের এই অপূর্ব্ব সতর্কতা তাহার দৈত্য-বুদ্ধির প্রকৃষ্ট উদাহরণ!

এদিকে দৈত্যপুরোহিতগণ রাজসভায় পিতাপুত্রের কথোপকথনের সংবাদ পাইয়া রাজরোষভয়ে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন এবং প্রহ্লাদকে একান্তে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

বৎস! প্রহ্লাদ! ভদ্রং তে সত্যং কথয় মা মৃষা,
বালান্ অতি কুতস্তভ্যমেষঃ বুদ্ধিবিপর্য্যয়ঃ ॥
বুদ্ধিভেদঃ পরকৃত উতাহো তে স্বতোঽভবৎ
ভণ্যতাং শ্রোতুকামানাং গুরূণাং কুলনন্দন! ॥ ৭।৫।৯-১০

—হে বৎস প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হউক, সত্য বলিও, মিথ্যা বলিও না। তোমার এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল? অপরাপর বালকগণের ত এইরূপ বুদ্ধি হয় নাই।

—হে দৈত্যকুলনন্দন প্রহ্লাদ, বাসুদেবের শরণাপন্ন হওয়ার বুদ্ধি অপর কেহ কি তোমার মনে আনিয়া দিয়াছে, অথবা আপনা হইতেই হইয়াছে?—ইহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, আমরা তোমার গুরু, অতএব আমাদের নিকটে প্রকাশ করিয়া বল।

শণ্ড ও অমর্কের কথাগুলি হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা প্রহ্লাদের হরিভক্তি শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজার ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন—হয়ত দৈত্যরাজ মনে করিবেন যে, শিক্ষকগণ নিজেরাই বালককে এইরূপ কুশিক্ষা দিয়াছেন, অথবা তাঁহাদের অনবধানতাবশতঃ অপর কোন হরিভক্তিপরায়ণ লোক আসিয়া তরলমতি বালকের মতিভ্রংশ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। তৃতীয় একটি সম্ভাবনাও আছে এবং সেই সম্ভাবনা সত্য হইলে শিক্ষকদের আর কোনও দোষ থাকে না—'উতাহো তে স্বতোঽভবৎ'—স্বভাবতঃই প্রহ্লাদের মনে কি হরিভক্তি উদিত হইয়াছে? যদি প্রহ্লাদ একবার তাহা স্বীকার করে তাহা হইলে শণ্ডামর্কের মনে আর কোনও আশঙ্কা থাকে না। তাই এই শেষের কথাটি শুনিবার আগ্রহে শিক্ষকদ্বয় তিরস্কারের লেশমাত্র বর্জ্জন করিয়া

অতি কোমল ও মধুর ভাষায়—"বৎস," "ভদ্রং তে," "শ্রোতুকামানাং গুরূণাং," "কুলনন্দন" প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করিয়া,—বালকের হৃদয়ে স্নেহ ও বিশ্বাস সঞ্চারিত করিবার প্রয়াস করিতেছেন। প্রহ্লাদের হরিভক্তি হউক বা নাই হউক, তাহা শিক্ষকদ্বয়ের উদ্বিগ্নতার কারণ নহে, তাঁহারা নিজেরা দোষমুক্ত হইয়া রাজরোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। প্রহ্লাদ উত্তর প্রদানের সময় প্রথমেই বলিলেন, "তস্মৈ ভগবতে নমঃ"—সেই চরাচরগুরু ভগবানকে প্রণাম করি, এবং তৎপরে শিক্ষকদ্বয়কে বুঝাইয়া দিলেন যে, "হ্যেষঃ ভিনত্তি মে মতিম্"—তাঁহারা যে হরিভক্তিকে বুদ্ধিভ্রংশ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন, প্রহ্লাদের সেই "বুদ্ধিভ্রংশ" স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়াছে। প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শিক্ষকদ্বয় কিয়ৎ-পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং বৃত্তিদাতা রাজা হিরণ্যকশিপুকে প্রসন্ন করিবার জন্য প্রহ্লাদকে "দৈত্যেয়-চন্দনবনে জাতোঽয়ং কণ্টকদ্রুমঃ"—দৈত্যকুলরূপ চন্দনবনে এই বালক কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ—বলিয়া তিরস্কার করিলেন এবং "আনীয়তাং অরে! বেত্র"—ওরে, কে আছিস, শীঘ্র বেত্রদণ্ড আনিয়া দে—এই বলিয়া যুগপৎ প্রহ্লাদকে শাসন এবং রাজার নিকট নিজ দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে শিক্ষকদ্বয় সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটি নীতি শিক্ষা প্রদান করিয়া প্রহ্লাদকে তাঁহার মাতা কয়াধুর নিকট আনয়ন করিলেন। এইবার আর অপর কাহারও সহিত প্রহ্লাদকে রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করা হইল না, শণ্ড ও অমর্ক নিজেরাই সঙ্গে করিয়া প্রহ্লাদকে রাজসভায় লইয়া যাইলেন। তখন মাতা কয়াধু নিজ হস্তে বালক প্রহ্লাদকে স্নান করাইয়া, অঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার প্রদান করিয়া তাঁহাকে রাজসভায় হিরণ্যকশিপুর নিকট প্রেরণ করিলেন। ইহাই গুরুগৃহবাসের পর পিতা ও পুত্রের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। গুরুদ্বয়ের

উৎকণ্ঠা, মাতার কনিষ্ঠ পুত্রের উপর স্নেহবর্ষণ, স্নাত ও অলঙ্কৃত পঞ্চবর্ষীয় বালকের অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা, পিতা হিরণ্যকশিপুর পিতৃস্নেহ ও উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের পরম আগ্রহ—এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড অংশগুলি একত্র সংযোজিত হইয়া সমগ্র বর্ণনাটিকে এক চিরন্তন চিত্ররূপে পরিণত করিয়াছে।

প্রহ্লাদ পিতৃচরণে প্রণত হইলেন, পিতা হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, এবং বহুদিনের পর পঞ্চবর্ষীয় বালককে দেখিতে পাইয়া—"পরিষ্বজ্য চিরং দোর্ভ্যাং পরমাং আপ নির্বৃতিম্"—নিজ বাহুর দ্বারা বালককে বহুক্ষণ জড়াইয়া ধরিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইল। পিতা-পুত্রের এই মিলন বড়ই অপূর্ব্ব ও করুণ রস-সূচক। দীর্ঘাকার রাজপরিচ্ছদে বিভূষিত, উজ্জ্বল কিরীটধারী দৈত্যাধিপতি, সহস্র সহস্র দৈত্যগণের মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল হইয়াও আজ পুত্রস্নেহে অধীর হইয়া নিজ উচ্চ সিংহাসন হইতে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়াছে, সুদীর্ঘ দেহ অবনত করিয়া স্মিতহাস্যে ক্ষুদ্রাকার বালককে বহুক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া আছে—এই চিত্র যত সুন্দর, ততই কোমল ও হৃদয়স্পর্শী। এইবার হিরণ্যকশিপু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিল, তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিল এবং আনন্দাশ্রুবিন্দুতে প্রহ্লাদের মস্তক অভিষিক্ত করিয়া প্রহ্লাদ গুরুগৃহে যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিল।

প্রহ্লাদ যাহা উত্তর দিলেন তাহা বৈষ্ণবগণের নিকট সুপরিচিত এবং সমাদৃত। প্রহ্লাদ বলিলেন,

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্,
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা,
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্। ৭।৫।২৩-২৪

—বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, তদীয় নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, পূজা, বন্দনা, দাসত্বভাব, মিত্রত্বভাব ও আত্মনিবেদন—এই নব লক্ষণযুক্তা। যে বিদ্যা লাভ করিলে মানুষ এইরূপ ভক্তি শ্রীহরিতে সমর্পণ করিতে সক্ষম হয়, সেই শিক্ষাই আমি সর্ব্বোত্তম শিক্ষা বলিয়া মনে করি।

প্রহ্লাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া "রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ"—ক্রোধে হিরণ্যকশিপুর অধর কম্পিত হইতে লাগিল এবং পিতৃস্নেহে অন্ধ হইয়া ষণ্ড ও অমর্কের দোষে পুত্র এইরূপ কুশিক্ষা লাভ করিয়াছে মনে করিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিল এবং বলিল যে, তাঁহারা "দুর্মৈত্রাশ্ছদ্মবেশিনঃ"—ছদ্মবেশী শত্রু, কপট বন্ধুর মত রাজার শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়া রাজপুত্রকে অসার বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তখন গুরুপুত্র ভীত ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন,

ন মৎপ্রণীতং ন পরপ্রণীতং সুতোবদত্যেষঃ তবেন্দ্রশত্রো!
নৈসর্গিকীয়ং মতিরস্য রাজন্! নিযচ্ছমন্যুং কদদাঃস্মমানঃ ॥ ৭।৫।২৮

—হে ইন্দ্রশত্রো! আপনার এই পুত্র যাহা বলিয়াছে, তাহা আমরা কখনও শিক্ষা দিই নাই, অপর কেহও শিক্ষা দেয় নাই। কিন্তু বালকের এইরূপ বুদ্ধি পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ স্বভাবতঃই হইয়াছে। অতএব হে রাজন্, ক্রোধ সম্বরণ করুন। দোষারোপ করিয়া আমাদিগকে নিগৃহীত করিবেন না।

শিক্ষকগণ শুক্রাচার্য্যের পুত্র, সুতরাং "নৈসর্গিকীয়ং মতিরস্য রাজন্"—স্বভাবতঃই সংস্কারবশতঃ প্রহ্লাদের হরিবিষয়ক বুদ্ধি হইয়াছে—তাঁহাদের এই জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি সমস্ত হরিভক্ত সম্বন্ধেই সমভাবে প্রযোজ্য। ইহাই হরিভক্তির মূল কথা। মানুষ চেষ্টা করিয়া ভক্তি লাভ করিতে পারে না, হরিভক্তি পূর্ব্বজন্ম সংস্কারপ্রসূত এবং একমাত্র হরিকৃপাসাপেক্ষ। মনের যে সরস অবস্থা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস হইতে হৃদয়ে ভক্তি আবির্ভূত হইয়া থাকে তাহা শিক্ষা-প্রসূত নহে, এমন কি সাধন-

ভজন প্রসূতও নহে। ইহা "নৈসর্গিকী মতিঃ"। শিক্ষাগুরুদ্বয়ের এই কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাজভীতি আছে, প্রহ্লাদের অবস্থার সুচারু বিশ্লেষণ আছে, যুক্তিযুক্ত ভাবে আত্মদোষ ক্ষালনের প্রচেষ্টা আছে এবং নিত্যকালের হরিভক্তগণের হরিভক্তির প্রকৃত নিদানের বিবরণ আছে।

দৈত্যরাজ যে দোষ শিক্ষকগণের উপর আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এখন তাহা নিষ্ফল হইয়া পুত্র প্রহ্লাদের উপর দ্বিগুণবেগে নিপতিত হইল। পুনরায় তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "নচেৎ গুরুমুখীয়ং তে কুতোঽভদ্রাসতী মতিঃ"—হে পুত্র, তোমার এই অসৎ বুদ্ধি যদি গুরুর উপদেশে না হইয়া থাকে তবে কোথা হইতে আসিল? নির্ভীক প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন যে, যাহারা প্রবৃত্তিমার্গনিষ্ঠ এবং "পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত চর্ব্বণানাম্"—যাহারা পুনঃ পুনঃ উপযুক্ত বিষয় ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না, "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা"—নিজ হইতে অথবা অপরলোক হইতে তাহাদের মতি শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত হয় না। মহৎলোকের শ্রীচরণ আশ্রয় করাই বিষয়ী লোকের ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। পুত্র প্রহ্লাদ এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, "অন্ধীকৃতাত্মা স্বোৎসঙ্গাৎ নিরস্যত মহীতলে"—হিরণ্যকশিপু ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রহ্লাদকে স্বীয় ক্রোড় হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিল।

এইস্থলে পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া রাজা হিরণ্যকশিপুর স্বীয় পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যবহার পাঠকগণকে স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা প্রথম হইতেই দেখিতে পাইতেছি যে, বজ্রসম কঠোর হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি অতিশয় কোমল। এই প্রহ্লাদ পিতার কনিষ্ঠ পুত্র, সুতরাং স্বাভাবিক জীব-প্রকৃতি বশতঃ পিতার অসীম স্নেহের পাত্র। প্রহ্লাদের আরও তিনটি জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল; কিন্তু তাহাদের বিশেষ কোনও কথা ভাগবতে

উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা সহজে অনুমেয় যে ইহারা কেহই মহাবীর পিতার কুলোজ্জ্বলকারী ছিল না। অতএব পিতার সমস্ত আশা ও ভরসা কনিষ্ঠ প্রহ্লাদের উপর নিপতিত হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই যে, গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যখন পিতা-পুত্রে প্রথম মিলন হইল, তখন পিতা স্নেহবশতঃ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মধুর কণ্ঠে তাহাকে সম্বোধিত করিয়াছিল। প্রহ্লাদ যখন পিতৃশত্রু হরির কথা বলিলেন তখনও অশেষ স্নেহশীল পিতার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই, অপরের কথায় বালকবুদ্ধিতে পিতৃশত্রুর উল্লেখ করিয়াছে মনে করিয়া হিরণ্যকশিপু হাসিয়াছিল।

এই ক্ষুদ্র হাসিটি হিরণ্যকশিপুর ধৈর্য্য এবং পুত্রস্নেহ প্রকাশ করিতেছে। পিতাপুত্রের যখন দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইল তখনও হিরণ্যকশিপু হঠাৎ ধৈর্য্যভ্রষ্ট হয় নাই, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ, দীর্ঘকাল আলিঙ্গন, ক্রোড়ে সংস্থাপন, মস্তক আঘ্রাণ এবং আনন্দাশ্রুবিগলিত চক্ষুর দ্বারা পুত্রের অভিষেক—এই সমস্তই প্রবল পিতৃস্নেহ এবং পুত্র কর্ত্তৃক দৈত্যকুল উজ্জ্বল করিবার প্রচ্ছন্ন আশা নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করিতেছে। পুত্র পুনরায় পিতৃশত্রুর প্রশস্তি আরম্ভ করিলে হিরণ্যকশিপু স্নেহবশতঃ সমস্ত দোষ শিক্ষকগণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া পুত্রের সরলতা এবং নিরপরাধতায় বিশ্বাস রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাই আমরা পূর্ব্বাপর দেখিতে পাইতেছি যে, রাজা-হিরণ্যকশিপু বজ্রের মত কঠোর কিন্তু পিতা-হিরণ্যকশিপু পুষ্পের মত কোমল। কিন্তু দৈত্যরাজের পুত্রদোষ ক্ষালনের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল, তখন স্বভাবতঃই অসীম স্নেহ অসীম ক্রোধে পরিণত হইল। ইহাই স্বাভাবিক। পুত্র রাজদ্রোহী হইয়াছে, সুতরাং তখন পিতৃস্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে সাধারণ প্রজা মনে করিয়া তাহার প্রতি রাজার কঠোর কর্ত্তব্য পালনই একমাত্র বিধান। একটা বিশাল রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ যদি পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া আজ রাজদ্রোহিতার প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে

সেই উদাহরণ সভাস্থিত অন্যান্য সভ্যগণের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব নহে এবং এই একটি ছিদ্রপথে দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়া সমগ্র রাষ্ট্রের পতন সংঘটিত করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় হিরণ্যকশিপু যাহা বিধান করিল, তাহা অহরহঃ মানব সমাজে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং হয়ত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভজনা করিলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় পুত্রের প্রতি অনুরূপ বিধানই অবলম্বন করিতেন। সুতরাং কিয়ৎপরিমাণে দৈত্যস্বভাব-সুলভ ক্রোধ এবং কিয়ৎ পরিমাণে রাজার কঠোর আদর্শ—এই উভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে সবেগে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। অতঃপর

আহ অমর্ষরুষাবিষ্টঃ কষায়ীভূতলোচনঃ
বধ্যতামাশ্বয়ং বধ্যো নিঃসারয়ত নৈঋতাঃ॥ ৭।৫।৩৪

—তখন ক্রোধে দৈত্যরাজের চক্ষুদ্বয় তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে দৈত্যগণকে বলিল—এই বালক বধার্হ, সুতরাং ইহাকে এই স্থান হইতে অবিলম্বে লইয়া যাও এবং বধ কর।

দৈত্যরাজ রাজ্যরক্ষার জন্য সামান্য প্রজার ন্যায় বিদ্রোহী প্রহ্লাদকে বধ করিবার আদেশ দিতেছে, অন্ধ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া নহে—ইহা দুইটি বিষয় হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। প্রথমটি এই যে, ক্রোধান্ধ হইলে হয়ত দৈত্যস্বভাববশতঃ হিরণ্যকশিপু নিজেই তৎক্ষণাৎ পুত্রহত্যা করিয়া বসিত, অথবা দৈত্যগণকে রাজসভামধ্যেই প্রহ্লাদকে তৎক্ষণাৎ বধ করিবার আদেশ প্রদান করিত,—এই দুইটির কোনটিই হিরণ্যকশিপু করিল না, বরং "নিঃসারয়ত"—ইহাকে এই স্থান হইতে দূরে লইয়া যাইয়া ইহাকে বধ কর—তাহার এই কথাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে রাজা হিরণ্যকশিপু ক্রোধে একেবারে বিবেকবুদ্ধি হারাইয়া ফেলে নাই। দ্বিতীয়তঃ, নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটি হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাহার চিন্তাশক্তি ক্রোধের দ্বারা অভিভূত হয় নাই, রাজ্যশাসনের

পক্ষে যাহা হিতকর, সেই রাজনীতি অতি সহজ ও সরলভাবে হিরণ্যকশিপু এইস্থলে প্রকাশ করিতেছে।

পরোঽপথ্যং হিতকৃদ্ যথৌষধং স্বদেহজোঽপ্যাময়বৎ
স্নুতোঽহিতঃ,
ছিন্দ্যাৎ তদঙ্গং যদুতাত্মনোঽহিতং শেষং সুখং জীবতি
যদ্বিবর্জ্জনাৎ॥ ৭।৫।৩৭

—শত্রু যদি কটু ঔষধের ন্যায় হিতকারী হয়, তাহা হইলে সেই শত্রু পুত্রের ন্যায় পালনীয়। আর ঔরসজাত পুত্রও যদি অহিতকারী হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র রোগসদৃশ, সুতরাং সমূলে উৎপাটনীয়। যে অঙ্গ নিজের অনিষ্টকারী এবং যে অঙ্গ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট শরীর সুখে জীবিত থাকিবে, সেই অঙ্গ ছেদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হিরণ্যকশিপু যেমন আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া একদিন মাতা দিতির শোক অপনোদন করিয়াছিল, তেমনি আবার রাজনীতি গভীরভাবে বিচার করিয়া প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করিতেছে। হিরণ্যকশিপু মূর্খ নহে, সে স্বয়ং শ্রীহরির পার্ষদ, সুতরাং অতুল জ্ঞানের অধিকারী।

প্রভুর আদেশ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণ "নদন্তো ভৈরবং নাদং ছিন্ধি ভিন্ধীতিবাদিনঃ"—ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে "মার্ মার্ কাট্ কাট্" শব্দ উত্থিত করিয়া প্রহ্লাদের মর্ম্মস্থলে শূলের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যগণ ইতিমধ্যে প্রহ্লাদকে রাজসভার বাহিরে লইয়া গিয়াছিল, হরিপ্রেমে নির্ভীক বালক ভূমির উপর বসিয়া ছিলেন। যখন শত সহস্র শূল ভক্তের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতেছে, তখনও শ্রীহরিচরণে সমর্পিতহৃদয় বালক প্রহ্লাদ বসিয়া আছেন, ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন না, প্রাণভয়ে পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন না; দৈত্যগণের করুণার উদ্রেক করিয়া তাহাদের হিংসা নিবারণ করিবার জন্য একটী কথাও উচ্চারণ করিতেছেন না। ইহাই

ব্রাহ্মীস্থিতি। ভক্ত যখন ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তদ্ভাবভাবিত হইয়া অবস্থান করে, তখন তাহার দেহজ্ঞান থাকে না, স্বতরাং শারীরিক অথবা মানসিক যন্ত্রণাবোধও থাকে না। ভাগবতে নবম স্কন্ধে রাজা অম্বরীষের উপাখ্যানের সময় আমরা ভক্তের ঠিক অনুরূপ অবস্থাই দেখিতে পাইব। পরবর্ত্তী যুগে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরম ভক্ত যবন হরিদাস বাজারে বাজারে কাজি প্রদত্ত কোঁড়ার আঘাত সহ্য করিয়াও নির্ভীক, নিশ্চল এবং হরিনামে নিমগ্ন। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়।

হিরণ্যকশিপু শুনিল যে, শূলবিদ্ধ হইয়াও প্রহ্লাদের মৃত্যু হয় নাই; তখন যুগপৎ ক্রোধ এবং দৈত্যসুলভ দৃঢ়তার বশবর্ত্তী হইয়া নানাবিধ উপায়ে প্রহ্লাদকে বধ করিবার চেষ্টা করিল। দিগ্‌গজগণের পদতলে নিষ্পেষণ, সর্পদংশন, পর্ব্বত হইতে নিম্নভূমিতে নিক্ষেপ, কূপাদিতে নিরোধ, বিষপ্রদান, অনাহার, জলমধ্যে নিমজ্জন প্রভৃতি বহু চেষ্টাতেও যখন প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না, তখন হিরণ্যকশিপু উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল,

> অপ্রমেয়ানুভাবোঽয়মকুতশ্চিদ্ভয়োঽমরঃ,
> নূনমেতদ্বিরোধেন মৃত্যুর্মে ভবিতা ন বা॥ ৭।৫।৪৭

—এই বালক অপরিমিত প্রভাবসম্পন্ন, সর্ব্ববিধ ভয়রহিত ও অমর। অতএব নিশ্চয়ই ইহার সহিত বিরোধের ফলে আমার মৃত্যু হইবে—অন্য কোনও প্রকারে আমার মৃত্যু হইবে না।

এইরূপ দুশ্চিন্তায় রাজার মুখ শুষ্ক হইয়াছে এবং তিনি মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া শণ্ড ও অমর্ক নির্জ্জনে তাহাকে বলিলেন যে, সাধারণতঃ বালকগণ নানাবিধ দোষ করিয়া থাকে, আবার কালক্রমে সংশোধিত হইয়া যায়; স্বতরাং রাজা হিরণ্যকশিপুর দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নাই। প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হউক; ইতিমধ্যে

স্বয়ং শুক্রাচার্য্য আসিয়া পড়িবেন এবং জ্ঞানী ও বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া প্রহ্লাদের বুদ্ধি পরিপক্ক হইবে। শিক্ষকদ্বয়ের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল এবং হিরণ্যকশিপু শণ্ডামর্কের সহিত প্রহ্লাদকে পুনরায় গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন।

এইরূপ গুরুগৃহবাস কালে যখন একদিন গুরুদ্বয় সাংসারিক কার্য্যের জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, তখন প্রহ্লাদের সঙ্গী অপর দৈত্যবালকগণ পুঁথিপত্র গুটাইয়া রাখিয়া খেলা করিবার নিমিত্ত প্রহ্লাদকে আহ্বান করিল। প্রহ্লাদ তাহাদিগকে খেলা হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য সকলকে তাঁহার নিকট বসিতে বলিলেন। বালকেরা খেলা ছাড়িয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে বসিল, ইহা যেন যুধিষ্ঠির সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া দেবর্ষি নারদ বলিলেন যে, দুইটি কারণে দৈত্যবালকগণ তাহাদের প্রিয় খেলাধূলা পরিত্যাগ করিয়া সহজেই প্রহ্লাদের কথা শ্রবণ করিল ;—প্রথমতঃ 'তদ্গৌরবাৎ'—অর্থাৎ প্রহ্লাদ রাজপুত্র বলিয়া তাঁহাকে সকলে সম্মান প্রদর্শন করিত এবং মৃত্যুর কবল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন জানিয়া সকলে তাঁহাকে বিস্ময়সূচক গৌরবের চক্ষে দেখিত ; দ্বিতীয়তঃ "বালাঃ অদূষিতধিয়ো"—এই দৈত্যবালকগণের বুদ্ধি এখনও বিষয়াসক্ত হইয়া মলিন হয় নাই, সুতরাং শুদ্ধ আধারবান্ এই বালকগণ সহজেই ধর্ম্মকথা শুনিতে সম্মত হইল।

এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ! পঞ্চমবর্ষীয় বালককে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া শত শত সমবয়স্ক দৈত্যবালক বসিয়াছে—অতি কোমল ও ক্ষুদ্রাকার গুরু, অতি কোমল ও ক্ষুদ্রাকার শিষ্যগণ ! ছোট হাতখানি নাড়িয়া নাড়িয়া গুরু বৃহৎ মানবধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, বিস্ময় ও কৌতূহলবিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় গুরুর মুখপদ্মে নিহিত করিয়া বালকগণ চিত্রের মত বসিয়া আছে। শণ্ড ও অমর্কের যে বিদ্যালয় হিংসাদ্বেষ ও অহঙ্কারপ্রসূত সাম-দান-ভেদ-দণ্ড প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের ঘোষণায় অহরহঃ মুখরিত হইত, সেই জড়-

বিদ্যা আজ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে ; তাহার স্থলে পরমব্রহ্মবিদ্যা প্রচারিত হইয়া গৃহী-শিক্ষকের বাসস্থলীকে ধর্ম্মগুরু ঋষির তপোবনে পরিণত করিয়াছে। সেদিন হিরণ্যকশিপুর রাজপ্রাসাদের নিকটে ভক্তকণ্ঠে হরিগুণগান হইয়া তেজ, দম্ভ ও অহঙ্কার-কলুষিত রাজধানীর বাতাসকে শুদ্ধ ও শীতল করিয়া তুলিতেছিল। সে কী অপূর্ব্ব দৃশ্য !

প্রহ্লাদ মহাশয় বলিলেন—

কৌমারে আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ,
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥
যথা হি পুরুষস্যেহবিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্,
যদেষঃ সর্ব্বভূতানাং প্রিয়ঃ আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ ॥
সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্,
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাৎ যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥ ৭।৬।১-৩

—মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ এবং ইহা অনিত্য। অথচ এই মনুষ্যজন্মে চেষ্টা করিলে পরম কল্যাণময় শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি যৌবন বার্দ্ধক্যের অপেক্ষা না রাখিয়া কৌমারকাল হইতেই ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

জীবের এই মনুষ্যজন্মে বিষ্ণুর শ্রীচরণ আশ্রয় করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। কারণ, এই বিষ্ণু সর্ব্বভূতের আশ্রয় ও সুহৃদ্।

হে দৈত্যবালকগণ, ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবশে যেমন যত্নব্যতীতই দুঃখপ্রাপ্তি ঘটে, সেইরূপ মানুষ, পশু প্রভৃতি সমস্ত যোনিতেই দেহিগণের চেষ্টা ব্যতীতই ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হইয়া থাকে।

প্রহ্লাদ আরও বলিলেন যে, যৌবনে বিষয়াসক্তি ঘোরতর হইয়া দাঁড়ায় ; সুতরাং যৌবন আসিবার পূর্ব্বেই ভাগবতধর্ম্ম অভ্যাস করিয়া বিষয়াসক্তি বিদূরিত করা উচিত। যে অর্থলিপ্সা মানুষের স্বাভাবিক এবং

যাহার জন্য মানুষ প্রাণ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া থাকে, সেই অর্থলিপ্সা মনে দৃঢ় হইবার পূর্ব্বেই কৌমার বয়সে ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য; সংসারী হইয়া পড়িলে তখন পত্নী ও কলভাষী পুত্রকন্যাগণের মোহে আবদ্ধ হইয়া জীব আত্মধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া যায়; অতএব কৌমার বয়স হইতেই প্রীতিপূর্ব্বক ভগবৎ ভজন করিলে সংসারের মোহ আর মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্,
ভাবমাসুরমুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ॥ ৭।৬।২৪

—অতএব হে অসুরবালকগণ, তোমরা অসুর ভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতে দয়া ও মিত্রতা স্থাপন কর। ইহা দ্বারাই ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া দৈত্যবালকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য প্রহ্লাদ বলিলেন যে, তিনি দেবর্ষি নারদের নিকট এই জ্ঞান ও শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছেন। দৈত্য বালকগণ সন্দিগ্ধ হৃদয়ে বলিল,

প্রহ্লাদ, ত্বং বয়ঞ্চাপি নর্ত্তেঽন্যং বিদ্মহে গুরুম্,
এতাভ্যাং গুরুপুত্রাভ্যাং বালানামপিহীশ্বরৌ ॥ ৭।৬।২৯

—হে প্রহ্লাদ, এই গুরুপুত্রদ্বয় ব্যতীত তুমি ও আমরা অপর কোনও গুরুকে জানি না; ইঁহারাই অতি শিশুকাল হইতে আমাদের গুরু; ইঁহাদের ভয়ে আমাদের অন্যত্র যাওয়া সম্ভব নহে। তবে, তুমি যে বলিলে যে নারদের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইয়াছিল?

সপ্তম অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক মাতৃগর্ভস্থ শিশু প্রহ্লাদকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান বর্ণিত হইয়াছে। নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,

এবং দৈত্যসুতৈঃ পৃষ্টো মহাভাগবতোঽসুরঃ,
উবাচ স্ময়মানস্তান্ স্ময়ন্মদনুভাষিতম্ ॥ ৭।৭।১

—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এইরূপে দৈত্যবালকগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে আমার উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন।

প্রহ্লাদ বলিলেন যে, বহু বর্ষ পূর্ব্বে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু যুদ্ধে অজেয় হইবার আশায় তপস্যা করিবার মানসে মন্দর পর্ব্বতে গমন করিলে এবং তথায় পিপীলিকাদি তাহার রক্তমাংসাদি ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ আনন্দিত হইয়া উৎসাহের সহিত নেতাবিহীন দানবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। তখন অসুরদলপতিগণ দেবগণকর্ত্তৃক যুদ্ধে আহত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং নিজ নিজ প্রাণরক্ষার আশায় স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, স্বজন গৃহ ও পশুসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ইতিমধ্যে জয়াভিলাষী দেবগণ সহজেই রাজপ্রাসাদ অধিকার করিয়া দানবগণের সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক যথাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু "ইন্দ্রস্তু রাজমহিষীং মাতরং মম চাগ্রহীৎ"—দেবরাজ ইন্দ্র রাজমহিষী প্রহ্লাদের জননীকে পশুশক্তি প্রয়োগে আকর্ষণ করিয়া আকাশপথে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া চলিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র গর্ভবতী মাতাকে লইয়া যাইতেছেন; ব্যাধভয়ে ভীতা কুররী পক্ষীর মত ভক্তমাতা রোদন করিতেছেন—প্রহ্লাদ এই সমস্ত শোকাবহ ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, অথচ প্রহ্লাদের মুখ প্রসন্ন, দৃষ্টি অকুণ্ঠিত, চক্ষুদ্বয় স্বচ্ছ ও কোমল,—তাহাতে ক্রোধ অথবা একবিন্দু অশ্রুও দেখা যাইতেছে না। কী দুর্ব্বিষহ মুহূর্ত্ত কী প্রশান্তির সহিত বর্ণিত হইতেছে! এদিকে বৈকুণ্ঠে হরিগুণগান করিতে করিতে একজন দীনবৎসলের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—তিনি আর্ত্তবন্ধু দেবর্ষি নারদ। এই ঘটনা বর্ণনার সময় দেবর্ষি প্রহ্লাদের কথা উদ্ধৃত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,

যদৃচ্ছয়াগতস্তত্র দেবর্ষির্দদৃশে পথি।

—হঠাৎ সেই সময়ে স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ আসিয়া সমস্ত দেখিতে পাইলেন।

এতবড় একটা বিরাট্ অন্যায় সংঘটিত হইতেছিল, সমস্ত দেবকুলে কলঙ্ক আরোপিত করিয়া হিংসাবশে দেবরাজ ইন্দ্র নারীনির্য্যাতন ও শিশুহত্যা করিতে বসিয়াছিলেন, প্রবল প্রতাপ দেবেন্দ্রের পশুশক্তি ও দেবশক্তিকে বাধা দিবার মত হয়ত ত্রিভুবনে স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না,—এত বড় একটা দুর্ঘটনা এবং সেই দুর্ঘটনার প্রতিরোধ বর্ণনা করিবার সময় দেবর্ষি নারদের ভাষার কী সংযম, ভাষার কী কার্পণ্য! কেবলমাত্র বলিলেন, 'যদৃচ্ছয়াগতস্তত্র দেবর্ষির্দদৃশে পথি'—যেন বিশেষ কিছুই ব্যাপার নহে, হঠাৎ নারদ আসিয়া ইন্দ্রের রথমধ্যে রোদনশীলা এক নারীকে দেখিতে পাইলেন মাত্র! ইহাই বৈষ্ণবোচিত বিনয়, যে বিনয়ের অপূর্ব্ব আদর্শ স্বয়ং শ্রীহরি। দেবর্ষি নারদ আসিয়া পড়িয়াছেন,—রাজা হিরণ্যকশিপু, রাণী কয়াধু, ভক্তশিরোমণি প্রহ্লাদ, দেবরাজ ইন্দ্র—ইহাদের সকলের জীবনে একটা কতবড় ঘটনা—দেবর্ষি নারদ আকাশপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! আমরা দেখিতে পাইতেছি, হিমালয় পর্ব্বতের মত উচ্চ শির লইয়া দেবর্ষি স্বর্গের অধিপতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন; সেই নিরস্ত্র, বীণাধারী, শীর্ণকায় বৈষ্ণবের সম্মুখে দৈত্যবিজয়ী, রমণীহরণকারী বজ্রধর ইন্দ্রের অন্তরাত্মা কম্পিত হইতেছে, গর্ভবতী প্রহ্লাদজননী অশ্রুকলুষিত ভীতিবিহ্বল নয়নযুগল দিয়া অনিমেষদৃষ্টিতে সেই শুভ্র সত্ত্বময় বৈষ্ণব মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন, দেবর্ষি নারদের করুণাবিস্ফারিত শীতল চক্ষুদ্বয় ভীতা কয়াধুর উপর বিন্যস্ত—দেবর্ষি নিরঞ্জন আনন্দমূরতি, তাঁহার "দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধরপরে করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।" কী অদ্ভুত ঘটনা, কী অপূর্ব্ব দৃশ্য! এ কি শুধু "যদৃচ্ছয়া গতস্তত্র দেবর্ষির্দদৃশে পথি"—ভাষার এই

দীনতা বাগ্মীবর মহাকবি পরম ভাগবত শ্রীশুকদেবের নহে, ইহা দেবর্ষির বৈষ্ণবোচিত অপূর্ব্ব বিনয়।

দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রকে বলিলেন,

প্রাহনৈনাং সুরপতে! নেতুমর্হস্যনাগসম্,
মুঞ্চ মুঞ্চ মহাভাগ! সতীং পরপরিগ্রহম্ ॥ ৭।৭।৮

—হে দেবরাজ, এই নিরপরাধা রমণীকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে। হে মহাভাগ, এই পতিব্রতা পরস্ত্রীকে তুমি পরিত্যাগ কর, এখনই পরিত্যাগ কর।

এইবার ভাষা বন্ধনের শৃঙ্খল অতিক্রম করিয়াছে, দেবর্ষির অসীম করুণা ভাষার চাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। 'মুঞ্চ, মুঞ্চ'—এই কথাটি তুইবার ব্যবহৃত হইয়া পরম শান্ত ও পরম ধৈর্য্যশীল নারদের মনের বর্ত্তমান আবেগ ও ধৈর্য্যহীনতা পরিস্ফুট করিতেছে, 'অনাগসম্'—নিরপরাধা, "সতীং"—পতিব্রতা, 'পরপরিগ্রহম্'—পরস্ত্রী, এই তিনটি কথা বজ্রের মত কঠিন হইয়া দেবরাজের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আবার 'সুরপতে', 'মহাভাগ'—এই তুইটি কথা পুষ্পের মত কোমল হইয়াও আত্মবিস্মৃত দেবরাজের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিতেছে।—তুমি 'সুরপতি', দেবতাগণের রাজা, তোমার এই নীচের মত কর্ম্ম সমগ্র দেবতাকুলে কলঙ্ক আরোপণ করিবে; তুমি 'মহাভাগ'—বহু ভাগ্যে তুমি শতবার যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া তবে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইয়াছ, তোমার পক্ষে পরনারীহরণরূপ এই পশুর কার্য্য শোভনীয় নহে।

এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্র দেবর্ষিকে বলিলেন যে, এই রমণীর গর্ভে দেবশত্রু হিরণ্যকশিপুর তুঃসহ বীর্য্য রহিয়াছে, অতএব এই নারীর প্রসবকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্র তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবেন। যথাসময়ে পুত্র প্রসব করিলে সেই সদ্যোজাত শিশুকে বধপূর্ব্বক দেবতাগণকে নিশ্চিন্ত

করিয়া তাহার পর ইন্দ্র হিরণ্যকশিপুর পত্নীকে মুক্ত করিয়া দিবেন। দেবর্ষি ইন্দ্রের অভিলাষ জানিতেন, তথাপি ইন্দ্রের নিজের মুখ হইতে তাঁহার অসদুদ্দেশ্য শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এখন দেবরাজ ইন্দ্র নিজমুখে তাঁহার কুৎসিত উদ্দেশ্য স্বীকার করিলে দেবর্ষি বলিলেন,

অয়ং নিষ্কিল্বিষঃ সাক্ষাৎ মহাভাগবতো মহান্,
ত্বয়া ন প্রাপ্স্যতে সংস্থামনন্তানুচরো বলী ॥৭।৭।১০

—গর্ভস্থ শিশু নিষ্পাপ ও ভগবানের ভক্ত। অতএব মহাপ্রভাব-সম্পন্ন ও সাক্ষাৎ পরমবৈষ্ণব এই শিশুকে তুমি বধ করিতে সমর্থ হইবে না।

স্বল্পভাষী দেবর্ষির ভাষা অত্যন্ত সংযত অথচ গভীর অর্থব্যঞ্জক। এই শ্লোকটিকে বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেইদেখা যায় যে, গর্ভস্থ শিশু 'নিষ্কিল্বিষঃ' অর্থাৎ পাপলেশবিহীন। সাধারণতঃ জীব পাপ এবং পুণ্যমিশ্রিত কর্ম্মফলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে কিন্তু মাতৃগর্ভস্থ এই শিশু বিধাতার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—সে পাপলেশবিহীন, সুতরাং ইহার জন্ম অভূতপূর্ব্ব। স্বভাবতঃই ইন্দ্রের মনে কৌতূহল জাগ্রত হইল,—কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইতে পারে? সর্ব্বান্তর্য্যামী দেবর্ষি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "সাক্ষাৎ মহাভাগবতঃ"—অর্থাৎ পরমা বৈষ্ণবীশক্তি এই শিশুকে আশ্রয় করিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে, সুতরাং সেই বৈষ্ণবীশক্তি প্রকাশের মধ্যে কোনও মলিনতা থাকিতে পারে না। দেবর্ষি এই কথাটির ভিতর দিয়া আরও ইঙ্গিত করিলেন যে, ভবিষ্যতে এই বৈষ্ণবীশক্তি ও দানবরাজের পশুশক্তির ভিতর সংঘর্ষ বাধিলে, পঞ্চবর্ষীয় কোমল বালক ও বজ্রসারদেহ দৈত্যকুলপতির মধ্যে সাধারণ দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য থাকিলেও বৈষ্ণবীশক্তি আশ্রয়কারী বালকের বিজয়ই অবশ্যম্ভাবী। "ত্বয়া ন প্রাপ্স্যতে সংস্থাং"—অর্থাৎ হে ইন্দ্র, তুমি ইহাকে বধ করিতে পারিবে না। শত সহস্র অসুর-যুদ্ধে বিজয়ী বজ্রধর ইন্দ্র একটি সদ্যোজাত শিশুকে

বধ করিতে পারিবেন না! কেন? কারণ এই গর্ভস্থ শিশু "অনন্তানুচরো বলী"—এই শিশু স্বয়ং শ্রীহরির সেবক সুতরাং প্রভুর শক্তিতে শক্তিমান্ এই দাস 'বলী' অর্থাৎ মহাবলবান্। 'বলী' কথাটির অর্থব্যঞ্জনা সহজেই অনুমেয়। দেবরাজ হয়ত মনে করিতেছিলেন, সমগ্র দেবতাগণের অশেষ শক্তিশালী রাজার পক্ষে পাপবিদ্ধ অথবা অপাপবিদ্ধ অসহায় কোন শিশুকেই বধ করা কঠিন হইবে না। কিন্তু এই শিশু 'বলী'—পশুশক্তিতে বলী অবশ্যই নহে, কিন্তু আত্মার অসীম শক্তিতে বলী। সুতরাং পশুশক্তি এবং আত্মশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিলে আত্মশক্তিই অবশ্য বিজয়ী হইবে। দেবর্ষির এই ভীতিপ্রদ অথচ যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি ইন্দ্র ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন, এবং "দেবর্ষের্মানয়ন্ বচঃ"—পরম সত্যবাদী নারদের কথাগুলি বিশ্বাস করিয়া "অনন্ত প্রিয়ভক্ত্যেনাং পরিক্রম্য দিবং যযৌ"—ভগবানের প্রিয় প্রহ্লাদ গর্ভে রহিয়াছেন জানিয়া প্রহ্লাদ-মাতাকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে নারদের নিকট পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে চলিয়া যাইলেন।

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে বলিলেন যে, দেবরাজ এইরূপে বিফল-মনোরথ হইয়া স্বর্গে চলিয়া যাইলে দেবর্ষি নারদ তাঁহার মাতাকে সঙ্গে করিয়া নিজ আশ্রমে লইয়া আসিলেন।

> ততো মে মাতরমৃষিঃ সমানীয় নিজাশ্রমে,
> আশ্বাস্য ইহ উষ্যতাং বৎসে! যাবত্তে ভর্ত্তুরাগমঃ। ৭।৭।১২

—অনন্তর দেবর্ষি নারদ আমার মাতাকে নিজ আশ্রমে আনয়ন করিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—হে বৎসে, যতদিন তোমার স্বামী ফিরিয়া না আসেন, ততদিন তুমি এই আশ্রমে অবস্থান কর।

এই একটি শ্লোকের ভিতর দিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ও মহর্ষি নারদের মধ্যে বৃহৎ পার্থক্য সহজেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কুররীর মত রোদনশীলা গর্ভবতী নারীকে দেখিয়া একজন উদাসীন, স্বীয় হিংসাপ্রবৃত্তিতে দৃঢ়ভাবে

অবস্থিত, অপরজন নারীর উদ্বিগ্ন মনের অবস্থায় বিগলিত হইয়া তাহাকে করুণ বচনে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন ; 'বৎসে' বলিয়া সম্বোধন করিয়া নারীর সমস্ত ভয় অপহরণ করিতেছেন ; একজনকে আমরা দেখিতেছি নির্দ্দয়তা ও স্বার্থসিদ্ধির প্রতিমূর্ত্তি, অপরকে দেখিতেছি অনন্ত করুণা-প্রস্রবণ। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, গর্ভে পরমবৈষ্ণবকে ধারণ করিয়া আছেন বলিয়াই আজ রাণী কয়াধুর এত সম্মান।

প্রহ্লাদমাতা নারদের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন, কন্যারূপে গৃহীতা এই নারীর দিন দেবর্ষির সেবা ও পরিচর্য্যায় কাটিতে লাগিল। কিন্তু দেবর্ষি "অমোঘদর্শন্"—তাঁহার দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না।

ঋষি কারুণিকস্তস্যাঃ প্রাদাতুভয়মীশ্বরঃ,
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং জ্ঞানঞ্চ মামপ্যুদ্দিশ্য নির্ম্মলম্ ॥৭।৭।১৫

—সর্ব্বশক্তিশালী ও পরম কারুণিক দেবর্ষি নারদ হরিকথার নিগূঢ় রহস্য ও নির্ম্মল জ্ঞান—এই উভয়ই আমাকে লক্ষ্য করিয়া আমার জননীকে উপদেশ করিতে লাগিলেন।

শ্লোকটিকে বিশ্লেষণ করা যাউক। ঋষি 'ঈশ্বরঃ' অর্থাৎ অপ্রতিহত শক্তি, ইন্দ্রের উদ্দেশ্য-বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া তাহা প্রমাণিত হইয়াছে ; ঋষি "কারুণিকঃ" অর্থাৎ পরম দয়াল, এই ঋষির দয়া ব্যতীত ইন্দ্রের কবল হইতে কয়াধুকে উদ্ধার করা এবং তাঁহার গর্ভস্থ বৈষ্ণব বালককে রক্ষা করা হয়ত ত্রিভুবনে আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না ; ঋষি হরিভক্তি ও নির্ম্মল জ্ঞান উভয়ই প্রদান করিতে সমর্থ, ঋষির প্রধান লক্ষ্য গর্ভস্থ বালক, আনুষঙ্গিকরূপে মাতাও কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হইতেছেন। দৈত্য বালক-গণের মনে সন্দেহ হইল যে, ঋষিমুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণের ফলে দৈত্যবীর্য্যে প্রহ্লাদের জন্ম হইয়াও, দৈত্যকুলে অবস্থান করিয়াও তাঁহার জীবনে হরিভক্তি প্রবলভাবে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু মাতা কয়াধুও হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কই তাঁহার জীবনে তো কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য

করা যাইতেছে না! প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণের এই সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য বলিলেন,

> তত্তু কালস্য দীর্ঘত্বাৎ স্ত্রীত্বাৎ মাতুস্তিরোদধে,
> ঋষিণানুগৃহীতং মাং নাধুনাপ্য জহাৎ স্মৃতিঃ ॥ ৭।৭।১৬

—দীর্ঘকাল অতীত হওয়ায় এবং স্ত্রীজাতি বলিয়া আমার মাতার সেই জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ঋষির অনুগ্রহে ঐ স্মৃতি আমি ভুলিয়া যাই নাই।

পূর্ব্বজন্মসংস্কার ও প্রথম ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণের মধ্যে ইহাই বিশেষ প্রভেদ। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার যাহার আছে, সে ধর্ম্মকথা সহজেই গ্রহণ করিতে পারে, সামান্য ধর্ম্মবিষয়ক ইঙ্গিতও তাহার হৃদয়ে সুদৃঢ় রেখা অঙ্কিত করিয়া যায়। কিন্তু যাহার পূর্ব্বজন্মসংস্কার নাই, তাহার হৃদয় উষর এবং অকর্ষিত ভূমির মত শস্যহীন, সেখানে শস্য ছড়াইয়া দিলেও কার্য্যকরী হয় না। সেইজন্য একই ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকট সহস্র সহস্র লোক একই উপদেশ গ্রহণ করিলেও সহস্রবিধ পরিণাম দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আর একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত—"স্ত্রীত্বাৎ"—প্রহ্লাদের মাতা স্ত্রীলোক, সুতরাং ধর্ম্মকথা তাঁহার জীবনে সহজে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোকদের সহজে চৈতন্য হয় না, তারা সৃষ্টি করবার জন্য আছে কি না।" প্রহ্লাদের কথা এবং এই সাধুর কথা একই অর্থদ্যোতক এবং প্রণিধানযোগ্য। মাতৃমূর্ত্তিতেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত অভিব্যক্তি—মাতৃমূর্ত্তি স্ত্রীলোকের স্বরূপ। সুতরাং অখণ্ড হরিভক্তি অথবা ব্রহ্মজ্ঞান তো স্ত্রীলোক সহজে ধারণা করিতে পারে না, যদি তাহা পারিত তাহা হইলে তো লীলাময়ের সমস্ত সৃষ্টিই বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

প্রহ্লাদ মহাশয় দেবর্ষির নিকট হইতে ধর্ম্মকথা শ্রবণের বৃত্তান্ত বলিয়া দৈত্যবালকগণের কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে

ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাহারা যদি প্রহ্লাদের বাক্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদেরও হৃদয়ে হরিভক্তি সঞ্চারিত হইবে। সমস্ত দেহই ক্ষণভঙ্গুর এবং জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ—এই ছয় প্রকার বিকারভাবের অধীন। কিন্তু আত্মা এই সমস্ত অবস্থা হইতে মুক্ত। অতএব দেহাদিতে আত্মাভিমান করা উচিত নহে।

বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ,
তা যেনৈবানুভূয়ন্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ ॥ ৭।৭।২৫

—জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি বুদ্ধির বৃত্তি। যিনি ঐ সকল বৃত্তি অনুভব করেন, সেই জ্ঞানস্বরূপ জীবই বুদ্ধি প্রভৃতির অধিপতি অথচ বুদ্ধি হইতে বিভিন্ন।

পরমেশ্বরের উপর রতি না হইলে সেই আত্মস্বরূপ ভগবানকে জানিতে পারা যায় না। কিরূপে ভগবানে রতি উৎপন্ন হয় তাহাই বলিতেছেন,

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ,
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ ॥
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্ত্তনৈর্গুণকর্ম্মনাম্
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ ॥ ৭।৭।৩০-৩১

—ভক্তিপূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষা, ভগবানে সর্ব্ব কর্ম্মসমর্পণ, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের ভজন, ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা, তাঁহার গুণ ও কর্ম্মসমূহের কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্মের ধ্যান এবং তাঁহার মূর্ত্তির দর্শন, পূজন ও বন্দন—এই সমস্ত অভ্যাসের দ্বারা পরা ভক্তিরূপা রতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রহ্লাদ মহাশয় নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বলিয়া দৈত্যবালকগণের প্রতি তাঁহার উপদেশ শেষ করিলেন,

ততঃ হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ,
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতাত্মনীশ্বরে ॥

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ,
একান্ত ভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণম্ ॥ ৭।৭।৫৩,৫৫

—অতএব দৈত্যবালকগণ, "আমাতে যেমন ভগবান্ অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত আছেন, সেইরূপ সর্ব্বভূতেও বর্ত্তমান আছেন"—এইরূপ আত্ম-তুলনার দ্বারা তোমরা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী শ্রীহরির প্রতি ভক্তিভাব স্থাপন কর।

ভগবান্ গোবিন্দের প্রতি একান্ত ভক্তি এবং সর্ব্বভূতে তাঁহাকে দর্শন করাই ইহলোকে পুরুষের পরম স্বার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়ে নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু বধ বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে এইরূপ তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলে তাহারা প্রহ্লাদের বাক্যই উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিল এবং গুরুর দীর্ঘকালের উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রহ্লাদের উপদেশমত ভগবানের উপর ভক্তিভাব স্থাপন করিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া শণ্ড ও অমর্ক যে সামদানভেদদণ্ড প্রভৃতি পার্থিব বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন, সেই সমস্ত বিদ্যাই প্রহ্লাদের ক্ষণকালের শিক্ষার ফলে স্রোতোবেগে তৃণখণ্ডের মত কোথায় ভাসিয়া গেল! শণ্ড ও অমর্ক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অসুরবালকগণের আসুরীভাব হইতে দৈবীভাবে পরিবর্ত্তন সহজেই লক্ষ্য করিয়া রাজা হিরণ্যকশিপুর ভয়ে চিন্তিত হইলেন। এতদিন একজনমাত্র বালক সমগ্র দৈত্যপুরীতে হরিভক্ত ছিল, এখন শত শত দৈত্যবালক রাজদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে! এইরূপে রাজদ্রোহিতা গৃহে গৃহে বিস্তারলাভ করিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইবে; এখনকার এই অবস্থা আর শণ্ড ও অমর্কের আয়ত্তাধীন নহে,—ইহা বিবেচনা করিয়া শিক্ষকদ্বয় "ভীতস্তুরিতো রাজ্ঞে আবেদয়ৎ যথা"—ভীত হইয়া প্রহ্লাদকে সঙ্গে করিয়া সত্বর রাজা হিরণ্যকশিপুর নিকট যাইয়া রাজপুত্রের কীর্ত্তিকলাপ এবং তাহার বিষময় ফল নিবেদন করিলেন। দৈত্যরাজ

বুঝিতে পারিলেন, এই পুত্র কেবলমাত্র রাজদ্রোহী নহে, সে রাজদ্রোহিতা প্রচার করিয়া হিরণ্যকশিপুর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সমুৎসুক। পিতা ও পুত্রের ইহাই তৃতীয় ও শেষ সাক্ষাৎ। হিরণ্যকশিপু "কোপাবেশচলদ্গাত্রঃ" —ক্রোধে কম্পিতকলেবর "সর্পঃ পদাহত ইব শ্বসন্ প্রকৃতিদারুণঃ"—সে স্বভাবতঃই নিষ্ঠুর, এখন পদাহত সর্পের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে—এই কৃতান্তসদৃশ নিষ্ঠুর পিতার সম্মুখে অতি কোমল পঞ্চ বর্ষীয় বালক দাঁড়াইয়া আছেন—"প্রশ্রয়াবনতং, দান্তং, বদ্ধাঞ্জলিং"—বিনয়াবনত, সুখদুঃখে সমবুদ্ধি, এবং বদ্ধাঞ্জলি। সে এক ভীষণ দৃশ্য। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুকাল উপস্থিত সুতরাং সে বিপরীত বুদ্ধি বশতঃ তাহার শত্রুর প্রতি অনুগত স্বীয় পুত্রের উপর বিষম ভাব প্রদর্শন করিতেছে, অন্যদিকে ভক্তশিরোমণি প্রহ্লাদ জোড়হস্তে পিতাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া শান্তহৃদয়ে সভামধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন —চতুর্দ্দিকে দৈত্য- সভাসদ্‌গণ একটা অনিশ্চিত দুর্ঘটনার আশঙ্কায় নির্ব্বাক ও নিশ্চল। সমগ্র সভাস্থলী নিস্তব্ধ, কেবল মধ্যে মধ্যে হিরণ্যকশিপুর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শ্রুতিগোচর হইতেছে,—এ যেন প্রলয় ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা!

হঠাৎ যেন বজ্রনির্ঘোষ হইল। রাজা হিরণ্যকশিপু গর্জ্জন করিয়া উঠিল,

হে দুর্ব্বিনীত, মন্দাত্মন্, কুলভেদকরাধম,
স্তব্ধং মচ্ছাসনোদ্বৃত্তং নেষ্যে ত্বাদ্য যমক্ষয়ম্ ॥
ক্রুদ্ধস্য যস্য কম্পন্তে ত্রয়ো লোকাঃ সহেশ্বরাঃ,
তস্য মেঽভীতবন্মূঢ়! শাসনং কিংবলোঽত্যগাঃ ॥ ৭।৮।৬,৭

—রে উদ্ধত, রে মন্দবুদ্ধি, কুলনাশক, অধম, তুই আমার শাসনের বহির্ভূত ও অবিনীত, অতএব তোকে আজ যমালয়ে প্রেরণ করিব।

রে মূঢ়, আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার ভয়ে লোকপালগণের সহিত ত্রিলোক কম্পিত হইয়া থাকে, তাদৃশ আমার শাসন তুই কাহার বলে নির্ভীকের ন্যায় লঙ্ঘন করিলি ?

এইবার উত্তর দিবার প্রয়োজন হইল। হিরণ্যকশিপু বলিয়াছিল "কিংবলঃ"—কাহার বলে বলী হইয়া প্রহ্লাদ মহাবীর দৈত্যরাজকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন ? এই "কিংবলঃ" কথাটির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল—হিরণ্যকশিপু হরির উপর ব্যঙ্গ করিয়া যেন ইঙ্গিত করিতেছে, যে যাহার বলের উপর প্রহ্লাদ নির্ভর করিতেছে, তাহার বল হিরণ্যকশিপুর তুলনায় অতিশয় তুচ্ছ। ইষ্টদেবের উপর এই অবজ্ঞা প্রদর্শন ভক্তের হৃদয়কে ব্যথিত করিল, সুতরাং প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন—কিংবলঃ ?—কাহার বলে আমার এত সাহস ? তবে রাজা হিরণ্যকশিপু শ্রবণ কর ঃ

ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্! স বৈ বলং বলিনাঞ্চাপরেষাং,
পরেঽবরেঽমী স্থিরজঙ্গমা যে ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ ॥ ৭।৮।৮

—হে রাজন্, ব্রহ্মাদি উচ্চ ও নীচ স্থাবর জঙ্গম সকলকে যিনি বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ভগবান্ কেবল আমার বল নহেন, তিনি আপনার এবং অপরাপর বলশালিগণেরও বল।

এই শ্লোকটি ব্যঞ্জনা-শক্তিতে অপূর্ব্ব। প্রহ্লাদ মহাশয় ইঙ্গিত করিতেছেন যে, হিরণ্যকশিপু, আজ "আমি বলবান্, আমার ভয়ে সকলেই কম্পমান"—এই বলিয়া যে বড়াই করিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি-বশতঃ। সে মনে করিয়া দেখুক যে একদিন সে আপনাকে দুর্ব্বল এবং অসহায় মনে করিয়া মন্দর পর্ব্বতে তপস্যা করিতে গিয়াছিল, পিপীলিকা তাহার সমস্ত রক্তমাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছিল, সে অস্থিমাত্রসার দেহ লইয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিল, ইতিমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র হিরণ্যকশিপুর স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। কই ? নিজ স্ত্রীঅপহরণকারীকে

পরাজিত করা দূরের কথা, সামান্য বাধা প্রদান করার শক্তিও তো তাহার ছিল না। তখন দেবর্ষি নারদ রাজমহিষীকে রক্ষা না করিলে সেদিনের এক দুর্ঘটনাই হিরণ্যকশিপুর পরবর্ত্তী যুগের সমস্ত সুখ ও ঐশ্বর্য্য নিরর্থক করিয়া দিত। সেই রাজমহিষীরক্ষাকারী দেবর্ষি নারদ শ্রীহরির বলে বলীয়ান, শ্রীহরির চরণাশ্রিত আজ্ঞাকারী দাস মাত্র। হিরণ্যকশিপু ইহার পরের কথাও স্মরণ করিয়া দেখুক। আজ সে ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত হইয়া দম্ভশালী ত্রৈলোক্যাধিপতি হিরণ্যকশিপু। কিন্তু "ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ"—স্বয়ং ব্রহ্মাও স্বতন্ত্র নহেন, তিনি শ্রীহরির ইচ্ছাশক্তির নিকট পরাধীন। ব্রহ্মাই হিরণ্যকশিপুর শক্তি, আবার ব্রহ্মার শক্তি সেই এক অদ্বিতীয় পরমপুরুষ শ্রীহরি। অতএব রাজা হিরণ্যকশিপুর দম্ভ নিরর্থক,—সে এবং প্রহ্লাদ উভয়েরই শক্তিস্বরূপ শ্রীভগবান্—"কিংবলঃ" ?—সমগ্র শক্তির শ্রীহরিই একমাত্র উৎস।

প্রহ্লাদ সেই সর্ব্বশক্তিস্বরূপ শ্রীহরির বলের কথা আরও বিশদভাবে বলিতেছেন :

স ঈশ্বরঃ কাল উরুক্রমোঽসা-বোজঃ সহঃ সত্ত্ব বলেন্দ্রিয়াত্মা
স এব বিশ্বং পরমঃ স্বশক্তিভিঃ সৃজত্যবত্যত্তি গুণত্রয়েশঃ ॥ ৭।৮।৯

—সেই শ্রীহরি সর্ব্বনিয়ন্তা মহাকালস্বরূপ। অমিতবিক্রমশালী তিনিই দেহশক্তি, মনঃশক্তি, ধৈর্য্যশক্তি। সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই গুণত্রয় তাঁহারই শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তিনিই স্বীয় শক্তির দ্বারা এই বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন।

প্রহ্লাদ ইঙ্গিত করিতেছেন যে, হিরণ্যকশিপু আপনার যে পশুশক্তির বড়াই করিতেছেন সে শক্তির উৎস শ্রীহরি, উপরন্তু আরও অনন্ত শক্তির তিনিই একমাত্র আধার। তিনিই মহাকাল, সুতরাং অহরহঃ পরিবর্ত্তন-শীল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শ্রীহরিই একমাত্র স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। হিরণ্যকশিপুর কতটুকু শক্তি ? তিনি তো বিশ্ব সৃজন করেন নাই, তিনি তো পালন

করিতেছেন না, তিনি তো সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংহার করিতেও সমর্থ নহেন। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক ক্ষুদ্র বালুকণার মত একখণ্ড রাজ্যের উপর তিনি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু যুগে যুগে, কল্পে কল্পে শ্রীহরি স্বীয় অনন্তশক্তির দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া থাকেন, পালন করেন, আবার এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় শক্তিবলে তাঁহার অনন্ত সত্তায় বিলীন করিয়া যুগোচিত যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীহরির সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া হিরণ্যকশিপু যে শক্তির অহঙ্কার করিতেছেন সেই শক্তি যদি তাঁহার নিজেরও হয় তাহা হইলেও সেই শক্তি বিশ্বস্রষ্টার শক্তির তুলনায় কতটুকু!

এইবার পুত্র প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার কল্যাণ কামনায় অতি কোমল এবং স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিতেছেন:

জহ্যাসুরং ভাবমিমং ত্বমাত্মনঃ সমং মনোধৎস্বনসন্তিবিদ্বিষঃ
ঋতে জিতাদাত্মনঃ উৎপথে স্থিতাৎ তদ্ধিহ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্॥ ৭।৮।১০
দস্যূন্ পুরা ষট্ ন বিজিত্য লুম্পতো মন্যতে একে স্বজিতা দিশোদশ
জিতাত্মনোজ্ঞস্য সমস্ত দেহিনাং সাধোঃ স্বমোহপ্রভাবাঃ কুতঃ পরে॥
৭।৮।১১

—হে পিতঃ, আপনি নিজের এই আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করুন। অবশীভূত ও উন্মার্গগামী মনের মত শত্রু আর কিছুই নাই, অতএব আপনি মনকে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত করুন; মনের ঐ সমপ্রতিষ্ঠাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ পূজা।

হে রাজন্, আপনার মত কেহ কেহ আয়ু অপহরণকারী ছয়টি ইন্দ্রিয়রূপ দস্যুকে জয় না করিয়াই নিজে দশ দিক্ জয় করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী,—"সমস্তই ভগবদাত্মক"—এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ও সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন, তাদৃশ সাধুব্যক্তির শত্রু কোথায়? অজ্ঞানতা হেতুই শত্রু কল্পনা করা হয়। জ্ঞানীর শত্রু নাই।

প্রহ্লাদের এই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ অথচ অসীম প্রীতিযুক্ত কথাগুলি হিরণ্যকশিপুর হৃদয়ে স্থান পাইল না, সে পুত্রের সমগ্র উপদেশ তাহার অবমাননা বলিয়া গ্রহণ করিল। ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া হিরণ্যকশিপু বলিল,

যস্ত্বয়া মন্দভাগ্যোক্তো মদন্যো জগদীশ্বরঃ,
ক্বাসৌ যদি স সর্ব্বত্র, কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে ॥ ৭।৮।১৩

—রে হতভাগ্য! আমিই জগতের ঈশ্বর। তথাপি তুই বলিতেছিস্ যে আমি ব্যতীত অপর একজন জগদীশ্বর আছেন। আচ্ছা, যদি থাকে তবে সে এখন কোথায়? তুই বলিয়াছিলি সর্ব্বত্রই থাকে, যদি তাহাই হয় তবে এই স্তম্ভের ভিতর তাহাকে দেখা যাইতেছে না কেন?

ইহাই শ্লোকটির সহজ অর্থ। কিন্তু এই শ্লোকটির দ্বিতীয় প্রকার অর্থও আছে এবং সেই অর্থটিই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। হিরণ্যকশিপু বলিতেছে—রে হতভাগ্য, তুই যে বলিতেছিস্, আমি ব্যতীত জগতের আর একজন প্রভু আছে, "ক্বাসৌ যদি স,"—যদি তাহাই হয় তবে সে কোথায়? প্রহ্লাদ বলিলেন "সর্ব্বত্র"। হিরণ্যকশিপু বলিল, "কস্মাৎ স্তম্ভে ন"—তাহা হইলে স্ফটিকের স্তম্ভের ভিতর দেখা যাইতেছে না কেন? প্রহ্লাদ বলিলেন, "দৃশ্যতে"—ঐ তো আমি দেখিতে পাইতেছি।

সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, রাজা হিরণ্যকশিপু মনে করিয়াছেন যে, শত্রু শ্রীহরি কোথায় এখন গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন প্রহ্লাদ জ্ঞাত আছেন, সুতরাং সেই স্থানটি প্রহ্লাদের মুখে জানিতে পারিলেই হিরণ্যকশিপু স্বীয় শক্তিপ্রভাবে শ্রীহরিকে বধ করিবে। রাজসভামধ্যে অদূরে স্ফটিকস্তম্ভ দেখা যাইতেছে—হয়তো সেইখানেই শত্রু কোনরূপে আত্মগোপন করিয়া পুত্র প্রহ্লাদকে উৎসাহিত করিতেছে। অথচ স্তম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হিরণ্যকশিপু সমস্তই শূন্যময়

দেখিতেছে, কিন্তু প্রহ্লাদ তাঁহার ইষ্টদেবকে সেই স্তম্ভের ভিতর স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন।

এই শ্লোকটির মধ্য দিয়া হিরণ্যকশিপুর তীব্র তিরস্কার, তাহার অধৈর্য্য-প্রসূত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, প্রহ্লাদের সংক্ষিপ্ত উত্তর একের পর এক ভাষা এবং ছন্দের বেগে চলচ্চিত্রের মত দ্রুতগতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে—সমগ্র ঘটনাটিকে সম্যক্ উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

এইবার ব্যাপার গুরুতর আকার ধারণ করিল। হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদের কথায় স্তম্ভের দিকে মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করিয়াও কিছুই দেখিতে পাইল না, তখন "গোপায়েতহরিস্ত্বাদ্য যস্তে শরণমীপ্সিতম্"—তুই আমার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিস্ সেই হরি আজ তোকে রক্ষা করুক—এই বলিয়া প্রহ্লাদকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক সে সিংহাসন হইতে লম্ফপ্রদান করিল এবং নিকটেই প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপুর মধ্যবর্ত্তী স্তম্ভ লক্ষ্য করিয়া শ্রীহরির উদ্দেশে ভীষণ মুষ্টিপ্রহার করিল। এই মুষ্টিপ্রহারের সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্তম্ভের ভিতর হইতে এক অতি ভয়ঙ্কর গর্জ্জনধ্বনি উত্থিত হইল, ত্রিভুবন বিদীর্ণ করিয়া সেই ধ্বনি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের শ্রুতিগোচর হইল,—চতুর্দ্দিকে ভয়াবহ গর্জ্জনধ্বনি, প্রতিধ্বনি, আবার তাহার প্রতিধ্বনি। হিরণ্যকশিপু চকিত হইয়া পাগলের মত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াও সেই ধ্বনির কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। তখন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি ভগবানের কথা সত্য করিবার জন্য পশুও নহে, মনুষ্যও নহে, এইরূপ অতি অদ্ভুত নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্তম্ভ হইতে বাহির হইলেন।

সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষ্বখিলেষুচাত্মনঃ,
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্ স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষং॥ ৭।৮।১৮

এই শ্লোকের অর্থ গভীর ব্যঞ্জনাসূচক। ভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন যে, শ্রীহরি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন এবং স্তম্ভমধ্যেও তিনি বিরাজমান—

ভক্ত এই কথা বলিয়াছেন সুতরাং তাঁহার কথা সত্য করিবার জন্য শ্রীহরি স্তম্ভের মধ্য হইতে আবির্ভূত হইলেন। প্রহ্লাদ শ্রীহরির ভৃত্য এবং ভৃত্যের কথা সত্য করিতে হইবে; নতুবা হয়ত আকাশপথে অথবা গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াও নৃসিংহদেব সভাস্থলে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন; হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিল যেন ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন জীব অথবা দেব দানব হইতে তাহার মৃত্যু না হয় এবং ব্রহ্মাও 'তথাস্তু' বলিয়া সেই বর প্রদান করিয়াছিলেন। এখন ব্রহ্মার বাক্য সত্য করিতে হইবে অথচ হিরণ্যকশিপুকে বধ করাও প্রয়োজন, সুতরাং শ্রীহরির এই অদ্ভুত নৃসিংহমূর্ত্তি; সনকাদি মুনিগণ ভগবানের পার্ষদদ্বয়কে অভিশাপ প্রদান করিয়া পরে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—তোমরা তিন জন্ম পরে মুক্ত হইবে,—সনকাদি ভক্তগণের এই বাক্য সফল করিবার জন্য স্বহস্তে বধ করিয়া পার্ষদজনকে মুক্তি দিবার জন্য আজ শ্রীহরি অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন; স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—আজ কিন্তু প্রবল বলশালী হিরণ্যকশিপু তীক্ষ্নধার খড়্গ লইয়া বালককে নিহত করিতে উদ্যত, সেই পিণ্ডীভূত পশুশক্তি বিনাশ করিয়া ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিতে একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানই সমর্থ, সুতরাং আজ "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এই নিজ বাক্য সত্য করিবার জন্য তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ হইতে দানবপুরীতে অবতরণ করিতে হইয়াছে; তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু,—এই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বাক্য জীবচক্ষের গোচরীভূত করিবার জন্য সেই স্তম্ভ হইতে বাহির হইয়া সভামধ্যে সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া প্রভু সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান। "ন মৃগং ন মানুষং"—সে কি অদ্ভুত রূপ! দেবর্ষি নারদ তিনটি শ্লোকে এই 'ভয়াবহ ঈশ্বরমূর্ত্তির রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই তিনটি শ্লোক নৃসিংহদেবের ধ্যানমূর্ত্তি।

প্রতপ্তচামী করচণ্ডলোচনং স্ফুরৎসটা কেশরজৃম্ভিতাননম্
করালদংষ্ট্রং করবাল চঞ্চল-ক্ষুরান্তজিহ্বং ভ্রূকুটীমুখোল্বনম্ ॥
স্তব্ধোর্দ্ধকর্ণং গিরিকন্দরাদ্ভূত—ব্যাত্তাস্যনাসং হনুভেদভীষণম্
দিবি স্পৃশৎ কায়মদীর্ঘ-পীবর-গ্রীবোরুবক্ষঃস্থলমল্পমধ্যমম্ ॥
চন্দ্রাংশু গৌরৈশ্ছুরিতং তনূরুহৈ-র্বিষ্বগ্‌ভুজানীকশতং নখায়ুধম্
দুরাসদং সর্ব্বনিজেতরায়ুধ—প্রবেকবিদ্রাবিতদৈত্যদানবম্ ॥

৭।৮।২১-২৩

—নৃসিংহদেবের সেই মূর্ত্তিতে লোচনদ্বয় উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ও উগ্র, জটা ও কেশর দীপ্তিশালী, মুখমণ্ডল বিকট, দংষ্ট্রাসমূহ ভয়ানক, জিহ্বা খড়্গের ন্যায় চঞ্চল ও ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ ছিল, এবং ভীষণ ভ্রূকুটীর জন্য ঐ মূর্ত্তিকে ভীষণতর দেখাইতেছিল ; নৃসিংহদেবের মূর্ত্তিতে কর্ণদ্বয় নিশ্চল ও উর্দ্ধমুখ, এবং মুখ ও নাসিকা পর্ব্বতগুহার মত অদ্ভুত ও বিস্ফারিত ছিল, কপোলপ্রান্তদ্বয়ের বিস্তৃতিহেতু ঐ মূর্ত্তি ভীষণ হইয়াছিল, ঐ মূর্ত্তির দেহ আকাশস্পর্শী, গ্রীবা হ্রস্ব ও স্থূল, বক্ষঃস্থল বিশাল ও উদর ক্ষীণ ছিল ; ঐ মূর্ত্তি চন্দ্রকিরণের ন্যায় গৌরবর্ণ রোমরাজিতে পরিব্যাপ্ত ছিল ; ঐ মূর্ত্তি শত শত নখরজালে ভয়ঙ্করদর্শন এবং চক্র, বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সমূহের দ্বারা দৈত্যদানবগণের চক্ষুতে ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল।

হিরণ্যকশিপু সাহস করিয়া গদাহস্তে গর্জ্জন করিতে করিতে নৃসিংহদেবের সম্মুখে ধাবিত হইল। তখন "মহোরগং তার্ক্ষ্যসুতো যথাগ্রহীৎ" —গরুড় যেমন মহাসর্পকে ধরিয়া ফেলে, সেইরূপ নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং অবলীলাক্রমে তাহাকে গৃহের দ্বারদেশে বহন করিয়া স্বীয় উরুদ্বয়ের উপর স্থাপন করতঃ নিজ শাণিত নখরজাল দিয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় হিরণ্যকশিপুর সহস্র সহস্র দৈত্য অনুচরগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া

নৃসিংহদেবকে আক্রমণ করিলে তিনি তাহাদের সকলকে বধ করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন নৃসিংহদেবের কী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! সহজেই ভীষণদর্শন এই মূর্ত্তি তখন সহস্র সহস্র দৈত্যগণের রুধিরে প্রবলিপ্ত, বিস্ফারিত চক্ষু হইতে যেন অগ্নি বাহির হইতেছে, ক্রোধে কেশরজাল উর্দ্ধমুখ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, ঘন ঘন গর্জ্জনের সহিত ঘন ঘন গভীর নিশ্বাসধ্বনি চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিতেছে। নারদ এই মূর্ত্তির কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,

সটাবধূতা জলদাঃ পরাপতন্ গ্রহাশ্চ তদ্দৃষ্টি বিমুষ্টরোচিষঃ
অম্ভোধয়ঃ শ্বাসহতাঃ বিচুক্ষুভু-র্নির্হ্রাদভীতাঃ দিগিভাঃ
বিচুক্রুশুঃ ॥ ৭।৮।৩৩

—উর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত নৃসিংদেবের জটার আঘাতে মেঘসমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে সরিয়া যাইতেছিল, তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় ভীষণ চক্ষুর দীপ্তিতে গ্রহগণের জ্যোতি পরিম্লান হইয়া গেল, তাঁহার বিস্ফারিত নাসাদ্বয়ের নিঃশ্বাসবায়ুর বেগে সমুদ্রবক্ষ আলোড়িত হইতে লাগিল, তাঁহার ভীষণ গর্জ্জন ধ্বনিতে ভীত হইয়া দিগ্‌গজগণ চীৎকার করিতে লাগিল।

অতঃপর নৃসিংহদেব সভামধ্যে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, যক্ষ গন্ধর্ব্বগণ—সকলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। সকলেই দূর হইতে স্তব করিলেন, কেহই সেই ক্রোধদীপ্ত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির নিকটে যাইতে সাহস করিলেন না। তখন

সাক্ষাৎ শ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈদৃ ষ্ট্বা তৎ মহদদ্ভুতম্,
অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতা ॥ ৭।৯।২

—নৃসিংহদেবের রূপ—অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং অশ্রুতপূর্ব্ব ; এইজন্য দেবতাগণ তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিলেন না। সুতরাং দেবগণ

বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীদেবীকে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিলেন কিন্তু সেই অত্যাশ্চর্য্য নৃসিংহরূপ দর্শন করিয়া লক্ষ্মীদেবীও শঙ্কিত হইলেন এবং তাঁহার সমীপে অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

এই একটি শ্লোকের ভিতর দিয়া দেবর্ষি নারদ সেই বিচিত্র ও বিকট রূপের এক অপূর্ব্ব চিত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে অঙ্কিত করিয়াছেন। সে কিরূপ মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তির স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়াও ব্রহ্মা আদি দেবগণ সম্মুখে যাইতে সাহস করেন না, এমন কি নারায়ণের চিরসহচরী, লীলা-সঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীও যে-রূপ দেখিয়া ভীত হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হন। ইহাই উপনিষদ্‌-কথিত "ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং"—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভীতিজনক বস্তুরও ভীতিস্বরূপ, ইহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভীষণ পদার্থের মধ্যে ভীষণতম ;—এই নৃসিংহমূর্ত্তিই সেই উপনিষদ্‌-বর্ণিত অপরূপ রূপ। সে কী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! কিন্তু যেখানে দেবগণ অক্ষম, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও সন্ত্রস্তা, সেখানে ভক্ত অবলীলাক্রমে গমন করিলেন—ভক্তের এতই সম্মান, ভক্তের এতই সাহস। ভক্তবৎসল শ্রীহরির কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! নারদ বলিলেন,

প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাস ব্রহ্মাবস্থিতমন্তিকে,
তাত! প্রশময়োপেহি স্বপিত্রে কুপিতং প্রভুম্॥
তথেতি শনকৈঃ রাজন্, মহাভাগবতোঽর্ভকঃ,
উপেত্য ভুবি কায়েন ননাম বিধৃতাঞ্জলিঃ॥
স্বপাদমূলে পতিতং তমর্ভকং বিলোক্য দেবঃ কৃপয়া পরিপ্লুতঃ,
উত্থাপ্য তচ্ছীর্ষ্ণ্যদধাৎ করাম্বুজং কালাহিবিত্রস্তধিয়াং
কৃতাভয়ম্॥
স তৎ করস্পর্শধৃতাখিলাশুভঃ সপত্ত্যভিব্যক্ত পরাত্মদর্শনঃ,
তৎপাদপদ্মং হৃদি নির্বৃতো দধৌ হৃষ্যত্তনুঃ ক্লিন্নহৃদশ্রুলোচনঃ॥
৭।৯।৩-৬

—সমীপে অবস্থিত প্রহ্লাদকে ব্রহ্মা বলিলেন—হে বৎস, তোমার পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ প্রভু নৃসিংহদেবকে এখন শান্ত কর।

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করিয়া পরমভাগবত বালক প্রহ্লাদ ধীরে ধীরে নৃসিংহের নিকটে গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূতলে শরীর লুণ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

তখন স্বীয় পাদমূলে পতিত প্রহ্লাদকে দেখিয়া নৃসিংহদেবের দয়ার উদ্রেক হইল এবং তাঁহাকে উঠাইয়া, যাহা কালরূপ সর্পের ভয়ে ভীত জীবগণের অভয়প্রদ, সেই স্বীয় করকমল প্রহ্লাদের মস্তকে স্থাপন করিলেন।

ভগবান্ নৃসিংহদেবের করস্পর্শে প্রহ্লাদের সমস্ত অশুভ দূর হইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরমাত্মস্বরূপের অনুভব হইল, তাঁহার শরীর পুলকিত, হৃদয় প্রেমার্দ্র ও লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল,—এই অবস্থায় আনন্দিত হইয়া তিনি নৃসিংহদেবের চরণকমল হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এই শ্লোক কয়টির ভিতর দিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যেখানে ব্রহ্মা আদি দেবগণও ভয় পাইতেছেন, সেখানে ভক্ত নির্ভয়, ভক্ত ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছেন। ভক্ত কি ভয় পায়! অনন্ত প্রভুর অনন্ত মূর্ত্তি, কিন্তু ভক্ত প্রভুকে একটিমাত্র রূপেই চিনিয়া রাখিয়াছে, ধরিয়া রাখিয়াছে,—সে মূর্ত্তি উপনিষদ্-কথিত ঋষিদৃষ্ট মূর্ত্তি—ওঁ পিতা নোঽসি—প্রভু, তুমি পিতা, আমি তোমার সন্তান। ভক্তের ভাষা—যিনি মহারাজা, এই বিশ্ব যাঁর প্রজা, জান না রে মন, আমি পুত্র তাঁর। আজ প্রভু মৃত্যুর সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিভুবনের সম্মুখে দণ্ডায়মান ;—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিহত হইয়াছে—যেন একটা অভ্রভেদী পর্ব্বতের চূড়া ভূমিতে অবলুণ্ঠিত, চতুর্দ্দিকে ছিন্নমুণ্ড, ছিন্নবাহু, ছিন্নদেহ দানবগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, রক্তের নদী বহিয়া যাইতেছে, দেবঋষিযক্ষরক্ষগণ এ দৃশ্য কখনও দেখেন নাই,—এ

ভীষণ মূর্ত্তি স্বয়ং ব্রহ্মারও অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব! আজ প্রভুর মৃত্যুমহোৎসব—তাণ্ডবলীলায় চতুর্দ্দিক কম্পিত ও প্রতিধ্বনিত। কিন্তু ভক্ত নির্ভয়, ভক্ত জানে ইহা প্রভুর ছদ্মবেশ—ঐ নখদংষ্ট্রায়ুধের পশ্চাতে, ঐ মৃত্যুবর্ষণকারী হস্তের অন্তরালে এক অতি কোমল "ভক্তানাং অভয়ঙ্করী" ভক্তগণের অভয়ঙ্কর হৃদয় লুক্কায়িত আছে, সে পুষ্পের মত কোমল হৃদয়ের পরিচয় একমাত্র আত্মসমর্পণকারী ভক্তই পাইয়া থাকে। তাই ভক্ত মহাকালস্বরূপ মৃত্যুরূপী ইষ্টদেবকে দেখিয়া ভয় পায় না। ভক্ত বলে,—

মৃত্যুর বেশে এসেছ ব'লে
তোমায় নাহি ডরিব হে,
যেথায় ব্যথা সেথায় তোমায়
নিবিড় করি ধরিব হে ॥
আঁধারে মুখ ঢাকিলে, স্বামী,
তবুও তোমায় চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে প্রভু
চরণ ধরি মরিব হে ॥
যেথায় ব্যথা সেথায় তোমায়
নিবিড় করি ধরিব হে ॥

এইরূপ আত্মসমর্পণের ফলে ভগবৎকৃপা অবশ্যম্ভাবী। নৃসিংহদেব প্রহ্লাদের মস্তকে শ্রীহস্ত প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং প্রহ্লাদের জন্ম-জন্মান্তরের অনর্থ কাটিয়া গিয়াছে, পরমার্থদর্শন হইয়াছে, ভগবানের শ্রীচরণ ধ্যান প্রগাঢ় হইয়া আসিতেছে। দেবর্ষির বর্ণনা-কৌশলে আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি এক মহাভয়ঙ্কর, লোমশ, নখদংষ্ট্রায়ুধ-সমন্বিত আকাশচুম্বী বিরাট শরীর ভূমিতে অবনত হইয়া নিজ পাদমূলে ছিন্নতরুর ন্যায় নিপতিত, আত্মসমর্পণকারী এক অতি ক্ষুদ্র অতি কোমল পঞ্চবর্ষীয় বালককে স্বীয় বজ্রসার হস্ত দিয়া ধীরে ধীরে অতি স্নেহভরে

তুলিয়া ধরিতেছেন,—যে বজ্রসার শক্তির সংঘর্ষে একদিন হিরণ্যাক্ষ রক্ত বমন করিয়াছিল, যে সুদর্শনচক্র সুশোভিত হস্ত যুগে যুগে "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" আবির্ভূত হইয়া অসুরনিধন ও সাধু-সংরক্ষণ করিয়া থাকে, যে হস্ত কলির অবসানে করাল অসিধারণ করিয়া ম্লেচ্ছনিবহনিধন করিবে, আজ সেই কোটিবজ্রসার হস্ত কোটিপুষ্প-সুকোমল হইয়া ভক্ত শিশু প্রহ্লাদের মস্তক স্পর্শ করিতেছে। এইবার ভক্ত প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মুনয়োঽথ সিদ্ধাঃ সত্ত্বৈকতান গতয়ো
বচসাং প্রবাহৈঃ,
নারাধিতুং পুরুগণৈরধুনাপি'পিপ্রুঃ কিং তোষ্টুমর্হতি
স মে হরিরুগ্রজাতেঃ ॥ ৭।৯।৮

—ভগবানের উৎকর্ষ যাঁহারা অবগত আছেন, তাদৃশ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, পরাশরাদি মুনিগণ ও কপিলাদি সিদ্ধগণ বেদবাক্যসমূহের দ্বারা এবং মনন ধ্যানাদি বহু গুণসমূহের দ্বারা অদ্যাপি যাঁহাকে সম্যক্‌রূপে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হন নাই, সেই শ্রীহরি কি আসুরীজাতিসম্ভূত আমার স্তবে পরিতুষ্ট হইবেন ?

কিন্তু প্রহ্লাদ জানেন যে, তপস্যা, পাণ্ডিত্য অথবা অষ্টাঙ্গযোগ—এই সমস্ত কিছুই ভগবানের প্রীতির জন্য যথেষ্ট নহে ; শ্রীহরি একমাত্র ভক্তির দ্বারাই প্রীত হইয়া থাকেন। অতএব "নীচঃ" নীচ অসুর সম্ভূত হইলেও "বিগতবিক্লবঃ ঈশ্বরস্য সর্ব্বাত্মনা মহি গৃণামি"—প্রহ্লাদ নিঃশঙ্ক হইয়া পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণনা করিতেছেন। নৃসিংহদেবের এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রহ্লাদ ভীত হন নাই,,—"নাহং বিভেমি"—আমি ভীত নই—বরং দাস প্রভুর প্রেমে এতই বিমোহিতচিত্ত যে তিনি "উশত্তম"—অর্থাৎ পরমসুন্দররূপেই ভক্তের চক্ষে প্রতিভাত হইতেছেন। জীবগণ স্বর্গভোগ কামনা করে কিন্তু প্রহ্লাদ দেখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুর

ভ্রুকুটির সম্মুখে লোকপালগণের স্বর্গ ও সম্পদ্ কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, অতএব স্বর্গসুখ তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু সেই প্রবলপ্রতাপ হিরণ্যকশিপু যাঁহার দ্বারা "নিরস্ত"—অবলীলাক্রমে নিহত, সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবানের নিকট প্রহ্লাদ "দাস্যযোগম্" দাস হইবার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্রহ্লাদ বলিলেন,

ধর্ম্মং মহাপুরুষ ! পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভব-
স্ত্রিযুগোঽথ সঃ ত্বম্।

—হে মহাপুরুষ, আপনি যুগে যুগে যুগানুরূপ ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকেন। কলিকালে আপনি প্রায়ই প্রচ্ছন্ন থাকেন। অতএব তিন যুগে আবির্ভূত হন বলিয়া আপনি ত্রিযুগ নামে প্রসিদ্ধ।

এই যুগাবতার ভগবানের নিকট প্রহ্লাদ নিবেদন করিতেছেন যে, "শোচে ততো বিমুখচেতসঃ ইন্দ্রিয়ার্থ-মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্" —যে সকল বিষয়ভোগী লোক ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখের জন্য নানাবিধ দুঃখপ্রদ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ ভার বহন করিয়া থাকে, প্রহ্লাদ সেই সমস্ত বিমূঢ় জীবগণের নিমিত্ত দুঃখিত ; প্রহ্লাদ নিজের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন না, তিনি এই সমস্ত দুঃখশীল জনগণের উদ্ধারের জন্য নৃসিংহদেবের দয়া ভিক্ষা করিতেছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সংসারে অনেক মুনি ঋষি আছেন, যাঁহারা জীবগণকে কৃপা করিবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ, কিন্তু প্রহ্লাদ বলিতেছেন,

প্রায়েণ দেব ! মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামাঃ মৌনং চরন্তি
বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ,
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষে একোনান্যং ত্বদস্য
শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥ ৭।৯।৪৪

—হে দেব, মুনিগণ প্রায়ই নিজ নিজ মুক্তি কামনা করিয়া নির্জ্জনে মৌনাবলম্বন করিয়া তপস্যা করেন, অপরের মুক্তির জন্য তাঁহারা

যত্নশীল নহেন। অতএব সংসারে ভ্রমণশীল এই জীবগণের আপনি ভিন্ন অপর আশ্রয় কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। এই দীনহীন বদ্ধ জীবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী বিমুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না।

এই শ্লোকটির ভিতর দিয়া প্রহ্লাদের যে উদারতা এবং অপূর্ব্ব মনোবৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পরিলক্ষণীয়। এই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"মুনিরা ভয়তরাসে। তারা নিজেরা যো সো ক'রে পার হয়ে যায়, কিন্তু নারদাদি ঋষিরা বাহাদুরী কাঠ। তাঁরা নিজেরাও পার হন, অপরকেও সঙ্গে নিয়ে পার করেন।" ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদ সংসারী লোকের দুঃখে দুঃখিত, কারণ তিনি তাঁহার পিতাকে দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং তাঁহার জীবনের ভিতর দিয়া দেহে আত্মবুদ্ধি সংসারী জীবের দুঃখকষ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই আজ দীনবৎসল প্রহ্লাদ ভগবান্ নৃসিংহদেবকে সম্মুখে পাইয়া নিখিল জনগণের মুক্তির উপায় ভিক্ষা করিতেছেন। এত উদার এমন বিশ্ববন্ধু ভক্ত ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে বিরল।

ভক্ত প্রহ্লাদের এইরূপ স্তবস্তুতি শ্রবণ করিয়া ভগবান নৃসিংহদেব প্রীত হইয়া বলিলেন,

প্রহ্লাদ, ভদ্র, ভদ্রং তে প্রীতোঽহং তেঽসুরোত্তম,
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপুরোঽস্ম্যহং নৃণাম্॥ ৭।৯।৫২

—হে ভদ্র প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর,—আমার দর্শনলাভ কখনও ব্যর্থ হয় না, কারণ "নৃণাং কামপুরঃ"—আমি নিখিল জনগণের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি।

এই স্থানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও ঋষিগণ সকলেই নৃসিংহদেবের স্তব করিয়াছিলেন; সেই স্তবস্তুতি শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কাহারও কথার কোনও উত্তর প্রদান করেন নাই।

শ্রীভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধারণতঃ অনেক স্তবস্তুতি শ্রবণ করিয়াও স্বয়ং ভগবান্ নির্ব্বাক হইয়া থাকেন,—যে ভক্তের আরাধনায় প্রীত হইয়া ভগবান্ শ্রীহরি স্নেহসূচক ভাষায় তাহার উত্তর প্রদান করেন, সেই ভক্ত অবশ্যই মহাসৌভাগ্যশালী। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ আজ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের সমক্ষেই এই অসাধারণ ভগবৎ প্রসাদ লাভ করিলেন।

অতঃপর শ্রীনারদ বলিলেন,

এবং প্রলোভ্যমানোঽপি বরৈঃ লোক প্রলোভনৈঃ,
একান্তিত্বাদ্ ভগবতি নৈচ্ছত্তানসুরোত্তমঃ॥ ৭।৯।৫৫

—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এইরূপে জীবগণ যাহাতে প্রলোভিত হয় তাদৃশ বরসমূহ প্রদান করিবেন বলিয়া প্রলোভন দেখাইলেও অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ ভগবানের নিষ্কাম ভক্ত বলিয়া সেই সকল বর কিছুই প্রার্থনা করিলেন না।

শুদ্ধ ভক্ত প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে বলিলেন,

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যা সক্তং কামেষু তৈর্ব্বরৈঃ
তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্নো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥
অহং ত্বকামস্তদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥ ৭।১০।২,৬

—হে ভগবন্, আমি স্বভাবতঃই কামনা-বাসনায় আসক্ত, অতএব আপনি আমাকে বরপ্রদানের দ্বারা প্রলোভিত করিবেন না। আমি সেই কামসঙ্গকে ভয় করি সুতরাং মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছায় আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।

আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত, আর আপনিও আমার প্রয়োজনশূন্য প্রভু; অতএব এই স্থলে আমাদের উভয়ের সম্বন্ধ রাজা ও রাজভৃত্যের ন্যায় পরস্পর স্বার্থমূলক নহে।

প্রহ্লাদের এই আত্মনিবেদন শ্রবণ করিয়া নৃসিংহদেব প্রীত হইয়া বলিলেন যে, প্রহ্লাদ "ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং কলেবরং কালজবেন হিত্বা"—ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় এবং পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পাপক্ষয় করিয়া অবশেষে কালক্রমে দেহত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের এই আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া পিতা হিরণ্যকশিপুর জন্য প্রভু নৃসিংহদেবের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। নৃসিংহদেব বলিলেন যে, প্রহ্লাদের ন্যায় বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করায় তাহার পিতৃকুল ধন্য হইয়াছে এবং "মদঙ্গস্পর্শনেনাঙ্গ! লোকান্ যাস্যতি সুপ্রজাঃ"—নৃসিংহদেবের অঙ্গস্পর্শে পবিত্র হইয়া হিরণ্যকশিপু উত্তম-লোকে গমন করিবে। তখন ব্রহ্মা পুনরায় নৃসিংহদেবের স্তব করিলে তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন, "মৈবং বিভো, অসুরাণান্তে প্রদেয়ঃ পদ্মসম্ভব!" —হে পদ্মযোনি, তুমি অসুরগণকে আর কখনও এইরূপ বরপ্রদান করিও না। অনন্তর নৃসিংহদেব তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি মুনিগণের সহযোগে ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণের অধিপতি করিলেন। এইরূপে দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট অপূর্ব্ব প্রহ্লাদচরিত্র বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন,

এতদ্ যঃ আদিপুরুষস্য মৃগেন্দ্রলীলাং দৈত্যেন্দ্রযূথপবধং প্রযতঃ পঠেত,
দৈত্যাত্মজস্য য সতাং প্রবরস্য পুণ্যং শ্রুত্বানুভাবমকুতোভয়মেতি
লোকম্॥ ৭।১০।৪৭

—যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া সনাতন পুরুষ শ্রীহরির এই সিংহের ন্যায় লীলা এবং দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ও দৈত্য দলপতিগণের নিধনবৃত্তান্ত এবং সজ্জনশ্রেষ্ঠ দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদের পবিত্র প্রভাব পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার ভয়রহিত অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিবেন।

শ্রীভাগবতের সমস্ত প্রধান প্রধান বিবরণগুলি শ্রীশুকদেব ও রাজা পরীক্ষিতের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। আমাদের মনে রাখিতে

হইবে, পরীক্ষিতের সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেই মহাভয় হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি শ্রীশুকদেবের শরণাপন্ন হইয়াছেন। পরীক্ষিতের সেই আদি প্রশ্ন—কিরূপে "কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্তক্ত্যে কলেবরং"—সেই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যক্ষভাবে প্রহ্লাদচরিত্র হইতে পাওয়া যাইতেছে। এই কাহিনী বিবৃত করিয়া যেন শুকদেব আর একবার পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—মাভৈঃ মাভৈঃ—মহারাজ, ভয় নাই, ভয় নাই; কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া তুমিও পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। শ্রীশুকদেব এই অভয়বাণীর পক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন করিতেছেন। প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তি হইয়াছে; মহারাজ পরীক্ষিৎ এমন পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—'যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাৎ গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্'—যেখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া আত্মীয়ের মত বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং এরূপ সৌভাগ্যশালী পরীক্ষিতের মৃত্যুসময়ে শ্রীকৃষ্ণে নিঃসঙ্গ মন সমর্পণ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। দ্বিতীয়তঃ, প্রহ্লাদ অবশ্যই যে সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন তাহা ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল,—তিনি মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে দেবর্ষি নারদের মুখে ভাগবতী কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ভগবদ্‌ভক্তি ও ভগবৎকৃপা তাঁহার পক্ষে সুলভ হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষিতের সৌভাগ্য আরও বিচিত্র ও বিস্ময়কর,—তিনি মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। অতএব প্রহ্লাদচরিত্র ও পরীক্ষিতের জীবন সর্ব্বতোভাবে সমালোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, প্রহ্লাদের পক্ষে যে হরিভক্তিলাভ সহজ হইয়াছিল, পরীক্ষিতের পক্ষে তাহা অধিকতর সহজ। সুতরাং প্রহ্লাদচরিত্র অনুশীলন করিয়া শ্রীশুকদেবের মাভৈঃ বাণী পরীক্ষিতের কর্ণে অনুক্ষণ নিনাদিত হইতে লাগিল, তিনিও বিশ্বাস করিলেন "কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনঃ" তিনিও অনায়াসে পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন।

(৩)

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম ও সর্ব্বধর্ম্মের সার বর্ণন।

ভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনী শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই দেবর্ষি নারদকে বলিলেন,

ভগবন্, শ্রোতুমিচ্ছামি নৃণাং ধর্ম্মং সনাতনম্
বর্ণাশ্রমাচারযুতং যং পুমান্ বিন্দতে পরম্ ॥ ৭।১১।২

—হে ভগবন্, আমি আপনার নিকট মনুষ্যগণের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ঐ ধর্ম্ম আচরণ করিয়া পুরুষ কিরূপে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া থাকে, তাহা বর্ণনা করুন।

যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি ক্রমে ক্রমে মনুষ্যগণের সাধারণ ধর্ম্ম এবং বিশেষরূপে চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম, স্ত্রীলোকগণের ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থমুনির ধর্ম্ম, সন্ন্যাসাশ্রমের ধর্ম্ম, গৃহস্থের ধর্ম্ম এবং অবশেষে সংক্ষেপে সর্ব্বধর্ম্মের সার বর্ণনা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের প্রধান প্রধান কর্ম্ম ও আচার বর্ণনা করিয়া দেবর্ষি পতিব্রতা রমণীগণের লক্ষণ ও ধর্ম্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিলেন যে—"স্বয়ঞ্চমণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্টপরিচ্ছদা"—স্ত্রীলোকগণ সংসারের ভূষণস্বরূপ; সুতরাং তাহারা প্রত্যহ গৃহসামগ্রীগুলি মার্জ্জনাদির দ্বারা পরিষ্কার করিয়া স্বয়ং সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারাদির দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া গৃহমধ্যে বিরাজ করিবে। সর্ব্বত্যাগী পরমবৈষ্ণব নারদের পক্ষে গৃহীর গৃহমধ্যস্থ দ্রব্যসমূহ এবং রমণীগণের দেহের ক্ষণভঙ্গুর সৌন্দর্য্যের প্রতি এই সহানুভূতিসূচক কোমল দৃষ্টি সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। দেবর্ষির কবিদৃষ্টি ছিল, তিনি বুঝিতেন যে, গৃহীগণ গৃহ ও দেহের প্রতি আসক্ত; সুতরাং এই গৃহ ও দেহ সুন্দর ও পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখিতে রাখিতে তাহারা ক্রমশঃ অখণ্ড সৌন্দর্য্যের প্রতি মনোযোগশীল হইয়া

পড়িবে। তাই দেবর্ষি বলিলেন, "স্বয়ঞ্চ মণ্ডিতানিত্যং"—গৃহী স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বদা নিজ নিজ দেহকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাখিবে। এইরূপে গৃহস্থগণ নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে করিতে,

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥ ৭।১১।৩২

—স্বভাবানুসারে বিহিত বৃত্তির দ্বারা জীবনধারণপূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে স্বভাবজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণত্ব লাভ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মচারী গুরুকূলে বাস করিবার সময় সংযমী হইবেন এবং—"উপক্রমেঽবসানে চ চরণৌ শিরসা নমেৎ"—প্রত্যহ বেদ অধ্যয়ন করিবার প্রারম্ভে ও অবসানে গুরুর চরণে মস্তক অবনত করিয়া গুরুকে প্রণাম করিবেন। এইরূপে গুরুগৃহে বাসকালে,

বর্জ্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্‌ব্রতঃ
ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথিনী হরন্ত্যপি যতের্মনঃ ॥
কেশপ্রসাধনোন্মর্দ্দস্নপনাভ্যঞ্জনাদিকং
গুরুস্ত্রীভির্যুবতিভিঃ কারয়েন্নাত্মনো যুবা ॥
নন্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্,
সুতামপি রহো জহ্যাদন্যথা যাবদর্থকৃৎ ॥ ৭।১২।৭-৯

—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী নারীবিষয়িনী আলোচনা পরিত্যাগ করিবে, কারণ বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ সন্ন্যাসীগণেরও মন হরণ করিয়া থাকে।

যুবক ব্রহ্মচারী যুবতী গুরুপত্নীগণের দ্বারা কখনও নিজের কেশপ্রসাধন, গাত্রমর্দ্দন, স্নান ও চন্দনবিলেপনাদি করাইবেন না। কারণ, নারী অগ্নিতুল্য ও পুরুষ ঘৃতকুম্ভসদৃশ। অতএব মনুষ্য নির্জ্জনে কন্যার সহিতও অবস্থান করিবে না, লোকসমক্ষে অবশ্যই কন্যার লালনপালনাদি করিবে।

বানপ্রস্থ মুনি কৃষ্টপচ্য অর্থাৎ ভূমিকর্ষণের দ্বারা নিষ্পন্ন ধান্যাদিজাত অন্ন ভোজন করিবেন না। তিনি হিম, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা ও সূর্য্যতাপ সহ্য করিবেন; কেবলমাত্র অগ্নিরক্ষার নিমিত্ত পর্ণকুটীর অথবা পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিবেন; এইরূপে বানপ্রস্থ মুনি দগ্ধকাষ্ঠ অগ্নির ন্যায় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে আসক্তিশূন্য হইয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশস্বরূপ জানিয়া মুক্তিলাভ করিবেন। সন্ন্যাসব্রতধারী মানুষ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া দেহমাত্র ধারণ করিয়া থাকিবেন এবং আসক্তিশূন্য হইয়া "গ্রামৈকমাত্র-বিধিনা"—এক এক গ্রামে এক এক রাত্রি অবস্থান করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন। তিনি "নাভিনন্দেৎ ধ্রুবং মৃত্যুমধ্রুবং বাস্য জীবিতম্"—নিশ্চিত মৃত্যু অথবা অনিশ্চিত দেহ, ইহাদের কোনটির দিকেই দৃষ্টিপাত করিবেন না, "বাদাবাদান্ ত্যজেৎ তর্কান্ পক্ষং কঞ্চ ন সংশ্রয়েৎ"—বাদ, প্রতিবাদ ও তর্ক পরিত্যাগ করিবেন এবং বিবাদাদিতে কোন পক্ষই অবলম্বন করিবেন না, এবং

> ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্,
> ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভারভেৎ ক্বচিৎ॥ ৭।১৩।৮

—সন্ন্যাসী কোনরূপ প্রলোভন প্রদর্শন করাইয়া শিষ্যসংগ্রহ করিবেন না, বহু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিবেন না, শাস্ত্রব্যাখ্যার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না, এবং জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবেন না।

এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই রাজা যুধিষ্ঠির দেবর্ষিকে বলিলেন,

> গৃহস্থঃ এতাং পদবীং বিধিনা যেন চাঞ্জসা
> যায়াদ্দেব, ঋষে, ব্রূহি মাদৃশো গৃহমূঢ়ধীঃ॥ ৭।১৪।১

—হে দেবর্ষি, গৃহে আসক্তচিত্ত আমার মত গৃহস্থ যেরূপ ধর্ম্মাচরণ করিয়া অনায়াসে মোক্ষমার্গে গমন করিতে পারে, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন।

যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ প্রথমেই বলিলেন,

গৃহেষ্ববস্থিতো রাজন্, ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্ যথোচিতাঃ,
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্॥ ৭।১৪।২

—হে রাজন্, গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তি বাসুদেবে সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণ করিয়া জ্ঞানী ও ভক্ত মুনিগণের সেবা করিবেন।

গৃহস্থজীবনের এই সারকথা সংক্ষেপে বলিয়া দেবর্ষি পুনরায় বলিলেন যে, গৃহস্থ প্রয়োজন অনুসারে দেহ, গৃহ ও লোকসমূহের সঙ্গ ও পরিচর্য্যা করিবেন, কিন্তু হৃদয়ে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সামাজিক আচরণে আসক্তের মত ব্যবহার প্রদর্শন করিবেন। অথচ সর্ব্বসময়ে অহংবুদ্ধি বর্জ্জন করিতে হইবে। দেবর্ষি বলিলেন,

যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্,
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥ ৭।১৪।৮

—যে পরিমাণ ধনের দ্বারা উদরপূর্ণ হয় সেই পরিমাণ ধনই গৃহস্থ দাবী করিতে পারে। যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক ধন আকাঙ্ক্ষা করে, সে তস্কর, অতএব দণ্ড পাইবার যোগ্য।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গৃহস্থকে প্রদত্ত দেবর্ষির এই উপদেশ বর্ত্তমান যুগে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। তিনি যেন পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান যুগকে দেখিতে পাইয়া গৃহস্থের সর্ব্বযুগোপযোগী চিরন্তন আদর্শ অতি সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। গৃহস্থ দেহের প্রতি আসক্তির জন্য ন্যায় অথবা অন্যায়রূপে যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকেন তাহা নিরর্থক, কারণ মানুষের দেহ ক্ষণভঙ্গুর। সুতরাং গৃহস্থ ধর্ম্মভাবে নিজের জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া অজর এবং অমর পরমাত্মার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়া জীবনধারণ করিবেন।

কৃমিবিড়্ভস্মনিষ্ঠান্তং ক্বেদং তুচ্ছকলেবরম্
ক্ব তদীয় রতির্ভার্য্যা ক্বায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ॥ ৭।১৪।১৩

—কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে যাহার পরিণতি, সেই দেহ এবং এইরূপ দেহের জন্য ভার্য্যার প্রতি গৃহস্থের এত আসক্তি ;—এই দেহ ও ভার্য্যা, এবং সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদনশীল অনন্ত পরমাত্মার মধ্যে কি অসীম পার্থক্য ! অতএব তুচ্ছ বিনাশশীল পদার্থে মমতাবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করাই গৃহস্থের একমাত্র কর্ত্তব্য।

মহাযোগী দেবর্ষি নারদের নারীদেহ সম্বন্ধে এই শ্লোকটি বিশেষ করিয়া প্রাণধানযোগ্য। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, দেবর্ষির চিন্ময় দেহের সহিত জড়পিণ্ড নারীদেহের একটা প্রচ্ছন্ন তুলনা রহিয়াছে। কিন্তু দেবর্ষির এইরূপ চিন্ময় দেহ চিরদিন ছিল না। প্রথম জন্মে তিনি যখন গন্ধর্ব্ব পরিবর্হণ নামে পরিচিত ছিলেন, তখন তিনি স্ত্রীদেহের উপর আকৃষ্ট হইয়া যে অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা এখনও তাঁহার স্মৃতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। নারীদেহ উপভোগপ্রসূত বুদ্ধিবৈক্লব্য তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞস্থলীতে রমণীগণ পরিবৃত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় কুৎসিত প্রেমগান করিতে করিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে পরজন্মে তাঁহাকে দাসীপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাই আত্মজীবন স্মরণ করিয়া করুণাময় দেবর্ষি মানবজাতিকে সাবধান করিয়া দিতেছেন ;—আত্মার উন্নতি ভুলিয়া নশ্বর দেহ-সুখের প্রতি আকৃষ্ট হইও না। শ্লোকটিতে নারীদেহকে বিশ্লেষণ করিয়া পুরুষের মনে নারীদেহের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মানুষ যেন মনে রাখে যে, যে নারীদেহের আকর্ষণে আজ সে উন্মত্তের মত লাজভয় সবই পরিত্যাগ করিয়াছে সে নারীদেহের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মরাশি। নারীদেহ উপভোগপ্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ এই পশুপ্রবৃত্তি কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, মানুষ, সকলের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। একটি সামান্য কৃমিকীট স্বজাতীয় স্ত্রীদেহ উপভোগ করিয়া যে সুখ পায়, একজন রাজা অপূর্ব্ব সুন্দরীর দেহ উপভোগ করিয়া তাহার

অধিক লেশমাত্র সুখও পায় না। এইখানে একটি কৃমিকীট ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন মানুষ উভয়েই সমপর্য্যায়ভুক্ত। "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং"—জীবসমূহের ইহাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু মানুষ যদি এই আদিম প্রবৃত্তিকে জয় করিতে পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতি সহজ হইয়া দাঁড়ায়। তাই দেবর্ষি মানুষের মনে নারীদেহের প্রতি বিতৃষ্ণা আনয়ন করিবার জন্য নারীদেহকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন,—ইঙ্গিত করিতেছেন যে, কি দেখিয়া মানুষ নারীদেহের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অথচ এই নারীদেহকে আশ্রয় করিয়া জগতে কত যে অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নির্ণয় নাই;—সংসার মজিয়া গিয়াছে, নরহত্যা হইয়াছে, সর্ব্বত্যাগী সাধুর বৃদ্ধবয়সে পতন ঘটিয়াছে, যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। দেবর্ষি তাই মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নারীদেহের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিতেছেন।

এই বিষয়ে ভগবান বুদ্ধের জীবনের একটি কাহিনী আমাদের মনে পড়ে। রাজা বিম্বিসার তখন মগধ রাজ্যের অধিপতি, রাজগৃহ তাঁহার রাজধানী। বিম্বিসার একটু স্থূলদেহ ছিলেন এবং স্ত্রীদেহ সম্বন্ধে তাঁহার মনের একটা দুর্ব্বলতা ছিল। রাজগৃহে শ্রীমতী নামে এক পরমাসুন্দরী গণিকা ছিল। এক ভিক্ষু সদাসর্ব্বদা শ্রীবুদ্ধদেবের সংস্পর্শে বাস করিয়াও দৈববশে শ্রীমতীর প্রেমে পড়িল, কিন্তু গণিকার মূল্য দিবার অর্থ তাহার ছিল না, তথাপি এমন উৎকট প্রেম তাহাকে জর্জ্জরিত করিল যে, সে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ঘরের ভিতর মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া রহিল। ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট সংবাদ যাইল, কিন্তু তখন তিনি কিছুই বলিলেন না। মহাযোগী বুদ্ধদেব জানিতে পারিয়াছিলেন যে, শ্রীমতীর মৃত্যু আসন্ন, তাই বুদ্ধদেব অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কয়েকদিন পরে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া শ্রীমতী'র মৃত্যু হইল। বুদ্ধদেব মহারাজ বিম্বিসারকে অনুরোধ করিয়া শ্রীমতীর মৃতদেহের সংকার কয়েকদিনের জন্য স্থগিত

রাখাইলেন। প্রায় সপ্তাহকাল পরে ভগবান বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে রাজা বিম্বিসারকে অগ্রণী করিয়া শ্রীমতীর মৃতদেহ দর্শন করিতে যাইলেন। তখন সেই সুন্দরীদেহ কৃমি, ক্লেদ ও কীটবিষ্ঠায় পরিপূর্ণ। ভগবান বুদ্ধদেব সেই প্রেমিক ভিক্ষুর সম্মুখে নারীদেহাসক্ত রাজা বিম্বিসারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই শ্রীমতীর দেহ উপভোগ করিবার জন্য মানুষ এক রাত্রিতে কত টাকা ব্যয় করিত?" বিম্বিসার বলিলেন—"মানুষ পঞ্চাশ কার্ষাপণ দিত।" বুদ্ধদেবের পুনরায় প্রশ্ন হইল—"এখন এই গলিত শবদেহের জন্য তাহারা কত দিতে চাহিবে?" রাজা বিম্বিসার একটু শুষ্ক হাস্য করিলেন। ইন্দ্রিয়সেবক রাজা বিম্বিসারের চৈতন্য হইয়াছিল কিনা তাহা লিপিবদ্ধ নাই। কিন্তু সেই প্রেমিক ভিক্ষুর চৈতন্য হওয়ায় সে পুনরায় সাধন ভজনে মন নিয়োগ করিয়া তাহার অবশিষ্ট ভিক্ষুজীবন সার্থক করিয়াছিল। পর-নারীদেহ উপভোগ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধদেব স্থানান্তরে বলিয়াছিলেন যে, পরস্ত্রীগামীর চারিটি বিপত্তি সংঘটিত হয়—সে পাপ সঞ্চয় করে, শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারে না, নিন্দাভাজন হয় এবং নরকগামী হইয়া থাকে। তাই দেবর্ষি নারদ শ্লোকটিতে দুইটি 'ক্ব' শব্দ প্রয়োগ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর দেহের সৌন্দর্য্য এবং আত্মার চিরভাস্বর জ্যোতির তুলনা করিয়া মানুষের মনে চৈতন্যসঞ্চার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দেবর্ষি আরও বলিলেন যে, সর্ব্বভূতগুহাশায়ী পরমেশ্বরকে মানুষ দেখিতে পায় না বলিয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, অথচ শ্রীহরি অন্তর্য্যামীরূপে সব মানুষের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া সকলকেই যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু মানুষ তাহা করে না, সেইজন্যই ত্রেতাদিযুগে জ্ঞানিগণ শ্রীহরির পূজার নিমিত্ত প্রতিমা সৃষ্টি করিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থের মনের এই অজ্ঞতা ও দীনতা ভক্ত কবির ভাষায় সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ

মানুষ সম্মুখে এলে কেন সেইক্ষণে
তোমার সম্মুখে আছি নাহি পড়ে মনে।

তাই দেবর্ষি বলিতেছেন যে, প্রতি মানুষের ভিতর ব্রহ্মদর্শন হইলে প্রতিমায় হরিপূজার কোন প্রয়োজন ছিল না ; কিন্তু অন্ধ মানুষ মানুষের ভিতর তাঁহাকে দেখিতে পায় না বলিয়া প্রতিমায় হরিপূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাপূজা করিলে প্রতিমা মানুষকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রতিমাপূজার এক মহৎ অন্তরায় আছে,—যাহারা জীবের প্রতি দ্বেষ ও হিংসাবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহাদের প্রতিমাপূজা সম্পূর্ণ নিরর্থক। অতএব সর্ব্বজীবে প্রীতিসাধনপূর্ব্বক তৎপরে প্রতিমাপূজা করিলে তবেই প্রতিমাপূজা সম্পূর্ণভাবে সার্থক হইয়া থাকে। দেবর্ষি নারদের প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে এই কথাগুলি যেমন বিস্ময়-সূচক তেমনই অর্থব্যঞ্জক। দেবর্ষির সিদ্ধান্ত অনুধাবন করিলে বহুক্ষেত্রে প্রতিমাপূজা কেন অভীষ্ট ফলপ্রসূ হয় না, তাহার কারণ আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

সপ্তম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ সর্ব্বধর্ম্মের সার বর্ণনা করিয়াছেন। পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকার্য্য অথবা দেবগণের উদ্দেশে পূজা, গৃহস্থগণের করণীয় এবং সেই সমস্ত কার্য্যের দ্রব্যাদি জ্ঞানভক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্ত ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। দেব অথবা পিতৃকার্য্যে ব্রাহ্মণভোজন করান কর্ত্তব্য—দেবকার্য্যে দুইজন ও পিতৃকার্য্যে তিনজন ব্রাহ্মণ প্রশস্ত ; অথবা উভয় কার্য্যেই একজন ব্রাহ্মণ হইলেও শাস্ত্রসম্মত হইবে। কিন্তু দেবর্ষি ধনী গৃহস্থকে সাবধান করিয়া দিতেছেন,—"সুসমৃদ্ধোঽপি শ্রাদ্ধে কুর্য্যাৎ ন বিস্তরম্"—ধনবান্ হইলেও শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধে বহু ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিয়া জাঁকজমক দেখাইয়া বহু ধন ব্যয় করিবেন না। দেবর্ষি এই নিষেধের কারণ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,

দেশকালোচিতশ্রদ্ধাদ্রব্যপাত্রার্হণানি চ
সম্যক্ ভবন্তি নৈতানি বিস্তরাৎ স্বজনার্পণাৎ ॥ ৭।১৫।৪

—স্বজন ও তদনুরোধে অপরাপর বহুলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অন্নাদি দানের বাহুল্য করিলে তাহাতে দেশ ও কালের অনুরূপ শ্রদ্ধা, দ্রব্য, পাত্র ও অর্চ্চনা, এই সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না এবং নিমন্ত্রিত সকল লোককে সমানভাবে সমাদর করা যায় না।

দেবর্ষির এই কথাগুলি সম্যগ্ভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, দেবর্ষি সাধারণভাবে উপদেশ প্রদান করিলেও বিশেষভাবে রাজা যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়াই কথাগুলি বাহির হইতেছিল। সসাগরা ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেও বলা হইতেছে—'সুসমৃদ্ধোঽপি শ্রাদ্ধে কূর্য্যাৎ ন বিস্তরম্'—ধনী হইলেও শ্রাদ্ধে ব্যয়বাহুল্য করা নিষিদ্ধ। যদি ব্যয়বাহুল্য মহারাজা যুধিষ্ঠিরের পক্ষেই অন্যায় হয়, তাহা হইলে অন্য সাধারণ ধনীপদবাচ্য লোকের পক্ষে তাহা স্বভাবতঃই নিন্দনীয়। দেবর্ষির কথাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রাদ্ধকার্য্য ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত হইলেও ব্যয়বাহুল্যের দোষে অনেকক্ষেত্রে ইহা রাজসিক অথবা তামসিক কর্ম্মে পরিণত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধে বহুব্যয় করিবার কণ্ডূয়ন মানুষের বাহাদুরী-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি মাত্র। শ্রাদ্ধ ধর্ম্মসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ, বিরাট্ আয়োজন করিলে সকলের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল হওয়া সম্ভবপর নহে, এবং শ্রদ্ধাবিরহিত কর্ম্ম ইহলোক অথবা পরলোক কোথাও ফলপ্রদান করে না। দেবর্ষি যেন বর্ত্তমান যুগের নাম ও খ্যাতিপিপাসু রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়াই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

গৃহীদিগকে সাবধানবাণী শ্রবণ করাইয়া দেবর্ষি সন্ন্যাসীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ,
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশী অপত্রপঃ ॥ ৭।১৫।৩৬

—যদি কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের আশ্রয়স্বরূপ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া পুনরায় ধর্ম্মার্থকামাদিতে আসক্ত হন তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসী যেন বমি করিয়া পুনরায় সেই বমির দ্রব্য কুড়াইয়া খাইতেছেন বলিয়া মনে হয়। এইরূপ সন্ন্যাসী ঘৃণার্হ ও নির্লজ্জ।

নারদের এই কথাগুলি সন্ন্যাসীজীবনের দায়িত্ব ও কঠোরতা যুগপৎ প্রকাশ করিতেছে। গৃহ পরিত্যাগ করা কঠিন নহে, বেশ পরিবর্ত্তন করাও সহজ ; কিন্তু মনে যদি বিষয়ভোগের লেশমাত্র বাসনা থাকে তাহা হইলে সমগ্র জীবনটাই নিষ্ফল হইয়া যাইবে। গৃহীর পক্ষে বিষয়ভোগ-লালসা গর্হিত হইলেও স্বাভাবিক, সুতরাং ক্ষমার্হ। কিন্তু ত্যাগের চিহ্ন ধারণ করিয়া যদি সন্ন্যাসী মনে মনে কামিনীকাঞ্চনের সেবা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই নিরর্থক হইয়া যায়। সেইজন্য অপক্বযোগীগণের প্রতি দেবর্ষির এই বজ্রনির্ঘোষ।

এইরূপে সর্ব্বধর্ম্মের বর্ণনা করিতে করিতে দেবর্ষি ভক্তি-মাহাত্ম্য সূচনা করিবার জন্য আপনার পূর্ব্ব-জন্মবৃত্তান্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে শ্রবণ করাইলেন। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থমুনি, সন্ন্যাসী—সকল আশ্রমের শেষ কথা ভক্তিযোগ। ভক্তি থাকিলে সকল আশ্রমেই মনুষ্যজীবন সার্থক হইতে পারে,—"গৃহেঽপ্যস্য গতিং যায়াৎ রাজন্, তদ্ভক্তিভাক্ নরঃ"—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া গৃহে বাস করিলেও মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই বিশ্বাস যুধিষ্ঠিরের মনে দৃঢ় করিবার জন্য নারদ নিজ পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন।

অহং পুরাভবং কশ্চিৎ গন্ধর্ব্বঃ উপবর্হণঃ
নাম্নাতীতে মহাকল্পে গন্ধর্ব্বাণাং সুসম্মতঃ ॥ ৭।১৫।৬৯

—হে রাজন্, পূর্ব্বকালে অতীত মহাকল্পে আমি উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্বগণের মাননীয় কোন এক শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্ব ছিলাম।

গন্ধর্ব্বজন্মে দেবর্ষি নারদ সুপুরুষ ছিলেন এবং সর্ব্বদা রমণীগণের প্রতি আসক্ত হইয়া নৃত্যগীতে সময় অতিবাহিত করিতেন। একদিন দেবগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে প্রজাপতিগণ শ্রীহরির গুণগান করিবার জন্য গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে আহ্বান করিলেন। গন্ধর্ব্ব উপবর্হণ রমণীগণে পরিবৃত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় গান করিতে করিতে দেবসভা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবগণের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধ প্রজাপতিগণ উপবর্হণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—"যাহি ত্বং শূদ্রতামাশু নষ্টশ্রীঃ কৃতহেলনঃ"—তুমি আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছ, অতএব সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট হইয়া শীঘ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হও। এই অভিশাপের ফলে গন্ধর্ব্ব উপবর্হণ দাসীপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু সেই শূদ্রজন্মে ব্রহ্মবাদী ভগবদ্‌ভক্তগণের সেবা করিয়া এবং তাঁহাদের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া পরজন্মে তিনি ব্রহ্মার পুত্র নারদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবর্ষির এই শূদ্রজন্মের কাহিনী ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে তিনি বেদব্যাসকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে হরিভক্তির মাহাত্ম্য বিবৃত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে হরিভক্তিলাভ সম্বন্ধে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক দেবর্ষি বলিলেন,

> যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগাঃ লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি
> যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাৎ গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥
>
> ৭।১৫।৭৫

—হে রাজন্, মনুষ্যলোকে আপনারা অতিশয় সৌভাগ্যশালী,—লোকপাবন মুনিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আপনাদের গৃহে আগমন করিয়া থাকেন। কারণ, নিগূঢ় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া আপনাদের গৃহে সাক্ষাৎ ভাবে বাস করিতেছেন।

দেবর্ষি এই আশ্বাসবাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করিতেছেন যে, গৃহস্থ হইলেও রাজা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ভক্তিলাভ সুলভ ; কারণ, তিনি সৌভাগ্য-বশতঃ অহরহঃ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ও তাঁহার লীলাদর্শন করিতেছেন। অনন্তর দেবর্ষির কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যুধিষ্ঠির "পূজয়ামাস সুপ্রীতঃ কৃষ্ণঞ্চ প্রেমবিহ্বলঃ"—পরমপ্রীত ও প্রেমবিহ্বল হইয়া দেবর্ষি নারদ ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন।

———

অষ্টম স্কন্ধ

(১)

গজেন্দ্রের উপাখ্যান

অষ্টম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব বিভিন্ন মনুগণের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে গজেন্দ্রের মুক্তি বর্ণনা করিলেন। এই গজেন্দ্র-বৃত্তান্ত শ্রীভাগবতে গজেন্দ্র-মোক্ষণ নামে পরিচিত। "গজেন্দ্র-মোক্ষণ" অর্থাৎ গজেন্দ্রের মুক্তি। ঘটনাটি বিচিত্র। এই বৃহৎ হস্তী পূর্ব্ব জন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত পাণ্ড্যদেশীয় নরপতি ছিলেন। ঐ নরপতি বিষ্ণুব্রতপরায়ণ হইয়া মলয় পর্ব্বতে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। একদিন অগস্ত্য মুনি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে মৌনব্রতধারী রাজা তাঁহাকে কোনও সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। তখন অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন—গজের ন্যায় জড়বুদ্ধি এই রাজা গজ-যোনি প্রাপ্ত হউক। কিছুকাল অতীত হইল, শাপবিমোহিত এই গজেন্দ্র একদিন ত্রিকূট পর্ব্বতে কাঞ্চনময় কমলসমূহে পরিশোভিত এক সুবিশাল সরোবরে হস্তিনীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছিল। এমন সময়ে এক বৃহৎ কুম্ভীর তাহার পদদেশ কামড়াইয়া ধরিয়া গজরাজকে গভীর জলমধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল। যখন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আপনাকে কুম্ভীর-কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিল না, তখন সে মনে মনে স্থির করিল—"যদ্ভয়াৎ মৃত্যুঃ প্রধাবত্যরণং তমীমহি"—যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া মৃত্যু নিয়মিতরূপে স্বকার্য্যসাধনে নিরত সেই পরমেশ্বরের আমি শরণাপন্ন হইব। এই স্থির করিয়া গজরাজ শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিল।

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে,
অরূপায়োরুরূপায় নমঃ আশ্চর্য্য কর্ম্মণে ॥
নমঃ আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে,
নমো গিরাং বিদূরায় মনসশ্চেতসামপি ॥ ৮।৩।৯-১০

—যিনি অনন্তশক্তি, প্রাকৃতরূপরহিত, অপ্রাকৃত বহুরূপধারী ও অদ্ভুতকর্ম্মা, আমি সেই পরমেশ্বর পরব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি স্বপ্রকাশ ও সকলের প্রকাশক, বেদবাক্যসমূহ যাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারে না, যিনি মন ও চিত্তবৃত্তিসমূহের অগোচর, আমি সেই জীবনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

এইরূপে স্তবস্তুতি করিলে শ্রীহরি গজেন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং কুম্ভীরের সহিত গজেন্দ্রকে সরোবর হইতে উত্তোলন করিয়া কুম্ভীর-মুখ বিদারণপূর্ব্বক গজেন্দ্রকে মুক্তি প্রদান করিলেন। "হর্য্যর্চ্চনানুভাবেন যদ্গজত্বেঽপ্যনুস্মৃতিঃ"—পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন হরিভজন করিয়াছিল বলিয়া গজজন্মেও তাহার শ্রীহরিকে স্মরণ ছিল, এবং সেইজন্যই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শ্রীহরির আরাধনা করায় সে বিপদমুক্ত ও দেহমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইল।

গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাৎ বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ,
প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৮।৪।৬

—ভগবানের স্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ায় গজেন্দ্র ভগবানের পার্ষদরূপ প্রাপ্ত হইয়া পীতাম্বর ও চতুর্ভুজ হইল।

(২)

সমুদ্র মন্থন

পঞ্চম অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত দেবাসুর সংগ্রামে পরাজিত দেবগণের ব্রহ্মার নিকট গমন, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ভগবৎস্তুতি, শ্রীহরির উপদেশে সমুদ্র-মন্থন, সমুদ্র-মন্থনে কালকূট বিষ ও অমৃতের উৎপত্তি ও ভগবানের মোহিনীরূপ ধারণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, যুদ্ধে অসুরগণ কর্ত্তৃক তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহের দ্বারা আহত হইয়া এবং দুর্ব্বাসার শাপে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া দেবগণ প্রতিকারের জন্য ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা "সমাহিতেন মনসা সংস্মরন্ পুরুষং পরম্"—সমাহিতচিত্তে পরম পুরুষ বাসুদেবকে স্মরণ করিয়া দেবগণকে বলিলেন, "ব্রজাম সর্ব্বে শরণং তমব্যয়ম্"—আমরা সকলে অব্যয় পরমেশ্বরের শরণাগত হইব। এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবতাগণকে সঙ্গে লইয়া ভগবৎ-ধামে উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানের স্তব করিলেন।

তেষামাবিরভূৎ রাজন্! সহস্রার্কোদয়দ্যুতিঃ॥
তেনৈব মহসা সর্ব্বে দেবাঃ প্রতিহতেক্ষণাঃ,
নাপশ্যন্ খং দিশঃ ক্ষৌণীমাত্মানঞ্চকুতোবিভুম্॥ ৮।৬।১-২

—তখন সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী ভগবান্ দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

সেই অতি প্রদীপ্ত তেজের দ্বারা দেবগণের চক্ষু ঝলসিয়া গেল, তখন শ্রীভগবানকে দর্শন করা দূরের কথা, তাঁহারা আকাশ, দিক্‌সমূহ, পৃথিবী এমন কি আপনারা পরস্পরকেও দেখিতে পাইলেন না।

তখন শ্রীহরি দেবতাগণকে বলিলেন যে, যতদিন কর্ম্মফলদাতা শ্রীহরির অনুগ্রহে দেবতাগণের শুভ সময় প্রত্যাবর্ত্তন না করে, ততদিন "সন্ধির্ব্বিধীয়তাম্"—অসুরগণের সহিত দেবগণের সন্ধিস্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই

সন্ধিকালের ভিতর দেবগণ মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিলে অমৃত-উদ্ভব হইবে এবং সেই অমৃত পান করিয়া দেবগণ অমর ও অজেয় হইতে পারিবেন। শ্রীহরি ইহাও বলিয়াছিলেন যে সমুদ্রমন্থনে কালকূট বিষ উত্থিত হইলে দেবতাগণের তাহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই,—সমুদ্রমন্থনে দেবতাগণ উপকৃত ও অসুরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

দেবগণ শ্রীহরির উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক দৈত্যরাজ বলির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তখন সমুদ্রমন্থনের যুক্তি গ্রহণ করিয়া দেব ও অসুরগণ মন্দরপর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সমুদ্রমন্থনকালে যে সব বস্তু উত্থিত হইল তাহাদের মধ্যে হলাহল নামক অতি উগ্র বিষ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সেই অতুলনীয় ও অসহনীয় বিষ উগ্রবেগে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া প্রজাপতিগণ ভীত হইয়া পড়িলেন এবং ভগবান্ শ্রীহরিকে উদাসীন দেখিয়া সদাশিবের শরণাপন্ন হইলেন। ভবানীর সহিত কৈলাস পর্ব্বতে সমাসীন মহাদেবের নিকট যাইয়া প্রজাপতিগণ বলিলেন

দেবদেব! মহাদেব! ভূতাত্মন্! ভূতভাবন!
ত্রাহি নঃ শরণাপন্নান্ ত্রৈলোক্যদহনাৎ বিষাৎ॥ ৮।৭।২১

—হে দেবদেব, হে মহাদেব, হে ভূতাত্মন্, হে ভূতপালক, এই তীব্র বিষ ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে; আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি এই বিষ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

তখন মহাদেব জীবগণের বিপদে দয়ালু হইয়া ভবানীদেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তস্মাদিদং গরং ভুঞ্জে প্রজানাং স্বস্তিরস্তু মে"—আমি প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য এই বিষ ভক্ষণ করিব। শিবানী শিবের স্বরূপ জানিতেন বলিয়া মহাদেবের এই সঙ্কল্প "অন্বমোদত"—অনুমোদন

করিলেন। তখন বিশ্ববন্ধু দেবাদিদেব সেই সর্ব্বত্রবিস্তৃত হলাহল বিষকে যোগবলে করতলে আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। সেই বিষপানের ফলে মহাদেবের কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করিল।

নিখিল জনগণের কল্যাণের জন্য মহাদেবের এই আত্মোৎসর্গ উপলব্ধি করিয়া শ্রীশুকদেব বলিলেন,

তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ,
পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ ॥ ৮।৭।৪৪

—হে রাজন্, সাধুস্বভাব ব্যক্তিগণ সাধারণ জীবের দুঃখে প্রায়ই ক্লেশভোগ করিয়া থাকেন। অপরের দুঃখনিবৃত্তির জন্য ক্লেশভোগ করাই সর্ব্বাত্মা পরমপুরুষের পরম আরাধনা।

মানবগণের মধ্যে দধীচি এবং দেবগণের মধ্যে মহাদেব এইরূপ পরদুঃখকরুণায় মহীয়ান্ হইয়া চিরদিনের জন্য সর্ব্ব জীবগণের পূজনীয় হইয়া আছেন।

অতঃপর শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, বিষপান করিবার সময় মহাদেবের হস্ত হইতে যে বিন্দুমাত্র বিষ ক্ষরিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়াছিল তাহা পান করিয়া বৃশ্চিক, সর্প প্রভৃতি জীবগণ বিষধর হইয়া উঠিল, এবং কোন কোন বৃক্ষলতা সেই বিষের সংস্পর্শে আসায় বিষাক্ত ওষধির সৃষ্টি হইল। কোন কোন মানুষ সেই হলাহল বিষকণা জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়াছিল কিনা তাহা শ্রীশুকদেব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই অনুমেয় যে, বিষবিন্দু কোন কোন মানুষও লেহন করিয়াছিল, নতুবা অমৃতের অধিকারী মানুষের জিহ্বা হইতে তীব্র বিষ ক্ষরণ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। চিরকালই দেখা যাইতেছে যে, মানুষের মুখ হইতে সময় সময় যে বিষক্ষরণ হয়, সে বিষের জ্বালা বৃশ্চিক অথবা সর্পদংশন অপেক্ষাও পীড়াদায়ক।

জিহ্বা মানবদেহের একটি অপূর্ব্ব অংশবিশেষ। কয়েকটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাংসপেশীর সংযোগে নির্ম্মিত এই জিহ্বা ব্যবহারভেদে মানুষের উন্নতি ও অবনতির কারণ হইয়া থাকে। সর্ব্বশাস্ত্রে জিহ্বাসংযম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে,—জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রিত না করিতে পারিলে মানুষের ইহকাল ও পরকালের উন্নতি সুদূর পরাহত হইয়া দাঁড়ায়। সমগ্র মানবদেহের ভিতর এই জিহ্বাই পরম সুখশীল ও বাবুপ্রকৃতির ইন্দ্রিয়। অতি বাল্যকাল হইতে অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত জিহ্বার মিষ্ট ও কটুস্বাদ বিচারের শক্তি একভাবে প্রবল থাকে। নানাবিধ সুখকর ভোজ্যদ্রব্য জিহ্বার ভিতর দিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরটিকে সুস্থ ও সবল রাখিয়া ভগবৎচিন্তনের পক্ষে সহায়তাসাধন করিয়া থাকে। কিন্তু জিহ্বা যেখানে অপরিমিত লোভী ও রসাস্বাদী হইয়া দাঁড়ায় সেখানে মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষতি হইয়া যায় এবং সেই মানব জগতে "জিহ্বালম্পট" বলিয়া নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। কিন্তু এহো বাহ্য। নানাবিধ মিষ্টরসে পুষ্ট হইয়া জিহ্বা যখন মিষ্টরস ক্ষরণ না করিয়া মানবসমাজে তিক্তরস ছড়াইয়া দিতে আরম্ভ করে তখন জিহ্বা মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ হয়ত জিহ্বার বিষক্ষরণে লজ্জিত হয়, অনুতপ্ত হয়, কিন্তু তথাপি জিহ্বাকে সংযত করিতে পারে না, মানুষের চেষ্টা সত্ত্বেও মিথ্যাকথা জিহ্বা হইতে বাহির হইয়া পড়ে, কটূকথা জিহ্বার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। জিহ্বা রসগ্রহণ করে এবং তাহার পরিপাকে শরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। কিন্তু জিহ্বার প্রধান কার্য্য হরিভজন, সমাজের মানুষকে মিষ্ট কথার দ্বারা শান্তি ও আনন্দপ্রদান। তাই ভক্ত নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—

...বল রসনা হরে, হরে কৃষ্ণ হরে,
বহুদিন তোমারে করেছি যতন।

ফলমূল মিষ্টান্ন যেখানে পেয়েছি
যতনে আনিয়ে তোমারে দিয়েছি,
অবসন্নদেহ বিপদে পড়েছি,
কর অনিবার নাম উচ্চারণ ॥

কিন্তু বিদ্রোহী ও কুপথগামী জিহ্বা তখন আর অনুরোধ রাখে না, সে অভ্যাসমত কুকথা বলিয়া থাকে, বিষক্ষরণ করিয়া আত্মীয়স্বজন বন্ধু প্রতিবাসী সকলের হৃদয়ে জালার সৃষ্টি করিয়া থাকে। অর্দ্ধবিন্দু ও একবিন্দুমাত্র হলাহল মহাদেবের করপুটস্খলিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, কোন কোন মানুষ হয়ত তাহা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়াছিল, তাই আজ যুগ-পরম্পরা আমরা আপনাদের জিহ্বার বিষের জালায় জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি, অপরের মনেও বিষের জালা আনিয়া সংসারটিকে তিক্ত ও বিষময় করিয়া তুলিতেছি। কবে কোন্ সেই অতীতযুগে একবিন্দু বিষের কণা মানুষ লেহন করিয়াছিল, তাই অমৃতের অধিকারী হইয়াও মানুষ আজ হরিনাম ভুলিয়া আকথা-কুকথা বলিয়া জিহ্বাকে দোষদুষ্ট করিয়া তুলিতেছে, সমাজের শিবময় স্বরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহাকে অসুরের লীলাভূমিতে পরিণত করিতেছে। জিহ্বাসংযম ধর্ম্মজীবনের প্রথম ও প্রধান সহায়। জিহ্বাকে যে জয় করিতে পারিয়াছে তাহার পক্ষে অন্যান্য ইন্দ্রিয়সংযম সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অতঃপর কামধেনু, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা নামক ঘোটক, ঐরাবত নামক চারিটি দন্তবিশিষ্ট গজরাজ, কৌস্তভ নামক পদ্মরাগমণি, পারিজাত নামক কল্পবৃক্ষ উত্থিত হইল, লক্ষ্মীদেবী উত্থিত হইলেন এবং অবশেষে অমৃতপূর্ণ কলস হস্তে লইয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরি সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইলেন। তখন প্রবল দৈত্যগণ তাঁহার হস্ত হইতে অমৃত কলস বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল এবং দ্রুতগতিতে পান

করিবার জন্য অধৈর্য্যসহকারে পরস্পরের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল। দেবগণ বঞ্চিত হইতেছেন দেখিয়া শ্রীহরি মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া স্বীয় সৌন্দর্য্যের দ্বারা দৈত্যগণের কামোদ্দীপক চিত্তবিভ্রম সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর সেই সুন্দরী নারী দৈত্যগণের অনুমতিক্রমে অমৃত ভাণ্ড লইয়া দুইটি পংক্তিতে উপবিষ্ট দেব ও অসুরগণের মধ্যে অমৃত বিতরণ করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ অমৃত পাইলেন, অসুরগণ অমৃত পাইবার আশায় মোহিনীর প্রতি বিমুগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দেবতাগণ অমৃতভাণ্ড নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলে শ্রীহরি নিজ মোহিনী মূর্ত্তি পরিত্যাগ এবং স্বরূপ ধারণ করিয়া গরুড়ে আরোহণকরতঃ স্বধামে প্রস্থান করিলেন। তখন অসুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া দেবতাগণকে আক্রমণ করিল। ভীষণ যুদ্ধে অসুরগণ পরাজিত হইলে তাহারা দৈত্যরাজ বলিকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন ভৃগুবংশীয় শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ স্বীয় সঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা আহত বলিকে এবং অপরাপর অসংখ্য দৈত্যগণকে আরোগ্য করিয়া দিলেন বলিয়া দৈত্যরাজ বলি পরাজিত হইয়াও দুঃখিত হইলেন না।

দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বয়ং মহাদেব শ্রীহরির নিকট তাঁহার মোহিনীরূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীহরি দেবাদিদেবকে তাঁহার মোহিনীরূপ পুনরায় প্রদর্শন করাইয়াছিলেন এবং সেই মোহিনীরূপ দর্শন করিয়া যোগীশ্বর মহাদেবও আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীশুকদেব তৃতীয় দিবসে শ্রীভাগবতের এই পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে ত্রয়বিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত দৈত্যরাজ বলির স্বর্গজয়, বামনদেব কর্তৃক বলিকে ছলনা, এবং বলির সুতলে বা পাতালে গমন বর্ণিত হইয়াছে।

(৩)

বামনদেব ও দৈত্যরাজ বলির উপাখ্যান

দৈত্যরাজ বলি শুক্রাচার্য্যপ্রমুখ ভৃগুবংশীয়গণের প্রযত্নে সুস্থ হইয়া কৃতজ্ঞতাবশতঃ শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তখন বলি স্বর্গ জয় করিতে ইচ্ছা করিলে শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে দিয়া বিশ্বজিৎ নামক এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন। দৈত্যরাজ ঘৃতের দ্বারা আহুতি প্রদান করিলে সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে কাঞ্চনময় একটি রথ, কতিপয় অশ্ব, ধ্বজা, দিব্যধনু, অক্ষয় শরদ্বয় এবং দিব্য কবচ উত্থিত হইল। বলির পিতামহ প্রহ্লাদ তাঁহাকে এক ছড়া অম্লান পুষ্পমাল্য প্রদান করিলেন এবং গুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে একটি শঙ্খ প্রদান করিলেন। তখন দৈত্যরাজ স্বীয় সৈন্যসমূহ দ্বারা ইন্দ্রপুরীকে চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ করিয়া গুরু শুক্রাচার্য্য প্রদত্ত মহাশব্দকারী শঙ্খবাদন করিলে দেব-রমণীগণের ভীতি উৎপন্ন হইল। দেবরাজ ইন্দ্র তখন দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়া বলির এই অসাধারণ শক্তি ও উদ্যোগের কারণ জানিতে চাহিলেন এবং স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। তখন বৃহস্পতি বলিলেন,

> ওজস্বিনং বলিং জেতুং ন সমর্থোঽস্তি কশ্চন,
> ভবদ্বিধো ভবান্ বাপি বর্জ্জয়িত্বেশ্বরং হরিম্ ॥
> বিজেষ্যতি ন কোঽপ্যেনং ব্রহ্মতেজঃ সমেধিতম্
> নাস্য শক্তঃ পুরঃ স্থাতুং কৃতান্তস্য যথা জনাঃ ॥ ৮।১৫।২৯,৩০

—এক স্বয়ং শ্রীহরি ব্যতীত তুমি অথবা তোমার মত শক্তিশালী অপর কোন ব্যক্তি মহাবলশালী বলিকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। ব্রহ্মতেজে শক্তিমান এই বলিকে কেহই পরাজিত করিতে পারিবে না। মানুষ যেমন যমরাজের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করে না, সেইরূপ কেহই ইহার সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হইবে না।

এই বলিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি দেবতাগণকে স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া অনুকূল অবস্থার প্রতীক্ষায় অন্যত্র প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং দেবতাগণ গুরুদেবের উপর বিশ্বাসবশতঃ স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মগোপন করিয়া অন্যত্র বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিনা যুদ্ধে স্বর্গজয় করিয়া বিরোচনপুত্র বলি "দেবধানীমধিষ্ঠায় বশং নিন্যে জগত্রয়ম্"—ইন্দ্রপুরী অধিকার করিয়া ত্রিভুবনকে স্বীয় বশে আনয়ন করিলেন। তখন শিষ্যবৎসল শুক্রাচার্য্য সেই বিশ্ববিজয়ী অনুগত শিষ্য বলির দ্বারা এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করাইলেন।

এদিকে পুত্রবৎসল দেবমাতা অদিতি দেবগণের এইরূপ ভাগ্য বিপর্য্যয়ে ব্যথিত হইয়া সন্তানগণের পুনরভ্যুদয় কামনা করিয়া নিজ স্বামী কশ্যপের শরণাপন্ন হইলেন। কশ্যপ পত্নী অদিতির সন্তানগণের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"অহো মায়াবলং বিষ্ণোঃ স্নেহবদ্ধমিদং জগৎ"—আহা, বিষ্ণুর মায়ার কি শক্তি! —এই সমগ্র জগৎ তাঁহার মায়ায় বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশ পুত্রমোহগ্রস্তা অদিতির হৃদয়ে স্থান পাইল না দেখিয়া ঋষি কশ্যপ বলিলেন,

উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং ভগবন্তং জনার্দ্দনম্,
সর্ব্বভূতগুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্‌গুরুম্ ॥
স বিধাস্যতি তে কামান্ হরিঃ দীনানুকম্পনঃ,
অমোঘা ভগবদ্ভক্তির্নেতরেতি মতির্ম্মম ॥ ৮।১৬।২০,২১

—হে ভদ্রে, যিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং যিনি চরাচর জগতের গুরু, তুমি সেই পরম পুরুষ বাসুদেবের আরাধনা কর। দীনবৎসল ভগবান্ শ্রীহরি তোমার কামনা-সমূহ পূর্ণ করিবেন। ভগবানের সেবা অমোঘ, ইহা কখনও বিফল হয় না—ইহাই আমার সুচিন্তিত অভিমত।

অদিতি স্বামীর উপদেশ স্মরণ করিয়া কোন্ বিধি অনুসারে শ্রীহরির আরাধনা করিলে তিনি সত্বর সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন তাহা জানিতে চাহিলেন। তখন কশ্যপ বলিলেন যে, ব্রহ্মার মুখে যে হরিতোষণ ব্রত তিনি শুনিয়াছিলেন সেই ব্রতের বিধি ও উপায় অদিতির নিকট বর্ণনা করিতেছেন।

ফাল্গুনস্যামলে পক্ষে দ্বাদশাহং পয়োব্রতঃ,
অর্চ্চয়েৎ অরবিন্দাক্ষং ভক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ॥ ৮।১৬।২৫

—ফাল্গুনমাসের শুক্লাপ্রতিপদতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ দিবস দুগ্ধপায়ী ও পরমভক্তিযুক্ত হইয়া কমললোচন শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে।

এইরূপে দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত কেবলমাত্র দুগ্ধপান করিয়া ব্রতাচরণ, শ্রীহরির আরাধনা, হোম, পূজা ও ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি বিধান করিতে হইবে, এবং প্রতিদিন ব্রহ্মচর্য্য পালন, ভূতলে শয়ন ও ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া এবং প্রাণীহিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাসুদেবপরায়ণ হইয়া অসৎ আলাপ এবং সর্ব্ববিধ ভোগ বর্জ্জন করিতে হইবে। ত্রয়োদশ দিবসে বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা ব্রত উদ্‌যাপন করাইতে হইবে। এই ব্রত "পয়োব্রত" নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপে অদিতিকে উপদেশ দিয়া ঋষি কশ্যপ অবশেষে বলিলেন,

তস্মাদেতদ্ ব্রতং ভদ্রে, প্রযতা শ্রদ্ধয়া চর,
ভগবান্ পরিতুষ্টস্তে বরানাশু বিধাস্যতি॥ ৮।১৬।৬২

—হে কল্যাণি, তুমি সংযত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই ব্রত আচরণ কর; ভগবান্ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হইয়া তোমার কামনাসমূহ শীঘ্রই পূরণ করিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায়ে অদিতির ব্রতে পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের আবির্ভাব এবং অদিতির গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবার অঙ্গীকার বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর অদিতিকর্ত্তৃক পয়োব্রত সুসম্পন্ন হইলে

তস্যাঃ প্রাদুরভূৎ তাত, ভগবান্ আদিপুরুষঃ
পীতবাসাশ্চতুর্ব্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৮।১৭।৪

—পীতাম্বর, চতুর্ব্বাহু ও শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ আদিপুরুষ অদিতির নিকট আবির্ভূত হইলেন।

তখন অদিতি সেই ভুবনমোহনরূপ দেখিয়া "ননাম ভুবি কায়েন দণ্ডবৎ প্রীতিবিহ্বলা"—ভূতলে শরীর লুণ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, এবং স্তব করিয়া বলিলেন,

যজ্ঞেশ! যজ্ঞপুরুষাচ্যুততীর্থপাদ! তীর্থশ্রবঃ,
শ্রবণমঙ্গলনামধেয়,
আপন্নলোকবৃজিনোপশমোদয়াদ্য! শং নঃ কৃধীশ,
ভগবন্নসি দীননাথঃ ॥ ৮।১৭।৮

—হে যজ্ঞেশ্বর, হে প্রভো, তীর্থসমূহ আপনার পাদপদ্মে অবস্থিত; হে পবিত্রকীর্ত্তে, হে বিভো, আপনার নামসমূহ শ্রবণ করিলেই জীবের কল্যাণ হইয়া থাকে; হে করুণাময়, আপনি শরণাগত জনগণের ক্লেশ-হরণের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া থাকেন; হে পরমেশ্বর, আপনি দীনজনের আশ্রয়, অতএব আপনি আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন।

শ্রীভগবান অদিতির এইরূপ স্তবস্তুতি শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন যে, তিনি অদিতির সমস্ত প্রার্থনাই অবগত আছেন, "প্রতিলব্ধ-জয়শ্রীভিঃ পুত্রৈরিচ্ছস্যুপাসিতুম্"—পুত্রগণ পুনরায় জয় ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইলে অদিতি তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করিবেন ইহাই অদিতি ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু অসুরদলপতিগণ এখন ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহ লাভ করিয়া যুদ্ধে অজেয় হইয়াছে, সুতরাং "ন বিক্রমস্তত্র সুখং দদাতি"—তাহাদের প্রতি এক্ষণে বিক্রম প্রকাশ করিলে উহা অভীষ্টফলপ্রদ হইবে না। কিন্তু অদিতির নিরাশ হইবার কারণ নাই, যেহেতু "মমার্চ্চনং নার্হতি গন্তুমন্যথা শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ"—আমার অর্চ্চনা কখনও

বিফল হইতে পারে না, আমার অর্চ্চনা অবশ্যই অর্চ্চনাকারীর শ্রদ্ধানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকে। ভগবান্ আরও বলিলেন যে,—"স্বাংশেন পুত্রত্বমুপেত্য তে সুতান্ গোপ্তাস্মি মারীচ তপস্যধিষ্ঠিতঃ"—কশ্যপের তপস্যায় অধিষ্ঠিত হইয়া আমি স্বীয় অংশে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার পুত্র দেবগণকে রক্ষা করিব। এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন এবং যথাকালে অদিতি গর্ভধারণপূর্ব্বক শ্রীহরির জন্মের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, অতঃপর শ্রীহরি "প্রজাপতেঃ বেশ্মতমঃ স্বরোচিষা বিনাশয়ন্"—প্রজাপতি কশ্যপের কুটিরের অন্ধকার স্বীয় দীপ্তির দ্বারা বিদূরিত করিয়া শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হইয়া চতুর্ভুজরূপে মাতা অদিতির গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আবির্ভাব সময়ে সর্ব্বদিক্ ও জলাশয় সমূহ প্রসন্ন হইল। সেদিন ভাদ্রমাস, শুক্লপক্ষ, দ্বাদশীতিথি, শ্রবণানক্ষত্র, মকর রাশি। সূর্য্য তখন মধ্যাহ্নগগন স্পর্শ করিয়াছে। শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, জ্ঞানিগণ ভাদ্রমাসের সেই শুক্লা দ্বাদশী তিথিকে "বিজয়া" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন—'বিজয়া নাম সা প্রোক্তা যস্যাং জন্ম বিদুর্হরেঃ'—অর্থাৎ সেই দ্বাদশী তিথিতে শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জ্ঞানিগণ তাহাকে 'বিজয়া' বলিয়া থাকেন। যোগমায়া অবলম্বন করিয়া প্রভু চতুর্ভুজরূপে অবতীর্ণ হইয়া পিতা কশ্যপ ও মাতা অদিতির বিস্ময় উৎপাদন করিলেন এবং অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। যথাকালে কশ্যপ স্বীয় পুত্রের জাতকর্ম্মাদি এবং উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করাইলেন, ব্রহ্মচারী ক্ষুদ্রাকার ব্রাহ্মণ ভিক্ষাপাত্র লইয়া অগ্রসর হইলে—'ভিক্ষাং ভগবতী সাক্ষাদুমাদাৎ অম্বিকাসতী'—জগন্মাতা ভগবতী উমাদেবী নবীন ব্রহ্মচারীকে প্রথম ভিক্ষা প্রদান করিলেন।

এদিকে দৈত্যরাজ বলি তখন গুরু শুক্রাচার্য্যের সহায়তায় নর্ম্মদা নদীর উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছনামক পবিত্রক্ষেত্রে পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। মহাবলী বলি তখন আপন শক্তি ও দম্ভে বিমোহিত। এইরূপ মনের অবস্থা এবং তাহার পরিণাম গীতায় শ্রীভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ হনিষ্যে চাপরানপি
ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া,
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহজালসমাবৃতাঃ,
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬।১৪-১৬

—অহঙ্কারে বিমূঢ় জীব মনে করে 'আমি বহু শত্রু বিনাশ করিয়াছি, আরও বহু শত্রু বিনাশ করিব', 'আমি শক্তিমান্,' 'আমি বিষয়সমূহ ভোগ করিতে সমর্থ,' 'আমি পুরুষকারের বলে বলবান্ ও সুখী।' "আমি উচ্চবংশসম্ভূত ঐশ্বর্য্যশালী, আমার সমকক্ষ আর কে আছে, আমি অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া যজ্ঞ করিব, ভূরি ভূরি অর্থ দান করিয়া লোকমান্য হইব, জীবনটাকে উপভোগ করিয়া স্ফূর্ত্তি করিব।' এইরূপে অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ অবিবেকে মোহগ্রস্ত হইয়া, বহু সঙ্কল্পে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া এবং বিষয়ভোগে আসক্তচিত্ত হইয়া অশুচি নরকে পতিত হইয়া থাকে।

এইস্থলে চতুর্দ্দশ সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বল্পপরিসর একটি মাত্র পংক্তির মধ্যে "অহং" কথাটি তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে—কতবড় অহঙ্কার জীবকে বিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছে, বহুবার ব্যবহৃত এই 'অহং' কথাটি তাহারই ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে।

দৈত্যরাজ বলির এখন এইরূপ মনের অবস্থা। শত যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়াও বলির যজ্ঞপিপাসা মিটে নাই, এখনও ভাবিতেছে 'যক্ষ্যে দাস্যামি

মোদিষ্যে'—এই যে যজ্ঞ, দান এবং স্ফূর্তির অস্বাভাবিক ক্ষুধা ইহাই এখন দৈত্যরাজের মনকে দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

বামনরূপী দীনদয়াল ভগবান্, দৈত্যরাজ বলিকে অহঙ্কারের কঠিন পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য ধীরে ধীরে যজ্ঞস্থলীর দিকে অগ্রসর হইলেন। দূর হইতে দেখা যাইতেছে 'আরাৎ উদিতং রবিম্ যথা'—নিকটেই সমুদিত অরুণবর্ণ সূর্য্যের ন্যায়, কে একজন ব্রহ্মচারী দণ্ড, ছত্র, জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক স্বীয় দীপ্তিতে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া যজ্ঞমণ্ডপের দিকে আসিতেছেন ; আবার যজ্ঞের মন্ত্র, বিধি ও আচার কিসের জন্য! তখনও কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, তথাপি ঋত্বিকগণ, যজমান বলি ও সভাসদ্‌গণ বামনদেবের তেজঃপুঞ্জ কলেবর দর্শন করিয়া কিসের যেন আভাস পাইতেছেন, এই বামনের পরিচয় সম্বন্ধে আপনাদিগের মধ্যে তর্কবিতর্ক আরম্ভ করিয়াছেন। এই ছদ্মবেশধারী বামনকে শ্রীহরি বলিয়া একজন কিন্তু চিনিতে পারিয়াছেন,—তিনি হিমকুন্দমৃণালাভ, দৈত্যগণের পরমগুরু, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্য। কিন্তু শুক্রাচার্য্য তখন কিছুই প্রকাশ করিলেন না। সকল ঋত্বিকগণ এবং গুরু শুক্রাচার্য্য এই অমিত তেজশালী ব্রাহ্মণ বালককে দেখিয়া নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, মহারাজ বলি আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন।

সমগ্র সভা নিস্তব্ধ—অগ্নিতে আহুতিপ্রদান থামিয়া গিয়াছে, মন্ত্রধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে না, সহস্র সহস্র দৈত্যদানব ও ঋষি ঋত্বিকগণ একটি ক্ষুদ্রাকার ব্রহ্মচারীর প্রতি নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া আছেন, দান করিবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন দেখিয়া দৈত্যরাজ প্রসন্ন,—মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে অশ্বমেধ যজ্ঞের যজ্ঞস্থলী বহু কোলাহলে মুখরিত হইতেছিল, সেই সভাস্থলীতে হঠাৎ অস্বাভাবিক স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে।

হইবারই কথা, আজ অদৃষ্টপূর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত। এতক্ষণ যজ্ঞের আয়োজন পরিদৃষ্ট হইতেছিল; যজ্ঞের কোলাহল চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছিল, কিন্তু যজ্ঞের স্বরূপ, ঋষি ও দানবগণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঋত্বিক্ ও দানবগণের মন এতক্ষণ শতধা বিভক্ত হইয়া শত শত বিভিন্ন আচার ও পদ্ধতিতে নিবিষ্ট ছিল—কেহ বা পশুবধের আয়োজন করিতেছেন, কেহ বা উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন, কেহ বা মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। এই শতধা-বিভক্ত খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মনগুলি হঠাৎ এক দুর্নিবার আকর্ষণবশে নিখিল বিশ্বের মন ও বুদ্ধিস্বরূপ শ্রীনারায়ণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—ছোট ছোট মনগুলি এক বিরাট মনের ভিতর হারাইয়া যাইতেছে। তাই মুহূর্ত্তপূর্ব্বে বিক্ষুব্ধ ও শব্দমুখরিত যজ্ঞভূমি হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, সমগ্র সভাকে আচ্ছন্ন করিয়া এক মহান্ আত্মকেন্দ্রিক মনের এক সুগভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। ঋত্বিক, দানব ও দানবরাজের অবচেতন মন বুঝিতে পারিয়াছে,—যজ্ঞেশ্বর আসিতেছেন, স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর আসিয়াছেন!

এইবার মহাবলশালী দীর্ঘাকার দৈত্যরাজ তাঁহার ইন্দ্রবিজয়ী হস্তের দ্বারা আসনে সুখাসীন বামনদেবের চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং সেই ভগবৎপাদোদক নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন,

স্বাগতং তে নমস্তুভ্যং ব্রহ্মন্! কিং করবাম তে,
ব্রহ্মর্ষীণাং তপঃ সাক্ষাৎ মন্যে ত্বার্য্য! বপুর্ধরম্॥
অদ্য নঃ পিতরস্তৃপ্তা অদ্য নঃ পাবিতং কুলম্,
অদ্য স্বিষ্টঃ ক্রতুরয়ং যদ্ভবান্ আগতো গৃহান্॥

অদ্যাগ্নয়ো মে সুহুতা যথাবিধি
দ্বিজাত্মজ, ত্বচ্চরণাবনে জনৈঃ
হতাংহসো বার্ভিরিয়ঞ্চ ভূরহো
তথা পুণীতা তনুভিঃ পদৈস্তব॥

যদ্ যদ্বটো ! বাঞ্ছসি তৎ প্রতীচ্ছ মে
ত্বামর্থিনং বিপ্রসুতানুতর্কয়ে
গাং কাঞ্চনং গুণবদ্ধাম মৃষ্টং
তথান্নপেয়মুত বা বিপ্র ! কন্যাম্,
গ্রামান্ সমৃদ্ধাং স্তুরগান্ গজান্ বা
রথাংস্তথার্হত্তম । সম্প্রতীচ্ছ ॥ ৮।১৮।২৯-৩২

—হে ব্রহ্মন্, আপনাকে নমস্কার ।. আপনার আগমনের সময় কোন কষ্ট হয় নাই ত ? আপনার কোন্ কার্য্য আমি সম্পাদন করিব ? হে আর্য্য, আপনাকে দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, আপনি ব্রহ্মর্ষিগণের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী তপস্যা ।

আপনার আগমনে আমার পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হইলেন, কুল পবিত্র হইল, আমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল ।

হে বিপ্রনন্দন, আপনার পাদপ্রক্ষালিত জলের দ্বারা আমার পাপসমূহ বিনষ্ট হইল, আমার যজ্ঞাগ্নিসমূহ যথাবিধি অৰ্চ্চিত হইল । এই সমগ্র পৃথিবীও আজ আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবিন্যাসে পবিত্র হইয়াছে ।

হে ব্রহ্মচারিন্, আপনাকে প্রার্থী বলিয়া লক্ষ্য করিতেছি, অতএব আপনি বাঞ্ছিতবস্তুসমূহ আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন । হে ব্রহ্মন্, ধেনু, কাঞ্চন, ভোগোপকরণযুক্ত বাসস্থান, শুদ্ধ অন্ন ও পানীয়, সুন্দরী নারী, সমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, গজ অথবা রথসমূহ যাহা কিছু ইচ্ছা হয় আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন ।

দৈত্যরাজ বলির কী অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণভক্তি, কী শ্রদ্ধা, কী অনন্যসাধারণ আত্মনিবেদন ! স্বচ্ছ প্রাণের ভাষা বেগবতী স্রোতস্বতীর মত সহজ ও সরলভাবে উৎসারিত হইতেছে, ভাষা ও ভাবের অপূর্ব্ব মিলন শ্রোতার মনকে পূর্ব্বাপর ঘটনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে । "স্বাগতং তে নমস্তভ্যং ব্রহ্মন্ ! কিং করবাম তে"—দুইতিনবার আবৃত্তি করিলেই

ভাবার মাধুর্য্য কাণের ভিতর বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। কিন্তু তথাপি এই অসাধারণ গুণাবলীকে প্রচ্ছন্ন করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে বিরাজ করিতেছিল বলির অহঙ্কারদৃপ্ত মন—'যক্ষে দাস্যামি মোদিষ্যে"—এবং এই প্রচ্ছন্ন দম্ভ ও অহংকার শ্রীহরির দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না।

দৈত্যরাজ বলির এইরূপ প্রিয়বচনসমূহ শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বামনদেব প্রীত হইলেন এবং বলিলেন যে, দৈত্যপতির গুরু স্বয়ং শুক্রাচার্য্য এবং পিতামহ ভক্তশিরোমণি প্রহ্লাদ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে এইরূপ উদার বাক্য কুলোচিত এবং যশস্কর। বামনদেব আরও বলিলেন,

> ন হ্যেতস্মিন্ কুলে কশ্চিৎ নিঃসত্ত্বঃ কৃপণঃ পুমান্
> প্রত্যাখ্যাতা প্রতিশ্রুত্য যো বাদাতা দ্বিজাতয়ে॥ ৮।১৯।৩

—আপনাদের এই কুলে কোন অপদার্থ বা কৃপণ এমন কোন পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি যাচক ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, অথবা দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া দান করেন নাই।

এই শ্লোকটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অশেষ বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া ক্ষুদ্রাকার ব্রাহ্মণ, দৈত্যরাজ বলিকে নানাবিধ যুক্তির বন্ধনে এমন করিয়া বাঁধিয়া ফেলিতেছেন যে, পরে হঠাৎ অনুতপ্ত হইলে অথবা গুরু শুক্রাচার্য্যের কথায় স্বীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হইলেও বলির নিষ্কৃতির সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। দৈত্যবংশের চির গৌরব উল্লেখ করিয়া বলিকে তাঁহার বংশ-গৌরবে প্রবুদ্ধ করা হইতেছে এবং তিনি ব্রাহ্মণের প্রার্থনামত দান না করিলে স্বীয় বংশের মধ্যে অধম বলিয়া জগতে পরিচিত হইবেন, এবং দান করিবার আশ্বাস দিয়া যদি সেই কথা অনুযায়ী কার্য্য করিতে ইতস্ততঃ করেন তাহা হইলেও তিনি জনসমাজে চিরকাল নিন্দনীয় হইয়া থাকিবেন। একটি শ্লোকের ভিতর দিয়া এইরূপে বলির সমগ্র অহংকারবুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিয়া বামনদেব স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ পূর্ব্ব

হইতেই প্রশস্ত করিয়া রাখিতেছেন। অতঃপর বামনদেব বলির নিকট যাচ্ঞা করিলেন ঃ

তস্মাৎ ত্বত্তো মহীমীষদ্ বৃণেঽহং বরদর্ষভাৎ

পদানি ত্রীণি দৈতেন্দ্র! সম্মিতানি পদা মম॥ ৮।১৯।১৬

—আপনি দাতাগণের শ্রেষ্ঠ ; অতএব হে দৈত্যরাজ, আমি আপনার নিকট আমার কিঞ্চিৎপ্রসারিত পদের দ্বারা ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিতেছি।

বামনদেবের এই অতি তুচ্ছ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ হাসিলেন এবং বলিলেন, "ত্বং বালো বালিশমতিঃ"—আপনি বালক এবং আপনার বুদ্ধিও অপরিপক্ব, "লোকানাং একমীশ্বরম্"—আমি ত্রিভুবনের একমাত্র অধীশ্বর, আমার নিকট প্রার্থনা করিলে একটা সমগ্র দ্বীপও আমি প্রদান করিতে পারি, "ন পুমান্ মামুপব্রজ্য ভূয়ো যাচিতুমর্হতি"—যাচক ব্যক্তি আমার নিকট যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাতে তাহাকে আর অপরের নিকট যাচ্ঞা করিতে যাইতে হয় না—"তস্মাৎ বৃত্তিকরীং ভূমিং বটো! কামং প্রতিচ্ছ মে"—অতএব হে ব্রাহ্মণকুমার, আপনি আপনার জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী ভূমি আমার নিকট হইতে ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করুন। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা দৈত্যরাজের এইরূপ দম্ভসূচক কথা শুনিয়া প্রভু মনে মনে হাসিলেন এবং বলিকে বলিলেন, "যদৃচ্ছালাভ তুষ্টস্য তেজো বিপ্রস্য বর্দ্ধতে"—যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকিলে ঐ সন্তোষের ফলে ব্রাহ্মণের তেজ বৃদ্ধি পায়।

তস্মাৎ ত্রীণি পদান্যেব বৃণে ত্বদ্বরদর্ষভাৎ,

এতাবতৈব সিদ্ধোঽহং বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনম্। ৮।১৯।২৭

—অতএব হে দৈত্যরাজ, আপনি দাতাগণের শ্রেষ্ঠ হইলেও আমি আপনার নিকট ত্রিপাদ পরিমিত ভূমিই প্রার্থনা করি, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইব। বিত্ত প্রয়োজনের অনুরূপ হইলেই সুখদায়ক হইয়া থাকে।

বামনদেবের স্বার্থবুদ্ধি উদ্দীপ্ত করিতে অসমর্থ হইয়া তখন দৈত্যরাজ হাসিতে হাসিতে ভূমি দান করিবার জন্য জলপাত্র গ্রহণ করিলেন।

অতি তুচ্ছ প্রার্থনা, কিন্তু ব্রাহ্মণ বালকটি দেখিতে তুচ্ছ নহেন। সুতরাং সমগ্র দৈত্যসভাসদ্‌গণ নির্নিমেষলোচনে দৈত্যরাজ ও বামনদেবের দিকে চাহিয়া আছেন। সভাস্থলে সকলের মুখে যেন একটা কৌতূহল বিরাজ করিতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের জলদমন্দ্র স্বর সমস্ত সভা কম্পিত করিয়া শ্রুতিগোচর হইল। পূর্ব্ব হইতেই দৈত্যগুরু বামনদেবকে চিনিতে পারিয়াছেন, বিস্ময় সহকারে এতক্ষণ তাঁহার কার্য্যকলাপ, কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করিতেছিলেন, প্রভুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য হয়ত সমগ্র রূপ ধারণ করিয়া দৈত্যগুরুর মনে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই—তাই গুরু এতক্ষণ নির্ব্বাক্, নিশ্চল,—শিষ্যের কল্যাণকামনায় উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল। বারংবার ত্রিপাদ ভূমিই বামনদেব প্রার্থনা করিতেছেন,—দ্বীপ চাহেন না, অর্থ, কন্যা, ধেনু, ঐশ্বর্য্য কিছুই তাঁহার কামনীয় নহে!—এইবার দৈত্যগুরুর নিকট ভগবান্ বামনদেবের সমগ্র উদ্দেশ্য স্বচ্ছ হইয়া প্রতিভাত হইল। শিষ্য বলি জলপাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং এই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে নতুবা শিষ্যের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবে। শিষ্য-কল্যাণকামী শুক্রাচার্য্য গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন:

এষঃ বৈরোচনে! সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ,
কশ্যপাৎ অদিতের্জাতো দেবানাং কার্য্যসাধকঃ॥
প্রতিশ্রুতং ত্বয়ৈতস্মৈ যদনর্থমজানতা,
ন সাধু মন্যে দৈত্যানাং মহানুপগতোঽনয়ঃ॥
এষঃ তে স্থানমৈশ্বর্য্যং শ্রিয়ং তেজো যশঃ শ্রুতম্,
দাস্যত্যাচ্ছিদ্য শক্রায় মায়ামানবকো হরি॥
ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ ইমান্ লোকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি,
সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ়! বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥ ৮।১৯।৩০-৩৩

—হে বিরোচনপুত্র, বামনরূপী ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু, ইনি দেবতাগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

নিজের ভাবী অনর্থের বিষয় বিবেচনা না করিয়া তুমি যে ইঁহাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ, তাহাতে দৈত্যগণের মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইবে।

স্বীয় সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য যোগমায়াবলে বামনরূপ ধরিয়া এই শ্রীহরি তোমার স্থান, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজ, যশ ও বিদ্যা অপহরণ করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিবেন।

বামনরূপে অবতীর্ণ বিরাট বিশ্বরূপ এই শ্রীহরি ত্রিপাদবিন্যাসের দ্বারা ত্রিলোক অধিকার করিবেন ; অতএব মূর্খ, সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে প্রদান করিয়া তুমি কোথায় থাকিবে, কিরূপে জীবনযাপন করিবে ?

এইরূপে দৈত্যরাজ বলিকে তিরস্কার করিয়া তাঁহার কল্যাণকামনায় গুরু শুক্রাচার্য্য যুক্তি ও শাস্ত্রবচনের দ্বারা তাঁহার দান-প্রবৃত্তির নিন্দা করিয়া বলির চৈতন্যসম্পাদন করিবার জন্য দানের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। সর্ব্বদা সত্য কথা বলা উচিত, কিন্তু অবস্থাবিশেষে মিথ্যা কথা বলিলে তাহা ইহকালে নিন্দনীয় অথবা পরকালে অধর্ম্মসূচক হয় না। শুক্রাচার্য্যের নীতি বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত।

স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাৎ জুগুপ্সিতম্ ॥ ৮।১৯।৪৩

—স্ত্রীলোককে বশীভূত করিবার সময়, পরিহাস কালে, বিবাহে বরাদির গুণকীর্ত্তনে, জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত, প্রাণসঙ্কটে, গো ও ব্রাহ্মণের হিতের জন্য এবং কাহারও প্রাণনাশের সম্ভাবনা হইলে, তাহার রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বলা দূষণীয় নহে।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের সমগ্র যুক্তি, তর্ক ও নীতিউপদেশ বিশ্লেষণ করিয়া আমরা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব চিত্র সংগ্রহ করিতে পারি। প্রথমেই দৈত্যগুরুর ভাষার গাম্ভীর্য্য ও সাবলীল গতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—"এষঃ বৈরোচনে! সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ"—এ যেন বিনামেঘে বজ্রপাতের মত সভামধ্যে অতর্কিত বজ্রনির্ঘোষ! ভাষার ভিতর দিয়া শুক্রাচার্য্যের উৎকণ্ঠা এবং শিষ্যের অকল্যাণ-আশঙ্কায় ধৈর্য্যচ্যুতি বারংবার প্রকাশিত হইতেছে—অতি তীব্র তিরস্কার অতি স্নিগ্ধ শিষ্য-প্রীতির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ভাষা ও ভাবকে এক বিস্ময়সূচক পরিণতি প্রদান করিয়াছে—'সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্বা মূঢ়! বর্ত্তিষ্যসে কথম্!' শুক্রাচার্য্যের কথাগুলির ভিতর দিয়া আমরা দৈতগুরুর আকৃতি, মনোভাব এবং চরিত্রের স্বচ্ছতা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি। স্বচ্ছ চরিত্র না হইলে এমন স্বচ্ছ ভাষা বাহির হইত না। সেই হিমকুন্দমৃণালাভ, অকুণ্ঠমেধা, ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ আজ স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, চক্ষুর ভিতর দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে; একদিকে অনুগত শিষ্যের কল্যাণকামনা, অপরদিকে পরমপুরুষ শ্রীহরির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন,—এই উভয়বিধ দ্বন্দ্বের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সেই ভাবোজ্জ্বলকান্তিময় বরবপু ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে, সংসারী জীবের ধর্ম্ম পরম পণ্ডিতের জিহ্বা হইতে প্রবলবেগে শতধারায় সভামধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং বামনদেব বিস্মিতলোচনে শুক্রাচার্য্যের দিকে চাহিয়া আছেন,—এমন ক্ষুরধারের মত বুদ্ধি, এমন সর্ব্বতত্ত্বভেদী শাস্ত্রজ্ঞান, এমন যোগমায়ার মায়াজাল ছিন্নভিন্নকারী দিব্য দৃষ্টি বামনদেব তাঁহার অপর কোন অবতারে তো লক্ষ্য করেন নাই; দৈত্যরাজ বলি একবার বামনদেবকে, পুনরায় দৈত্যগুরুকে বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে লক্ষ্য করিতেছেন; ঋত্বিক্‌গণ তাঁহাদের প্রধান ঋত্বিকের শাস্ত্রানুমোদিত কথাগুলি শ্রবণ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন, অপর কেহই

কথা বলিতে সাহস করিতেছেন না, সত্যবাদী শিষ্য ও কল্যাণকামী গুরুর বিপরীতধর্ম্মী মনের সংঘর্ষের পরিণতি দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এইস্থলে আর একটি বিষয় পরিলক্ষণীয়। সর্ব্বজ্ঞ বামনদেব আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির বাধা একমাত্র শুদ্ধবুদ্ধি শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতেই আসিতে পারে। তাই তিনি প্রথমেই শুক্রাচার্য্যকে প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বাধাপ্রদান হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বামনদেব বলিয়াছিলেন, "যস্য প্রমাণং ভৃগবঃ সাম্পরায়ে"—শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি ভৃগুবংশীয়গণ যাঁহার ধর্ম্মকার্য্যের প্রবর্ত্তক, সেই বলির পক্ষে এরূপ দানশীল হওয়া বিচিত্র নহে। শুক্রাচার্য্য শ্রীহরিকে চিনিতে পারিয়াছেন, সুতরাং স্বয়ং নারায়ণের মুখে এইরূপ প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার বিমোহিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। অতি প্রবল মনঃশক্তি না হইলে শ্রীহরির প্রশংসাবাণী উপেক্ষা করিয়া শিষ্যের কল্যাণ-কামনায় বামনদেবের সম্মুখেই ত্রিপাদভূমি দান সম্বন্ধে বলিকে বাধাপ্রদান করিতে পারিতেন না। স্বয়ং শ্রীহরির মুখে আত্মপ্রশংসা শুনিয়াও শুক্রাচার্য্য যে আপনার স্বাধীন মতবাদ রক্ষা করিতেছেন, ইহা ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে বিরল। আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি যে, সাংসারিক জীবের বৃত্তিরক্ষা, প্রাণরক্ষা, গো-ব্রাহ্মণরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে যে মিথ্যাকথা বলা শুক্রাচার্য্য অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাহা যতিধর্ম্ম না হইলেও সংসারী জীবের পক্ষে বাস্তবধর্ম্ম,—ধর্ম্মের একটা কঠোরআদর্শ গৃহীলোকের জীবনে সর্ব্বভাবে, সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না, অবস্থাবিশেষে ধর্ম্মের আদর্শ জীবনের সহিত মিলাইয়া লইতে না পারিলে সে মানব অথবা জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বৃহত্তম কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্রতম আদর্শ আমরা অহরহঃ ক্ষুণ্ণ করিতেছি এবং তাহা না করিলে মানুষের পক্ষে সমাজে বাস করা সম্ভবপর হইত না। কেবলমাত্র ধর্ম্মের একটা কঠোর অবাস্তব আদর্শ গ্রহণ করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতি বারংবার বিভিন্ন শত্রুগণের পদানত

হইয়াছে, গার্হস্থ্যজীবন, সামাজিকজীবন, ধর্ম্মজীবন সবই দীর্ঘকালের জন্য বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। শুক্রাচার্য্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং শাস্ত্রসম্মত কথাগুলি গৃহস্থজীবনের পক্ষে অমূল্য। ইহাই গতিশীল, ক্রিয়াশীল, প্রাণবান্ ধর্ম্ম। ধর্ম্মের যে উচ্চতম আদর্শ জীবনে পালন করা অত্যন্ত দুরূহ—প্রায় অসম্ভব,—সে ধর্ম্ম সকলের জন্য নহে,—সে ধর্ম্ম অতি অল্পসংখ্যক কয়েকজন বিশিষ্ট, বহুজন্মের সংস্কারবশে সৌভাগ্যবান্ পুরুষসিংহের জন্য। আবার, আমরা দেখিতে পাইতেছি, শুক্রাচার্য্য কেবলমাত্র পণ্ডিত ছিলেন না, গুহাশায়ী পরমাত্মাকে চিনিতে পারিবার শুদ্ধা দৃষ্টিশক্তিও তাঁহার ছিল। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ' —অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার দ্বারা সমাবৃত বলিয়া আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। কিন্তু এই বিশ্ববিমোহিনী যোগমায়া আজ শুক্রাচার্য্যের নিকট তিরস্কৃত। প্রভুর সমস্ত ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া দৈত্যগুরু তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইতেছেন—'মায়ামানবকো হরিঃ"—এই ব্রাহ্মণ-বালক যোগমায়ায় সমাবৃত স্বয়ং শ্রীহরি; শুক্রাচার্য্য প্রভুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য ধরিয়া ফেলিয়াছেন—"দেবানাং কার্য্যসাধকঃ"—দেবতাগণের কল্যাণ-কামনায় বলিকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন। এমন পাণ্ডিত্য অথচ এমন সূক্ষ্মদৃষ্টির সমন্বয় আর কোন পণ্ডিতের জীবনে পূর্ব্বে পরিদৃষ্ট হয় নাই। শ্রীহরি বলিকে ছলনা করিতে সমর্থ হইলেন,—তিনি দৈত্যরাজ-বিজয়ী বামনদেব, কিন্তু শুক্রাচার্য্যের নিকট তাঁহার পরাজয় ঘটিয়া গেল—তাঁহার যোগমায়া, তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য সমস্তই বিশ্লেষণ করিয়া দৈত্যগুরু সমগ্র সভার সম্মুখে নগ্নরূপে উপস্থাপিত করিলেন। তাই শ্রীভাগবতের এই অপূর্ব্ব অংশে বামনদেবের বলি-বিজয় এবং শুক্রাচার্য্যের বামন-বিজয় —উভয়ই স্মরণ রাখিয়া সমগ্র বিবরণটী পাঠ করিতে হইবে।

দৈত্যরাজ বলি স্থিরভাবে গুরুদেবের যুক্তি ও নিষেধবাচক সমস্ত কথাগুলি শ্রবণ করিলেন এবং ক্ষণকাল মৌন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অতঃপর 'অবহিতঃ' অর্থাৎ জিহ্বা সংযতপূর্ব্বক অতি সাবধানতার সহিত গুরুদেবের নিকট নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করিলেন।

বলি বলিলেন,

সত্যং ভগবতা প্রোক্তং ধর্ম্মোহয়ং গৃহমেধিনাম্,
অর্থং কামং যশো বৃত্তিং যো ন বাধেত কর্হিচিৎ ॥
স চাহং বিত্তলোভেন প্রত্যাচক্ষে কথং দ্বিজম্,
প্রতিশ্রুত্য দদামীতি প্রাহ্লাদিঃ কিতবো যথা ॥ ৮।২০।২,৩

—হে ভগবন্, যে ধর্ম্ম কখনও অর্থ, কাম, যশ ও জীবিকার ব্যাঘাত করে না, তাহাই গৃহস্থগণের ধর্ম্ম ;—ইহা যে আপনি বলিলেন, তাহা সত্য।
—কিন্তু আমি প্রহ্লাদের পৌত্র। গৃহস্থ হইলেও আমি দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া ধূর্ত্তের মত বিত্তলোভে কি প্রকারে ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিব?

দৈত্যরাজ এইরূপে পরম শ্রদ্ধা অথচ দৃঢ়তার সহিত শুক্রাচার্য্যের আদেশ পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইলে দৈত্যগুরু বিরক্ত হইয়া শিষ্যকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—"ত্বং অচিরাৎ ভ্রশ্যসে শ্রিয়ঃ"—তুমি অচিরেই শ্রীভ্রষ্ট হইবে। কিন্তু

এবং শপ্তঃ স্বগুরুণা সত্যান্ন চলিতো মহান্,
বামনায় দদৌ এনাং অর্চ্চিত্বোদক পূর্ব্বকম্ ॥ ৮।২০।১৬

—এইরূপে গুরু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াও মহাত্মা বলি সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি বামনদেবের অর্চ্চনা করিয়া জলগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূমি প্রদান করিলেন।

তখন শ্রীবামনদেবের ক্ষুদ্র শরীর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তিনি এক পদের দ্বারা পৃথিবী, দ্বিতীয় পদের দ্বারা স্বর্গলোক, শরীরের দ্বারা আকাশমণ্ডল, বাহুর দ্বারা দিক্‌সকল অধিকার করিয়া ফেলিলেন। তখন "ন বৈ তৃতীয়ায় তদীয় মণ্বপি"—ভগবানের তৃতীয় পদ বিন্যাসের নিমিত্ত

বলির আর অনুমাত্র স্থানও রহিল না। অষ্টম স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ে দৈত্যরাজকর্ত্তৃক ভগবানের এই বিরাট্‌ রূপদর্শন শ্রীভাগবতে "বিশ্বরূপ দর্শন" নামে পরিচিত।

তৃতীয় পাদ ভূমি প্রদান না করিলে দৈত্যরাজ বলির সত্যরক্ষা হয় না, তাই বামনদেব বলিকে বলিলেন,

পদানি ত্রীণি দত্তানি ভূমের্মহ্যং ত্বয়াসুর!
দ্বাভ্যাং ক্রান্তা মহী সর্ব্বা তৃতীয়মুপকল্পয় ॥ ৮।২১।২৯

—হে অসুররাজ, তুমি আমাকে ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি দান করিয়াছ; আমি দুই পদ বিন্যাস করিয়া তোমার সমগ্র ভূমি অধিকার করিয়াছি; এক্ষণে তুমি আমাকে তৃতীয় পদ বিন্যাসের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দাও।

এই বলিয়া বামনদেব বলিকে পাশবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

তখন দৈত্যরাজ বলিলেন যে, বামনদেব দুই পদের দ্বারাই তাঁহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছেন; অতএব "পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্"—আমার মস্তকে আপনি আপনার তৃতীয় পদ স্থাপন করুন। ইতিমধ্যে বলির পিতামহ প্রহ্লাদ ও ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদ, বলির পত্নী বিন্ধ্যাবলি ও ব্রহ্মা, ইঁহারা সকলেই বলিকে পাশমুক্ত করিয়া দিতে বামনদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তখন ভগবান্ বামনদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন; "গুরুণা ভৎর্সিতঃ শপ্তো জহৌ সত্যং ন সুব্রতঃ"—গুরু শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও এই সুব্রত বলি সত্য পরিত্যাগ করে নাই, সুতরাং

এষঃ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুষ্প্রাপমমরৈরপি,
সাবর্ণেরন্তরস্যায়ং ভবিতেন্দ্রো মদাশ্রয়ঃ ॥
তাবৎ সুতলমধ্যাস্তাং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতং
যদাধয়ো ব্যাধয়শ্চ ক্লমস্তন্দ্রা পরাভবঃ
নোপসর্গা নিবসতাং সম্ভবন্তি মমেক্ষয়া ॥ ৮।২২।৩১-৩২

—এই বলিকে আমি দেবগণেরও দুর্লভ স্থান প্রদান করিব স্থির করিয়া রাখিয়াছি। আমার আশ্রয়ে থাকিয়া এই বলি সাবর্ণিমন্বন্তরের ইন্দ্র হইবে। ঐ মন্বন্তর যতদিন না আসে, ততদিন বলি বিশ্বকর্ম্মা রচিত সুতললোকে বাস করুক। আমার কৃপাদৃষ্টির ফলে যাহারা ঐ সুতললোকে বাস করে, তাহাদের মনঃপীড়া, দেহপীড়া, ক্লান্তি, আলস্য, পরাভব অথবা অপরাপর উপদ্রবসমূহ কখনও হয় না।

অতঃপর প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বামনদেব বলিলেন যে, প্রহ্লাদও বলির সহিত সুতলপ্রদেশে গমন পূর্ব্বক উভয়ে একত্র থাকিয়া আনন্দ অনুভব করুক এবং "নিত্যং দ্রষ্টাসি মাং তত্র গদাপাণিমবস্থিতম্" —সেখানে তুমি সর্ব্বদা আমাকে গদাহস্তে দেখিতে পাইবে।

তখন প্রহ্লাদ ও বলি উভয়েই সুতললোকে প্রবেশ করিলে বামনদেব দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন যে, শিষ্য বলিকর্ত্তৃক যে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয় নাই, তাহা শুক্রাচার্য্যের সুসম্পন্ন করা উচিত। শুক্রাচার্য্য বলিলেন,

কুতস্তৎ কর্ম্মবৈষম্যং যস্য কর্ম্মেশ্বরো ভবান্
যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষঃ সর্ব্বভাবেন পূজিতঃ ॥
মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ,
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসঙ্কীর্ত্তনং তব ॥
তথাপি বদতো ভূমন্, করিষ্যাম্যনুশাসনম্,
এতচ্ছ্রেয়ঃ পরং পুংসাং যত্তবাজ্ঞানুপালনম্ ॥ ৮।২৩।১৫-১৭

—হে ভগবন্, যে একান্ত নিষ্ঠার দ্বারা সত্যরূপী আপনার পূজা করিয়াছে, যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞপুরুষ আপনি যাহার কর্ম্মসমূহের ঈশ্বর, সেই বলির কর্ম্মসমূহে বৈগুণ্য কিরূপে হইবে? অধিক কি, মন্ত্রের স্বরাদিচ্যুতি, অনুষ্ঠানের ব্যতিক্রম, দেশ ও কালের উল্লঙ্ঘন, যোগ্য পাত্রের অভাব এবং দক্ষিণাদি বস্তুর ন্যূনতা—এই সকল হইতে কর্ম্মের যে ছিদ্র উপস্থিত

হয়, তাহা আপনার নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে।

তবে আপনি যখন বলিতেছেন, তখন আপনার আজ্ঞা আমি পালন করিব; কারণ আপনার আজ্ঞা পালনই জীবগণের পরম মঙ্গল।

এই কথা বলিয়া শুক্রাচার্য্য অপরাপর ব্রাহ্মণগণের সহিত যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিলেন। অতঃপর বামনদেব বলি-পরিত্যক্ত ত্রিভুবনের সাম্রাজ্য ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন এবং ইন্দ্র বামনদেবকে সঙ্গে করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইলেন। তথায় বামনদেবের বাহুবলে সুরক্ষিত ইন্দ্র ত্রিভুবন প্রাপ্ত হইয়া 'শ্রিয়া পরময়া জুষ্টো মুমুদে গত সাধ্বসঃ'—পরম সম্পদ উপভোগ করিয়া নির্ভয় হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সমগ্র বামনচরিত বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিলেন,

ক্রিয়মানে কর্ম্মনীদং দৈবে পিত্র্যেঽথ মানুষে,
যত্র যত্রানুকীর্ত্ত্যেত তৎ তেষাং সুকৃতং বিদুঃ॥ ৮।২৩।৩১

—দৈব, পিত্র্য অথবা লৌকিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে যে যে কর্ম্মে এই বামন অবতারের কাহিনী কীর্ত্তিত হয়, সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় বলিয়া জ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন।

———

নবম স্কন্ধ

(১)

মহারাজ অম্বরীষ ও ঋষি দুর্ব্বাসা

এই নবম স্কন্ধে প্রথম ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সূর্য্যবংশ এবং পরে একাদশ অধ্যায়ে চন্দ্রবংশ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই স্কন্ধে অম্বরীষ, হরিশ্চন্দ্র, ভগীরথ, শ্রীরামচন্দ্র, পরশুরাম, যযাতি ও রন্তিদেবের আখ্যানই প্রধান।

মনুপুত্র নভগের পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অম্বরীষ। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশুকদেব বলিলেন,

নাভাগাদম্বরীষোঽভূন্মহাভাগবতঃ কৃতী
নাস্পৃশদ্ ব্রহ্মশাপোঽপি যং ন প্রতিহতঃ ক্বচিৎ॥ ৯।১৪।১৩

—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, নাভাগের ঔরসে মহাভাগবত পুণ্যবান্ অম্বরীষ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মশাপ কোথাও প্রতিহত হয় না, কিন্তু সেই ব্রহ্মশাপও মহাভাগবত অম্বরীষকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

শুকদেবের কথা শুনিয়া পরীক্ষিৎ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,

ভগবন্, শ্রোতুমিচ্ছামি রাজর্ষেস্তস্য ধীমতঃ,
ন প্রাভূদ্ যত্র নির্ম্মুক্তো ব্রহ্মদণ্ডো দুরত্যয়ঃ॥ ৯।৪।১৪

—হে ভগবন্, দুরতিক্রমণীয় ব্রহ্মশাপ যাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়া নিজ শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই, আমি সেই জ্ঞানবান্ রাজর্ষি অম্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য অম্বরীষের অপূর্ব্ব আখ্যান আরম্ভ করিয়া বলিলেন,

অম্বরীষো মহাভাগঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্,
অব্যয়াঞ্চ শ্রিয়ং লব্ধা বিভবঞ্চাতুলং ভূবি॥

মেনেঽতি দুর্ল্লভং পুংসাং সর্ব্বং তৎ স্বপ্নসংস্তুতম্
বিদ্বান্ বিভবনির্ব্বাণং তমো বিশতি যৎ পুমান্ ॥ ৯।৪।১৫-১৬

—হে মহারাজ, মহাভাগ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী, অক্ষয় সম্পদ ও অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনি বিভবের নশ্বরতা বুঝিতে পারিয়া পৃথিবীতে মনুষ্যগণের পক্ষে অতি দুর্ল্লভ হইলেও সেই সমস্ত বিভবকে স্বপ্নের ন্যায় অনিত্য মনে করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত বিভবের জন্যই জীব মোহে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

এইরূপ ঐশ্বর্য্যের নশ্বরতা বুঝিতে পারিয়া রাজা অম্বরীষ "প্রাপ্তো ভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোষ্ট্রবৎ স্মৃতম্"—বাসুদেব ও তদ্ভক্ত সাধুগণের প্রতি নিষ্কাম ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রাজা অম্বরীষ কিরূপে তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলিলেন,

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
৯।৪।১৮

—সেই ভগবদ্ভক্ত অম্বরীষ মনকে অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে, বাক্যকে শ্রীহরির গুণানুবর্ণনে, করদ্বয়কে শ্রীহরির মন্দির মার্জ্জনাদি কার্য্যে এবং কর্ণদ্বয়কে ভগবান অচ্যুতের লীলাকথা শ্রবণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজে বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সন্দেহ হইল যে, অনুক্ষণ হরিসেবায় ও হরিচিন্তনে নিমগ্ন রাজা অম্বরীষের পক্ষে রাজ্যশাসন অথবা বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষা কিরূপে সম্ভবপর হইয়াছিল। অন্তর্য্যামী শুকদেব পরীক্ষিতের সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য বলিলেন যে, অম্বরীষের একান্ত ভক্তিভাবে প্রসন্ন হইয়া শ্রীহরি শত্রুসৈন্যগণের ভয়াবহ ও ভক্তজনের রক্ষক সুদর্শনচক্র তাঁহার রক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

একদিন দ্বাদশীব্রত অনুষ্ঠান করিবার অভিপ্রায়ে মহারাজ অম্বরীষ দশমী তিথি রাত্রিতে এবং একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে দিবারাত্র উপবাসী থাকিয়া কালিন্দী নদীতে স্নান করিয়া মধুবনে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূজা শেষ করিয়া তিনি ব্রাহ্মণগণকে গাভী প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করাইয়া সেই পূর্ণকাম ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া পারণ করিবার উপক্রম করিতেই হঠাৎ "তস্য তর্হ্যতিথিঃ সাক্ষাৎ দুর্ব্বাসা ভগবানভূৎ"—ঠিক সেই সময়েই ভগবান দুর্ব্বাসা অতিথিরূপে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। স্মলভকোপ ঋষি দুর্ব্বাসার উপস্থিতি প্রায়ই জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া থাকে,—এই ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইল। রাজা অম্বরীষ তৎক্ষণাৎ স্বীয় দ্বাদশীব্রতের পারণ বন্ধ করিয়া দুর্ব্বাসাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে রাজার গৃহে ভোজন করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। ঋষি দুর্ব্বাসা রাজার অনুরোধ স্বীকার করিয়া কালিন্দীর জলে অবগাহন করিবার জন্য গমন করিলেন। ঋষির ফিরিয়া আসিতে দেরী হইতে লাগিল। এদিকে দ্বাদশী তিথির আর অতি অল্প সময়মাত্র অবশিষ্ট আছে দেখিয়া রাজা অম্বরীষ 'তদ্ধর্ম্মসঙ্কটে'—ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে বুদ্ধি স্থির করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,

ব্রাহ্মণাতিক্রমে দোষো দ্বাদশ্যাং যদপারণে,
যৎ কৃত্বা সাধু মে ভূয়াৎ অধর্ম্মো বা ন মাং স্পৃশেৎ ॥ ৯।৪।৩৯

—নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে উপেক্ষা করিয়া অগ্রে ভোজন করিলে পাপ হয়, আবার দ্বাদশীতে পারণ না করিলেও ব্রতবৈগুণ্যরূপ দোষ হয়; অতএব হে ব্রাহ্মণগণ, যাহা করিলে আমার মঙ্গল হইবে এবং অধর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, তাহাই উপদেশ করুন।

অবশেষে সামান্য জলপান করিয়া ব্রতপারণ করাই স্থির হইল এবং শ্রীহরিকে স্মরণ পূর্ব্বক রাজা জলপান করিয়া দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

ঋষি দুর্ব্বাসা স্নান সমাপনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, অতিথি-ভোজনের অগ্রেই রাজার জলপান জানিতে পারিলেন এবং ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,

যো মাম্ অতিথিমায়াতং আতিথ্যেন নিমন্ত্র্য চ
অদত্ত্বা ভুক্তবাংস্তস্য সদ্যস্তে দর্শয়ে ফলম্॥ ৯।৪।৪৫

—অম্বরীষ, তুমি অতিথিরূপে সমাগত আমাকে আতিথ্য-বিধি অনুসারে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন না করাইয়াই স্বয়ং ভোজন করিয়াছ, অতএব তাহার ফল সদ্যই তোমাকে দেখাইতেছি। এই কথা বলিয়া "রোষপ্রদীপিতঃ" দুর্ব্বাসা নিজের মস্তক হইতে একটি জটা উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন এবং রাজার বধের নিমিত্ত তখনই সেই জটার দ্বারা কালাগ্নিতুল্য এক মারক:অপদেবতা সৃষ্টি করিলেন। এমন সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। মারক দেবতাকে "জলতীং অসিহস্তাং পদাভুবং বেপয়ন্তীং"—অগ্নিপরিবেষ্টিত হইয়া উন্মুক্ত অসিহস্তে পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে রাজার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া "ন চচাল পদাৎ নৃপঃ"—রাজা অম্বরীষ যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইস্থান হইতে এক পদও কোথাও নড়িলেন না। এই ভীষণ পরিস্থিতির বর্ণনা বড় চমৎকার। একদিকে ভীষণ মূরতি কালানলোপম মারক অপদেবতা অগ্রসর হইতেছে, অন্যদিকে মহাভাগবত রাজা অম্বরীষ ভগবৎ অনুগ্রহে বিশ্বাসী হইয়া, যিনি 'ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং' যিনি ভয়ের ভয়, ভীষণের ভীষণ, তাঁহার রূপ চিন্তা করিয়া তুচ্ছ-ভয়প্রদ মারকদেবীর সম্মুখে অবিচলিত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, ঈষৎ পার্শ্বদেশে ঋষি দুর্ব্বাসা মারক দেবীকে দেখিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনের

আশায় কতকটা উৎফুল্ল, রাজাকে স্থির অবিচলিত দেখিয়া কতকটা বিস্মিত। পরম বৈষ্ণব অম্বরীষের এই সাহস কোথা হইতে আসিল? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছেন, 'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—হে অর্জ্জুন, কল্যাণকার্য্যে নিরত আমার ভক্ত কখনও দুঃখপ্রাপ্ত হয় না। আবার সেই শ্রীমুখনিঃসৃত অভয়বাণী 'কৌন্তেয়, প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'—হে কৌন্তেয়, সত্যবাণী শ্রবণ কর,—আমার ভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। এই যুগে যুগে প্রচারিত ভগবৎবাণী ভক্ত অম্বরীষের কর্ণে তখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তিনি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছেন, আনন্দময় শ্রীহরির আনন্দময় মূর্ত্তি; সুতরাং উপনিষদের ভাষায় "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়া অম্বরীষ সর্ব্বত্রই নির্ভয়। ক্ষুদ্র অসিধারিণী অগ্নিরূপিণী মারক অপদেবতা পদভরে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে পারে, কিন্তু যে হৃদয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি স্বয়ং নারায়ণ অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন, সেই পৃথিবী হইতেও বৃহত্তর ভক্তহৃদয়কে ভয়ে কম্পিত করিবার মত ভীষণ মূর্ত্তি আজিও সৃষ্ট হয় নাই। ইহাই পরম বৈষ্ণব অম্বরীষের তখনকার মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ। ক্ষুদ্র ভয় অম্বরীষকে স্পর্শ করিল না, বিচলিত করিল না, কিন্তু বৃহত্তম ভয় দুর্ব্বাসাকে অভিভূত করিয়া তুলিল—হঠাৎ শ্রীহরির সুদর্শন চক্র আবির্ভূত হইয়া মারক অপদেবতাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল এবং ভক্তের অনিষ্টচিন্তাকারী দুর্ব্বাসাকে ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। এই বিপদের সময় ঋষি দুর্ব্বাসার ভগবৎস্মরণ হইল না, শ্রীহরির নাম স্মরণ করিলে হয়তো তাঁহার বিপদ কাটিয়া যাইত; কিন্তু ভয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া "দুর্ব্বাসা দুদ্রুবে ভীতো দিক্ষু প্রাণপরীপ্সয়া"—ঋষি ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার ইচ্ছায় চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা সুমেরু পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় লইলেন, দশদিকে, আকাশে, পৃথিবীতে,

রসাতলে, সমুদ্রে ও স্বর্গে ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু "যতো যতো ধাবতি তত্র তত্র সুদর্শনং দুষ্প্রসহং দদর্শ"—যেখানেই পলায়ন করেন, সেইখানেই দুঃসহনীয় সুদর্শন চক্রকে দেখিতে পাইলেন। ঐ সেই সুদর্শনচক্র দুষ্টের ভীতিপ্রদ ও ভক্তের অভয়ঙ্কর, ঐ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি আলাতের মত শূন্যে চক্রপথে ভ্রমণশীল, কোটি-সূর্য্যসম দীপ্তি, কোটি-সূর্য্যসম উত্তপ্ত, বিষ্ণুর বৈষ্ণবীশক্তি দুর্ব্বাসার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে, তাঁহার সব ব্রত, সব তপস্যা নিস্ফল করিয়া ভক্তজনের অবমাননা, ভক্তজনের অনিষ্টচিন্তা দুর্ব্বাসার জীবনে প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ সর্ব্বংসহ, সন্তানের সর্ব্ব পাপতাপসহনশীল, মহাধৈর্য্যশালী শ্রীহরির ক্রোধ উদ্দীপিত হইয়াছে, তাঁহার সমগ্র শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া আজ দুর্ব্বাসাকে দগ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। দুর্ব্বাসা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন, ব্রহ্মা অক্ষম; "বিষ্ণুচক্রোপতাপিতঃ" দুর্ব্বাসা কৈলাসনিবাসী মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন, নীলকণ্ঠ শঙ্করও অক্ষম ;—কিন্তু ভক্তবৎসল সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব আর্ত্ত ও শরণাগত দুর্ব্বাসাকে রক্ষার উপায় বলিয়া দিলেন—"তমেব শরণং যাহি হরিস্তেশং বিধাস্যতি"—তুমি শ্রীহরির শরণাপন্ন হও, তিনিই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন।

ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! ব্রহ্মা ও শঙ্কর অক্ষম, শ্রীহরি ক্রুদ্ধ, কে দুর্ব্বাসাকে রক্ষা করিবে? শ্রীশুকদেব লক্ষ্য করিলেন, মহারাজ পরীক্ষিতের মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে, তিনি ভয়চকিতনেত্রে শুকদেবের প্রতি চাহিয়া আছেন,—ঋষি দুর্ব্বাসা সামান্য একটু ভুলের জন্য ভক্ত অম্বরীষের অবমাননা করিয়া আজ বিষ্ণুরোষে ভস্মীভূত হইতে চলিয়াছেন—তাহা হইলে ভক্ত ঋষি শমীককে অবমাননা করিয়া রাজা পরীক্ষিতের কি উপায় হইবে! চিরদিন সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিয়া ঋষি দুর্ব্বাসাকে মুহূর্ত্তের ত্রুটির জন্য যদি দুর্ব্বিসহ শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে চিরদিন বিষয়ভোগী পরীক্ষিৎ অকারণে ভক্ত শমীকের অবমাননা করিয়া

কাহার নিকট শরণাপন্ন হইবেন! সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতের মনের এই ভয়াকুল অবস্থা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসিয়া পুনরায় বলিলেন,

সন্দহ্যমানোঽজিতশস্ত্রবহ্নিনা তৎপাদমূলে পতিতঃ সবেপথুঃ
আহ অচ্যুতানন্ত, সদীপ্সিত, প্রভো, কৃতাগসং মাব হি বিশ্বভাবন ॥
অজানতা তে পরমানুভাবং কৃতং ময়াঘং ভবতঃ প্রিয়াণাম্,
বিধেহি তস্যাপচিতিং বিধাতর্ম্মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে
নারকোঽপি ॥ ৯।৪।৬১,৬২

—বিষ্ণুচক্রের তেজ দুর্ব্বাসা ঋষিকে দগ্ধ করিতেছিল, এই অবস্থায় ঋষি বৈকুণ্ঠে যাইয়া ভয়কম্পিতকলেবর হইয়া শ্রীহরির পাদমূলে নিপতিত হইয়া বলিলেন,—হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে সজ্জনবাঞ্ছিত, হে প্রভো, হে বিশ্বস্রষ্টা, আমি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার ভক্তবৎসলতা সম্যক্ উপলব্ধি না করিয়া ভক্ত অম্বরীষের নিকট অপরাধ করিয়াছি। আপনি আমাকে ঐ অপরাধ হইতে মুক্ত করুন, আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনার নাম উচ্চারণ করিলে নরকস্থ ব্যক্তিও পাপমুক্ত হইয়া থাকে।

আর্ত্ত ও শরণাগত দুর্ব্বাসার এইরূপ আত্মনিবেদন শ্রবণ করিয়া শ্রীহরি যাহা বলিলেন, তাহা বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত এবং বহুসমাদৃত। শ্রীহরি বলিলেন,

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ,
সাধুভিঃ গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৯।৪।৬৩
যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্,
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাং স্ত্যক্তুমুৎসহে ॥ ৯।৪।৬৫
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং, হৃদয়স্ত্বহম্,
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৯।৪।৬৮

—হে দ্বিজ, আমি ভক্তের অধীন, সুতরাং লোকে আমাকে স্বাধীন মনে করিলেও আমি ভক্তাধীন। ভক্তজন আমার প্রিয় এবং সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছে।

আমার যে সকল ভক্ত স্ত্রী, গৃহ, পুত্র, স্বজন, প্রাণ, বিত্ত, ইহলোক ও পরলোক আমার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি কি প্রকারে তাহাদিগকে ভুলিয়া থাকিতে পারি ?

সাধুগণ আমার হৃদয়ে, আমি সাধুগণের হৃদয়ে। তাহারা আমাকে ভিন্ন অপর কাহাকেও জানে না ; আমার নিকটও তাহাদের মত প্রিয়জন আর কেহই নাই।

ভক্তবৎসল শ্রীহরির এইরূপ ভক্ত-প্রশস্তি দুর্ব্বাসার মনে ভয়সঞ্চার করিল ; দুর্ব্বাসা আশঙ্কা করিলেন যে, এই বৈকুণ্ঠেও তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইবে, এবং তাহা হইলে তাঁহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অন্তর্য্যামী শ্রীহরি দুর্ব্বাসার মনের এই ব্যাকুল অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বিপন্মুক্তির উপায় বলিয়া দিলেন। শ্রীহরি বলিলেন, "উপায়ং কথয়িষ্যামি তব বিপ্র, শৃণুষ্ব তৎ"—হে বিপ্র, তোমাকে উপায় বলিয়া দিতেছি।

ব্রহ্মং স্তদ্গচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্,
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৯।৪।৭১

—হে ব্রহ্মন্, তুমি গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। নাভাগপুত্র পরম বৈষ্ণব রাজর্ষি অম্বরীষের নিকট যাইয়া তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাহাতেই তোমার শান্তি হইবে।

ঋষি দুর্ব্বাসা শ্রীহরির উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় রাজা অম্বরীষের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং "তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ"—ভক্তের অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে অম্বরীষের চরণদ্বয় ধারণ করিলেন। তখন ক্ষত্রিয় রাজা "পাদস্পর্শ বিলজ্জিতঃ"—ব্রাহ্মণ পাদস্পর্শ করায় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কাতরকণ্ঠে সুদর্শন চক্রের স্তব করিতে

লাগিলেন। ভক্ত চিরদিন পরদুঃখকাতর,—ভক্তের সম্মান অপরিসীম, ভক্তের দুঃখও অপরিসীম! অম্বরীষ বলিলেন,

সুদর্শন, নমস্তভ্যং সহস্রারাচ্যুতপ্রিয়,
সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্, বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়া ইড়স্পতে॥ ৯।৫।৪

—হে সুদর্শন, তোমাকে নমস্কার করি। হে সহস্রধার, হে ভগবৎপ্রিয়, হে সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্, হে পৃথিবীপতে, তুমি এই ব্রাহ্মণের আশ্রয়স্বরূপ হও।

এইরূপে পূজিত হইয়া বিষ্ণুচক্র সুদর্শন প্রশান্ত হইল এবং দুর্ব্বাসা ভয়মুক্ত হইয়া বলিলেন,

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে,
কৃতাগসোঽপি যদ্রাজন্, মঙ্গলানি সমীহসে॥ ৯।৫।১৪

—আহা, আজ আমি ভগবান্ অনন্তের দাসগণের মহত্ত্ব দর্শন করিলাম। হে রাজন্, আমি আপনার নিকট অপরাধী, তথাপি আপনি আমার মঙ্গলবিধান করিয়াছেন।

অতঃপর শুকদেব বলিলেন যে, সুদর্শন চক্রভয়ে ভীত, স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়নপর দুর্ব্বাসার, অম্বরীষের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতে এক বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সংবৎসরকাল রাজা অম্বরীষ অতিথি দুর্ব্বাসার প্রত্যাবর্ত্তনপ্রতীক্ষায় মাত্র জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন। এখন ঋষিকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি "চরণাবুপসংগৃহ্য প্রসাদ্যসমভোজয়ৎ"—ঋষি দুর্ব্বাসার চরণযুগল ধারণ করতঃ তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। অতঃপর ঋষি প্রস্থান করিলে ভগবৎপ্রসাদ উপলব্ধি করিয়া রাজা অম্বরীষ বিষয়বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ বিরক্ত হইয়া পুত্রগণের উপর রাজ্যভার সমর্পণকরতঃ বন গমন করিলেন এবং তথায় পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি মন সমাহিত করিয়া জন্মমৃত্যুপ্রবাহ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

(২)

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন

অতঃপর শ্রীশুকদেব অম্বরীষের বংশ বর্ণনা করিয়া সগরের বৃত্তান্ত, কপিলের নিকটে অপরাধ করায় তৎপুত্রগণের বিনাশ ও সগরের পৌত্র অংশুমানের কপিলানুগ্রহ লাভ বর্ণনা করিলেন। নরপতি রাহুকের পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী সগর। সগর যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার বিমাতাগণ দ্বেষবশতঃ তাঁহার মাতাকে 'গর' অর্থাৎ বিষমিশ্রিত অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন। সেই 'গর' অর্থাৎ বিষের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শিশু সগর নামে পরিচিত হইলেন। "সগরশ্চক্রবর্ত্ত্যাসীৎ সাগরো যৎ সুতৈঃ কৃতঃ"—অর্থাৎ মহাযশস্বী সগর রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্রগণই সাগর খনন করিয়াছিলেন। সম্রাট্ সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য যজ্ঞীয় অশ্বকে দেশ বিদেশে ছাড়িয়া দিলে দেবরাজ ইন্দ্র সেই অশ্ব হরণ করেন। অতঃপর ষাট্ হাজার সগরপুত্র অশ্ব খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাকে কপিল মুনির নিকট দেখিতে পাইয়া কপিল-মুনিকে চোর বলিয়া অবমাননা করিলে, মহতের অবমাননার জন্য তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইল। যখন ষাট্ হাজার পুত্র ফিরিয়া আসিল না, তখন পিতামহ সগরের আদেশে পৌত্র অংশুমান অশ্ব অন্বেষণ করিতে বাহির হইলেন। কপিলদেবের নিকটে ভস্মস্তূপ ও যজ্ঞীয় অশ্ব দেখিয়া অংশুমান ভগবান্ কপিলদেবের স্তবস্তুতি করিলেন, এবং তখন কপিলদেব প্রীত হইয়া বলিলেন, "ইমে চ পিতরো দগ্ধা গঙ্গাম্ভোঽর্হন্তি নেতরৎ"—হে বৎস, এই তোমার পিতৃব্যগণ ভস্মীভূত হইয়াছে, ইহারা গঙ্গা জল পাইলেই সদ্গতি লাভ করিবে, অন্য উপায়ে নহে। সগর রাজা পৌত্র অংশুমানের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইলে অংশুমান গঙ্গা আনয়ন করিবার ইচ্ছায় সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি

গঙ্গা-আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই। অংশুমানের পুত্র দিলীপও গঙ্গা আনয়নে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, দিলীপের পুত্র ভগীরথ পিতৃবংশ উদ্ধারের জন্য গঙ্গা আনয়ন করিবার ইচ্ছায় অতি দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন। তখন গঙ্গাদেবী প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,

কোঽপি ধারয়িতা বেগং পতন্ত্যা মে মহীতলে,
অন্যথা ভূতলং ভিত্বা নৃপ, যাস্যে রসাতলম্ ॥
কিঞ্চাহং ন ভুবং যাস্যে নরা ময্যামৃজন্ত্যঘম্,
মৃজামি তদঘং ক্বাহং রাজং স্তত্র বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৯।৯।৪,৫

—হে রাজন্, আমি যখন আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইব, তখন কাহাকেও আমার বেগ ধারণ করিতে হইবে, নতুবা আমি ভূতল ভেদ করিয়া রসাতলে চলিয়া যাইব। ভূতলে যাইবার আমার ইচ্ছাও নাই; কারণ, আমি ভূতলে যাইলে মনুষ্যগণ আমার বারিরাশিতে তাহাদের পাপরাশি ধৌত করিবে, আমি তখন সেই পাপরাশি হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইব? হে রাজন্, আপনি এই সকল বিষয়ে উপায় চিন্তা করুন।

তখন ভগীরথ বলিলেন, শ্রীমহাদেব গঙ্গার বেগ ধারণ করিবেন; কারণ, পরমাত্মা শ্রীহরি রুদ্রদেবের মধ্যে বিরাজিত আছেন। পাপী-সংস্পর্শ-কলুষিত গঙ্গাবারি সম্বন্ধে ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ ॥ ৯।৯।৬

—হে মাতঃ, সর্ব্বত্যাগী, লোকপাবন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শমগুণসম্পন্ন সাধুগণ আপনাতে অবগাহন করিয়া আপনার উক্ত পাপরাশি ক্ষালন করিয়া দিবেন, কারণ, পাপহারী শ্রীহরি তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজিত।

অতঃপর ভগীরথ বায়ুর ন্যায় বেগশালী রথে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবাহিত

হইয়া "দেশান্ পুনন্তী নির্দগ্ধানাসিঞ্চৎ সগরাত্মজান্"—দেশসমূহকে পবিত্র করতঃ ভস্মীভূত সগরসন্তানগণকে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে সগরপুত্রগণ গঙ্গাবারি স্পর্শে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

অতঃপর শ্রীশুকদেব শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব ও রাজ্যশাসন বর্ণনা করিয়া ইক্ষাকুপুত্র নিমির বংশ বর্ণনা করিলেন এবং অবশেষে চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে চব্বিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশ-বৃত্তান্ত মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রবণ করাইলেন। এই চন্দ্রবংশ প্রসঙ্গে রাজা পুরূরবা ও উর্ব্বশীর আখ্যান এবং পরশুরাম কর্ত্তৃক কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বধ বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকদেব যযাতির সহিত শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী এবং দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহ এবং তাহার পরিণতি মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট বিবৃত করিলেন।

(৩)

রাজা যযাতির উপাখ্যান

রাজা যযাতির উপাখ্যান বড়ই বিচিত্র ও শিক্ষাপ্রদ। মহারাজ নহুষের ছয়জন পুত্রের মধ্যে যযাতি দ্বিতীয়। জ্যেষ্ঠপুত্র যতি বৈরাগ্যবশতঃ রাজা হইতে অসম্মত হইলে দ্বিতীয় পুত্র যযাতি সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হইলেন। শুকদেব বলিলেন যে, যযাতি শুক্রাচার্য্যের কন্যা ও বৃষপর্ব্বার কন্যাকে বিবাহ করিয়া দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া রাজা পরীক্ষিৎ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, রাজা ক্ষত্রিয় ও শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণ, সুতরাং "রাজন্যবিপ্রয়োঃ কস্মাদ্বিবাহঃ প্রাতিলোমিকঃ" —ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রতিলোম বিবাহ কিরূপে সম্ভবপর হইয়াছিল? শ্রীশুকদেব তখন যযাতির সমস্ত জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

একদিন দানবরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র সখী ও গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর সহিত মিলিত হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষসমাকুল এক উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই উদ্যান মধ্যে এক সরোবর দেখিতে পাইয়া সকলে নিজ নিজ বস্ত্র তীরে রাখিয়া অবগাহনপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের দেহে জল নিক্ষেপ করিতে করিতে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে—

বীক্ষ্য ব্রজন্তং গিরিশং সহ দেব্যা বৃষস্থিতম্
সহসোত্তীর্য্য বাসাংসি পর্য্যধুঃ ব্রীড়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৯।১৮।৯

—ঐ সময়ে দৈবাৎ মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বৃষে আরোহণ করিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া যুবতীগণ অতিশয় লজ্জিতা হইলেন এবং সত্বর জল হইতে উঠিয়া নিজ নিজ বস্ত্র পরিধান করিলেন।

ইতিমধ্যে দৈবক্রমে এক সামান্য ভুলের জন্য এক বৃহৎ ঘটনার সূত্রপাত হইল,—'শর্ম্মিষ্ঠাজানতী বাসো গুরুপুত্র্যাঃ সমব্যয়ৎ'—শর্ম্মিষ্ঠা তাড়াতাড়িতে ভুল করিয়া গুরুকন্যা দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করিয়া ফেলিলেন। তখন ব্রহ্মণ্যাভিমানিনী দেবযানী অকারণে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তীব্র কণ্ঠে শর্ম্মিষ্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

অহো নিরীক্ষ্যতামস্যা দাস্যাঃ কর্ম্ম হ্যসাম্প্রতম্,
অস্মদ্ধার্য্যং ধৃতবতী শুনীব হবিরধ্বরে ॥ ৯।১৮।১১

—এই দাসীটার অন্যায় কার্য্য দেখ। কুক্কুরীর যজ্ঞীয় ঘৃত ভোজনের ন্যায় এই দাসীটা আমার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে।

হঠাৎ অকারণে দেবযানীর ধৈর্য্যচ্যুতি ও তীব্র ভাষা প্রয়োগ! আরও কটুকথা দেবযানী বলিলেন—শর্ম্মিষ্ঠার পিতাকে অসুর বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া স্বয়ং ভৃগুবংশীয় কন্যা বলিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিলেন, শর্ম্মিষ্ঠাকে 'অসতী' বলিয়া গালাগালি দিলেন! দাসী, কুক্কুরী, অসুরকন্যা, অসতী,—

তীব্র জিহ্বার মুখে স্রোতের মত এই মর্য্যাদাহানিকর এবং উত্তেজক কথাগুলি বাহির হইলে স্বভাবতঃই ক্ষত্রিয়রাজকন্যা ক্রুদ্ধা হইলেন এবং "রুষা শ্বসন্ত্যুরগীব ধর্ষিতা দষ্টদচ্ছদা"—ক্রোধে ওষ্ঠদংশন পূর্ব্বক পদাহত সর্পিণীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে 'কাক' এবং 'ভিক্ষুকী' বলিয়া দেবযানীকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তখন ক্ষত্রিয়-কন্যার ক্রোধ উদ্দীপিত হইয়াছে; সুতরাং গালাগালিতেই এই তুচ্ছ ঘটনার অবসান হইল না, শর্ম্মিষ্ঠা আরও কঠোরবাক্যে তিরস্কৃত ও অবমানিত করিয়া দেবযানীর বস্ত্র কাড়িয়া লইলেন, এবং তাঁহাকে এক স্বল্পজল কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। একটা তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া একটা বৃহৎ দুর্ঘটনার সূচনা হইল।

সকলেই চলিয়া গিয়াছে, দেবযানী অন্ধকার কূপমধ্যে একাকী পড়িয়া আছেন। ইতিমধ্যে রাজা যযাতি মৃগয়া উপলক্ষ্যে বনে গমন করিতে করিতে সেই কূপমধ্যে দেবযানীকে দেখিতে পাইলেন; বিবসনা দেবযানীকে রাজা নিজ উত্তরীয় পরিধান করিতে দিলেন এবং হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। দেবযানী কূপ হইতে উত্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতা বশতঃ রাজা যযাতিকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন যে তাঁহাদের পরস্পরের এই দর্শন 'এষ ঈশকৃতো বীর, সম্বন্ধো নৌ ন পৌরুষঃ'—ঈশ্বরের বিধানবশতঃই হইয়াছে, ইহা মনুষ্যবিহিত নহে। রাজা যযাতি দেবযানীকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর দেবযানী রোদন করিতে করিতে পিতা শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন এবং নিজ দোষ আচ্ছাদন করিয়া শর্ম্মিষ্ঠার তিরস্কার-বাক্য ও কূপনিক্ষেপ সবিস্তারে রোদনের অন্তরালে বর্ণনা করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র-প্রবক্তা, পরমজ্ঞানী শুক্রাচার্য্য কন্যাস্নেহে অন্ধ হইয়া সমস্ত ঘটনাটিকে স্বচ্ছবুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে পারিলেন না এবং ক্রোধে অধীর হইয়া

কন্যা দেবযানীকে সঙ্গে লইয়া দানবরাজের রাজধানী পরিত্যাগ করতঃ অন্যত্র চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। দানবরাজ বৃষপর্ব্বা বুদ্ধিমান; সুতরাং তিনি বুঝিলেন যে, ক্রুদ্ধ শুক্রাচার্য্য যদি দানবগণের সহায় না হন তাহা হইলে গুরু-পরিত্যক্ত দানবগণের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দানবরাজ "গুরুং প্রসাদয়ং মূর্দ্ধ্না পাদয়োঃ পতিতঃ পথি"—পথিমধ্যে পথচারী সমস্ত প্রজাগণের সম্মুখে তাঁহার উজ্জ্বল মুকুটপরিশোভিত মস্তক ভূতলে রাখিয়া গুরু শুক্রাচার্য্যের চরণবন্দনা করিলেন। শুক্রাচার্য্য ছিলেন "ক্ষণার্দ্ধমন্যুঃ" অর্থাৎ তাঁহার ক্রোধ ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী হইত; সুতরাং তিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বৃষপর্ব্বাকে বলিলেন যে, দেবযানীর ইচ্ছানুযায়ী বিধান করিলেই শুক্রাচার্য্য দানবরাজকে পরিত্যাগ করিবেন না। বৃষপর্ব্বা সম্মত হইলে দেবযানী বলিলেন, "পিত্রা দত্তা যতো যাস্যে সানুগা যাতু মামনু"—পিতা আমাকে যেখানে সম্প্রদান করিবেন, সখীগণের সহিত শর্ম্মিষ্ঠাকেও তথায় দাসীর মত আমার অনুগমন করিতে হইবে। স্নেহশীল বৃষপর্ব্বার পক্ষে ইহা কঠোর সর্ত্ত, কিন্তু সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য তাঁহাকে পিতৃস্নেহ বিসর্জ্জন দিতে হইল—শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র সখীর সহিত দাসীর ন্যায় দেবযানীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অপরিণতবুদ্ধি ব্রাহ্মণকন্যা যে এইরূপে আপনার স্বার্থের মূলে আপনিই কুঠারাঘাত করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

কন্যা-স্নেহে মুগ্ধ শুক্রাচার্য্য দেবযানীর প্রার্থনামত তাঁহাকে রাজা যযাতির করে সমর্পণ করিলেন এবং দেবযানীর সঙ্কল্পানুযায়ী রূপবতী রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দাসীরূপে দেবযানীর সহিত তাঁহার পতিগৃহে গমন করিলেন। পরম পণ্ডিত শুক্রাচার্য্যের মনে একটা আশঙ্কা রহিয়া গেল—তিনি রাজা যযাতিকে বলিলেন, "রাজন্ শর্ম্মিষ্ঠামধাঃতল্পে ন কর্হিচিৎ" হে রাজন, তুমি কখনও শর্ম্মিষ্ঠার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিও না। দৈত্যগুরু কন্যাস্নেহে অন্ধ হইয়া কন্যার ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থাই

করিলেন, কন্যার পতিগৃহে সুখের কামনায় সাবধানতা অবলম্বন করিলেন, কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর ভুলিয়া যাইলেন যে, রূপবতী রাজকন্যা অহরহঃ রাজার অন্তঃপুরবাসিনী হইলে রাজা যযাতির পক্ষে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রতিজ্ঞারক্ষা করা কঠিন্—'বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি'—বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানকে পরাভূত করিয়া সময় সময় আপনার শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

ঘটনাচক্রে নিজ দোষে দেবযানীর ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল। দেবযানী পুত্র সম্ভাবিতা, রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা রূপেগুণে অতুলনীয়া রাজচক্রবর্ত্তীর অতি নিকটে থাকিয়াও পুত্রসুখে বঞ্চিতা। একদিন সেই চিরসুপ্ত মাতৃত্বের ক্ষুধায় চঞ্চল হইয়া শর্ম্মিষ্ঠা নির্জ্জনে রাজা যযাতির নিকট নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। শুক্রাচার্য্যের নিষেধ রাজা যযাতির মনে পড়িল, তথাপি 'দিষ্টম্ এব'—ইহা অদৃষ্টের সংঘটন—মনে করিয়া রাজা শর্ম্মিষ্ঠার কামনা পূরণ করিলেন। যথাকালে দেবযানী দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠা তিনপুত্র প্রসব করিলেন। তখন সমস্ত ঘটনা জানাজানি হইলে রাজা যযাতি 'পাদ-সংবাহনাদিভিঃ"—দেবযানীর পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠা-উপভুক্ত স্বামীর দেহকে উচ্ছিষ্ট অন্নের মত ঘৃণা করিয়া দেবযানী "পিতুর্গেহং যযৌ ক্রোধবিমূর্চ্ছিতা"—দেবযানী ক্রোধে আত্মবিস্মিত হইয়া পিতা শুক্রাচার্য্যের গৃহে যাইলেন। এদিকে 'কামী'—অর্থাৎ দেবযানীর প্রতি আসক্ত রাজা দেবযানীকে অনুনয় বিনয় করিতে করিতে দেবযানীর সহিত শ্বশুর শুক্রাচার্য্যের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শুক্রাচার্য্য কন্যার সুখবিপর্য্যয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—'স্ত্রীকাম, অনৃতপুরুষ, ত্বাং জরাবিশতাং মন্দ, বিরূপকরণী নৃণাম্'—রে কামুক্, রে বিশ্বাসঘাতক নরাধম, তুই আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিস্, অতএব যে জরা মনুষ্যগণের রূপ বিকৃত করিয়া দেয়, সেই জরা তোর দেহ এখনই অধিকার করুক! শুক্রাচার্য্য কিন্তু ক্রোধে অভিভূত

হওয়ায় হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ এই প্রবল অভিশাপের দ্বারা তাঁহার কন্যা দেবযানীও যে ভোগ-সুখবঞ্চিতা হইয়া সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন তাহা শুক্রাচার্য্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই। যযাতি সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া শ্বশুরকে নিবেদন করিলেন— 'অতৃপ্তোঽস্ম্যদ্য কামানাং ব্রহ্মন্, দুহিতরি স্ম তে'—হে ব্রহ্মন্, আমি আপনার কন্যাকে সম্ভোগ করিয়া এখনও পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই, অতএব আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন। কথাগুলি কিন্তু যযাতির সম্বন্ধেই নহে, ইহা দেবযানীর সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। শুক্রাচার্য্য যযাতির ইঙ্গিত বুঝিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ ক্ষণার্দ্ধকালও স্থায়ী হইত না, সুতরাং দৈত্যগুরু ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিশাপের সমস্ত ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করিলেন এবং তখন শান্ত হইয়া যযাতিকে বলিলেন—'ব্যত্যস্যতাং যথাকামং বয়সা যোঽভিধাস্যতি'— যদি কোনও যুবক তোমার জরা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে স্বীকার করে, তাহা হইলে তুমি তাহার যৌবনের সহিত নিজ জরা বিনিময় করিয়া লইতে পারিবে।

অভিশপ্ত বিষয়-ভোগপ্রয়াসী রাজা যযাতি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্রকে যৌবনের পরিবর্ত্তে জরাগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—'যদো, তাত, প্রতীচ্ছেমাং জরাং দেহি নিজং বয়ঃ'—হে বৎস যদু, তোমার মাতামহের শাপে আমার অকালে জরা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি এই জরা গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন আমাকে প্রদান কর,—'ন তৃপ্তো বিষয়েষ্বহম্'—আমি এখনও কামিনীকাঞ্চন উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই, 'বয়সা ভবদীয়েন রংস্যে কতিপয়াঃ সমাঃ'—তোমার যৌবনের দ্বারা আমি কয়েক বৎসর বিষয়সুখ ভোগ করিব। যদু জরাগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন,—'অবিদিত্বা সুখং গ্রাম্যং বৈতৃষ্ণ্যং নৈতি পুরুষঃ'—মানুষ গ্রাম্যসুখ উপভোগ না করিয়া বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হইতে পারে না।

পুত্র যদুর এই জ্ঞানগর্ভ কথাগুলির মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত রহিয়াছে। মানুষ সহজে বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারে না, মানুষের মন স্বভাবতঃই বিষয়ভোগপ্রমুখ'। অতএব অনেক সময় দেখা যায় যে, যখন বিষয় সুখ ভোগ করিতে করিতে ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া আসে, বিষয়ের অনিত্যতা উপলব্ধি হয়, তখন বিষয় সুখ আলুনি বলিয়া মনে হয় এবং সেই সময় একটু চেষ্টা করিলেই সহজে মনে বৈরাগ্য সঞ্চারিত হইতে পারে। মনে বিষয়-পিপাসা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বাহিরে বিষয়পরিহার করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। অবশ্য এই কথাগুলি যযাতিকে যদু সাধারণভাবেই বলিতেছেন। কারণ, যদু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণভজনশীল এবং জরা গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণভজনের ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই যদু জরা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইতেছেন। পিতাকে নিজের ধর্ম্মসাধনের কথা বলা অহঙ্কারের পরিচয় বলিয়া যদু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে জরা গ্রহণের যে বাধা, তাহাই আপনার পক্ষেও প্রযোজ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন। অবশেষে পিতার অনুরোধে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু যযাতির জরা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং যযাতি নব যৌবন লাভ করিয়া দেবযানীর সহিত বিষয়সমূহ ভোগ করিতে লাগিলেন; পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিলেন, বহু যজ্ঞ সমাপন করিয়া যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরির অর্চনা করিলেন। কিন্তু এইরূপে সহস্র বৎসর বিষয়ভোগ করিয়াও 'নাতৃপ্যৎ', যযাতি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না।

এইরূপে সহস্র বৎসর কামিনীকাঞ্চন উপভোগ করিয়া যখন 'স্ত্রৈণঃ' যযাতি দেখিলেন যে, ভোগবাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, উপশম হইবার কোন লক্ষণই নাই, তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি আপনাকে ছাগ এবং দেবযানীকে ছাগীর সহিত তুলনা করিয়া বলিলেন, 'আত্মানং নাভিজানামি মোহিতস্তব মায়য়া"—হে সুন্দরী, আমি তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছি। অতঃপর বিষয়বিরক্ত যযাতি বলিলেন,

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ,
ন দুহ্যন্তি মনঃ প্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে ॥
ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥
যা দুস্তজা দুর্ম্মতিভির্জীর্য্যতো যা ন জীর্য্যতি,
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্ম্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ ॥ ৯।১৯।১৩,১৪,১৬

—পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, সেই সমস্ত বস্তু একত্রীভূত হইয়াও বিষয়াসক্ত মানুষের বিষয়পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না।

কাম্যবস্তুসমূহের উপভোগের দ্বারা কখনও কামতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না, পরন্তু ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নি যেমন বর্দ্ধিতই হয়, সেইরূপ উপভোগের দ্বারা কাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই থাকে।

—যে বিষয়তৃষ্ণা বদ্ধজীবগণের ত্যাগ করা দুঃসাধ্য এবং মনুষ্য জরাজীর্ণ হইলেও যে বিষয়তৃষ্ণা কিছুমাত্র কমে না, কল্যাণকামী ব্যক্তি দুঃখপ্রদ সেই বিষয়তৃষ্ণাকে সত্বর পরিত্যাগ করিবেন।

সৌভাগ্যবশতঃ যযাতির শুভবুদ্ধির উদয় হইয়াছে, সুতরাং তিনি ভোগ বাসনার পরিণতি বুঝিতে পারিয়া চিত্ত পরব্রহ্মে সমাহিত করিবার অভিপ্রায়ে পুরুকে তাঁহার যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া বনগমন করিলেন। দেবযানী স্বামীর পরমার্থপ্রদ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার বনগমন দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, "সন্নিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ামিব গচ্ছতাম্" —আত্মীয় স্বজনগণের মিলন জলসত্রে সম্মিলিত তৃষ্ণাধীন মনুষ্যগণের মত ক্ষণস্থায়ী। অতএব দেবযানী আসক্তিশূন্য হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্গতি প্রাপ্ত হইলেন।

নবমস্কন্ধের উনিশ অধ্যায়ে যযাতির উপাখ্যান শেষ করিয়া সর্ব্বশেষ শ্লোকে শ্রীশুকদেব ভগবৎস্মরণ পূর্ব্বক ভগবানকে নমস্কার জানাইতেছেন।

শ্রীশুকদেবের এইরূপ ভগবৎস্মরণ বিচিত্র। বহু উপাখ্যান ও ইতিহাস শ্রীশুকদেব বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু বর্ণনা শেষ করিয়া নিষ্ঠার সহিত ভগবৎ-স্মরণ তিনি ভাগবতের অপর কোনও অংশে করেন নাই। কিন্তু যযাতির উপাখ্যানের শেষে এই ভগবৎস্মরণ বিচিত্র হইলেও গভীর অর্থপ্রদ। রাজা যযাতির উপাখ্যান পূর্ব্ব হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিষয়ভোগ-পিপাসার উপাখ্যান এবং এই বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবকে কামিনীকাঞ্চনের বহুবিধ ভোগবিলাস পুনঃ পুনঃ ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হইয়াছে। এই বিষয়-ভোগের বহুবিধ বর্ণনা করিয়া যেন শ্রীশুকদেব আপনাকে অপবিত্র মনে করিতেছেন, যেন তাঁহার নিরঞ্জন মন একটা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছে, সুতরাং যযাতির ইতিহাস শেষ করিয়া শুকদেব শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার জিহ্বা ও মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতেছেন। এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,

নমস্তভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে,
সর্ব্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতেনমঃ॥ ৯।১৯।২৯

—হে ভগবন্, আপনি সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী, জগতের বিধাতা, শান্ত, পরমমহান্, এতাদৃশ ভগবান বাসুদেব আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।

(৪)

রন্তিদেবের উপাখ্যান

অতঃপর শ্রীশুকদেব পুরুবংশীয় রাজা দুষ্মন্তের ইতিহাস বর্ণনাকালে তাঁহার শকুন্তলার সহিত পরিণয় এবং তাঁহার পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী ভরতের কথা বিবৃত করিলেন। ভরতবংশীয় ভক্তপ্রবর রন্তিদেবের মহিমা ইহলোক এবং পরলোকে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহার অতিথিসেবা জগতে বিস্ময়কর। একবার নিজে ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত ও মৃতপ্রায় হইয়াও

রন্তিদেব অন্ন ও জল অতিথিগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। রন্তিদেব বলিয়াছিলেন,

> ন কাময়েহহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা
> আর্ত্তিং প্রপদ্যেহখিল দেহভাজাং অন্তঃস্থিতো যেন
> ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥ ৯।২১।১২

—আমি ভগবানের নিকট অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি অথবা মোক্ষও পাইতে ইচ্ছা করি না। আমি যেন জন্মে জন্মে দেহীগণের অন্তরের দুঃখ অনুভব করিয়া তাহাদিগের দুঃখ দূর করিতে পারি।

রন্তিদেবের এই সঙ্কল্প শ্রীভাগবতে প্রসিদ্ধ। ইহাই খাঁটি পরদুঃখ-কাতরতা, এবং এইরূপ পরদুঃখানুভূতি শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা বলিয়া অন্যত্র কথিত হইয়াছে। (৮।৭।৪৪)

(৫)

রাজা জ্যামঘের অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা

এই বংশীয় রাজাগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব জ্যামঘের বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করেন। জ্যামঘের পত্নীর নাম শৈব্যা। জ্যামঘ অপুত্রক ছিলেন, তথাপি স্ত্রী শৈব্যার "ভয়াৎ" ভয়ে অন্য পত্নী গ্রহণ করেন নাই। একদিন ঘটনাচক্রে কোন এক শত্রুকে পরাজিত করিয়া তাহার গৃহ হইতে জ্যামঘ ভোজ্যা নাম্নী এক কন্যাকে হরণ করিয়া আনিতেছিলেন। তখন এক কৌতুককর ঘটনা সংঘটিত হইল।

> রথস্থাং তাং নিরীক্ষ্যাহ শৈব্যা পতিমমর্ষিতা,
> কেয়ং কুহক, মৎস্থানং রথমারোপিতেতি বৈ ॥
> স্নুষা তবেত্যভিহিতে স্ময়ন্তী পতিমব্রবীৎ,
> অহং বন্ধ্যা অসপত্নীচ স্নুষা মে যুজ্যতে কথম্ ॥ ৯।২৩।৩৬,৩৭

—শৈব্যা দেখিলেন, রথে পতির বামপার্শ্বে এক অপরিচিতা সুন্দরী বসিয়া আছেন। বাঘিনী শৈব্যা স্বামীর নূতন-স্ত্রী-উপভোগ-পিপাসা বুঝিতে পারিয়া পতিকে বলিলেন,—হে বিশ্বাসঘাতক, কাহাকে তুমি রথে আমার উপবেশন-যোগ্যস্থানে বসাইয়া এখানে আনিয়াছ? জ্যামঘ চুপিচুপি বৃহৎ অন্তঃপুরের কোথাও ভোজ্যাকে রাখিয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ বাঘিনী স্ত্রীর নিকট ধরা পড়িয়া গিয়া নবীনা স্ত্রী উপভোগের ইচ্ছা মনের মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল এবং ভয়ে ভ্যাবাচাকা খাইয়া শৈব্যাকে বলিয়া ফেলিলেন,—স্নুষা তব—'এই মেয়েটি তোমার পুত্রবধূ।' ব্যাপার জটিল হইয়া দাঁড়াইল—শৈব্যা ত বন্ধ্যা! বন্ধ্যার আবার পুত্রবধূ! শৈব্যা বিস্মিত হইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—আমি বন্ধ্যা, আমার সপত্নীও নাই, তবে পুত্রবধূ কোথা হইতে আসিল? জ্যামঘ ভয়ে ভয়ে বলিলেন, হে রাজ্ঞি, তুমি যে পুত্র প্রসব করিবে, এই কন্যা তাহারই পত্নী হইবে। শৈব্যা হয়ত সবই বুঝিতে পারিলেন, তথাপি পুত্র প্রসব করিবেন—এই আশায় বিমোহিতা হইয়া স্বামীর সম্মুখে বোকা সাজিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। পিতৃগণ ও দেবগণের আশীর্ব্বাদের ফলে শৈব্যা গর্ভ ধারণ করিয়া যথাকালে একটি পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। শ্রীশুকদেব বলিলেন, ঐ কুমার বিদর্ভনামে পরিচিত হইয়া ভোজ্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং জ্যামঘের স্ত্রী হইতে আসিয়া ভোজ্যা ভাগ্যচক্রে জ্যামঘের পুত্রবধূ হইয়া দাঁড়াইলেন।

অতঃপর শ্রীশুকদেব নবম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে বিদর্ভবংশ বর্ণনা করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন যে, আহুকের দুই পুত্র—দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের সাত কন্যার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গর্ভধারিণী জননী বলিয়া দেবকী ভাগবতে প্রসিদ্ধা। বসুদেব এই সাতজন কন্যাকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। উগ্রসেনের নয়জন পুত্র, তাহাদের মধ্যে কংস শ্রীকৃষ্ণের

সহিত বিদ্বেষ করিয়া ভাগবতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন,—"অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল"—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরিই তাঁহাদের অষ্টম পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এইরূপে নবম স্কন্ধের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণের মানুষরূপে জন্মগ্রহণের কথা ইঙ্গিত করিয়া শ্রীশুকদেব বিরাট দশম স্কন্ধে অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

দশম স্কন্ধ

(১)

দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

শ্রীভাগবতগ্রন্থে দ্বাদশটি স্কন্ধের মধ্যে এই দশম স্কন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহাতে সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলা বর্ণিত হওয়ায় বৈষ্ণব সমাজে এই স্কন্ধের সমাদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন অনেক বৈষ্ণব আছেন যাঁহারা সমগ্র শ্রীভাগবতগ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলেও এই দশম স্কন্ধ হয়ত বারংবার শ্রবণ করিয়াছেন, সমগ্র ভাগবতগ্রন্থ নিজ গৃহে রক্ষা করিয়া ভক্তি-পিপাসা মিটাইবার সৌভাগ্য না পাইলেও, একমাত্র দশম স্কন্ধ গৃহে রাখিয়া এবং তাহা দর্শন, স্পর্শন এবং পঠন করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতের নিকট যখন প্রথম শ্রীভাগবতী কথা ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন, তখন রাজা পরীক্ষিতের পরমায়ুর সাতদিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব নয়টি স্কন্ধ কীর্ত্তন করিতে করিতে তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে,—অবশিষ্ট যে চারিদিন এখনও রহিয়াছে তাহার ভিতর বিরাট দশম স্কন্ধ, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ পাঠ ও শ্রবণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে সুবৃহৎ দশম স্কন্ধ নব্বইটি অধ্যায় এবং তিন হাজার নয়শত তেতাল্লিশটি শ্লোকে বিস্তৃত। এই স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণলীলা স্থূলভাবে তিন প্রকারে বর্ণনা করা হইয়াছে—ব্রজলীলা, মথুরালীলা এবং দ্বারকালীলা। গোকুলে ও বৃন্দাবনে যে লীলা তাহাই "ব্রজলীলা" নামে পরিচিত; মথুরা ও দ্বারকার লীলাকে সাধারণতঃ "পুরলীলা" বলা হইয়া থাকে।

প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে যে, শ্রীভাগবতের প্রাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলা কাহিনী গ্রন্থের এত দূরে আসিয়া পড়িল কেন? মানুষের সাধারণ

বুদ্ধিতে ইহাই মনে হয় যে প্রথম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্ম ও লীলা কাহিনী বর্ণিত হইলে সুবোধ ও সুশোভন হইত। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে পরমহংস শ্রীশুকদেবের রচনাশৈলী, বস্তু-বিশ্লেষণ ও কলাকৌশল সবই হৃদয়গ্রাহী ও সর্ব্ববিধ দোষবর্জ্জিত। নানাবিধ আখ্যান ও ধর্ম্মকথা নয়টী স্কন্ধে বলিয়া শ্রীশুকদেব পাঠকের মনকে শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন, প্রথম হইতেই যদি গভীর কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করা হইত, তাহা হইলে সাধারণ পাঠক সমস্ত বিষয়বস্তু গোলমাল করিয়া ফেলিত, ভক্তিপ্রবাহ আস্বাদন করিতে অক্ষম হইয়া লীলাকাহিনীর কূলকিনারা হারাইয়া ফেলিত। সকল জিনিষেরই একটী পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়, শ্রীকৃষ্ণ কাহিনী শ্রবণ ও ধারণা করিবার জন্য মনের একটা সঙ্কল্প যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, ভাগবত পাঠক পণ্ডিত মহাশয় কোনস্থানে ভাগবত পাঠ করিতে গিয়াছেন, গ্রাম্য কর্তৃপক্ষগণ আসিয়া আদেশ করিলেন "রাসলীলা" পাঠ করিতে হইবে। দশম স্কন্ধে বর্ণিত রাসলীলার পাঁচটী অধ্যায় শ্রীভাগবত গ্রন্থে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল, সকলের এই রাসলীলা শ্রবণ করিবার অধিকারও নাই, ধারণা করা ত বহুদূরের কথা। কিন্তু শ্রোতাগণ শ্রীভাগবতের অন্য কিছুই না জানিলেও, "রাসলীলা" কথাটী লোক মুখে শ্রবণ করিয়াছেন, সুতরাং ফ্যাসান-করা ভক্তি দেখাইবার জন্য তাঁহারা "রাসলীলা"র ফরমাস দিয়া বসিলেন। ভাগবত পাঠক মহাশয় অর্থপ্রাপ্তির আশায় ভাগবত পাঠ করিতে আসিয়াছেন, অতএব শ্রোতাগণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিবার মত নৈতিক মনোবল তাঁহার হয়ত নাই, সুতরাং সভামধ্যে তিনদিন ধরিয়া "রাসলীলা" পাঠই চলিল, জড়বুদ্ধি মানুষ যত বুঝিল বা না বুঝিল, রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের প্রেমের কাহিনী শ্রবণ করিয়া প্রচুর কাঁদিল এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। কিন্তু শুদ্ধভক্ত

একেবারে লাফাইয়া "রাসলীলা" শ্রবণ করিতে চাহেন না, তিনি "শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্"-এর যুক্তি মনে রাখিয়া ধীরে ধীরে ভাগবতের প্রথম অংশ শ্রবণ ও ধারণা করিয়া আপনাকে "রাসলীলা"র শুদ্ধাভক্তির কাহিনী শ্রবণ করিবার অধিকারী করিয়া তুলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুদ্ধভক্ত, সুতরাং মহাজ্ঞানী শ্রীশুকদেব ধীরে ধীরে নয়টী স্কন্ধে পরীক্ষিতের চিত্তশুদ্ধি সাধন করিয়া তবে দশম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই দশম স্কন্ধে গোপীগণের যে আকুতি ও বিরহ জ্বালা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমরা কি করিয়া সহজে ধারণা করিতে পারিব! ইলেকট্রিক ফ্যানের নীচে গালিচা আঁটা চত্বরে বসিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণবিরহ গাথা শ্রবণ করি, মধ্যে মধ্যে আহাঃ উহঃ শব্দ করিয়া রুমালে চোখ মুছিয়া ভক্তির ভাণ করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগণের অর্দ্ধস্খলিত অঙ্গবেশ, তাঁহাদের বক্ষের হাহাকার ধ্বনি; লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিয়া ধূলিময় পথে শ্রীকৃষ্ণের রথের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছেন, পতিপুত্র কোথায় পড়িয়া রহিল, সে চিন্তা একবারও মনের ভিতর উদিত হইতেছে না, তাঁহাদের সমগ্র দেহ মন ও পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে;—ইলেকট্রিক ফ্যান সেবন করিতে করিতে রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া সেই কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীদের বিরহের জ্বালা অনুভব করা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেহত্যাগ করিয়াছেন, ভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী বিরহবিধুর মন লইয়া বৃক্ষতলে শ্রীচৈতন্য চিন্তায় নিমগ্ন। একটি শুষ্ক পাতা বৃক্ষ হইতে স্খলিত হইয়া সনাতনের বক্ষের উপর পড়িবামাত্র পাতাটী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীচৈতন্যবিরহপ্রসূত সনাতনের বুকের আগুন তখন মানুষ বুঝিতে পারিল। তাই পরমহংস শ্রীশুকদেব পূর্ব্ব পূর্ব্ব নয়টী অধ্যায়ে মানুষের মনকে শ্রীকৃষ্ণচিন্তনে অভ্যস্ত করিলেন, ভগবৎমুখী করিলেন, তাহার পর মহারাজ পরীক্ষিৎকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। যে

মানুষ খানাডোবাতেই সাঁতার দিতে শিখে নাই, তাহার পক্ষে একেবারে সমুদ্র দর্শন এবং সমুদ্রে অবগাহন আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী। তাই শ্রীকৃষ্ণলীলা ভাগবতের প্রথমেই সংযোজিত হয় নাই, মহাজ্ঞানী, মহাকবি শুকদেব শ্রীকৃষ্ণলীলাকে দশম স্কন্ধে আনিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং সমগ্র জগদ্‌বাসীর অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন।

দশম স্কন্ধে প্রথম চারিটি অধ্যায়ে ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভূ-ভারহরণার্থ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং পঞ্চম অধ্যায় হইতে উনচল্লিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্রজলীলা, চল্লিশ অধ্যায়ে যমুনাজলমধ্যে অক্রূর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি, একচল্লিশ অধ্যায় হইতে একান্ন অধ্যায় পর্য্যন্ত মথুরালীলা এবং বাহান্ন অধ্যায় হইতে নব্বই অধ্যায় পর্য্যন্ত দ্বারকালীলা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শ্রীভগবানের লীলা দ্বিবিধ—ঐশ্বর্য্যময়ী এবং মাধুর্য্যময়ী। যে লীলায় শ্রীভগবান্ কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করেন না, কিংবা কাহারও সহিত পিতা, মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সম্বন্ধ স্থাপিত করেন না, কেবলমাত্র নিজ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে ভক্তমনোরথ পরিপূর্ণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হন, শ্রীভগবানের সেই লীলা ঐশ্বর্য্যময়ী। শ্রীনৃসিংহদেব এই ঐশ্বর্য্যময়ী লীলার প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি। কিন্তু যে লীলায় শ্রীভগবান্ প্রাকৃত মানুষের মত জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতামাতা প্রভৃতি নানাবিধ আত্মীয় সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া ভক্তমনোরথ পূরণ করেন, সেই লীলা মাধুর্য্যময়ী। সর্ব্বরসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এই মাধুর্য্যময়ী লীলার অপূর্ব্ব উদাহরণ। এই দশম স্কন্ধে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, পূতনাবধ, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, বকাসুর, অঘাসুর, ধেনুকাসুর বধ, কালিয় দমন, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, গোবর্দ্ধন ধারণ, রাসলীলা, মথুরাগমন, কুব্জার বাঞ্ছাপূরণ, কংসবধ, দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ, রুক্মিণী হরণ, জরাসন্ধ বধ, শিশুপাল বধ, শ্রীদাম নামক ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহ প্রভৃতি ঘটনাবলী প্রধানতঃ বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে তিরোধান পর্য্যন্ত সমগ্র লীলা একশত পঁচিশ বৎসর

পর্য্যন্ত ব্যাপী—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়া একশত পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। দশম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলা ভাব, ভাষা ও রসসমন্বয়ে অপরাপর অবতারগণের লীলা অপেক্ষা মধুর ও আশ্চর্য্যজনক। তাই সাধারণতঃ "শ্রীকৃষ্ণ" নাম এবং "শ্রীকৃষ্ণলীলা"র শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া ভক্তগণ বলিয়া থাকেন "রসেন উৎকৃষ্যতে কৃষ্ণঃ"—সর্ব্ব রসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নাম ও শ্রীকৃষ্ণলীলাই সর্ব্ব ভগবৎনাম ও সর্ব্ব ভগবৎলীলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন ঃ—

কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে,
কানাকড়ি ছিদ্রসম জানিহ সেই শ্রবণ
তার জন্ম হইল অকারণে।

প্রথম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অবতারের কারণ বর্ণনা পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের লৌকিক পিতা ও মাতা বসুদেব ও দেবকীর কারাবাসের ইতিবৃত্ত প্রদান করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রথম দুইটি শ্লোকে রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিবার জন্য কৌতুহল প্রকাশ করিয়া বলিলেন,

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ
রাজ্ঞাঞ্চোভয় বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥
যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম,
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ ॥ ১০।১।১,২

—হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনি চন্দ্র ও সূর্য্যের বংশাবলী বর্ণনা করিয়াছেন, সেই উভয় বংশীয় রাজগণের অত্যাশ্চর্য্য চরিত্রকথা এবং সতত ধর্ম্মশীল যদুর বংশাবলীও বর্ণনা করিয়াছেন। এক্ষণে সেই যদুবংশে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত চরিত্রের কিয়দংশ আমার নিকট বর্ণনা করুন; ভগবানের

লীলা অনন্ত, সুতরাং তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা আপনার পক্ষে সম্ভবপর হইলেও আমার পক্ষে তাহা ধারণা করা অসম্ভব।

দশম স্কন্ধের প্রথম এই শ্লোক দুইটি ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই শ্লোক দুইটির ভিতর দিয়া প্রথমেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মৃত্যুপথযাত্রী রাজা পরীক্ষিতের মনে শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণের একটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছে,—এই ব্যাকুলতা না থাকিলে ধর্ম্মকথা শ্রবণ বৃথা, যতদিনই শ্রবণ করা যাউক না কেন, গ্রহণ করিবার, অনুভব করিবার প্রকৃত অবস্থার অভাবে সমস্ত ধর্ম্মকথাই কোথায় ভাসিয়া যায়, মনে লেশমাত্র লাগিয়া থাকে না। ভাগবতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আজ চতুর্থ দিবসে পরীক্ষিতের মনে প্রবল কৌতূহলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার লোভের সীমা নাই, তিনি আরও শুনিবার জন্য আগ্রহশীল! সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকথা আত্মসাৎ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত, কিন্তু বুদ্ধিমান্ রাজা বুঝিতেছেন যে, তিনি চিরজীবন বিষয়-ভোগ করিয়াছেন, আজ হঠাৎ যদি শ্রীকৃষ্ণলীলা শুকদেব সমগ্রভাবেই বর্ণনা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সময়-সংক্ষেপের জন্য মাত্র চারদিনের ভিতর সে লীলাকথার একটা সমগ্ররূপ ধারণা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। যদিও বা চারদিনের ভিতর সমগ্র লীলাকথা বর্ণনা করা ভক্তচূড়ামণি সতত-শ্রীকৃষ্ণসমাহিত শুকদেবের পক্ষে সম্ভবপর হয়, তথাপি সেই সমগ্রকথা গ্রহণ করা, উপলব্ধি করা বিষয়ভোগী রাজার পক্ষে অসম্ভব। যথেষ্ট গ্রহণ করিবার জন্য দীর্ঘকালব্যাপী সাধন ভজন প্রয়োজন, বিষয়বিরক্ত মন প্রয়োজন। এখনও তো মধ্যে মধ্যে বিষয়বাসনা পরীক্ষিতের হৃদয় হইতে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, আবার শ্রীশুকদেবের অগ্নিবর্ষী সর্ব্বতত্ত্বভেদী দৃষ্টির নিকট ভীত ও লজ্জিত হইয়া রাজার বিষয়বাসনা লুকাইয়া পড়িতেছে। অতএব বেশী লোভ করা রাজার পক্ষে উচিত নয়, শ্রীকৃষ্ণলীলা সবটাই শুনিতে যাইয়া তিনি কি সবটাই হারাইয়া

ফেলিবেন! তাহার চেয়ে "অংশেন"—শ্রীকৃষ্ণলীলার অংশমাত্র শ্রীশুকদেব বর্ণনা করুন, যাহাতে পরীক্ষিৎ কিয়দংশমাত্র উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়া যান—গীতার ভাষায় 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ,'—এই মহাধর্ম্মের কণামাত্র শ্রবণ করিলে, অনুধাবন করিলে, পরীক্ষিৎ মহান্ মৃত্যুভয় হইতে রক্ষা পাইবেন।

এই শ্লোক দুইটির ভিতর দিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রাজা পরীক্ষিৎ শুধু আগ্রহশীল নহেন, তিনি বিনয়ী, হরিকথায় শ্রদ্ধাশীল, তিনি শ্রীশুকদেবের নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, তীব্র আগ্রহ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি হইতে আসিয়া থাকে, বিষয়বস্তু জানিবার জন্য বুদ্ধির একটা নিছক কৌতূহল মাত্র, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া মনকে তদাকারকারিত করিবার কোনও আধ্যাত্মিক চেতনা নাই। কিন্তু রাজা পরীক্ষিৎ হরিকথা উপলব্ধি করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছেন। শ্রীশুকদেব নবম স্কন্ধের শেষ ভাগে শ্রীকৃষ্ণ অবতারের কথা উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে শেষ দুইটি শ্লোকে সমগ্র কৃষ্ণলীলার ইঙ্গিত করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন।

> জাতো গতঃ পিতৃগৃহাৎ ব্রজমেধিতার্থো হত্বা রিপূন্
> স্যুতশতাতিকৃতোরুদারঃ
> উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে আত্মানমাত্মনিগমং
> প্রথয়ন্ জনেষু ॥
> পৃথ্ব্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরূণামন্তঃ সমুত্থকলিনা
> যুধি ভূপচম্বঃ,
> দৃষ্ট্যা বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য প্রোচ্যোদ্ধবায় চ
> পরং সমগাৎ স্বধাম ॥ ৯।২৪।৬৬,৬৭

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় চতুর্ভুজরূপে কংসকারাগারে আবির্ভূত হন; পরে সাধারণ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া পিতৃকারাগৃহ হইতে

ব্রজধামে গমন করেন। তথায় তিনি ব্রজবাসিগণের বহু প্রয়োজন সাধন করিয়া শত্রুগণকে সংহার করেন। অনন্তর তিনি বহু দারপরিগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত পত্নীতে শতশত পুত্র উৎপাদন করেন এবং জনসমাজে বেদমার্গ প্রচার করিয়া বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিজেই নিজের পূজাপদ্ধতি প্রচলিত করেন।

অনন্তর কুরুদিগের মধ্যে যে কলহ উপস্থিত হয়, তাহাকে তিনি নিমিত্ত করিয়া রাজাগণের সৈন্যসমূহ সংহারকরতঃ পৃথিবীর গুরুভার হরণ ও অর্জ্জুনের জয় ঘোষণা করেন। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতার তত্ত্বকথা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর লীলার অবসান সময়ে উদ্ধবকে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও যোগকথা শ্রবণ করাইয়া তিনি লীলা সংবরণ পূর্ব্বক নিজধামে প্রস্থান করেন।

নবম স্কন্ধের এই শেষ দুইটি শ্লোক হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শ্রীশুকদেব সংক্ষেপে সমগ্র শ্রীকৃষ্ণলীলার ইঙ্গিত পূর্ব্বেই পরীক্ষিৎকে প্রদান করিয়া দশম স্কন্ধের প্রথমেই নির্ব্বাক্ ও নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। এখন যদি রাজা পরীক্ষিৎ হরিকথায় শ্রদ্ধাশীল হইয়া বিনয়ের সহিত আত্মনিবেদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা "অংশেন" কিয়দংশমাত্র অথচ "বিস্তরাৎ"—সেই কিয়দংশই বিশদভাবে, নিগূঢ়ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য প্রশ্ন করেন তবেই শ্রীশুকদেব পুনরায় হরিকথা বলিতে আরম্ভ করিবেন। শ্রোতা যদি আগ্রহশীল না হন, শ্রোতা যদি গ্রহণ করিবারউপযুক্ত না হন, শ্রোতা যদি ধারণ করিবার জন্য মনকে প্রস্তুত না রাখিতে পারেন, তাহা হইলে বক্তা সেইরূপ শ্রোতার নিকট ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করেন না,—শ্রীকৃষ্ণলীলার অবসানকালে স্বয়ং ভগবান্ উদ্ধবকে সমস্ত ধর্ম্মকথা শ্রবণ করাইয়া এই উপদেশই প্রদান করিয়াছিলেন।

> নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ
> অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্ব্বিনীতায় দীয়তাম্ ॥ ১১।২৯।৩০

—হে উদ্ধব, তুমি এই ধর্ম্মতত্ত্ব নাস্তিক, শঠ, শ্রবণে অনিচ্ছুক, অভক্ত ও অবিনীত ব্যক্তিকে উপদেশ করিও না।

গীতায় ঠিক অনুরূপ আদেশই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাই সর্ব্বদর্শী শ্রীশুকদেব যেন রাজা পরীক্ষিতের মনের ভাব রাজার নিজের মুখ হইতে শুনিবার জন্য নবম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণকথার ইঙ্গিত করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন—রাজা পরীক্ষিৎ আরও লীলাকথা শ্রবণ করিতে আগ্রহশীল হইলে তবেই শ্রীশুকদেব সবিস্তারে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিবেন, নতুবা এইখানেই ভাগবতী কথার পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া যাইবে। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে দয়া করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিয়া বহু ধর্ম্মকথা তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, এখন রাজা পরীক্ষিতের মন ভগবৎমুখী হওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষিতের কঠোর পরীক্ষা! মহাভাগ্যবান্ বিষ্ণুরাত এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন,—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'—প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা ও সেবা-দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞান জিজ্ঞাসা কর—অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ রাজা পরীক্ষিৎ পালন করিলেন, তাই শ্রীশুকদেব অসীম কৃপাপরবশ হইয়া আনন্দ আস্বাদন করিয়া অনুগত শিষ্যকে আনন্দ প্রদান করিয়া, আপনি দশম স্কন্ধে নূতন করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা আরম্ভ করিলেন। "বিষ্ণোর্বীর্য্যানি শংস নঃ"—শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা আরও বলুন—রাজা পরীক্ষিৎ যদি এই কথা না বলিতেন, তাহা হইলে হয়ত নবম স্কন্ধেই শ্রীভাগবতী কথা শেষ হইয়া যাইত; ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা হইতে বঞ্চিত হইতেন। আজ যে আমরা সবিস্তারে শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাহা রাজা পরীক্ষিতের প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্নের জন্য—সুতরাং সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ রাজা পরীক্ষিতের নিকট ঋণী, রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের নিকট কৃতজ্ঞ।

এই শ্লোক দুইটিতে আরও লক্ষ্য করিবার কথা আছে। রাজা পরীক্ষিৎ চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের বিষয় উল্লেখ করিবার সময় "সোমসূর্য্যয়োঃ" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে শ্রেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ-বাচক পদে দ্বন্দ্ব সমাস হইলে শ্রেষ্ঠ বাচক পদই পূর্ব্বে থাকে। চন্দ্র উপগ্রহ এবং সূর্য্য গ্রহ, সূর্য্যের আলোকে চন্দ্র আলোকিত হইয়া জগৎ আলোকিত করেন, চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্য আয়তনেও অনেক বড়,—এই সকল প্রাকৃত বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয় চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্যই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং চন্দ্র ও সূর্য্য পদদ্বারা সমাস করিলে "চন্দ্রসূর্য্য" না হইয়া "সূর্য্যচন্দ্র" হওয়াই উচিত, কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট "সূর্য্যসোময়োঃ" না বলিয়া "সোমসূর্য্যয়োঃ" বলিয়াছেন। কারণ সহজেই অনুমেয়। চন্দ্রবংশে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—জন্মগ্রহণ করিয়া চন্দ্রবংশকে চিরগৌরবান্বিত করিয়াছেন, সুতরাং বংশ-গৌরবে চন্দ্রবংশের স্থান সূর্য্যবংশের অনেক উর্দ্ধে। দ্বিতীয়তঃ এখানে পরীক্ষিতের মনে বংশের কথা উদিত হইতেছে না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মন অধিকার করিয়াছেন, চন্দ্রসূর্য্যবংশ কথাটি উপলক্ষ্য মাত্র, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই পরীক্ষিতের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া একমাত্র সত্যরূপে এখন বিরাজিত। রাজা পরীক্ষিতের নিকট সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই, শ্রীকৃষ্ণ মুখ্য, অপর সকলই গৌণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া চন্দ্রই এখন সূর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাই ব্যাকরণের ক্ষুদ্র নিয়ম বিস্মৃত হইয়া রাজা পরীক্ষিৎ "সোমসূর্য্যয়োঃ" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন।

আর একটি কথা এইখানে লক্ষ্য করিতে হইবে। যদুবংশের কথা উল্লেখ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ "যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং"—নিরন্তর ধর্ম্মশীল যদুর বংশ—কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু যদুর চরিত্র সাধারণতঃ মানবসমাজে ধর্ম্মশীল বলিয়া পরিজ্ঞাত নহে। তাঁহার পিতা

যযাতি শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়া নিজ জরাভার পুত্র যদুকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে যদু স্বীকৃত হন নাই, অতি সহজ ও সরলভাবে পিতার আদেশ অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। পিতার আদেশ লঙ্ঘনকারী যদুকে রাজা পরীক্ষিৎ ধর্ম্মশীল বলিয়া অভিহিত করিতেছেন,—ইহা আপাতদৃষ্টিতে বিচিত্র বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যদু ছিলেন নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণভজনশীল, এবং জরাগ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা করিয়া যদু পিতার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তাঁহার দেহ তখন শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পিত। জরাগ্রস্ত হইলে শ্রীমন্দির মার্জ্জন, পুষ্প-তুলসী চয়ন, জলকলস বহন ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কার্য্যে ব্যাঘাত হইবে, সুতরাং বৃহৎ আত্মধর্ম্মের জন্য ক্ষুদ্র সামাজিক ধর্ম্ম যদু অনায়াসে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। বিভীষণ ধর্ম্মের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ ভক্তিসাধনের জন্য পিতা হিরণ্যকশিপুর আদেশ পালন করেন নাই, ভরত শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য মাতা কৈকেয়ীর উপদেশ গ্রহণ করেন নাই, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য পতির প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন

> মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে,
> মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপঃ স্যাৎ মৎপ্রভাবতঃ ॥

—আমার প্রতি ভক্তি সাধনের জন্য সামাজিক চক্ষে পাপ করিলেও তাহা ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, আমাকে ভুলিয়া ক্ষুদ্র সামাজিক বা ব্যবহারিক ধর্ম্মসাধন পাপ-শ্রেণিভুক্ত। সুতরাং অহরহঃ শ্রীকৃষ্ণমননশীল যদুর পক্ষে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করাও অন্যায় কার্য্য হয় নাই; সুতরাং "যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং"—কথাগুলি ভক্তিমান্ যদুর প্রতি কিছুমাত্র বিচিত্র অথবা অত্যুক্তি নহে।

অতঃপর রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, আত্মস্বরূপ ভগবানের জ্ঞানে সমস্ত শোক নিবৃত্ত হইয়া যায়; যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানে পরাঙ্মুখ, সে আত্মঘাতী। আজ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাজা পরীক্ষিতের এই দিব্যদৃষ্টি হইয়াছে; তিনি বুঝিয়াছেন যে, মরণশীল মানবের পক্ষে গোবিন্দভজন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণে উৎসাহশীল রাজা প্রাণের আবেগে শ্রীশুকদেবকে বলিতেছেন,

ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ

—মূর্খ ও আত্মঘাতী মানুষ ব্যতীত কোন্ পুরুষ পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের গুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তনে বিরত হইতে পারে?

এই শ্লোকটিতে "উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ" কথাটি বিশেষ করিয়া পরিলক্ষণীয়। কথাটি শ্রীভাগবতে অসংখ্যবার শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে 'উত্তমঃ'—বিসর্গ দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা বিসর্গ নাই। একই গ্রন্থে মুদ্রাকরের অসাবধানতা বশতঃ অনেক স্থলে বিসর্গ দেওয়া অথবা বিসর্গ বাদ দেওয়ায় কথাটির ব্যাকরণসম্মত শুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিতে অসুবিধা হইয়া থাকে। 'উত্তমঃ' কথাটি কিন্তু বিসর্গ অথবা বিসর্গবর্জ্জিত উভয়রূপেই ব্যাকরণ-সিদ্ধ, যদিও অর্থের কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া যায়। 'উত্তমঃ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার 'শ্লোক" অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যাদিজনিত যশঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দীনের প্রতি অহেতুকী করুণা, দীন উদ্ধারে এত চেষ্টা, অযাচিতভাবে সর্ব্বজীবের এমন হিতসাধন শ্রীগোবিন্দ ব্যতীত অপর কেহই করেন না, সুতরাং শ্রীগোবিন্দ "উত্তম-শ্লোকঃ"। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে সমাসবদ্ধপদে বিসর্গ থাকিতে পারে না—'উত্তমঃ শ্লোকঃ যস্য সঃ'—উত্তমশ্লোকঃ। অন্য বানানও কোন কোন হস্তলিখিত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। 'উত্তমঃ' অর্থাৎ উৎ অর্থাৎ উৎকীর্ণং তমঃ যেভ্যঃ তে—যাঁহারা তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের বাহিরে অবস্থিত তাঁহারা উত্তমঃ। ব্রহ্মা, শিব, অনন্তদেব প্রভৃতিকে

শাস্ত্রকারগণ 'উত্তমঃ' বলিয়া থাকেন। উত্তমঃগণও শ্রীগোবিন্দের যশঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'উত্তমশ্লোকঃ'। এই দ্বিবিধ বানানই বিভিন্ন হস্তলিখিত গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, টীকাকারগণ কেহ বা প্রথমটি, কেহ বা দ্বিতীয়টি গ্রহণ করিয়া শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য তুইটির মধ্যে তত্ত্বগত কোনও প্রভেদ নাই। অতএব 'উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ' এবং 'উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ' এই উভয়বিধ পাঠই ব্যাকরণসিদ্ধ।

রাজা পরীক্ষিতের সমগ্র মন অধিকার করিয়া তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, সুতরাং যুগপৎ বহু প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হইতেছে,— শ্রীকৃষ্ণ কি কারণে পিতৃগৃহ হইতে ব্রজে গমন করিয়াছিলেন, ব্রজে এবং মথুরাতে তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, মাতুল, সুতরাং বধের অযোগ্য, কংসকে তিনি কেন বধ করিলেন, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ কত বৎসর ছিলেন, তাঁহার কতজন পত্নী?—এইরূপ বহুবিধ প্রশ্নই আজ শ্রীকৃষ্ণ-ভাবেভাবিত রাজার মনে স্বভাবতঃই উদিত হইতেছে। রাজা শ্রীশুকদেবের নিকট মনের এইরূপ কৌতূহল নিবেদন করিয়া বলিলেন,

এতদন্যচ্চ সর্ব্বং মে মুনে, কৃষ্ণবিচেষ্টিতম্
বক্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ, শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতম্ ॥
নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজ-চ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥ ১০।১।১২,১৩

—হে মুনে, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহা জিজ্ঞাসা করি নাই অথচ জানা প্রয়োজন, সেই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা আপনি শ্রদ্ধাশীল আমার নিকটে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

—হে ব্রহ্মন্, আপনার মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হরিকথামৃত পান করিতেছি বলিয়া জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও দুঃসহ ক্ষুধা আমাকে পীড়িত করিতে পারিতেছে না।

এই শ্লোক দুইটিতে পরীক্ষিৎ শুকদেবের শরণাপন্ন হইতেছেন এবং তিনি কৃষ্ণলীলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল,—অতএব উপযুক্ত শ্রোতা—তাহাও শ্রীশুকদেবের নিকট নিবেদন করিতেছেন। "শ্রদ্দধানায়"—রাজা শ্রদ্ধাশীল, সুতরাং উপযুক্ত শ্রোতা,—ভাগবতী কথা শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও শুনিবার অধিকার নাই, পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধাশীল শ্রোতা ব্যতীত অপর কাহারও নিকট এই হরিকথা কীর্ত্তন করেন না, তাহা পরীক্ষিৎ জানেন; উপরন্তু রাজা পরীক্ষিৎ আজ দেহ ভুলিয়া আত্মার শক্তিতে উদ্বুদ্ধ,—মানবশরীরের সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর অনুভূতি—ক্ষুধা—তাহাই আজ রাজা বিস্মৃত হইয়াছেন; আজ দেহধর্ম্ম বিলুপ্ত ও অবজ্ঞাত, আত্মধর্ম্ম ক্রিয়াশীল ও সচেতন। এইরূপ শ্রোতাই হরিকথা শ্রবণ করিবার অধিকারী, এইরূপ শ্রোতার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করা সার্থক, এইরূপ শ্রোতাকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দিত হইয়া থাকেন। রাজা পরীক্ষিতের হৃদয়ভূমি প্রস্তুত, এখন শ্রীশুকদেব হরিকথাবীজ বপন করিলেই মৃগয়াসক্ত, বিষয়াসক্ত উষর হৃদয়ও ভক্তিসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

শ্রীশুকদেব শ্রীভাগবতী কথা কীর্ত্তন করিতে গঙ্গাতীরে আসিয়াছেন, কিন্তু রাজা পরীক্ষিতের এই আত্মনিবেদন পরীক্ষা করিবার জন্যই তিনি স্থির হইয়া এতক্ষণ বসিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাশীল শ্রোতা ব্যতীত অপর কাহারও ভাগবতী কথা শ্রবণ করিবার অধিকার নাই; সুতরাং রাজাকে শ্রদ্ধাশীল জানিতে পারিয়া এইবার শ্রীশুকদেব ভাগবতী কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলেন,

> সম্যগ্‌ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
> বাসুদেব কথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ॥
> বাসুদেব কথাপ্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনাতি হি,
> বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা॥ ১০।১।১৫,১৬

—হে রাজর্ষি, আপনার কৃষ্ণলীলায় গাঢ় আসক্তি জন্মিয়াছে, সুতরাং বুদ্ধি স্থির হইয়া শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিবার জন্য আপনাকে আগ্রহশীল করিয়া তুলিয়াছে।

—যেমন শ্রীকৃষ্ণ পাদোদ্ভূতা গঙ্গা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই তিন লোককে পবিত্র করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রশ্ন,—প্রশ্নকর্ত্তা, প্রশ্নোত্তর-দাতা এবং প্রশ্নোত্তর-শ্রোতা—এই তিন ব্যক্তিকেই উদ্ধার করিতে সমর্থ।

এই শ্লোক দুইটি যদিও সাক্ষাৎভাবে রাজা পরীক্ষিতের উদ্দেশে কথিত হইয়াছে, তথাপি কথাগুলি পরোক্ষভাবে সেই ধর্ম্মসভাস্থ মুনিঋষি ভক্ত জ্ঞানী সকলেরই প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। কথাগুলি শ্রীশুকদেবের উপদেশ। মানবজীবনের একমাত্র সার্থকতা "বাসুদেবকথায়াং নৈষ্ঠিকী রতিঃ"—বাসুদেবলীলাকথায় নির্ম্মল রতি। যাঁহার বাসুদেবকথায় আসক্তি জন্মে নাই, তিনি বেদ বেদান্ত পুরাণ শাস্ত্র যতই অধ্যয়ন করুন না কেন, তাঁহার মনুষ্যজন্ম নিরর্থক। এই বাসুদেবকথায় রতি জন্মিলে তবে মানুষের বুদ্ধি স্থির হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়,—শ্রীকৃষ্ণকথায় আগ্রহশীল মানুষই বুদ্ধিমান্—অপর সকলে শাস্ত্র পড়িলেও মূর্খশ্রেণীভুক্ত। স্বভাবতঃ চঞ্চল মন একবার শ্রীকৃষ্ণরসের সন্ধান পাইলে সেইখানেই মধুমক্ষিকার ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া পড়ে, আর গুন্‌গুন্ করে না, আর তখন ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে না। সেই গঙ্গাতীরে উপস্থিত মুনিঋষিগণ, গৃহীভক্তগণ নিজ নিজ ধর্ম্মসাধনার ফল এই কষ্টি-পাথরে ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়া লউন,—বাসুদেব-কথায় তাঁহাদের নৈষ্ঠিকী রতি হইয়াছে কিনা, বুদ্ধি সম্যক্‌ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা! শ্রীশুকদেব আরও ইঙ্গিত করিতেছেন যে, সেই সভায় বহু বৃদ্ধ অতিবৃদ্ধ ঋষি, মুনি ও গৃহী সমবেত হইয়াছেন কিন্তু এই দীর্ঘ জীবন নিরর্থক, এমন কি দীর্ঘজীবনব্যাপী শাস্ত্রপাঠ ও সাধনভজনও নিরর্থক,

যদি সাধনভজন ও শাস্ত্রপাঠের পরিপাকে বাসুদেবকথায় তাঁহাদের রুচি উৎপন্ন না হইয়া থাকে। যদি দীর্ঘ আয়ু মানুষকে হরিকথা শ্রবণ করিতে প্রণোদিত না করে, যদি দীর্ঘ আয়ু বৃথা শাস্ত্রপাঠ, বৃথা বিষয়কর্ম্মেই অতিবাহিত হইয়া যায়, তবে সেই দীর্ঘ আয়ু বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রীশুকদেব আরও ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আজ কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিয়া কেবলমাত্র শ্রীশুকদেব ধন্য নহেন, প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করিয়া কেবলমাত্র রাজা পরীক্ষিৎই কৃতার্থ নহেন, পরোক্ষভাবে শ্রবণ করিয়া সমবেত ঋষি, মুনি, গৃহী, ভক্ত, জ্ঞানী সকলেই আজ ধন্য ও পবিত্র হইয়া যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা প্রবাহিত হইতেছে, যে এই ধর্ম্ম-স্রোতে অবগাহন করিবে, সেই মুক্ত হইয়া যাইবে—কেবল গ্রহণ করিবার অপেক্ষা;—একবার কৃষ্ণমুখী হইয়া মন যদি এই লীলাকথা শ্রবণ করে, শরীরকে সভাস্থলে রাখিয়া মনকে বিপরীতমুখী না করিয়া রাখে,—গঙ্গাবারি নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া আপনার উত্তপ্ত দেহ লইয়া একবার সেই শীতল বারিতে অবগাহন করে, তাহা হইলেই তাহার মানবজন্ম কৃতার্থ হইয়া যাইবে, তাহার মৃত্যুভয় নিবারিত হইবে। তাই এই শ্লোক দুইটি সভায় সমবেত সাধু, মুনি, ঋষি, গৃহী, ভক্ত ও জ্ঞানীর প্রতি শ্রীশুকদেবের করুণার বাণী, বজ্রনির্ঘোষের মতই সুস্পষ্ট ও হৃদয়স্পর্শী।

এইরূপে বক্তা পরম ভাগবত শ্রীশুকদেব ও শ্রোতা পরম শ্রদ্ধাশীল বিষ্ণুরাতের মধ্যে অন্তরের একটা বোঝাপড়া হইয়া যাইবার পর এই অধ্যায়ে সপ্তদশ শ্লোক হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রত্যক্ষভাবে আরম্ভ হইতেছে।

> ভূমির্দৃপ্ত নৃপব্যাজ—দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ,
> আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥
> গৌর্ভূর্ত্বাশ্রুমুখী খিন্না রুদন্তী করুণং বিভোঃ,
> উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং স্বমবোচত ॥ ১০।১।১৭,১৮

—শাস্ত্র মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী রাজবেশধারী দৈত্যগণের এবং তাহাদের অসংখ্য সৈন্যসামন্তের ভারে পীড়িতা হইয়া পৃথিবী ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন।

—পৃথিবী শীর্ণকলেবর গোরূপ ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট নিজ দুঃখবৃত্তান্ত বলিলেন।

ইহাই শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মুখ্য কারণ। শ্রীভগবানের লীলা দ্বিবিধ, প্রকট এবং অপ্রকট। যখন ভগবানের লীলা পৃথিবীর জীবের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন প্রকটলীলা, এবং যখন ব্রহ্মাণ্ডের জীবের অগোচরে হয়, তখন অপ্রকটলীলা। বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়া একশত পঁচিশ বৎসর প্রকটলীলা সম্পাদন করেন। অপ্রকটলীলায় শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যধামে নিত্য-পার্ষদগণের সহিত নিত্য-বিহার করিয়া থাকেন। গীতায় বলা হইয়াছে, "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্"—যখনই পৃথিবীতে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই শ্রীনারায়ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর গ্লানি অপহরণ করিয়া থাকেন। তাই শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা বলিবার প্রারম্ভেই শুকদেব তদানীন্তন পৃথিবীর কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই বর্ণনা করিলেন। পৃথিবী যখন পাপভারে জর্জ্জরিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট তাঁহার দুঃখ নিবেদন করিলেন, তখন ব্রহ্মা পরমপুরুষের বাণী শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ জনিষ্যতে"—সাক্ষাৎ পরমপুরুষ বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা পোষণের জন্য 'সুরস্ত্রিয়ঃ' অর্থাৎ দেবরমণীগণ গোপীরূপে এবং বলরাম শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন। আরও আসিবেন যোগমায়া,—যুগে যুগে—শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যসহচরী।

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ,
আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥ ১০।১।২৫

—যাঁহার মায়ায় জগৎ বিমোহিত, সেই ভগবতী যোগমায়া প্রভু বিষ্ণুর আদেশে প্রভুর কার্য্যসিদ্ধির জন্য অংশরূপে অবতীর্ণা হইবেন।

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভাবের কথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘোষিত হইয়া গেল।

এখন এই ব্রহ্মঘোষণার কয়েকটি কথা আমাদের বুঝিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ, আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় গোপীগণ কেহই সামান্যা মানবী নহেন,—বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি, দেবতাকন্যা এবং নিত্যসিদ্ধা গোপীবর্গই এই লীলার পরিকর। দ্বিতীয়তঃ, প্রভু সঙ্কর্ষণ বলরামরূপে এই লীলাভূমিতে অবতীর্ণ,—তিনি কখনও কৃষ্ণ ছাড়া থাকিতে পারেন না। শ্রীভগবান্ যখন রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ, তখন সঙ্কর্ষণ লক্ষ্মণরূপে তাঁহার সেবা করিতেছেন, মহাপ্রলয়ের পর শ্রীভগবান্ যখন সমগ্র বিশ্ব আত্মসাৎ করিয়া মহাসমুদ্রে শয়ন করেন তখন সঙ্কর্ষণ শেষরূপে তাঁহার শয্যা হইয়া প্রভুর নিকটেই ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করেন। তৃতীয়তঃ বিষ্ণুর মায়া—যোগমায়াও আসিতেছেন। কোন কোন টীকাকার যোগমায়া ও মায়া পৃথক্ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহারা উন্মুখ, তাঁহাদের মোহনকারিণী "যোগমায়া" এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাহারা বিমুখ, তাহাদের মোহনকারিণী "মায়া"। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবহির্মুখ কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি অসুরগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং তাহারা মায়ামুগ্ধ। আবার ব্রজবাসী গোপগোপীগণও শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, তাঁহারা কেহ পুত্র, কেহ সখা, কেহ প্রাণবল্লভ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ ভাবানুসারে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সুতরাং মায়া কৃষ্ণোন্মুখ ও কৃষ্ণবিমুখ উভয়কেই সমভাবে মোহন করিতে সমর্থ। অবশ্য ক্ষেত্র ও কার্য্যের প্রভেদে এই মোহনের কিছু বিশেষত্ব আছে। কৃষ্ণোন্মুখগণ

কৃষ্ণমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণমাধুর্য্য ও সেবানন্দ আস্বাদন করেন এবং কৃষ্ণ-বিমুখগণ কৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত হইয়া কৃষ্ণ ভুলিয়া বিষয়কণ্টক চর্ব্বণ করেন। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই মোহন হইলেও বিশেষত্বের জন্য মায়াকে দুইভাগে বিভক্ত অথবা দুই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। সেইজন্য জনৈক প্রসিদ্ধ টীকাকার বলিয়াছেন—"উন্মুখ-মোহনকারিণী যোগমায়া এবং বিমুখ-মোহনকারিণী মায়া।" এই বিষয়ে টীকাকারগণ বহু তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন। মূলকথা এই যে, যোগমায়াই প্রধানা, মায়া তাঁহারই অংশবিশেষ।

এইরূপ ব্রহ্ম ঘোষণার কিছুকাল পরে শূরসেনের পুত্র বসুদেব যদুবংশীয় রাজগণের রাজধানী মথুরায় দেবকের কন্যা দেবকীকে বিবাহ করিয়া নিজ গৃহে গমন করিবার জন্য রথে আরোহণ করিলেন।

এই মথুরাপুরী মহাগৌরবময়ী নগরী—'মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ'—মথুরাপুরীতে ভগবান্ শ্রীহরি নিত্য বিরাজিত। সমগ্র মথুরামণ্ডল চৌরাশি ক্রোশব্যাপী এবং সহস্রদল পদ্মসদৃশ। তাহার মধ্যস্থলে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের স্থান, সেই স্থানই মথুরাপুরী অথবা মথুরা। শ্রীবৃন্দাবনও মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত, কিন্তু মথুরাপুরী বলিলে শ্রীবৃন্দাবন বুঝায় না, মথুরা নামক বিশিষ্ট নগরীকেই বুঝায়। এই মথুরা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহস্বরূপ। মথুরা সকামব্যক্তির সর্ব্বকামপ্রদা ও মুমুক্ষুর মুক্তিদাত্রী। পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নানাভাবে মথুরার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া বরাহপুরাণে লিপিবদ্ধ নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি মথুরার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য প্রচারিত করিতেছে।

অন্যত্র যৎ কৃতং পাপং তীর্থমাসাদ্য নশ্যতি,
তীর্থে তু যৎ কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি ॥
মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্যতি,
এষা পুরী মহাপুণ্যা যত্র পাপং ন তিষ্ঠতি ॥

—অর্থাৎ তীর্থছাড়া অন্যস্থানে যে পাপ করা হয় সেই পাপ তীর্থে গমন করিলেই ক্ষয় হইয়া যায়, কিন্তু তীর্থে অবস্থান করিয়া কোন পাপ করিলে সে পাপ বজ্রলেপের মত হয়—কিছুতেই তাহার ক্ষয় হয় না। সকল তীর্থেই এই নিয়ম ; কিন্তু মথুরার মাহাত্ম্য অন্যরূপ,—মথুরায় কোন পাপ করা হইলে মথুরাবাসের দ্বারাই সেই পাপ দূরীভূত হইয়া যায়— মথুরা মহাপুণ্যনগরী। এমনই মথুরাপুরীতে বসুদেব দেবকীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেবক ও উগ্রসেন সহোদর ভ্রাতা। দেবকের সাতটি কন্যা,— তাঁহাদের মধ্যে দেবকী সর্ব্বকনিষ্ঠা। বসুদেব সেই সাত কন্যাকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন কংস উগ্রসেনের পুত্র। সুতরাং কংস ও দেবকী পরস্পর খুড়তুতা-জাঠতুতা ভাইবোন—কংস বয়সে বড়, দেবকী কনিষ্ঠা,—চিরদিন কংস ও দেবকীর মধ্যে গভীর স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু দেবকীর বিবাহের সময় ব্যাপার অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল।

বসুদেবের সহিত দেবকীর বিবাহ মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে ; রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংস বিবাহের সময় কত ছুটাছুটি করিয়াছেন, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিজ পদগৌরব ও বংশগৌরব ভুলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজগুলি স্বহস্তে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। বসুদেবও কংসের সুপরিচিত—দেবকীর ছয়টি ভগ্নীকেই বসুদেব পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছেন,— আজিকার রাজপ্রাসাদ ও বিবাহবাসর তাঁহার মনে আনন্দের কোন উদ্বেগ সৃষ্টি করে নাই। চারিদিকে আনন্দের শান্তিময় প্রবাহ। এইবার বর ও বধূকে বিদায় দিবার সময় উপস্থিত—তাঁহারা রথে আরোহণ করিয়াছেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও সালঙ্কারা দাসী বরবধূর চারিদিকে যৌতুকস্বরূপে বিরাজ করিতেছে ; শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, স্বয়ং কংস আনন্দের উচ্ছ্বাসে সারথিকে অপসারিত করিয়া নিজেই বরবধূর রথের অশ্বগণের

বল্গাধারণ করিয়াছেন,—সে কী অপূর্ব্ব দৃশ্য, বরবধূর জীবনে সে কী অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত! হঠাৎ সকলকে চমকিত করিয়া বজ্রধ্বনি উত্থিত হইল:

অস্যাস্তামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ! ১০।১।৩৪

—রে মূর্খ কংস, তুই সারথিরূপে যাঁহাকে বহন করিতেছিস্, সেই দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান তোকে বধ করিবে।

এই অশরীরী দৈববাণী শ্রবণ করিয়া কংস স্তম্ভিত হইলেও তৎক্ষণাৎ তড়িৎগতিতে নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন—

ভগিনীং হন্তুমারব্ধঃ খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ। ১০।১।৩৫

—ভগ্নীকে বধ করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক কংস দেবকীর কেশরাশি আকর্ষণ করিলেন।

ইহাই স্বাভাবিক। দেহে আত্মবুদ্ধি মানুষ দেহকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করে, দেহের বিনাশ হইলে আপনার আত্যন্তিক বিনাশ ঘটিল বলিয়া মনে করে, সুতরাং দেহনাশের আশঙ্কা হইলেই মৃত্যুর কারণের উপর অসাধারণ ক্রোধের সৃষ্টি হয়, ক্রোধের উদয় হইলে শুদ্ধা বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়, দৈববাণীর নিগূঢ় অর্থ গ্রহণ করিবার শক্তি আর থাকে না,— পশুবুদ্ধি মানুষ মনে করে যে, প্রাণনাশের একটা কারণ দূর করিতে পারিলেই সে চিরজীবী হইয়া থাকিবে। পশুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ইহাই স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। বসুদেব শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কংসকে বলিলেন,

শ্লাঘণীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্ব্বণি ॥
মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর! দেহেন সহ জায়তে,
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥ ১০।১।৩৭,৩৮

—হে বীর, বীরগণ আপনার প্রশংসা করিয়া থাকেন,—আপনি ভোজবংশের যশোবর্দ্ধক, সুতরাং কিরূপে আপনি স্ত্রীজাতি আপনার ভগ্নীকে বিবাহোৎসবের দিনেই বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন?

—হে বীর, মৃত্যু দেহের সহিতই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে—জন্ম ও মৃত্যু একসঙ্গেই দেহের মধ্যে বাস করে। আজই হউক অথবা শতবৎসর পরেই হউক, দেহিগণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

এই দুইটি শ্লোক হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বসুদেব বুদ্ধিমান্ এবং শাস্ত্রজ্ঞানী। কংস নারীহত্যা করিতে উদ্যত, সুতরাং তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে হইলে, প্রথমেই তাঁহার প্রশংসা ও বংশগৌরব কীর্ত্তন করিতে হইবে—কংস 'শ্লাঘণীয়গুণঃ', কংস 'ভোজযশস্করঃ'। এমন লোক স্ত্রীলোক হত্যা করিতে উদ্যত, ইহা বীরগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, সেই নারী আবার ভগ্নী,—সুতরাং নারীহত্যা অত্যন্ত গর্হিত, আবার বিবাহের উৎসবের দিন, উৎসবের দিন ভ্রাতাকর্ত্তৃক ভগ্নীহত্যা, বীরকর্ত্তৃক নারীহত্যা, সর্ব্বজগতের বিস্ময়সূচক। কংস ভোজসমাজে বীর বলিয়া পরিচিত, সুতরাং বীরের মর্য্যাদাহানিকর এই কথাগুলি শুনিয়া কংস হয়ত নৃশংস কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন। যদি বীর হইয়াও আজ মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত কংস পশুর মত আচরণ করিতে উদ্যত হন তাহা হইলে তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত যে, জীবমাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জীবন ও মৃত্যু মানবদেহে পাশাপাশি চলিয়াছে, মানবদেহকে ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া দুইটিই নিবিড়ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে,—মৃত্যু একদিন হইবেই, সুতরাং সেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর ভয়ে নারীহত্যা করা কোনও বুদ্ধিমান্ লোকের উচিত নহে। কিন্তু বসুদেব কংসের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার কথাগুলি মৃত্যুভয়ে ভীত কংসের মনের উপর কিছুমাত্র রেখাপাত করিতেছে না। তখন বসুদেব কংসের মনে দয়ার উদ্রেক করিবার জন্য বলিলেন,

> এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা
> হন্তুং নার্হসি কল্যাণীমিমাং ত্বং দীনবৎসলঃ॥ ১০।১।৪৫

—এই দেবকী আপনার কনিষ্ঠা ভগ্নী এবং বালিকা, আপনার ভয়ে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অচেতনপ্রায় হইয়াছে। অতএব দীনবৎসল আপনার পক্ষে এই কল্যাণীকে বধ করা উচিত নয়।

আজ পত্নীবৎসল বসুদেব কঠিনহৃদয় কংসের নিকট কৃপার ভিখারী। পশুতেও ক্ষেত্রবিশেষে দয়া এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকে, সুতরাং পশুধর্ম্মী কংসের নিকট ইহাই বসুদেবের শেষ আশা ও প্রচেষ্টা। কিন্তু পশুর নিকট, পশুবুদ্ধি মানুষের নিকট মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর সত্য আর কিছুই নাই, সুতরাং মৃত্যুর সম্মুখে বসুদেবের সমগ্র যুক্তি, তর্ক ও আবেদন ভাসিয়া যাইল, কংস পুনরায় খড়্গ উত্তোলন করিলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বসুদেব আশু বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কংসকে বলিলেন,

> ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য, যদ্‌বাগাহাশরীরিণী
> পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্‌॥ ১০।১।৫৪

—হে সৌম্য, আকাশবাণী যাহা হইয়াছে তাহাতে দেবকী আপনার মৃত্যুর কারণ নহে, সুতরাং দেবকী হইতে আপনার কোন ভয় নাই। দেবকীর পুত্র হইতেই আপনার ভয়, আমি দেবকীর পুত্র জন্মিবামাত্র আপনার হস্তে সমর্পণ করিব, আপনার ভয়ের কোন কারণ থাকিবে না।

কংস জানিতেন বসুদেব সত্যবাদী ; সুতরাং বসুদেবের এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কংস দেবকীকে পরিত্যাগ করিলেন, বসুদেব দেবকীর সহিত নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বসুদেব ও দেবকীর শঙ্কিত দিনগুলি কোনমতে কাটিয়া যাইতে লাগিল। কংসের নিকটেই মথুরাপুরীতে বাস করিতে হইতেছে—এ যেন 'সসর্পে চ গৃহে বাসঃ'—সর্পের সহিত একই ঘরে বাস করা। কালক্রমে দেবকীর প্রতিবৎসর এক একটি করিয়া আটটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রথম পুত্র জন্মিবার পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বসুদেব

তাহাকে লইয়া কংসের হস্তে অর্পণ করিলেন। কংস বসুদেবের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া প্রীত ও নিশ্চিন্ত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে বসুদেবকে বলিলেন,

প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং ন হ্যস্মাদস্তি মে ভয়ম্
অষ্টমাৎ যুবয়োর্গর্ভাৎ মৃত্যুর্মে বিহিতঃ কিল॥ ১০।১।৬০

—এই শিশুকে আপনি লইয়া যান, ইহা হইতে আমার কোন ভয় নাই। আপনার অষ্টম সন্তান হইতেই আমার মৃত্যু হইবে বলিয়া দৈববাণী হইয়াছে।

হয়ত এইভাবেই বসুদেবের সাতটি পুত্র রক্ষা পাইতেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে অবস্থা বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। দেবর্ষি নারদ একদিন আসিয়া কংসকে বলিলেন যে, যদুবংশের সকলেই দেবতা এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচর এবং শ্রীকৃষ্ণ কংসের চিরশত্রু। পূর্ব্বজন্মে কংস কালনেমি নামক অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণু তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। দেবর্ষির এই সমস্ত কথা শুনিয়া কংস আরও ভীত হইয়া পড়িলেন, এবং দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য হইয়া দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, তাঁহাদের পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শিশুগণকে বধ করিতে লাগিলেন, যদু, ভোজ ও অন্ধকবংশীয়-গণের অধিপতি সার্ব্বভৌম রাজা পিতা উগ্রসেনকে অবরুদ্ধ করিয়া পুত্র কংস স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেশসকল শাসন করিতে লাগিলেন। শিশুবধ ও পিতৃনিগ্রহ কংসের পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। যাহারা "অসুতৃপ্" অর্থাৎ আত্মপ্রাণতর্পণই যাহাদের একমাত্র ব্রত, তাহারা পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী সকলকেই বধ করিয়া আত্মপোষণ করিতে পারে। এই জাতীয় আসুরিকপ্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আত্মতৃপ্তি, আত্মপোষণই একমাত্র লক্ষ্য—সৎকর্ম্ম, দয়া, মায়া, পরোপকার, পরপোষণ তাহারা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারে না। তাহাদের পৃথিবীতে একটিমাত্র

দেহ আছে, একটি মাত্র মন আছে,—সেই নিজদেহ ও নিজমনের সংবাদ তাহারা রাখে, অপরের দেহ অথবা মনের ভিতর প্রবেশ করিবার কল্পনা-শক্তি তাহাদের নাই। সুতরাং মহারাজ কংস পরিপূর্ণ পাপের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া দেবকীর অষ্টমগর্ভস্থ শিশুর জন্য উদ্বেগ ও আশঙ্কার সহিত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় "গর্ভগতবিষ্ণোর্ব্রহ্মাদিকৃতস্তুতিঃ"—ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক গর্ভগত শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি নামে পরিচিত। এই অধ্যায়ে দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব এবং ব্রহ্মাদি দেবগণকর্ত্তৃক ভগবৎস্তুতি বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম শ্লোকেই কংসের অত্যাচারের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এবং সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্ট-দলনের জন্য ভগবান্ যে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতেছেন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের দেবকীগর্ভে আবির্ভাবের প্রয়োজন শ্রীশুকদেব বিস্তারিতভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, প্রলম্ব, বক, চানূর, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি অসুরগণের সহিত মিলিত হইয়া কংস যাদবগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন, কংসের পিতা যাদবপতি উগ্রসেন যখন মথুরায় রাজা, তখন যাদবগণই তাঁহার পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ ও মন্ত্রী ছিলেন। কংস উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াই যাদবগণকে বিতাড়িত করিয়া মনের মত নূতন পাত্র-মিত্রাদি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এইরূপে শাসনযন্ত্র এবং শাসনপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। যাদবগণ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পুণ্যভূমি মথুরামণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া কুরু, পাঞ্চাল, বিদর্ভ, নিষধ, প্রভৃতি দেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইরূপে অধিকাংশ যাদবগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেও "একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে"—অক্রূর প্রভৃতি কোন কোন যাদব শ্রীকৃষ্ণদর্শনের আশায় কংসের অনুগত হইয়া মথুরায় অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মন এবং কার্য্যে এই যে গুরুতর পার্থক্য থাকিয়া

গেল তাহাতে কোন দোষ হয় নাই, কারণ বৃহত্তর ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য এইরূপে অসুর কংসকে বঞ্চনা করা কিছুমাত্র দূষণীয় নহে। তাঁহাদের মনের ভাব এই যে, মথুরা শ্রীভগবানের নিত্য লীলাভূমি—'মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ'—বহু সৌভাগ্যের ফলে এই মথুরায় বাস মানবজীবনে সম্ভবপর হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে যদি অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র যাদবগণই বিতাড়িত হন, সে পরের কথা, তখন ক্ষেত্র বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু আপাততঃ যতদিন মথুরায় বাস করিতে পারা যায় ততদিনই মঙ্গল। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে—'দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে'—এই মথুরায় একদিনমাত্র বাস করিতে পারিলেও শ্রীগোবিন্দচরণে ভক্তিলাভ হইয়া থাকে। এমন যে মহাপুণ্য-ক্ষেত্র মথুরা, সেই দেবভূমিতে বাস করিবার লোভে ঘৃণিত কংসকেও সেবা করিয়া কোন কোন যাদবগণ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে একে একে দেবকীর ছয়টি পুত্র কংস কর্ত্তৃক নিহত হইল এবং বাসুদেবের কলাভূত স্বয়ং বলরাম দেবকীর সপ্তমগর্ভে আবির্ভূত হইলেন। অবস্থা গভীর উদ্বেগজনক—বলরাম শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচররূপে আসিয়াছেন, বলরামকে হারাইলে শ্রীকৃষ্ণের লীলা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, সেই শিশু বলরামের জীবনসংশয় উপস্থিত। তখন বৈকুণ্ঠনিবাসী শ্রীহরি "যোগমায়াং সমাদিশৎ"—যোগমায়াকে এইরূপ আদেশ করিলেন।

> গচ্ছ দেবি, ব্রজং ভদ্রে! গোপগোভিরলঙ্কৃতম্
> রোহিণীবসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে,
> অন্যাশ্চ কংস সংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥
> দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্,
> তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥ ১০।২।৭,৮

—হে দেবি মহামায়ে, তুমি গোপ, গোপী ও গোসমূহে পরিশোভিত ব্রজধামে গমন কর। নন্দালয়ে বসুদেব-পত্নী রোহিণী আছেন, বসুদেবের

অন্যান্য পত্নীগণ কংসভয়ে নানা গুপ্তস্থানে অবস্থান করিতেছেন। এদিকে শেষ নামক আমার অংশ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত, তুমি তাঁহাকে দেবকীগর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীগর্ভে স্থাপন কর।

শ্রীহরির লীলাসহচর বলরাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছেন অথচ শ্রীহরি স্বয়ং এখনও বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিতেছেন, ইহাতে যোগমায়ার হৃদয়ে সহজেই বিস্ময়ের উদয় হইল। কারণ শ্রীহরি ও শ্রীবলরাম যুগে যুগে নিত্য সহচর, একজনকে বাদ দিয়া অপরজনের লীলা অথবা মনুষ্যজীবন সার্থক হয় না। যোগমায়ার এই স্বাভাবিক বিস্ময় বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ পুনরায় বলিলেন,

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥ ১০।২।৯

—হে কল্যাণি, তুমি দেবকীগর্ভ হইতে আমার অংশ আকর্ষণ করিলে তাহার পর আমি দেবকীর পুত্র হইয়া পরিপূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইব এবং তুমিও নন্দপত্নী যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে।

এই শ্লোকটির মধ্যে "অংশভাগেন" কথাটি পণ্ডিতসমাজে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সাধারণভাবে গ্রহণ করিলে 'অংশভাগেন' কথাটির এই অর্থ দাঁড়ায় যে, শ্রীহরি অংশরূপেই দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পূর্ণাবতার রূপে নহেন। কিন্তু স্বভাবতঃই মনে হয় যে, শ্রীশুকদেব নিশ্চয়ই 'অংশভাগেন' কথাটির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অংশাবতার রূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই;—কারণ, এই সাধারণ অর্থ শ্রীশুকদেবের সমগ্র ভাগবতব্যাখ্যার পরিপন্থী। তাই এই কথাটিকে লইয়া শ্রীধরস্বামী ছয়প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্যান্য টীকাকারগণেরও বহুবিধ ব্যাখ্যা আছে। শ্রীধরস্বামী মহাশয় যে ছয় প্রকার টীকা করিয়াছেন তাহার সবগুলিই ঘুরিয়া ফিরিয়া 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষ—ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে। মূলকথা এই

দাঁড়াইতেছে যে, "অংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশো যত্র সঃ অংশভাগঃ" —যাঁহাতে অংশের প্রবেশ অর্থাৎ মিলন হয় তাঁহার নাম 'অংশভাগ।' স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত অবতারের লীলাই—ভূভারহরণ, অসুরদলন, ধর্ম্মসংস্থাপন তো দেখিতে পাওয়া যায়ই, উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণে যাহা আছে—প্রেমাধীনতা, মহামাধুর্য্য,—তাহা কোন অবতারেই নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

স্বয়ং ভগবান্ অবতার যেই কালে
আর সব অবতার তাহে আসি মিলে ॥

সুতরাং টীকাকারগণের জটিল তর্ক ও যুক্তিজালসমূহ সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইলেও, 'অংশভাগেন' কথাটির মূল অর্থ—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—ইহা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে।

এইরূপে বলরামের আবির্ভাব, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীহরির আবির্ভাব মহামায়ার নিকট ঘোষণা করিয়া শ্রীহরি মহামায়াকেও লীলাসহচরীরূপে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলে বিস্মিতা যোগমায়া শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীহরি যোগমায়ার বিস্ময়ের কারণ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,

অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্
নানোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকাম বরপ্রদাম্ ॥
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি,
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ,
মায়া নারায়ণী ঈশানা শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥ ১০।২।১০-১২

—হে দেবি, তুমি বরদাত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, তুমি মনুষ্যগণের সর্ব্বকামনা পূর্ণকারিণী। মনুষ্যগণ নানাবিধ পূজোপকরণের দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিবে।

—হে দেবি, পৃথিবীতে মনুষ্যগণ তোমাকে নানা স্থানে স্থাপিত করিবে, তোমার নামে তীর্থভূমি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তুমি তাহাদের নিকট দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানা, শারদা, ও অম্বিকা—এই সকল নামে পরিচিতা হইবে।

অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় শ্রীহরির যোগমায়া একটি পরম ঐশ্বর্য্যবিশেষ। ঐ যোগমায়া না থাকিলে শ্রীহরির মানবলীলা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। যে শক্তিতে ভগবান্ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, সে শক্তিতে পরম মাধুর্য্যময়ী শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্ভবপর নহে, সে লীলায় তাঁহার অনন্ত শক্তিকে আবরণ করিবার জন্য যোগমায়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়,—নতুবা মানুষরূপী হইয়াও সকলের কাছে অনন্তরূপী পরম পুরুষ বলিয়া ভগবান্ ধরা পড়িয়া যান। তাই শ্রীকৃষ্ণলীলায় তিনি কখনও বা মায়া-মানুষ, কখনও বা মায়া-মাণবক নামে অভিহিত; কখনও বা যোগমায়া প্রভাবে শিশুরূপে প্রতিভাত হইয়া মাতা যশোদার যষ্টি তাড়না সহ্য করিয়া অসহায় বালকের মত রোদন করিতেছেন, উদূখলে বাঁধা পড়িয়া কাতরদৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, কখনও বা যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ ব্রহ্মাকে মোহিত করিয়া ফেলিতেছেন, আবার কখনও বা শারদোৎফুল্লমল্লিকা জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে "যোগমায়া-সমাশ্রিতঃ" শ্রীকৃষ্ণ সহস্র সহস্র গোপীগণের প্রাণপতি সাজিয়া তাহাদের সহিত লীলা করিতেছেন। তাই যোগমায়াকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জন্মগ্রহণ করিতে হইবে—একজন মথুরায় কারাগৃহে, অপরজন ব্রজপুরীতে নন্দের প্রাসাদে—পথের ব্যবধান অনেক—গভীর যমুনাই তো যাতায়াতের পথে মহান্ বিঘ্নের সৃষ্টি করিতেছে। তবু নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে—উভয়েই এক হইয়া আছেন, যোগমায়া না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্ভবপর হয় না। এই যোগমায়াই কখনও বা মায়ারূপে পরিচিত হইয়া থাকেন,—একই শক্তি, কার্য্য-বিভেদে

বিভিন্নরূপিণী মাত্র। যে শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গপ্রার্থী ভক্তগণ বিমোহিত হইয়া থাকেন, সেই উন্মুখ-মোহিনী শক্তি "যোগমায়া" এবং যে শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জীবগণ সংসারমুগ্ধ হইয়া থাকে সেই বিমুখ-মোহিনী শক্তি "মায়া"—দুই-ই এক, ক্রিয়াভেদে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান মাত্র।

এই অঘটনঘটনপটীয়সী মহাশক্তি পৃথিবীতে দুর্গা, ভদ্রকালী, ঈশানা, অম্বিকা ও চণ্ডিকা নামে পরিচিতা। এই বিশ্বমোহিনী জগন্মাতা কৃপা না করিলে মানুষের ইহলোকে কোন বাসনাই চরিতার্থ হয় না, পরলোকেও সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নহে। নারদপঞ্চরাত্র নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে বলা হইয়াছে,

> একেয়া প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী,
> অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ ॥
> অস্যা আবরিকা শক্তি র্মহামায়াখিলেশ্বরী
> যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ ॥

—শ্রীভগবানের চিন্ময়ীশক্তি দুর্গা, ইঁহার কৃপাপ্রাপ্তি ঘটিলে দেবদেব ভগবানের চরণপ্রাপ্তি সুলভ হয়। ইঁহার কৃপা ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। প্রপঞ্চাধিকারিণী মহামায়া ইঁহারই আবরণ-শক্তি; ইনি শ্রীকৃষ্ণ-বহির্মুখ জীবগণকে দেহ-গেহাদির মমতা-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

পুনরায় শ্রীহরি যোগমায়াকে বলিলেন যে, গর্ভ আকর্ষণ করিয়া অন্যত্র স্থাপন করা হইবে বলিয়া রোহিণীপুত্র পৃথিবীতে সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হইবেন, তিনি জনগণের প্রীতি উৎপাদন করিবেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে রাম নামে সম্বোধন করিবে, এবং বলশালীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন বলিয়া তিনি বলভদ্র নামেও পরিচিত হইবেন। এইরূপে বলরাম সাতমাস দেবকীগর্ভে বাস করার পর শ্রীহরির আদেশে যোগমায়াকর্ত্তৃক রোহিণীগর্ভে স্থান গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া সমগ্র

জগতে পরিচিত হইলেন। সাতমাস গর্ভের পর হঠাৎ দেবকীর গর্ভলক্ষণ তিরোহিত হওয়ায় মথুরাবাসীগণ দেবকীর গর্ভপাতের আশঙ্কা করিয়া নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে দেবকীর অষ্টমগর্ভ আশ্রয় করিয়া শ্রীহরি মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইলেন। গর্ভশায়ী শ্রীহরির চিন্ময় রূপের ছটা মাতা দেবকীর সর্ব্ব অঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, "শুচিস্মিতাং"—পবিত্র আনন্দঘন মূর্ত্তি—সেই দেবকীকে কারাগৃহে দেখিয়া কংস বিচলিত হইয়া পড়িলেন—কই, এমন রূপ তো দেবকীর পূর্ব্বে কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই! দীর্ঘকাল কারাগৃহ-বাসের ফলে দেবকীর সোনার অঙ্গ মলিন হইয়া গিয়াছিল, মুখে হাসি ছিল না, অন্তর ও বাহির আচ্ছন্ন করিয়া একটা প্রগাঢ় বিষাদ বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ "প্রভয়া বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাং"—অঙ্গপ্রভার দ্বারা অন্ধকার কারাগৃহ যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, মলিন মুখে আনন্দের একটা আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে—বুদ্ধিমান্ কংস বুঝিতে পারিলেন, "এষঃ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী"—এইবার আমার প্রাণহন্তা হরি নিশ্চয়ই দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছে, কারণ এই দেবকী তো পূর্ব্বে দেখিতে এরূপ ছিল না! এই যে দেবকীর অঙ্গচ্ছটার ভিতর দিয়া মহারাজ কংস গর্ভশায়ী শ্রীহরিকে মানসচক্ষে দর্শন করিতেছেন, ইহা কংসের বহু সৌভাগ্যের পরিচায়ক। শ্রীহরিকে কংস শত্রু বলিয়াই জানেন, কিন্তু প্রবল শত্রু, সুতরাং তাঁহাকে পরাজিত করিবার জন্য কংস অনুক্ষণ চিন্তা করিয়াছেন। যে দিন দৈববাণী উত্থিত হইয়া কংসকে জানাইয়া দিল যে দেবকীর অষ্টমগর্ভস্থ শিশু তাঁহাকে বধ করিবেন, সেইদিন হইতেই কংসের মন শত্রুভাবে অহরহঃ শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিতে লাগিল। এই যে হরিসংলগ্ন মন, ইহা তো বহুভাগ্যে হইয়া থাকে, ইহাই তো মুক্তির প্রশস্ত পথ! আজ কারাগারে প্রবেশ করিয়া দেবকীর হঠাৎ অমানুষিক রূপপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া কংস

বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুরূপী শ্রীহরি অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন, ঐ তো দেবকীর গর্ভে তাঁহাকে দেখা যাইতেছে। কংস কারাগারের পাহারা আরও কঠোর করিয়া দিলেন, চতুর্দ্দিকে সকলেই রাজার আদেশে সতর্ক হইয়া রহিল, কংস আপনি অপেক্ষা করিয়া রহিলেন,—কবে শ্রীহরি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবেন—"আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরের্ব্বৈরানুবন্ধবৃৎ"—শ্রীহরির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণকরতঃ তাঁহার জন্মের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সে কি রকম প্রতীক্ষা? একটি মাত্র অপূর্ব্ব শ্লোকে মহাকবি শুকদেব, মুনিশ্রেষ্ঠ শুকদেব, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ শুকদেব ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীম্
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥ ১০।২।২৪

—কংস উপবেশন, শয়ন, উত্থান, ভোজন, ভ্রমণ,—সকল অবস্থায় শ্রীহরির চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত জগৎ হরিময় দেখিতে লাগিলেন।

ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা! শত্রুভাবাপন্ন কংস বিষয়ভোগী সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ—বিষয়াসক্ত লোক মুখে শ্রীহরিকে স্বীকার করে, টিয়াপাখীর মত হরিনাম করে, কিন্তু কৃষ্ণরূপ তাহারা মনে ধারণা করিতে পারে না, সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমের কোন ছোপই তাহাদের হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু শত্রুভাবেও কৃষ্ণরূপ চিন্তা করিলে সে রূপ মনে লাগিয়া যায়, সে রূপ-চিন্তা হইতে আর বিরত হওয়া যায় না, সুতরাং সেই চিন্ময়রূপধারণার অবশ্যম্ভাবী ফল মানবজীবনে সংঘটিত হইয়া থাকে, সে তখন "তন্ময়ং জগৎ"—হরিময় জগৎ দেখিতে থাকে। তাই কংসের শত্রুভাবও বিষয়ী জীবের উদাসীনভাব অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। কত ঋষি, যোগী, জ্ঞানীগণ নির্জ্জনে কত শতবৎসর তীব্র তপস্যা করিয়াও হয়ত হরিময় জগৎ দেখিতে সমর্থ হন না, কিন্তু কংস কয়েক বৎসরের মধ্যেই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—উপনিষদের এই মহাবাক্য নিজ

জীবনে সত্য ও সার্থক করিলেন। কারণ সহজেই অনুমেয়। চঞ্চল মনোবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণদর্শনের পক্ষে অনুকূল নহে—চিত্ত স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতে হইবে, শত্রুভাবেই হউক অথবা মিত্রভাবেই হউক—চিত্ত শ্রীকৃষ্ণসংলগ্ন হওয়া চাই। দূষিত চিত্তবৃত্তিও যদি তাঁহার কাছে যায়, তাহা হইলে তিনি সেই দূষিত চিত্তকেও নিকটে রাখিয়া দেন, এবং সর্ব্বদোষ ক্ষালন করিয়া আপনার সাহচর্য্যের যোগ্য করিয়া তুলেন, তিনি গ্রহণ করিতে জানেন, তিনি বর্জ্জন করিতে পারেন না। গ্রহণ ও বর্জ্জন জগতের ধর্ম্ম; জগন্নাথের কাছে গ্রহণ আছে, বর্জ্জন নাই। সেইজন্য দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন,—"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"—যেমন করিয়া পার মনটি শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত কর। তাই আমরা দেখিতে পাই, কংস শ্রীভগবান্‌কে শত্রু মনে করিয়া প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিবার যেমন সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেরূপ সুযোগ মুনি ঋষিগণের সহজে উপস্থিত হয় না। কংসের আত্মচিন্তা, বিষয়চিন্তা নাই, বসিয়া, শুইয়া, খাইয়া সুখ নাই,—অহরহঃ শ্রীহরির চিন্তা। ইহাই তো "তদ্ভাবভাবিতঃ"—শ্রীহরির ভাবে ভাবিত হওয়া! এইজন্যই দেবর্ষি নারদ শ্রীভাগবতের অন্যত্র বলিয়াছেন

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তা মিয়াৎ,
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥

—শত্রুভাবে হরিচিন্তা করিলে যেমন তন্ময়তা লাভ হয়, শাস্ত্রশাসন ভয়ে, কিংবা ভুক্তি-মুক্তিলাভের লোভে ভক্তিসাধন করিলে তেমন তন্ময়তা আসে না।

অবশ্য শত্রুভাবে ভাবনা করিলে আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই, তাহাতে প্রতি পদে কংসের মত মহাভয়ে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তন্ময়তার হানি হয় না। শত্রুভাবের তন্ময়তায় সুখের লেশমাত্রও নাই, তাহাতে কেবলমাত্র দুঃখ এবং মহাভীতি; ভক্ত ও প্রেমীর

তন্ময়তায় ইহাই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু সংসারভয়ে ভীত, কামনা-বাসনার দাস বদ্ধজীব অপেক্ষা কৃষ্ণভয়ে ভীত কংস অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

(২)

দেবগণকর্ত্তৃক গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্তব

ইতিমধ্যে ব্রহ্মা ও মহাদেব, নারদ প্রভৃতি ঋষি ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া কংস-কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেবকীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভূভারহরণের নিমিত্ত ও নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য জগতে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ—দেব ও ঋষিগণের আনন্দের সীমা নাই। সমবেত দেবকণ্ঠে স্তুতিমন্ত্র উত্থিত হইল ঃ

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চসত্যে
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

১০।২।২৬

—হে ভগবন্, আপনার ভজন সত্য, সত্যের দ্বারা আপনাকে পাওয়া যায়, আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান—এই ত্রিকালেই সত্যস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন ; আপনিই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতের উৎপত্তিকারণ, আপনি অন্তর্য্যামী,—আমরা এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সত্যস্বরূপ আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি।

এই শ্লোকটি ভাষা এবং ভাবসমন্বয়ে শ্রীভাগবতে অপূর্ব্ব। দেবস্তুতির পনরটি শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকটি ভগবানের সত্যস্বরূপ প্রকাশ করিতেছে—এই ত্রিভুবনে একমাত্র তিনিই সত্য, আর সমস্তই ক্ষয়শীল ও বিনাশশীল। ভূ-ভূব প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনে নানা বিগ্রহধারী বহু জীব বাস করে, তাহার মধ্যে সত্যবিগ্রহ কেহ নহে। নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ শেষ হইলে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মহতেরও মহৎ

পিতামহ-ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেরই বিগ্রহ অর্থাৎ দেহপতন হয়, সুতরাং ইহাদের মধ্যে কাহারও শরণাপন্ন হইয়া কেহ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না,—যে নিজেই বিনাশশীল, সে অপরকে কি করিয়া রক্ষা করিবে! কিন্তু শ্রীহরি সত্যঘনমূর্ত্তি, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে জীবের আর বিনাশ নাই। সুকর্ম্মবলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইলেও জীব সেখানে চিরদিন থাকিতে পারে না, "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"—পুণ্যক্ষয় হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয়; কিন্তু শ্রীগোবিন্দচরণে আশ্রয় লইলে, 'গতাগতি পুনঃ পুনঃ' হয় না; তাঁহার কৃপায় জীব পার্ষদদেহ লাভ করিয়া চিরদিন শ্রীহরি-সঙ্গলাভ করিয়া থাকে—"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"—আমার ধাম প্রাপ্ত হইলে আর ফিরিয়া যাইতে হয় না। পূর্ব্বে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত ক্ষীর সমুদ্রের তীরে গমন করিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়া ভগবৎ আবির্ভাবের যে আশ্বাস পাইয়াছিলেন তাহা সত্যে পরিণত হইতে দেখিয়া দেবগণ সকলে আনন্দিত হইয়া সমবেতকণ্ঠে প্রথমেই ভগবানের অনন্তরূপের মধ্যে সত্যঘনরূপের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। কোন কোন টীকাকার 'ত্রিসত্যং' কথাটির অর্থ করিয়াছেন যে, ভগবানের ভক্ত, ভজন এবং ভজনফল—এই তিনটিই সত্য, অতএব ভগবান্ 'ত্রিসত্যং'; কিন্তু শ্রীধরস্বামী মহাশয়ের ব্যাখ্যা অধিকতর সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী বলিয়া মনে হয়। শ্রীধরস্বামী মহাশয় 'ত্রিসত্যং' কথাটির টীকা করিয়াছেন—'ত্রিসত্যং ত্রিষ্বপিকালেষু স্রষ্টেঃ পূর্ব্বং প্রলয়ান্তরঞ্চ স্থিতিসময়ে চ সত্যং অব্যভিচারেণ বর্ত্তমানং"—অর্থাৎ যে ভগবান্ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-কালে অখণ্ডরূপে বিরাজমান। 'ত্রিসত্যং' কথাটির এই অর্থই সুন্দর বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে শ্রীশুকদেব "বৃষণমৈড়য়ন্"—অর্থাৎ দেবগণ সর্ব্বপুরুষার্থ-প্রদ ভগবান্ শ্রীহরির স্তব করিলেন, ইহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৃষণ অর্থাৎ সর্ব্বকামবর্ষণকারী মেঘ—শ্রীদেবকীগর্ভাকাশে সমুদিত শ্রীকৃষ্ণ

কৃষ্ণমেঘ। গগনে মেঘ দেখিলে কৃষক, নীলকণ্ঠ ময়ূর, চাতক এবং দাবদগ্ধ পশুগণের আনন্দ স্বাভাবিক। কৃষক নিজক্ষেত্রে শস্যরোপণ করিয়াছে, কিন্তু প্রখর রৌদ্রতাপে তাহা দগ্ধপ্রায় দেখিয়া দুঃখিত মনে দিন যাপন করিতেছে, হঠাৎ একদিন নবমেঘের উদয় হইল, তাহার আর আনন্দের সীমা নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কৃষক, ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্রে জীব-শস্য রোপণ করিয়া তাহা প্রখর পাপের তাপে দগ্ধপ্রায় হইতে দেখিয়া দুঃখিত মনে ব্রহ্মলোকে বাস করিতেছিলেন, আজ নবমেঘের উদয় দেখিয়া পরমানন্দে বিভোর হইয়া কংস-কারাগারে ছুটিয়া আসিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সেই অপূর্ব্ব ভাষা—'কৃষ্ণ নবজলধর, জগৎশস্যের উপর, বরিষয়ে লীলামৃতধার।' আকাশে নবঘনসঞ্চার হইলে নীলকণ্ঠ ময়ূরের আনন্দের আর সীমা থাকে না—সে পেখম মেলিয়া মেঘের দিকে চাহিয়া নৃত্য করিতে থাকে। আজ "বৈষ্ণবাণাং যথা শম্ভু"—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহাদেব নীলকণ্ঠ বিস্তার করিয়া কারাগৃহে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার ধ্যানের দেবতা দেবকীর গর্ভে দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়াছেন। চাতক সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ের নিকটে থাকিলেও তাহার জলপানে পিপাসা শান্তি করে না, সে মেঘের জলের আশায় ঊর্দ্ধমুখ হইয়া অবস্থান করে। দেবর্ষি নারদ সেই চাতক। আজ ঘনকৃষ্ণ-মেঘের উদয় দেখিয়া কৃপাবারি পান করিবার আশায় দেবর্ষিও আজ কংসকারাগারে উপস্থিত। গহনবনে দাবানল প্রজ্জলিত হইলে বনস্থ পশুগণ তাপিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে, সেই সময়ে নব মেঘের উদয় হইলে শীতল হইবার আশায় তাহারা আনন্দিত হয়। পৃথিবীতে কংসের সহিত চানূর, অঘ, পূতনা প্রভৃতি অসুরগণের সম্মিলনে পাপবহ্নির সৃষ্টি হইয়াছে। এই অত্যাচারের বহ্নি হয়তো দেবগণের বাসভূমি স্বর্গরাজ্যও স্পর্শ করিতে পারে। তাই ইন্দ্র ও দেবগণ দাবদগ্ধ পশুর মত শঙ্কিত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারা আকাশে কৃষ্ণঘনসঞ্চার দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন, অসুর-দাবানল নির্ব্বাপিত হইবে মনে করিয়া কংস-কারাগারে আসিয়া

মেঘের পূর্ব্বাভাস দর্শন করিতেছেন। এইরূপে ব্রহ্মা, মহাদেব, দেবর্ষি, ইন্দ্র ও দেবগণ, সকলেই আনন্দিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ মেঘের দিকে অনিমেষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, গর্ভশায়ী শ্রীকৃষ্ণের কালোছায়া তাঁহাদের চক্ষে গাঢ়তর ছায়ার সৃষ্টি করিতেছে, কারাগার প্লাবিত করিয়া ব্রহ্মার বেদধ্বনি, দেবগণের মধুর স্তুতি উত্থিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের রূপচ্ছটায়, দেবকীর আনন্দবিস্ফারিত দীপ্তিতে, দেবগণের শুদ্ধসত্ত্বময়ী প্রভায় আজ অন্ধকার কারাগার ভাসিয়া যাইতেছে—আজ কারাগারই বৈকুণ্ঠের মায়া ধারণ করিয়াছে!

এই দেবস্তুতির পনরটি শ্লোকের শেষ শ্লোকে "ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে"—হে যদুকুলশ্রেষ্ঠ, আপনি এক্ষণে পৃথিবীর ভার গ্রহণ করুন, আমরা আপনাকে বন্দনা করিতেছি—এই কথা বলিয়া দেবগণ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি শেষ করিলেন। অতঃপর বিস্মিত কৃষ্ণমাতাকে আশ্বাস দিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলাকার্য্য ঘোষণা করিয়া—"মাভূদ্ভয়ং ভোজপতে মুমূর্ষো গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ"—হে মাতঃ দেবকী, আপনার ভয় নাই, কংসের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী, আপনার এই পুত্র নিগৃহীত যদুবংশীয়গণকে রক্ষা করিবেন,—এই বলিয়া দেবগণ অন্তর্হিত হইলেন।

(৩)

কংসকারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বসুদেব ও দেবকীকর্ত্তৃক ভগবৎস্তুতি, বসুদেব-দেবকীর পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত, শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের ব্রজধাম নন্দালয়ে গমন, যশোদার কন্যাকে লইয়া বসুদেবের প্রত্যাবর্ত্তন, কংসের সহিত অসুরমন্ত্রিগণের মন্ত্রণ—এই সমস্ত প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহরূপী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষের জন্মকাহিনী পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসী নহেন, শ্রীকৃষ্ণ নিরাসক্ত আদর্শ সংসারী। আমরা দেখিতে পাইব যে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছেন, পুত্র পৌত্র কন্যাদি লইয়া তিনি পরম সংসারী; কখনও বা তিনি কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার জন্য বড়ই কর্ম্মব্যস্ত, কখনও বা তিনি গ্রাম্য বিবাদের সালিসী করিতেছেন, কখনও বা কূপ খনন করাইয়া জনহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। তাই ভাগবতের লীলাপুরুষ আমাদের মত সংসারী জীবের পরম আশ্রয়, আমাদের প্রাণের ঠাকুর। তিনি সংসার ত্যাগ করিবার আদর্শ গ্রহণ করেন নাই। তিনি সংসারী হইয়াই ধর্ম্মের চিরন্তন আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি কর্ম্ম করেন, কিন্তু কর্ম্মের প্রতি তাঁহার আসক্তি নাই,—ইহাই হইল শ্রীকৃষ্ণের সংসারজীবনের মূল কথা। যে মানবধর্ম্ম তাঁহার সমগ্র লীলাকাহিনীকে ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে সে ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী হইল নিরাসক্তি। সংসারী মানুষকে মনে রাখিতে হইবে যে, কর্ম্ম অথবা সংসার তাহার নহে, সমস্ত কর্ম্মের ভোক্তা, তাহার সংসারের প্রভু, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ। একবার যদি অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা হইয়া মানুষ আপনাকে 'কর্ত্তাহমিতি মন্যতে'—কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে সে আদর্শভ্রষ্ট সংসারী, তাহাকে তখন কর্ম্মবশে জন্মজন্মান্তর দুঃখভোগ করিতে হইবে। কিন্তু সমস্ত সংসারটি প্রভু শ্রীহরির সংসার, সমস্ত কর্ম্ম প্রভুর প্রীতির জন্য করা হইতেছে,—আত্মপ্রীতির জন্য নহে, আত্মগৌরবের জন্য নহে,—ইহা মনে রাখিলে আর ভয় নাই। ইহাই শ্রীভাগবতের লীলাকাহিনীর একমাত্র আদর্শ বস্তু। আবার সন্ন্যাসী হইয়াও যদি মঠের উপর আকর্ষণ আসে, সেই মঠটাই ভাল লাগে, প্রয়োজনবশতঃ অন্য কোন স্থানে যাইতে হইলে মনে উদ্বেগ অথবা অস্বচ্ছন্দতার সঞ্চার হয়, যদি কোন সন্ন্যাসীর তাঁহার মঠবাসিগণকে ভাল

লাগে, অন্য কাহাকেও ভাল লাগে না,—ইহাই মনের অবস্থা হয়, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসী আদর্শভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং আসক্তির জন্য তাঁহার সমস্ত সাধনভজন কমবেশী ব্যর্থ হইয়া যাইল। নিরাসক্তিই হইল শ্রীকৃষ্ণের প্রধান লীলারহস্য। আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে গোপীগণের সহিত পরম প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছেন, হঠাৎ মথুরায় যাইবার প্রয়োজন হইল। তিনি রথারূঢ় হইয়া মথুরায় যাইতেছেন, তাঁহার পরমপ্রিয় গোপীগণ শোকাচ্ছন্ন হইয়া আলুথালুবেশে তাঁহার রথের পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একবার ফিরিয়া চাহিলেন না, ধূলির পর্ব্বত উড়াইয়া তাঁহার রথ মথুরার দিকে ছুটিয়া চলিল। ইহাই নিরাসক্তি। এই নিরাসক্তিই সংসারী শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

মহাভারতে একজন সংসারীর অনুরূপ নিরাসক্তির কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বজন সমাদৃত মিথিলাধিপতি জনক। নারায়ণ বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আসিয়া মহারাজ জনকের নিরাসক্তি পরীক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ও জনক রাজা ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে মিথিলার এক অংশে আগুন লাগিয়া গিয়াছে, অগ্নি রাজধানীর ভিতর ছড়াইয়া পড়িতেছে। মিথিলাধিপতি জনক নির্লিপ্ত হৃদয়ে ব্রাহ্মণবেশী নারায়ণের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া চলিয়াছেন, অগ্নিদাহের জন্য কোন ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতেছেন না। ব্রাহ্মণ ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে মহারাজ জনক যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে আজ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে :

মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতে কিঞ্চন।

—অর্থাৎ মিথিলানগরী আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাইলেও আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

এমন নিরাসক্তির কাহিনী মহাভারতে আর দ্বিতীয়টি নাই। তাই আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণলীলাকাহিনী পাঠ করিবার পূর্ব্বে মনে রাখিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসী নহেন, তিনি গৃহী, এবং তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের একমাত্র আদর্শ সংসারে নিরাসক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারে জন্মগ্রহণ করিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষ-নিশীথে, ততোধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন অপরিসর লৌহময় প্রকোষ্ঠে, গম্ভীর মেঘ-গর্জ্জনের ভীষণতার ভিতর দিয়া—যিনি 'ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং'—ভয়ের ভয়, ভীষণের ভীষণ অথচ যিনি 'ভক্তানাং অভয়ঙ্করঃ', —ভক্তগণের অভয়দাতা—সেই মহাকাল শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণ 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং'—সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, পাপিগণকে বিনাশ করিবার জন্য—"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং আবিরাসীৎ" —দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে কারাগারের অনাবৃত ধূলিময় ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। যিনি রাজার উপরে রাজা রাজরাজেশ্বর, সেই পরমপুরুষ স্বেচ্ছাবৃত মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া দীনাতিদীনের ন্যায় নগ্ন ধরিত্রীর প্রস্তরের উপর অসহায় শিশুর মত পড়িয়া আছেন! সে দিন কি অপূর্ব্ব দিন! বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ভাদ্রমাসে 'বিজয়' বেলায় রোহিণী নক্ষত্র বুধবার কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতিথিতে পৃথিবীর ভাগ্যে এই শুভমুহূর্ত্তের উদয় হইয়াছিল। সে আজ প্রায় কিঞ্চিৎ কম সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। দিকে দিকে কোথাও বা জ্ঞাতসারে, কোথাও বা অজ্ঞাতসারে, আনন্দের প্রকাশ হইতে লাগিল। প্রকৃতির ভিতর দিয়া এই আনন্দ পরিদৃষ্ট হইল—"দিশঃ প্রসেদুঃ"—দিকসমূহ প্রসন্ন হইল, "মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা"—পৃথিবীর সমস্ত নগর ও গোষ্ঠ, আনন্দ ও মঙ্গলের ক্রীড়াভূমি হইয়া উঠিল, "নদ্যঃ প্রসন্ন-সলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ"—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, গোদাবরী, কাবেরী নদনদীগণের বর্ষাকালীন আবিলতা দূর হইয়া গেল, হ্রদসমূহ

অসংখ্য পদ্মরাজিতে সুশোভিত হইল, "দ্বিজাতিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ" বনরাজির পুষ্পস্তবকসমূহ পক্ষিগণের কূজন ও ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিল, "ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ"—সুখস্পর্শ ও পবিত্রগন্ধে আমোদিত নির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে পরিদৃশ্যমান জগতের আনন্দজনিত শিহরণ চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু অন্তর্জগতেও একটা পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল—মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্"—অজানিত, অপ্রত্যাশিত আনন্দে সাধুপ্রকৃতির ভক্তগণের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎকে আনন্দে পরিপ্লুত করিয়া আনন্দময় শ্রীহরি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন্।

কিন্তু কারাগারে কেন? বৈকুণ্ঠনিবাসী জগদীশ্বর কারাগারে জন্মগ্রহণ করিলেন কেন? কংস তো বাসুদেব ও ভগিনী দেবকীকে প্রাসাদের কোন অংশে অথবা অন্য কোন অট্টালিকায় প্রহরী পরিবৃত করিয়া রাখিতে পারিতেন অথবা যে-ভগবান্ তাঁহার ঐশ্বর্য্যবলে প্রহরীকে নিদ্রাভিভূত, লৌহশৃঙ্খল উন্মোচন, গভীর যমুনাকে ক্ষুদ্র জলাশয়ে পরিণত করিয়া সুদূর নন্দগোপগৃহে গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই মাতা ও পিতাকে গুপ্তভাবে স্থানান্তরে লইয়া যাইয়া কোনও দেবমন্দিরে অথবা জনশূন্য বাসগৃহে জন্মগ্রহণ করিতে পারিতেন, পুনরায় ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে পিতামাতাকে কারাগারে পূর্ব্ববৎ অবরুদ্ধ অবস্থায় অনায়াসে রাখিয়া দিতে পারিতেন। যাঁহার পক্ষে এই সবই সম্ভবপর ছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণ পাপভূমি, অন্ধকারাগারে জন্মগ্রহণ করিলেন কেন?

এই কারাগারে জন্ম অর্থহীন নহে—ইহার ভিতর শ্রীভগবানের একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তিনি আজ পাপভারে জর্জ্জরিত পৃথিবীকে নিজ দেহ দিয়া স্পর্শ করিবার জন্য, মানবচক্ষু দিয়া দর্শন করিবার জন্য, বদ্ধ জীবের অনুভূতি লইয়া অনুভব করিবার জন্য বৈকুণ্ঠ

ছাড়িয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পার্থিব বন্ধনের ভিতর কারাগারের বন্ধনই সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দয় ও লজ্জাপ্রদ—বদ্ধজীবের সংসার-কারাগারে সেই কঠোর বন্ধন, সেই আত্মবিস্মৃত মহামোহময় লজ্জা, আজ শ্রীহরি মানুষের চক্ষু দিয়া দর্শন করিবেন, উপলব্ধি করিবেন। ঠিক এইরূপ উদ্দেশ্যেই একদিন শ্রীকৃষ্ণ যশোদার হস্তে বন্ধন গ্রহণ করিয়া নলকূবর ও মণিগ্রীবের বৃক্ষরূপী বন্ধনের প্রতি চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, আপনার কটিদেশে রজ্জুর সহিত উদূখলে আবদ্ধ লইয়া তমোভাবগ্রস্ত বৃক্ষদ্বয়ের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আরও কারণ ছিল। সেই যুগে কংস-শাসনাধীন সমগ্র মথুরামণ্ডল একখণ্ড বিরাট্ কারাগারে পরিণত—সেই কারাগারের ভিতর আরও ক্ষুদ্র কারাগারটি কংসরাজশাসনের প্রতীকস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। সেইজন্য—'ভক্তানাং অভয়ঙ্করঃ'—ভক্তগণের অভয়দাতা শ্রীভগবান্ ছোট কারাগারটিকেই আপনার সূতিকা-গৃহ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, আপনি কারাগারে রুদ্ধ হইয়াই যেন সমগ্র মথুরামণ্ডলের কারাপ্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য তিনি মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বায়ুলেশবিহীন লৌহপ্রাচীর-বেষ্টিত অপরিসর কক্ষমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া বদ্ধজীব মানুষের দুঃখ রক্তমাংসগঠিত নিজ মানুষ-বক্ষ দিয়া অনুভব করিতেছেন। আরও কারণ ছিল। আজ যিনি আসিয়াছেন তিনি দরিদ্রের সখা,—তিনি ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ধনীর কেহই নহেন। দরিদ্রের কুটিরেই সাধারণ মানুষের জন্ম হয়, যে কয়েকজন সৌভাগ্যশালী লোক প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করে তাহারা গণনার মধ্যে নহে। জগত্তারণ প্রভু জগৎকে উদ্ধার করিতে আসিতেছেন, জগতে সব লোক যে ভাবে জন্মগ্রহণ করে, যে দৈন্য, যে দারিদ্র্য, কখনও বা যে লজ্জার ভিতর জন্মগ্রহণ করে, আজ জগন্নাথ সেই দৈন্য, সেই দারিদ্র্য, সেই লজ্জার ভিতর দিয়াই আসিতেছেন,—নতুবা কি করিয়া তিনি সকলের হইবেন! কারাগারে জন্মগ্রহণ না করিলে হয়তো অন্য আরও

পাঁচজন প্রতিবাসী শিশুর জন্মসময়ে উপস্থিত হইত, হয়তো শঙ্খধ্বনি তাঁহার মানবজন্ম ঘোষণা করিত, হয়তো অপরের আনন্দধ্বনি পিতা-মাতার বক্ষেও আনন্দস্পন্দনের সৃষ্টি করিত। কিন্তু দরিদ্রের কুটির অপেক্ষাও নিরানন্দ নিরালা কারাগৃহের মধ্যে প্রভুর আবির্ভাব। প্রভু অন্ধকারের ভিতর দিয়া আসিতেছেন, প্রভু কারাকক্ষের নিরানন্দের ভিতর দিয়া আসিতেছেন, প্রভুর জন্মসময়ে শঙ্খধ্বনি হয় নাই, একজনও প্রতিবাসী অথবা পথের মানুষ মাতার সূতিকাকক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। প্রভু অষ্টম সন্তান হইয়া আসিয়াছেন,—ইহাও নিরর্থক নহে—দরিদ্র পিতামাতা একটি ছেলেকেই আদরের সহিত ভরণ-পোষণ করিতে পারে না, অষ্টম পুত্র তো বিরক্তি, নৈরাশ্য ও অনাদরের ভিতর দিয়াই আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই বহুভ্রাতার জন্মের পর প্রভু যেন চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে বহুমানবচক্ষুর সমালোচনা-দৃষ্টির অন্তরালে একখণ্ড অন্ধকারময় কক্ষে, চতুর্দ্দিকে ঘনায়মান কৃষ্ণা রজনীর অন্ধকারের ভিতর দিয়া আসিয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হইতেছেন। দরিদ্রের গৃহে শিশুর অনাদর আস্বাদন করিবার জন্যই হয়তো এই পুত্ররূপী ভগবানের আবির্ভাব। আরও আসিয়াছেন পিতামাতার ঘোরতর বিপদের দিনে, পুত্র-শোকাতুর জনকজননী হয়তো আর পুত্রশোক সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন, অসহায় হইয়া নিষ্ঠুর কংসরাজার হস্তে শিশুহত্যা দেখিবার ধৈর্য্য আর তাঁহাদের নাই। এইরূপ বিপদের দিনেই তো মানবজীবনে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা আসিয়া উপস্থিত হয়—মানুষের বিপদই তো শ্রীহরির সুযোগ। যখন মানুষ আপনাকে অত্যন্ত অসহায় বলিয়া মনে করে, যখন মানুষ পৃথিবীতে নিতান্তই একা, যখন সে নিজে আর হাল ধরিতে পারে না, শুধু শ্রীহরির মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকে, সেই সম্পূর্ণ পুরুষকার-বিহীন নিশ্চেষ্ট আত্মনিবেদনের ভিতর দিয়াই শ্রীহরি আসিয়া উপস্থিত হন। আজ সমগ্র মথুরামণ্ডলে বসুদেব ও দেবকীর মত দীন ও অসহায়

আর কেহই নাই, সুতরাং তাঁহাদের মত কৃপার অধিকারীও তখন মথুরামণ্ডলে অপর কেহই ছিলেন না। এই সমস্ত সমষ্টিগত কারণের জন্যই কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ বসুদেব ও দেবকীর পার্শ্বে শ্রীহরি পুত্ররূপে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন—কংস-কারাগার ধন্য ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, জন্মমৃত্যুর প্রাচীরবেষ্টিত জগৎরূপী বৃহত্তম কারাগার আজ শ্রীকৃষ্ণচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া জীবের মনুষ্যজন্ম দেবজন্ম অপেক্ষাও গৌরবময় করিয়া তুলিল। তাই শ্রীকৃষ্ণের কারাগারে জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র নহে,—ইহার পশ্চাতে শ্রীহরির মহতী কৃপা ও বিরাট্ উদ্দেশ্য কার্য্য করিতেছিল।

বসুদেব চাহিয়া দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব শিশু ভূতলে পড়িয়া আছেন—তাঁহার অদ্ভুত রূপ, অদ্ভুত জ্যোতিঃ, চতুর্ভুজে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম, পরিধানে পীতবাস, ঘনমেঘের ন্যায় তাঁহার বর্ণ-সৌন্দর্য্য—পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে শিশুগুলি এই কারাগারেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল আজিকার শিশুটি তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

> তদদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যায়ুধম্
> শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্ ॥
> ১০।৩।৯

—বসুদেব সেই অদ্ভুত শিশুকে দেখিতে পাইলেন। শিশুর নয়নদ্বয় কমলসদৃশ, শিশু চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন; গলদেশে রমণীয় কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীতবসন, ঘনমেঘের ন্যায় তাঁহার বর্ণসৌন্দর্য্য, মণিময় মুকুট ও কুণ্ডলের দীপ্তিতে তাঁহার কেশরাশি উদ্ভাসিত ; অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রহার, কেয়ূর ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিশোভিত।

বসুদেব বুঝিতে পারিলেন যে এই শিশু পরমপুরুষ শ্রীহরি, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বসুদেব প্রথমেই বলিলেন,

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ,
কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ ॥ ১০।৩।১৩

—হে ভগবন্, আপনাকে আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম ; সৎ, চিৎ ও আনন্দ আপনার স্বরূপ, আপনি সর্ব্বজ্ঞ।

এমন করিয়া সাক্ষাৎভাবে ভগবানের দর্শন ও স্বরূপজ্ঞান মানবজীবনে দুর্ল্লভ। এই অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের ইঙ্গিত করিয়া শ্রীশুকদেব "সাক্ষাৎ বিদিতোঽসি" ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্রসিদ্ধি, যোগাভ্যাসের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু তাহা "বিদিতোঽসি" মাত্র,—"সাক্ষাৎ বিদিতোঽসি" নহে। সাক্ষাৎরূপে এমন দর্শন বসুদেবের পরমগৌরব, পরমসৌভাগ্য। দেবকীদেবীও শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন, কংসরোষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন এবং তাঁহার অলৌকিকরূপ সম্বরণ করিবার জন্য নিবেদন করিলেন, নতুবা কংস সহজেই তাঁহাকে নিজ শত্রু শ্রীবিষ্ণু বলিয়া চিনিতে পারিবেন। দেবকী বলিলেন,

উপসংহর বিশ্বাত্মন্ অদোরূপমলৌকিকম্,
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়াজুষ্টং চতুর্ভুজম্ ॥ ১০।৩।৩০

—হে বিশ্বাত্মন্, আপনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মপরিশোভিত আপনার এই অলৌকিক চতুর্ভুজরূপ সম্বরণ করুন।

বসুদেব ও দেবকী উভয়েই শ্রীকৃষ্ণরূপ দেখিতেছেন, উভয়েই বুঝিতেছেন যে, এই অলৌকিক শিশু স্বয়ং পরমপুরুষ শ্রীভগবান, তথাপি দেহধারীর স্বাভাবিক ভীতি ও উৎকণ্ঠা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে না—তাঁহারা ভাবিতেছেন, প্রবলপ্রতাপ কংস এই রূপ দেখিলে সহজেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন, তৎক্ষণাৎ শত্রুবোধে তাঁহাকে বধ করিয়া ফেলিবেন। হয়ত নারায়ণ মানবশিশুরূপে প্রতিভাত হইলে কংস

না চিনিতেও পারেন, কাকুতি মিনতির দ্বারা মুগ্ধ হইয়া হয়তো বা শিশুবধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন ; কিন্তু এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলে শিশুর তৎক্ষণাৎ মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী। একদিকে অখণ্ড জ্ঞান, অন্যদিকে সন্দিগ্ধ ও সীমাবদ্ধ মানববুদ্ধি—ইহাই সচরাচর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই অসীম কৃপার অধিকারী হইয়াও দেবকী ও বসুদেবের সন্তানের প্রতি মমত্ববুদ্ধি তিরোহিত হইতেছে না,—কংস শিশুকে হত্যা করিবে, এই চিন্তায় মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। অন্তর্য্যামী শ্রীহরি সবই বুঝিলেন এবং আশ্বাস দিবার জন্য সেই পিতৃরূপী বসুদেব ও দেবকীকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে নিজ অলৌকিক রূপ প্রতিসংহার করিয়া সাধারণ মানবশিশুর ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন। শ্রীহরি বলিলেন যে, পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবকী পৃশ্নি নামে এবং বসুদেব সুতপা নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা কঠোর তপস্যা করিলে শ্রীহরি পরিতুষ্ট হইয়া ঠিক এইরূপ শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারীরূপে তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীহরি তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করিয়া বরপ্রদান করিতে চাহিলে "মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ"—তাঁহারা শ্রীহরির মত পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীহরি তাঁহাদের বাসনাপূরণ করিয়া তাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃশ্নিপুত্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহারাই আবার পরজন্মে কশ্যপ ও অদিতিরূপে জন্মগ্রহণ করিলে পুনরায় অদিতিগর্ভে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান্ শ্রীহরি আবির্ভূত হইয়া সেই রূপ সংবরণ করিয়া বামনরূপে দেবকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহারাই এইজন্মে বসুদেব ও দেবকী-রূপে পরিচিত, এবং তাঁহাদের এই তৃতীয় জন্মে শ্রীহরি পুনরায় তাঁহাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীহরি বলিলেন,

> এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্ জন্মস্মরণায় মে,
> নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গে ন জায়তে ॥

যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বা সকৃৎ,
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাম্॥ ১০।৩।৪৪,৪৫

—পূর্ব্বে আমিই তোমাদের নিকট বরদান করিবার সময় এবং আমার জন্মের সময় চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম, ইহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই পুনরায় ইহজন্মে তোমাদের নিকট চতুর্ভুজরূপে প্রকাশিত হইয়াছি। আমার এই রূপ না দেখাইলে আমার মনুষ্যরূপ দেখিয়া কেহ আমাকে চিনিতে পারে না। তোমরা আমাকে পুত্রভাবেই হউক অথবা ব্রহ্মভাবেই হউক, নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে আমার প্রতি আসক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইবে।

এই শ্লোক দুইটিতে শ্রীহরি দেবকী ও বসুদেবকে চতুর্ভুজরূপে আবির্ভাবের কারণ এবং তাঁহাদের পরমগতির প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছেন। তিনি যদি নররূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিকট আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীহরিকে পুত্রবোধে কোলে তুলিয়া লইতেন কিন্তু তীব্র তপস্যা করিয়া তাঁহারা যে শ্রীহরির দর্শন ও বরলাভ করিয়াছিলেন এবং সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে পরিদৃষ্ট শ্রীহরিই যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ আজ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কংস-ভয়ে অত্যন্ত ভীত, শ্রীহরি নররূপে আবির্ভূত হইলে সেই কংসভীতি আরও বর্দ্ধিত হইত। তিনি চতুর্ভুজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা শ্রীহরিকে বরদাতা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন, বাৎসল্য প্রেমাবেশে সময় সময় কংসভীতির উদ্রেক হইলেও তাঁহারা স্থিরবুদ্ধিতে বুঝিতে পারিবেন যে, কীটাণুকীট কংস পরমপুরুষের কোনও অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। তাঁহাদের যখন দেহবুদ্ধি উপস্থিত হইবে তখন তাঁহারা পিতামাতারূপেই হয়তো শ্রীহরির উপর মমত্ববুদ্ধি আরোপ করিবেন, যখন শুভবুদ্ধির উদয় হইবে তখন পিতাপুত্রের-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতিরূপে ব্রহ্মস্বরূপেই উপলব্ধি করিবেন। ফল একই

হইবে—পুত্রবুদ্ধি অথবা ব্রহ্মবুদ্ধি—যে কোন ভাবেই শ্রীহরিতে ডুবিয়া যাইতে পারিলে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ গতাগতি হইতে মুক্ত হইবেন। অনন্তরূপধারী শ্রীহরির সহিত মানুষ অনন্ত প্রকারের সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারে—তাহাতে সিদ্ধিপ্রাপ্তির কোনও বিভিন্নতা হয় না—ইহাই শ্রীহরির প্রতিশ্রুতি, ইহাই বৈষ্ণবদর্শনাচার্য্যগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। কেহ বা গোপাল মূর্ত্তিতে তাঁহার সেবা করিতেছেন, বেত্রহস্তে তাড়না করিতেছেন, উদূখলে বাঁধিয়া শাসন করিতেছেন ; কেহ বা বালকের প্রতি অসীম স্নেহ ও প্রীতিবশতঃ শ্রীহরিকে পিঁড়ি অথবা পাদুকা বহন করিয়া আনিতে বলিতেছেন,—অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, মহামহিমময় পরমেশ্বর ঘাড়ে করিয়া অতি কষ্টে ভারী পিঁড়িটি বহন করিয়া আনিতেছেন, মানুষের ব্যবহারের জন্য পাদুকা দুইটি পরম যত্নসহকারে বক্ষে আবেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন ; কেহ বা সখা মনে করিয়া তাঁহার স্কন্ধে চড়িয়া বসিয়া আছেন, পরম আদরের সহিত নিজের উচ্ছিষ্ট অন্ন শ্রীহরির মুখে তুলিয়া ধরিতেছেন ; কেহ বা আপনাকে দাস মনে করিয়া প্রভুর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিতেছেন, প্রভুর পরিত্যক্ত ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া প্রভুর নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যগুলি করিয়া বেড়াইতেছেন ; কেহ বা তাঁহাকে প্রাণপতি ভাবিয়া তাঁহার দেহ, মন ও প্রাণের পরিচর্য্যা করিতেছেন, বংশীধ্বনি শুনিয়া সংসারের অর্দ্ধসমাপ্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি ফেলিয়া রাখিয়া পাগলিনীর মত যমুনার বেলাভূমির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন ; কেহ বা গভীর অরণ্যে পর্ব্বতগুহায় একাকী বসিয়া "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" মন্ত্র জপ করিতে করিতে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভুবনমোহন রূপ ধ্যান করিতেছেন ;—পার্থক্য কিছুই নাই—পথ বিভিন্ন মাত্র, ফল সেই শ্রীহরিতে ডুবিয়া যাইয়া আত্মবিস্মৃতি ও আত্মনিবেদন, সকলেরই একমাত্র ফল পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীনতা হইতে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি। তাই একদিন বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন,—যিনি বেদান্তের নির্গুণ, নিরুপাধি

ব্রহ্ম,—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—যাঁহাকে ধারণা করিতে যাইয়া মন পুনঃ পুনঃ অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসে—সেই নির্গুণ, ধ্যানাতীত অনন্তশক্তি ঐ যশোদার উদূখলে আবদ্ধ হইয়া কাতরদৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। ভক্ত কবির ভাষায়,

জ্ঞানাতীত, রূপাতীত, ভীষণ শকতি,
ধরেছে আমার কাছে জননী মূরতি॥

তাই শ্রীহরি সর্ব্বধর্ম্ম-বিবাদের মীমাংসা করিয়া, সর্ব্বধর্ম্ম-বিরোধের সমন্বয় করিয়া আপনার শ্রীমুখে বলিতেছেন,

যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বা সকৃৎ
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাম্॥ ১০।৩।৪৫

—ইহাই অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ, অখণ্ড প্রেমস্বরূপ শ্রীহরির প্রতিশ্রুতি,—ভক্ত অথবা যোগী, অথবা বৈদান্তিক—ইঁহারা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া শুধু এই কথাগুলি মনে রাখিলেই দেখিতে পাইবেন যে, বাক্যের ঝড় ও তর্কের ধূলি অন্ধবুদ্ধিকে আকুল করিয়া প্রবল বেগে ধাবিত হইলেও শ্রীহরির পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ দিকে দিকে এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে:—

যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বা সকৃৎ
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাম্॥

—প্রেমের সম্বন্ধই স্থাপন কর, অথবা তদ্গতচিত্ত হইয়া ধ্যান, ধারণা, আসন, প্রত্যাহার সমাধিই অবলম্বন কর—ফল একই—"যাস্যেথে মদ্গতিং পরাম্"—তোমরা পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

(৪)

বসুদেব কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে আনয়ন

শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, এই কথা বলিয়া শ্রীহরি নীরব হইলেন, নিজ ঐশ্বর্য্যরূপ সংবরণ করিয়া পিতামাতার সমক্ষে প্রাকৃত মানবশিশুর মতই অসহায় অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। ঠিক সেই সময়েই শ্রীভগবানের আদেশে যোগমায়া ব্রজধামে নন্দপত্নী যশোদার গর্ভ ইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন।

এদিকে শ্রীভগবানের নির্দ্দেশমত বসুদেব নিজ শিশুপুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধীর ও নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে কারাগার হইতে বাহির হইতেছেন। যোগমায়ার প্রভাবে প্রহরীগণ নিদ্রিত, লৌহশৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছে, লৌহকপাট খুলিয়া গিয়াছে—নন্দধামে যাইবার জন্য শ্রীহরি ইচ্ছা করিয়াছেন—কে রোধিবে সেই প্রবল মনঃশক্তিকে। যে ইচ্ছাশক্তিতে অহরহঃ ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত ও বিনষ্ট হইতেছে, যে প্রবল শক্তি চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারকাকে চক্ষের দৃষ্টির দ্বারাই শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সেই মহাশক্তির সম্মুখে প্রহরীর বিরুদ্ধতাসূচক সতর্কতা, শৃঙ্খলের বন্ধন, লৌহকপাটের অবরোধ তুচ্ছ অপেক্ষাও তুচ্ছ। গভীর নিশীথে অজ্ঞাত ও অদৃষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের ভিতর দিয়া বসুদেব নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। মেঘে মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া মেঘসমূহ গর্জ্জন করিতেছে, অবিরলধারায় বারিবর্ষণ হইতেছে, পথে পথিক নাই, এই দুর্য্যোগময়ী গভীর রজনীতে সকলেই আপন আপন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। প্রবল বৃষ্টিপাতে বসুদেবের অসুবিধা হইতেছে, তাই অনন্তদেব কৃষ্ণসেবার সুযোগ পাইয়া সহস্র ফণা বিস্তার পূর্ব্বক বসুদেবের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মুষলধারে বারিবর্ষণের ফলে মথুরা-প্রান্তবাহিনী

যমুনা স্ফীতকলেবরা হইয়া উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণস্পর্শলোভাতুরা যমুনা আজ আনন্দে যেন মাতাল হইয়া উঠিয়াছেন, শত সহস্র আবর্ত্তের ঘাঘরা ঘুরাইয়া, 'তমালতালীবনরাজি-নীলা' দুই তীরকে হাসির ঠেলা দিতে দিতে আপন মনের আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া যমুনা যেন নটীর মত অলঙ্কারের ঝঙ্কার তুলিতে তুলিতে নাচিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু এই নৃত্যপরায়ণা যমুনার মাতাল-আনন্দ বসুদেবের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিতেছে—কি করিয়া গভীর যমুনা তিনি এই বর্ষামুখরিত অন্ধকার রাত্রিতে পার হইবেন তাহাই ভাবিতেছেন।

বসুদেব যমুনাকূলে দাঁড়াইয়া অকূলের কাণ্ডারী শ্রীহরিকে কি করিয়া পার করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন! বাৎসল্যপ্রেমের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! যে চতুর্ভুজ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহমূর্ত্তিকে বসুদেব কিছুক্ষণ আগেই দেখিয়াছেন, দেখিয়া বলিয়াছেন "বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ"—আপনাকে সাক্ষাৎ পরমপুরুষ বলিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি—সেই বসুদেব এখন পিতৃত্বের অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া নিখিল বিশ্বের অধিপতিকে অসহায় শিশু বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, কালপারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন—সেই পরমপুরুষকে বক্ষে আবেষ্টন করিয়াও যমুনা পার হইবার জন্য ভাবিয়া আকুল হইতেছেন! ইহাই বৈষ্ণবীমায়া—ইহাই বাৎসল্যপ্রেম। অবশেষে "ভয়ানকাবর্ত্তশতাকুলা নদী মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ"—ভয়ানক আবর্ত্তসঙ্কুলা যমুনা নদী বসুদেবকে পথ ছাড়িয়া দিলেন, যেমন একদিন মহাসাগর সীতাপতি রামচন্দ্রকে লঙ্কায় যাইবার জন্য পথ দিয়াছিলেন।

বসুদেব কর্ত্তৃক যমুনা অতিক্রম শ্রীভাগবতে এইরূপ সংক্ষেপেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ, প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা একটু বিভিন্নরূপে, কোথাও বা

আরও বিশদভাবে, কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এই পুরাণসমূহের মধ্যে দেখা যায় যে, হঠাৎ গভীর যমুনার জল জানুমাত্র গভীর হইয়া যাইল, এবং অগ্রগামী শৃগালীকে দেখিয়া যমুনার জল অত্যন্ত অগভীর মনে করিয়া বসুদেব অনায়াসে যমুনা অতিক্রম করিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণচরণ মস্তকে ধারণ করিবার জন্য যমুনার মনে যে অভিলাষ উত্থিত হইয়াছিল অন্তর্য্যামী শ্রীহরি সেই অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য "মায়াং কৃত্বা জগন্নাথঃ পিতুরঙ্কাৎ জলেঽপতৎ"—হঠাৎ পিতা বসুদেবের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া শ্রীহরি যমুনার জলে নিপতিত হইলেন, যমুনা তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়া পুনরায় শান্তভাব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত এই সমস্ত ঘটনাগুলি শ্রীভাগবতে লিপিবদ্ধ নাই, কেবলমাত্র "নদী মার্গং দদৌ"—যমুনা নদী পথ ছাড়িয়া দিলেন,—ইহাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর বসুদেব যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া নন্দালয়ে যাইয়া গোপ-গোপীগণকে যোগমায়া প্রভাবে গভীর নিদ্রায় অভিভূত দেখিতে পাইলেন এবং তখন নিশ্চিন্ত. হইয়া যশোদার শয্যায় পুত্রকে রাখিয়া যশোদার কন্যাকে লইয়া কংসকারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রসববেদনা-পরিশ্রান্তা ও যোগমায়া প্রভাবে হতচেতনা নন্দপত্নী যশোদা প্রসবের পরই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র অথবা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং পুত্রকন্যার মাতা-পরিবর্ত্তন হওয়া সত্ত্বেও নন্দগৃহে কোনও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল না। এইরূপে যশোদার কন্যাকে কারাগারে স্থাপন করিবার পর দ্বাররুদ্ধ হইয়া যাইল, লৌহ শৃঙ্খল বসুদেবের পদদ্বয় আবদ্ধ করিল, কারাগারের ভিতরে ও বাহিরে যে এতবড় একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল তাহার কোন চিহ্নই কোথাও পরিদৃষ্ট হইল না। বসুদেব উদ্বিগ্নচিত্তে কংস-আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

বসুদেব কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে "ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাঃ সমুত্থিতাঃ"—শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রহরীগণ জাগিয়া উঠিল। কংসের নিকট নূতন শিশুজন্মের সংবাদ প্রেরিত হইল, কংস দেবকীর অষ্টমপুত্রের আবির্ভাবের কথা শুনিয়া "প্রস্খলন্মুক্তমূর্দ্ধজঃ" বিপর্য্যস্ত কেশরাশি লইয়া কম্পিতপদে কারাগারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা দেবকীর বিশ্রামের অবসর নাই, তিনি সন্তান প্রসব করিয়া জাগ্রত হইয়াই রাত্রি যাপন করিতেছিলেন। এখন কৃতান্তসদৃশ রুদ্রমূর্ত্তি কংসকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার দয়া উদ্রেক করিবার জন্য দেবকী কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"স্নুষেয়ং তব কল্যাণ, স্ত্রিয়ং মা হন্তুমর্হসি"—এই কন্যাকে তুমি তোমার পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিও, এই শিশু বালিকাকে তুমি বধ করিও না। কংস প্রাণভয়ে ভীত, সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে প্রস্তুত। তিনি তৎক্ষণাৎ দেবকী-ক্রোড় হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া তাহার কোমল ও পিচ্ছল পা দুইটি ধরিয়া কারাগারস্থিত শিলাখণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। দেবকী ভয়ে অসাড় হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন, শিশুর অস্থি ও রক্তমাংস এখনই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে; —এদৃশ্য তিনি পূর্ব্বে বহুবার দেখিয়াছেন! কিন্তু এইবার অন্যরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইল। দেবী মহামায়া কংসের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ঊর্দ্ধাকাশে বিরাজমানা। আকাশে মেঘের অপেক্ষাও গম্ভীর, বজ্রের অপেক্ষাও কঠোর মহাবাণী শ্রুতিগোচর হইল—দেবকী চাহিয়া দেখিলেন,

> অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥
> দিব্যস্রগম্বরালেপরত্নাভরণ ভূষিতা,
> ধনুঃ শূলেষু চর্ম্মাসি শঙ্খচক্রগদাধরা ॥ ১০।৪।১০

—এক অপূর্ব্ব দেবী ঊর্দ্ধাকাশে বিরাজ করিতেছেন, দেবী অষ্টভুজা, —তিনি ধনুক, শূল, বাণ, চর্ম্ম, অসি, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়া আছেন, তিনি দিব্যমাল্য, বস্ত্র, চন্দন ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা। তখন

চতুর্দ্দিক হইতে শূন্যদেশে সমবেতকণ্ঠে স্তবস্তুতি হইতেছিল, কিন্তু সেই দেবগণের গম্ভীর স্তোত্রধ্বনিকে ক্ষীণতর করিয়া অষ্টভুজা দেবীর কণ্ঠ হইতে মহান্ মেঘমন্দ্রস্বর উত্থিত হইল ঃ

কিং ময়া হতয়া মন্দ, জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ,
যত্র ক্বচিৎ পূর্ব্বশত্রুর্মাহিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা ॥ ১০।৪।১২

—রে মূঢ় কংস, আমাকে বধ করিতে পারিলেই বা তোর কি লাভ হইত ? তোকে যে বিনাশ করিবে তোর সেই পূর্ব্বজন্মের শত্রু অন্য স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অসহায় বসুদেব ও দেবকীর প্রতি অত্যাচার করা সম্পূর্ণ বৃথা। এই বলিয়াই দেবী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

দেবীকে দর্শন করিয়া, তাঁহার বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া কংসের চৈতন্য হইল;—দেবকীর বিবাহের সময় যে দৈববাণী হইয়াছিল, পারিপার্শ্বিক ঘটনার দ্বারা তাহা তো মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। কংস আজ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন, তিনি পূর্ব্বকৃত অপরাধের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন, বৃথাই এতদিন পরম স্নেহময়ী ভগ্নীর উপর অত্যাচার করিয়াছেন! তাঁহার শত্রু তো দেবকীগর্ভে জন্মায় নাই, অন্য কোথাও জন্মিয়াছে। কংস তো চক্ষের সম্মুখেই দেখিলেন যে, দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান কন্যা,—পুত্র নহে। তখন দেবকী ও বসুদেবের শৃঙ্খল কংস নিজহস্তে উন্মোচন করিয়া দিলেন, এতদিন নিষ্ঠুরভাবে শিশুহত্যা করিয়াছেন স্বীকার করিয়া মৃত্যুর পর তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে শাস্তিগ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন এবং অবশেষে অনুতাপে দগ্ধ হইয়া দেবকী ও বসুদেবের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

ক্ষমধ্বং মম দৌরাত্ম্যং সাধবো দীনবৎসলাঃ,
ইত্যুক্তাশ্রুমুখঃ পাদৌ শ্যালঃ স্বস্রোরথাগ্রহীৎ ॥ ১০।৪।২৩

—কংস বলিলেন, "হে ভগ্নীপতি, তোমরা সাধু ও দীনবৎসল, অতএব আমার এই অত্যাচার ক্ষমা কর।" এই কথা বলিয়া অশ্রুপ্লাবিতবদনে কংস তখনই দেবকী ও বসুদেবের চরণ ধারণ করিলেন।

আজ এই যে ব্যবহার কংস করিতেছেন, কনিষ্ঠা ভগ্নী দেবকী ও তাঁহার স্বামীর চরণ ধরিয়া অনুশোচনায় কাঁদিতেছেন, ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিগড়মুক্ত করিয়া দিতেছেন, ইহার মধ্যে কোন ভান নাই, সমস্তই কংসের তপ্ত হৃদয় হইতে উৎসারিত হইতেছে। কোন কোন টীকাকার কংসের এইরূপ ব্যবহার সম্পূর্ণ অভিনয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ কংসের পূর্ব্ব এবং পরের আচরণের সহিত এই অনুতাপের কোনও সঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয় না। কংস আবার শত্রুরূপী শিশুকে বধ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে অসুরসমূহকে প্রেরণ করিবেন, সুতরাং তাঁহার কথা ও আচরণের মধ্যে কিছুমাত্র মিল নাই,—যাহার কথা ও আচরণ বিভিন্ন সে ভণ্ড! কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কংস সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কংস দেবকীর প্রতি স্নেহশীল, কংস জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে শাস্ত্রবচনে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। যখন তাঁহার আপনার প্রাণের উপর কোনও আশঙ্কা উপস্থিত না হয়, তখন তিনি আদর্শ ভ্রাতা ও আদর্শ মানুষ। কিন্তু কংস দুর্ব্বলচিত্ত, সুতরাং শাস্ত্রবচন তাঁহার চরিত্রের সহিত এক হইয়া মিশিয়া যায় নাই,—প্রাণের ভয় উপস্থিত হইলে সমস্ত শাস্ত্রপাঠ, সমস্ত সামাজিক বন্ধন কোথায় ভাসিয়া যায়! ইহাই তো সাধারণ মানুষের চিরদিনের চিত্র। তাই মৃত্যুর আশঙ্কায় কংস নিষ্ঠুর, মৃত্যুর কারণের বিরুদ্ধে সর্ব্ববিধ প্রতিকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু যখনই বুঝিলেন যে দেবকী হইতে তাঁহার আর কোন আশঙ্কা নাই; তখনই পূর্ব্বের স্নেহ কংসের হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল, নিরর্থক অপরাধের জন্য অনুশোচনা হইল, তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। এই যে আচরণ, ইহার মধ্যে কিছুমাত্র ভান নাই; সমস্তই খাঁটি হৃদয়ের অভিব্যক্তি—ইহাই কংসের স্বরূপ, মৃত্যুভয়ে

ভীত কংসের যে নৃশংস আচরণ, তাহা কংসের ভিতরকার বস্তুটির সাময়িক অভ্যুদয় মাত্র। সমস্ত দুর্ব্বলচিত্ত মানুষই হয়ত স্বভাবতঃ নিরীহ ও ধাৰ্ম্মিক হইয়াও এইরূপে সময় সময় আপনার অন্তরস্থিত পশুর আক্রমণে পরাজিত হইয়া লোকচক্ষুতে পশু বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই বিষয়ে কংস সাধারণ মনুষ্যশ্রেণিভুক্ত। অনেক সময়ে নিজের ভুল বুঝিয়াও তো অহঙ্কারে বিমূঢ় মানুষ তাহা স্বীকার করে না, —সে দিক দিয়া বিচার করিলে কংস সাধারণ মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ভুল বুঝিয়া ক্ষমা চাহিতেছেন, পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছেন।

দেবকী ও বসুদেব কংসের মিনতি শুনিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন—যে মানুষ তাঁহাদিগকে বহুবর্ষযাবৎ কারাগারে নির্য্যাতিত করিয়াছে, তাঁহাদের পুত্র হত্যা করিয়াছে, তাহাকে সহজেই ক্ষমা করিলেন। অনন্তক্ষমাশীল শ্রীহরির পিতামাতা কি না, তাই এত সহজে কংসকে শুধু কথায় নয়, মনেও ক্ষমা করিলেন। দেবকী ও বসুদেবের অনুমতি লইয়া কংস নিজ প্রাসাদে চলিয়া যাইলেন। অতঃপর রাত্রি প্রভাত হইলে, কংস মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া, দেবী যোগমায়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। দৈত্যগণ কংসকে সাহস-প্রদান করিল, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণকে “ভীতাঃ” ও “মুক্তকচ্ছশিখাঃ” —ভীরু, কাছাখোলা বলিয়া গালাগালি দিল, এবং আস্ফালন করিয়া বলিল যে, দশ দিন বয়সের এবং কিঞ্চিৎ ততোধিক বয়সের সমস্ত শিশুকে খুঁজিয়া হত্যা করিয়া তাহারা মহারাজ কংসকে নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টক করিবে। শ্রীবিষ্ণুই দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া দৈত্যগণ গো-ব্রাহ্মণ হত্যা করিতে আরম্ভ করিবে। এইরূপে যখন তমোগুণে বিমোহিতচিত্ত হইয়া অসুরগণ সাধু ও ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল, তখন তাহাদের সমস্ত পূর্ব্বজন্মসুকৃতি তিরোহিত হইয়া তাহারা মৃত্যুর দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মহতের অনিষ্ট ও অবমাননার ভীষণ পরিণামের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিলেন,

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ,
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ১০।৪।৪৬

—মহৎ ব্যক্তির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে কাহারও কল্যাণ হয় না। তাহাতে ধন, প্রাণ, ধর্ম্ম, ইহকাল, পরকাল সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব সকলের সাবধান থাকা উচিত—যেন মহতের মর্য্যাদালঙ্ঘন না হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ের এই শেষ শ্লোক শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ চমকিয়া উঠিলেন—তিনিও তো ঋষির গলদেশে মৃতসর্প স্থাপন করিয়া মহতের অবমাননা করিয়াছেন। তবে উপায় কি?

(৫)

গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব

দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল—শ্রীকৃষ্ণ এখন ব্রজধামে পিতা নন্দের গৃহে রহিয়াছেন, স্থতরাং এখন লীলাভূমি ব্রজপুরী। "নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ"—ব্রজরাজ নন্দ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন,—আনন্দের উচ্ছাসে তাঁহার মন উদার ও দানশীল হইয়া উঠিল। এই যে শ্রীকৃষ্ণ একই জন্মে একই কালে বসুদেবপুত্র বাসুদেব ও নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিচিত হইলেন, ইহা এক মহান্ বিস্ময়কর ব্যাপার। উভয় পিতাই শিশুকে আপনার ঔরসজাত পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, পিতৃবুদ্ধিতে স্নেহ করিতেছেন। কিন্তু উভয়েরই এই পিতৃবুদ্ধি থাকিলেও দুইজনের বাৎসল্য-প্রেমের বিশেষ তারতম্য আছে। বসুদেবের বাৎসল্যপ্রেমের সহিত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের সম্বন্ধ

আছে; গোপরাজ নন্দ কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য শুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমবান্। এই তারতম্যবশতঃই শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে পাইয়া বসুদেব স্তুতি-প্রণামাদি করিলেন কিন্তু গোপরাজ নন্দ পুত্রস্নেহে বিভোর হইয়া অসহায় মানব-শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ইহাই স্বাভাবিক। কারণ, বসুদেবের নিকট শ্রীভগবান চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শিশুমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আশ্বাসপ্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং বসুদেবের বাৎসল্যপ্রেমে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি মিশ্রিত ছিল। কিন্তু নন্দরাজ ভগবানকে সাধারণ দ্বিভুজ মানবশিশুরূপে দেখিলেন, কথাবার্ত্তা তো নাই-ই, বরং সমস্তই বিমূঢ় ও অসহায় মানবশিশুর মত আচরণ। তাই বসুদেব সময় সময় পিতৃবুদ্ধিতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যরূপ ভুলিয়া যাইলেও তাঁহার অবচেতন মনে সর্ব্বদাই একটা ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত শ্রদ্ধা বিরাজ করিতেছিল;—নন্দরাজের মনের কোনও ভাগাভাগি ছিল না, মাধুর্য্যময় বিশুদ্ধ বাৎসল্যরস তাঁহার সমগ্র মনটিকে সর্ব্বসময়েই অধিকার করিয়া থাকিত। উভয়পিতার মধ্যে এই পার্থক্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত "গোপালচম্পূঃ" নামক গ্রন্থে একটি শ্লোকে বিশদভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন।

আহ্লাদেন সমং জজ্ঞে বালঃ কিং কিং স এব সঃ,
এবং বিবেক্তুং নন্দস্য নাসীন্মতিমতী মতিঃ ॥—গোপালচম্পূঃ

—শুভলক্ষণযুক্ত পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নন্দের অন্তর ও বাহির প্লাবিত করিয়া আনন্দধারা প্রবাহিত হইতেছে, অথবা এই পুত্র সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপ কি না,—এই পার্থক্য বিচার করিবার বুদ্ধি নন্দের ছিল না।

এই একটি শ্লোকে পরমপণ্ডিত শ্রীজীব গোস্বামী মূলকথাটি সহজেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে অনেকসময় স্নেহান্ধ পিতা আপনার সমস্ত ভাগ্যোদয়ই পুত্রের শুভজন্মের ফল বলিয়া গ্রহণ করেন,

এক্ষেত্রেও হয়ত তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং "আনন্দং ব্রহ্ম"—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আনন্দঘনমূর্ত্তি—এই ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি নন্দের ছিল না। তিনি পুত্রজন্মজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, আনন্দে ডুবিয়া আছেন,—অমৃতরস পান করিতেছেন, অমৃতভাণ্ডের বিচার করিয়া তাঁহার লাভ নাই, বিচার করিবার অবসর নাই, বিচার করিবার বুদ্ধি নাই।

চারিদিকে আনন্দ-পাথার থই থই করিতেছে,—আনন্দরসকন্দ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! কংসকারাগারে ছিল স্তবস্তুতি, ছিল অশ্রুবিসর্জ্জন, ছিল ক্ষমা ও দাক্ষিণ্য ;—নন্দধামে স্তবস্তুতি, অশ্রুবিসর্জ্জন নাই, কেহ অপরাধ স্বীকার করিতেছে না, কেহ অপরাধ ক্ষমাও করিতেছে না। আনন্দ, চারিদিকে অনাবিল আনন্দ! সে কিরূপ আনন্দ!—নন্দ-যশোদার বুক ছাপাইয়া, প্রাসাদ পরিপূর্ণ করিয়া, পথঘাট প্লাবিত করিয়া, সমগ্র ব্রজধাম ভাসাইয়া সেই আনন্দলহরী চলিয়াছে—নন্দরাজগৃহে আজ সর্ব্বসুলক্ষণোপেত, নন্দকুলতিলক, সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে! আজ নন্দরাজের "কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন"—নন্দবংশ পবিত্র, মাতা যশোদা কৃতার্থা, মথুরামণ্ডলীর ধূলি পুণ্যময় তীর্থভূমিতে পরিণত। এই আনন্দ নন্দকে "মহামনাঃ"—উদারহৃদয়—করিয়া তুলিয়াছে, তিনি পুত্রের জাতকর্ম্ম সম্পাদনের পর স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর, তাম্রপৃষ্ঠ, মুক্তাদামপরিশোভিত দুইলক্ষ সবৎসা গাভী ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতেছেন। ব্রজবাসিনী গোপীগণ যশোদার পুত্র হইয়াছে শুনিয়া আনন্দিত মনে বসনভূষণ ও অঞ্জনে সুশোভিতা হইয়া দলে দলে নন্দগৃহে আগমন করিতেছেন। তাঁহাদের হাতের কঙ্কণগুলি একসুরে বাজিয়া উঠিতেছে, 'বাজে বলয়া, বাজে কিঙ্কিণী', 'পৃথুশ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ', চরণ চঞ্চলগতিতে ছুটিয়া যাইতে চায় কিন্তু বিপুল নিতম্বের ভারে তাঁহাদের চরণ মনের গতির সহিত তাল

রাখিতে পারিতেছে না, নিতম্বের দোলা খাইয়া ঘনসন্নিবিষ্ট কুচদ্বয় যেন নৃত্য করিতেছে; গোপীগণ "চিত্রাম্বরাঃ"—কত বিচিত্র বর্ণের সাড়ি পরিয়া কত বিচিত্র রূপ লইয়া তাঁহারা পথ অতিক্রম করিতেছেন; "পথি শিখাচ্যুত মাল্যবর্ষাঃ"—চটুলগতিতে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টাশীলা গোপীগণের খোঁপার বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, খোঁপা হইতে বিচিত্র-গন্ধের বিচিত্রবর্ণের ফুল পথের ধূলিতে খসিয়া পড়িতেছে,—সে দিকে লক্ষ্য নাই, গন্ধে গন্ধে বাতাস্ যেন ভারি হইয়া উঠিয়াছে, সহজে উড়িতে পারে না,—সেদিন রাজপথে পুষ্পে পুষ্পে ঢাকি গেল ধূলি, কনকে রতনে খেলিল বিজুলী। অন্য দিকে

গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ,
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ ॥ ১০।৫।১৪

—গোপগণ আনন্দিত হইয়া দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনী ও জল পরস্পরের দেহে মাখাইয়া দিতে লাগিলেন।

সে দিন ব্রজধামে দধিদুগ্ধ খাইবার লোক ছিল না—মন যেখানে বিশুদ্ধ আনন্দে পরিপূর্ণ, সেখানে শরীরের ক্ষুধা অনুভব করা যায় না;—গভীর শোক অথবা গভীর আনন্দ—উভয়ই সমভাবে মানুষকে দেহের কথা ভুলাইয়া দেয়। আজ ব্রজধামে কাহারও দেহবুদ্ধি নাই, সমগ্র দেহকে ঢাকিয়া আত্মা ছাপাইয়া উঠিয়াছে, খাবার জিনিষ নষ্ট হইতেছে বলিয়া বোধ নাই, জিনিষ নষ্ট করিয়াই পরমানন্দের অভিব্যক্তি হইতেছে। ইহা তো ব্রজপুরীর চিত্র, কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবগণ যে গর্ভস্থ শিশুকে আনন্দে স্তব করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই শিশুকে সশরীরে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়া কি করিলেন! পদকর্ত্তা শিবানন্দ তাঁহার অপূর্ব্ব পদাবলীতে সমগ্র চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

আজ স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভূবন ॥

(আজ) শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে, আর নাচে ইন্দ্র,
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া,
হাতে নড়ি, কাঁধে ভার, নাচে থৈয়া থৈয়া ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া
নাচেরে নাচেরে নন্দ আনন্দ পাইয়া ॥

সকলেরই আনন্দের সংবাদ পাইতেছি, পথে ঘাটে, ঘরে বাহিরে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সকলেরই আনন্দের বর্ণচ্ছটা ভাগবতের পাতায় পাতায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণগর্ভধারিণী যশোদা কোথায়! এমন কি, বলরামের মাতা রোহিণীর কথাও শ্রীশুকদেবের মনে পড়িয়াছে, তিনি "দিব্যবাসঃস্রক্-কণ্ঠাভরণভূষিতা"—দিব্যবসন, মাল্য, হার পরিধান করিয়া আনন্দে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এত লোকের এত রকম আনন্দের বর্ণনায় ভাগবতী কথা মধুর হইতেও সুমধুর হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু মহাকবি, মহাবাক্‌বিভূতিসম্পন্ন শুকদেব মাতা যশোদার একটি কথাও এই আনন্দ-উৎসবের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই কেন?—যশোদা কিরূপে শ্রীশুকদেবের সর্ব্বদর্শী চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাইলেন! সেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে নিদ্রিতা যশোদাকে আমরা দেখিয়াছিলাম, তাহার পর আর তো তাঁহার উল্লেখমাত্রও নাই! কারণ সহজেই অনুমেয়। সর্ব্বজ্ঞ, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেব যশোদাকে ভুলিয়া যান নাই! আজ যে বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসের আনন্দ মাতা যশোদার হৃদয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছে, সেই অপূর্ব্ব বাৎসল্য-রসের বাহিরে কোনও অভিব্যক্তি নাই, আনন্দের মহাসাগরে লেশমাত্র উচ্ছ্বাস নাই, গর্জ্জন নাই, কূলপ্লাবিত করিবার প্রচেষ্টা নাই;—যশোদা নিস্তরঙ্গ প্রেমসিন্ধু, স্থির ও নিশ্চল। শ্রীশুকদেব এই বাৎসল্যরস কখনও আস্বাদন করেন নাই, ত্রিভুবনে কোনও যুগে কোনও লীলায় কোনও

ভাগ্যবান ভক্ত এই অখণ্ড বিশুদ্ধ বাৎসল্যরস কখনও অনুভব করেন নাই। যশোদার বাৎসল্যরসের একমাত্র তুলনা যশোদারই বাৎসল্য-রস;—'গগনং গগনাকারং'—নীল আকাশই নীল আকাশের একমাত্র তুলনা—অপর কিছুই তাহার সহিত তুলনীয় নহে। যশোদার এই অপূর্ব্ব বাৎসল্যরস শ্রীশুকদেবের অনুভূতির ভিতর আসে না, সুতরাং তাঁহার জিহ্বায় প্রকাশিত হওয়াও সম্ভবপর নহে।

শ্রীশুকদেব মাতৃগর্ভ হইতেই সংসারবিরাগী, ষোল বৎসর মাতৃগর্ভে বাস করিয়া অবশেষে জন্মগ্রহণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া বনপ্রদেশে গমন পূর্ব্বক সাধনভজনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি মাতার স্তনপান করেন নাই, তিনি কখনও পিতৃক্রোড়ের আনন্দ অনুভব করেন নাই,—পিতামাতার বক্ষে যে সন্তানস্নেহ ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হয় তাহা শুকদেবের কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী—নিজের সন্তান হওয়া দূরের কথা, বিবাহ করার বাসনা কখনও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। এমন সংসারবিরক্ত চিরসন্ন্যাসী শুকদেব অখণ্ড বাৎসল্যরসের আনন্দ কিরূপে অনুভব করিবেন? তাই ত্রিকালদর্শী শুকদেব সকলের আনন্দ বর্ণনা করিলেন কিন্তু অক্ষম হইয়া যশোদার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিলেন না। অথচ মাতা যশোদা হয়ত কিছুই করিতেছেন না,—তাঁহার ধেনুদান নাই, তাঁহার বসনভূষণের গরিমা নাই, তাঁহার কবরীতে ফুল নাই, তাঁহার দোলায়মান কেশপাশ হইতে ফুল খসিয়া মাটিতে পড়িতেছে না,—তিনি শুধু শিশু কৃষ্ণকে কোলে লইয়া তাহার মুখের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া আছেন, তাঁহার পৃথিবীতে তখন নন্দ নাই, গোপগোপী নাই, বসনভূষণের বর্ণ বৈচিত্র্য নাই, তাঁহার পৃথিবীতে তখন শুধু মা ও ছেলে। এই শুদ্ধ বাৎসল্য-রসঘনমূর্ত্তি, পরমানন্দস্বরূপিণী মাতা যশোদা মানব-ভাষার মানব-বর্ণনার বিষয়বস্তু নহেন, তাই এখানে শ্রীশুকদেবের জিহ্বা মূক।

আজ ব্রজধামে ও স্বর্গপুরীতে যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহা ব্রহ্মানন্দকেও পরাজিত করিয়াছে—যে আনন্দ ক্ষুধাতৃষ্ণাবোধ ভুলাইয়া দেয়, যে আনন্দ খাবার জিনিষ মাটিতে ছড়াইয়া দিতে পারে, যে আনন্দ পরম ঐশ্বর্য্য গোধনগুলিকে দুই হাতে দান করিয়া নিজগৃহ শূন্য করিয়া দেয়, যে আনন্দে পরম যোগী মহাদেব ডমরু বাজাইয়া নৃত্য করেন, সেই মধুর আনন্দ কিরূপ তাহা কে জানে! সে আনন্দ নন্দ জানেন, গোপগোপিনীরা জানেন, আর কে জানেন? আর সর্ব্বযুগে জানেন বৈষ্ণবভক্ত,—যে ভক্তের সম্বন্ধে লালদাস বলিয়াছেন

যে জন গোবিন্দ ভজে মজে কৃষ্ণপ্রেমে
তার পদধূলি লব জনমে জনমে ॥
না ছুঁইব গঙ্গাজল না যাব তার তীরে
বসে রব তার কাছে যার নামে আঁখি ঝুরে ॥
ছোঁব না মলয় বায়ু চন্দনের পিঁড়ি,
কৃষ্ণ ব'লে প্রেমেতে যার শ্বাস পড়ে ধীরি,
তার কাছে বসে রব জুড়াব জীবন,
লাল বলে আর কিবা আছে প্রয়োজন ॥

নন্দরাজের আনন্দ আমরা দেখি নাই, গোপগোপীগণের আনন্দের সহিত আমাদের পরিচয় নাই,—তাহাতে দুঃখ নাই,—আমরা "যে জন গোবিন্দ ভজে" সেই বৈষ্ণবের অশ্রু, কম্প, পুলক এখনও দেখিতে পাই,—সেই বৈষ্ণবের মুখচ্ছবিতে এখনও নন্দপুরীর সেদিনের আনন্দের আভাষ প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে—যেমন প্রভাতের একবিন্দু শিশিরের উপর সমগ্র সূর্য্য প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

শ্রীশুকদেব চতুর্থ দিবসে শ্রীভাগবতের এই পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন সামন্তরাজা নন্দ “কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুম্”—মহারাজ কংসকে বার্ষিক রাজকর প্রদান করিবার জন্য মথুরায় গমন করিলেন। বসুদেব নন্দের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কুশল সংবাদাদি আদান প্রদানের পর বসুদেবের মুখে গোকুলে আসন্ন আশঙ্কার ইঙ্গিত শ্রবণ করিয়া নন্দরাজ বৃষচালিত শকটযোগে গোকুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়—বসুদেব কি করিয়া এতদূর হইতে পূতনা-রাক্ষসীর দুরভিসন্ধির কথা জানিতে পারিলেন? কই! নন্দত গোকুলে থাকিয়া অথবা মথুরায় আসিয়া এই বিপদের কোন ইঙ্গিত পান নাই! কারণ অনুমান করা যায়। বসুদেব ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে পরম ঐশ্বর্য্যময় শ্রীহরির পূজা করিয়াছিলেন, এখনও সময় সময় সেই চতুর্ভুজমূর্ত্তির কথা বসুদেবের মনে পড়ে, ‘তদ্‌ভাবভাবিত’ হইয়া তাঁহার মন তদাকারকারিত হইয়া যায়, ঐশ্বর্য্যের ছটা আসিয়া বসুদেবের মনকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। তাই বসুদেবের ঐশ্বর্য্য-প্রভাবিত মন দূর হইতেই ভবিষ্যৎকে দেখিতে পাইতেছে, বিপদের ইঙ্গিত প্রদান করিয়া নন্দকে ব্রজধামে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছে। কিন্তু পিতা নন্দ বাৎসল্যরসমুগ্ধ—শিশু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্নেহের পাত্র, তিনি ছাড়া অসহায় শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার আর কেহই নাই। সুতরাং নন্দের মনে ঐশ্বর্য্যভাব নাই, ঐশ্বর্য্যের দূরদৃষ্টিও নাই।

পূতনা বধ

ষষ্ঠ অধ্যায়ে পূতনারাক্ষসীর নিধনবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। আজ শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছয় দিন মাত্র। কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকারময়ী রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর! মথুরা হইতে গোকুলগমনের পথ নিস্তব্ধ, কোন পথিকের চলাচল নাই, কেবলমাত্র রাত্রিচর পক্ষীর কর্কশ রব ও পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষ হইতে শুষ্ক পত্রপতনের মর্ম্মরশব্দ কর্ণগোচর হইতেছে। এমন সময়ে নন্দ শকটে চড়িয়া মথুরা হইতে গোকুলে যাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গী গোপগণও পৃথক্ পৃথক্ শকটে আরোহণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। সকলেই নীরব, সকলের মনই একটা অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত। বসুদেবের কথা কখনও মিথ্যা হয় না, ইহা নন্দ জানেন, সুতরাং শকটের মধ্যে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কখনও বা মুদ্রিত নয়নে ভয়ে ভয়ে শ্রীহরি স্মরণ করিতেছেন।

নন্দঃ পথি বচঃ শৌরের্নমৃষেতি বিচিন্তয়ন্
হরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ॥ ১০।৬।১

—নন্দ মথুরা হইতে ব্রজের অভিমুখে যাইতে যাইতে ভাবিলেন যে বসুদেবের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গোকুলে উপদ্রবের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত পূতনারাক্ষসী ব্রজধামে এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে। এই পূতনা কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে;— পূতনা একজাতীয় রাক্ষসীর নাম। যে পূতনা-জাতীয় রাক্ষসী নন্দপুত্রের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল তাহার নাম বকী, সে বকাসুর ও অঘাসুরের ভগ্নী। এই পূতনা-জাতীয় রাক্ষসীগণ অতি ভয়ঙ্কর, ইহাদের স্তন হইতে ইচ্ছামাত্রই অতি তীব্র বিষধারা ক্ষরিত হয়, এবং সেই বিষ

মুখে লাগিলেই মানবশিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,

যস্মৈ যস্মৈ স্তনং রাত্রৌ পূতনা সংপ্রযচ্ছতি,
তস্য তস্য ক্ষণেনাঙ্গং বালকস্যোপহন্যতে ॥৫।৫।৮

—পূতনা-রাক্ষসী রাত্রিকালে যে যে বালককে স্তন পান করায় তৎক্ষণাৎ সেই সেই বালকের প্রাণ বিনাশ হয়।

এমনই ভয়ঙ্করী পূতনারাক্ষসী! ইহার মুখ সুবৃহৎ পেঁচার মত—শাণিত নখরজাল এবং তীক্ষ্ণধার দাঁতগুলি ইহার অস্ত্রের কাজ করে।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মের পরদিন প্রাতঃকালে কংস মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, মথুরামণ্ডলে দশদিনের মধ্যে যত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে যেন তেন প্রকারেণ হত্যা করিতে হইবে। এই বিরাট পরিকল্পনার অনুবর্ত্তী হইয়া বকী আজ কয়েকদিন হইতেই শিশুহত্যা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। গোপরাজ নন্দ করপ্রদানের জন্য মথুরায় আসিলে তাঁহার মুখে কংস শুনিয়াছেন যে, ব্রজধামে নন্দের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বকীও তাহা শুনিল এবং সেইজন্যই আজ তাহার ব্রজধামে অভিযান। অসাধারণ তৎপরতার সহিত বকী নন্দগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। হয়ত বকী ভাবিয়াছিল যে, যত সত্বর কার্য্যসিদ্ধি হয় ততই ভাল, উপরন্তু নন্দরাজের অনুপস্থিতিতে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকগণকে বিমোহিত করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধি করা সহজ। তাই পেচকীর মত ভীষণ ও কুৎসিত-রূপবিশিষ্টা বকী এক পরমাসুন্দরী রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশকলাপে রচিত বেণী পৃষ্ঠদেশে লম্বমান, কেশরাশির চারিপাশে মল্লিকাফুলের মালা শোভা পাইতেছে, তাহার কটিদেশ ক্ষীণ, কানের কুণ্ডলদ্বয় ঈষৎ দুলিতেছে, মুখে অপূর্ব্ব হাসি। তখন গভীর রাত্রি। যশোদার গৃহমধ্যে বিচিত্র কোমল শয্যায় নন্দনন্দন শুইয়া আছেন, যশোদা ও রোহিণী শয্যাপার্শ্বে তখনও জাগ্রত,

এমন সময়ে ধীরে ধীরে হাস্যচ্ছটায় মাতৃদ্বয়ের মনোহরণ করিয়া এক সুন্দরী রমণী দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। কত নরনারীই তো আজ ছয়দিন ধরিয়া স্রোতের মত নবজাতককে দেখিতে আসিতেছে, এই নারী হয়তো দূরপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাই এতো রাত্রিতে আসিয়া শিশুদর্শন করিতেছে। যশোদার মনে কোন দ্বিধা অথবা সন্দেহ নাই—বরং যেন একটা মাতৃত্বের গৌরব তাঁহার মনকে অধিকার করিয়াছে!—এমন ভুবনমোহন শ্যামবর্ণ শিশুকে কত নরনারী দেখিতে আসিতেছে, দিনে আসিতেছে, রাত্রিতে আসিতেছে, দীনদুঃখী আসিতেছে, অদৃষ্টপূর্বা অভিজাতবংশের এই ধনী রমণীর মত কত ঐশ্বর্য্যশালী লোকও আসিতেছে। যশোদা-রোহিণী অবাক হইয়া সেই সুন্দরীর দিকে চাহিয়া আছেন, রূপবতী নারীটির দৃষ্টি শিশু কৃষ্ণের প্রতি নিবদ্ধ, কক্ষমধ্যে একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা—কাহারও মুখে কথা নাই, গভীর রাত্রিতে কোথাও কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না—প্রকৃতি যেন ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া একটা বিপদের আশঙ্কায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময়ে দুইটি ব্যাপার সংঘটিত হইল—শিশুকৃষ্ণ অপরিচিতা নারীকে দেখিয়া চক্ষু নিমীলিত করিলেন, পূতনা শিশুকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইল।

> বিবুধ্য তাং বালমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ,
> অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধি রজ্জুধীঃ॥ ১০।৬।৮

—চরাচর নিখিল বিশ্বের আত্মাস্বরূপ বালকরূপী ভগবান সেই রমণীকে বালঘাতিনী পূতনারাক্ষসী বলিয়া বুঝিতে পারিয়া নিজ নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলেন। তখন অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন রজ্জুবোধে নিদ্রিত কালসর্পকে হাতে তুলিয়া লয় সেইরূপ পূতনা নিজ কালস্বরূপ শ্রীভগবানকে অসহায় বালকজ্ঞানে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

শিশুকৃষ্ণ পূতনাকে দেখিয়া চক্ষু বন্ধ করিলেন কেন? ইহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্য টীকাকারগণ বহু ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মূল

কথাটি সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, শিশু অপরিচিত রমণীকে দেখিয়া কতকটা লজ্জা, কতকটা ভয়ে চক্ষুমুদ্রিত করিতেছে। হয়তো শিশুরূপী পরমপুরুষের মনে অন্য কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য থাকিতে পারে—যে পাপীয়সী বহুবিধ শিশু বধ করিয়া আজ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার কলুষিত মুখদর্শন করিতে অনিচ্ছুক, অথবা আজ যদি এখন পূতনার সহিত তাঁহার চোখোচোখি হইয়া যায় তাহা হইলে পূতনার সমস্ত কপটতা ও ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে; তখন আর শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধরূপ বাল্যলীলা সংঘটিত হইবে না। সাধারণতঃ এই সমস্ত কারণ বশতঃই শ্রীকৃষ্ণ ও পূতনার সাক্ষাৎ দর্শনকার ঘটিল না, শ্রীকৃষ্ণ চক্ষুমুদ্রিত করিয়া নিদ্রা যাইবার ভান করিলেন। বকী অর্দ্ধনিদ্রিত শিশুকে কোলে তুলিয়া লইল—'যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ'—এ যেন সাধারণ দড়ি মনে করিয়া কালসর্পকে পুচ্ছ ধরিয়া টানিয়া তোলা! বকী জানে বহু শিশুবধ সে করিয়াছে, এই শিশুবধও সে অনায়াসেই করিয়া ফেলিবে—কিন্তু শুকদেব বলিতেছেন যে বকী যাঁহাকে রজ্জুখণ্ড বলিয়া হাতে তুলিয়া লইয়াছে তিনি কিন্তু গীতার ভাষায় "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো, লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ"—আমি মহাকাল, পাপীগণের ধ্বংস সাধন করিয়া এই পৃথিবীর ভারহরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি!

পূতনা শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে স্তন প্রদান করিল—যেন মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া এই অপরিচিতা নারী মাতার মতই আচরণ করিতেছে। শিশু "গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ"—যেন ক্রুদ্ধ হইয়া হঠাৎ স্তনটিকে দুই হাতে জোর করিয়া ধরিয়া স্তনদুগ্ধের সহিত পূতনার সমস্ত প্রাণশক্তি হরণ করিতে লাগিলেন। ছয়দিনের কতটুকু ছেলে, দাঁত নাই, কতটুকুই বা তাহার শক্তি! তথাপি পূতনা সেই স্তনপানের ফলে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—'মুঞ্চ মুঞ্চ' 'অলং'—ছাড়্ ছাড়্, আর স্তনপান

করিতে হইবে না—পূতনা ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটি যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, যন্ত্রণায় হাত-পা ছুঁড়িতেছে, গভীর আর্ত্তনাদ করিতেছে। এ কী হইল! মাতা যশোদা ও রোহিণী বিস্ময়ে যেন হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন, মুখে কথা নাই, কি করিবেন, কাহাকে ডাকিবেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পূতনা তাহার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া শিশুকে ছাড়াইয়া ফেলিবার প্রবল চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে শিশুর দেহে অযুতমত্তহস্তীর শক্তি, শিশুর দেহ যেন পর্ব্বতের মত ভারী। তখন পূতনা নিজরূপ ধারণ করিল, তাহার মুখগহ্বর যন্ত্রণায় প্রসারিত হইয়া গেল, হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে সে আকাশপথে উড্ডীয়মান হইয়া দূরে গোষ্ঠমধ্যে কংসের এক বিলাস-উদ্যানের উপর প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। বাগানটি ছয়ক্রোশ পরিমিত ভূমির উপর ছিল, পূতনার দেহ তাহার উপর পড়িয়া সেই সুবৃহৎ বাগানের সমস্ত গাছগুলি ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া ফেলিল। বকী ভাবিয়াছিল যে কোনরূপে উড়িতে উড়িতে কংসের নিকট যাইতে পারিলে মহাবল কংস ও বলিষ্ঠ অসুরগণ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে; কিন্তু তাহা হইল না, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় শতগঙ্গাপ্রবাহিনী শততীর্থময়ী ব্রজধামের সীমানার মধ্যেই মৃতদেহ স্থান পাইল। কত বিচিত্ররূপে—কত বিচিত্র উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ মানব জীবনে লীলা করিয়া থাকেন তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। হয়তো কোন লোক রজতমোগুণের লীলাক্ষেত্র কলিকাতা নগরীতে সারাজীবন অতিবাহিত করিয়া কর্ম্মব্যপদেশে কাশীতে যাইয়া বিশ্বনাথের শ্রীচরণ লাভ করিল, আর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল না; আবার কেহ বা দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কত সাধনভজন করিয়াও পুত্রের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া গঙ্গাহীন দেশে দূর নগরীতে কয়েকদিনের জন্য আসিয়া সেইখানেই দেহত্যাগ করিল, তীর্থভূমি তাহার দেহকে স্থান দিল না। কেহ হয়তো বহুবর্ষ ধরিয়া ভগবৎস্মরণ করিতেছেন, ভগবৎ সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব কবিতা রচনা

করিতেছেন, জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার কবি-খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, দেশবিদেশে ভক্ত বলিয়া একটা ঘোষণা পড়িয়া গিয়াছে—কিন্তু মৃত্যুকালে হয়তো তিনি দিনের পর দিন অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া রহিলেন, গলা হইতে একটা ক্লেশসূচক ঘড়্ ঘড়্ শব্দ দিবারাত্র উত্থিত হইতে লাগিল, অসংখ্য ভগবৎনামের মধ্যে একটি নামও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। আবার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন যে, এক রমণী সারাজীবন বেশ্যাবৃত্তি করিয়া মৃত্যু-সময়ে অর্দ্ধ-অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ-অঙ্গ গঙ্গাতীরে রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে ভগবৎ-স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে অনায়াসে পতিত দেহ গঙ্গাতীরে ফেলিয়া রাখিয়া পরম পবিত্র আত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিশাইয়া দিল। কে বুঝিবে লীলাময়ের বিচিত্র উদ্দেশ্য, কে বলিবে এই বিচিত্র ঘটনার কারণ কি! ঠিক সেইরূপ বিচিত্র কারণে মহাপাপী বকীর দেহ কংসের পাপপুরীতে যাইতে পারিল না—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলাভূমি ব্রজধামের মধ্যেই, শ্রীহরিকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার শেষ নিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণের নিশ্বাসের সহিত মিশাইয়া যাইল। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহার কারণ হাত্ড়াইয়া আন্দাজ করিবার চেষ্টা করেন,—আন্দাজই হয়, সত্য-নির্ণয় হয় না;—অতি বড় পণ্ডিতও শ্রীকৃষ্ণলীলার কতটুকুই বা বুঝেন, কতটুকুই বা জানেন!

কিন্তু বকী কংসের বাগানে পড়িল কেন? কারণ ছিল। সেই বাগানটি কংসের বড়ই প্রিয়,—সেই উদ্যানের আম্রপনসাদি-ফল কংসের অসুরমনের পরিপুষ্টি সাধন করিত, কোন দেবকার্য্যে তাহা ব্যবহৃত হইত না, সুতরাং সেই উদ্যানের বৃক্ষরাজি ফলবান্ হইয়াও শুধু যে নিস্ফল তাহা নহে, অসুরের সেবা করিয়া এই বৃক্ষরাজিও অসুরভাবাপন্ন। জগতে শুধু যে মানুষের দুইরকম বিভাগ আছে—দৈব ও আসুরিক—তাহা নহে, ঋষি মনুর ভাষায় বৃক্ষলতাগুলিও "অন্তঃসংজ্ঞাঃ ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ" —ইহাদের ভিতরে ভিতরে জ্ঞান আছে, ইহারা সুখ দুঃখ সমস্তই অনুভব

করিতে পারে। তাই মানুষের মত প্রাণবন্ত গাছগুলির ভিতরও কেহ দৈব ভাবযুক্ত, কেহ বা আসুরিক ভাবসম্পন্ন। জগতে দেখা যায়, কোন কোন বৃক্ষের পত্র-পুষ্প-ফল শ্রীভগবৎ-সেবায় ব্যবহৃত হয়, তাহার ছায়ায় বসিয়া ভগবৎ-ভক্তগণ বিশ্রাম করেন, পরস্পর কৃষ্ণকথা আলাপন করেন, সেই বৃক্ষের কাষ্ঠে হয়ত শ্রীভগবৎ-মন্দির ও দেব-সিংহাসনাদি প্রস্তুত হয়, এবং শ্রীভগবৎ-সেবার জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করা হয়। আবার কোন কোন বৃক্ষের পত্র-পুষ্পদ্বারা বিলাসীর বিলাস সাধন হয়, ফলগুলি ভোগাসক্ত ব্যক্তির রসনার তৃপ্তিসাধন করে, তাহার ছায়ায় হিংস্র ব্যাঘ্রভল্লুক বিশ্রাম করে, তাহার শাখায় কাক শকুনি প্রভৃতি নরমাংসভোজী পাখী বাস করে, কাষ্ঠে বহির্মুখজীবের নানাবিধ ভোগ্য বস্তু প্রস্তুত হয়। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, কুবেরের দুইটি পুত্র মহর্ষির কৃপায় শাস্তি পাইয়া দুইটি অর্জ্জুনবৃক্ষে পরিণত হইয়া গোকুলে নন্দরাজের পুণ্যগৃহের নিকট জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বৃক্ষসমূহের মধ্যে তারতম্য দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে বৃক্ষেরও পূর্ব্বসঞ্চিত শুভ এবং অশুভ অদৃষ্ট আছে, এবং তাহাদের মধ্যেও মনুষ্যাদির ন্যায় দৈব ও আসুরিক বিভাগ আছে। তাই "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্"—কণ্টকের দ্বারা কণ্টক তুলিয়া ফেলার মত শ্রীকৃষ্ণ আসুরিক ভাবসম্পন্ন বকীর গুরুভার পতন এবং যন্ত্রণায় হস্তপাদাদি ক্ষেপনের দ্বারা আসুরিক কংসের অসুরধর্ম্মবিশিষ্ট বৃক্ষগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। কংসের বাগান ধ্বংস করার আর একটি গুরুতর কারণ ছিল—ইহাই মহারাজ কংসের বিরুদ্ধে শিশুকৃষ্ণের প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা!

গোপগোপীগণ বকীর বিরাট গর্জ্জনে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে কংসের সেই বিলাসভূমি মনোরম উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কি কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য! দূর হইতেই তাঁহারা দেখিলেন যে অতিসুন্দর ফলপুষ্পশোভিত উদ্যানটি ভাঙ্গিয়াচুরিয়া এক বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে, নিকটে

আসিতেই দেখা গেল ততোধিক বীভৎস এক মৃতদেহ। মৃতদেহের মুখ যন্ত্রণায় পর্ব্বতগহ্বরের মত ফাঁক হইয়া রহিয়াছে, তাহার ভিতরে লাঙ্গলের মত বড় বড় সুতীক্ষ্ণ দাঁত, বৃহৎ পাষাণখণ্ডের মত কঠিন ও আজানুলম্বিত স্তনদ্বয়, চক্ষু দুইটি তখনও যেন অগ্নিকুণ্ডের মত সমুজ্জ্বল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রক্তবর্ণ কেশবন্যা চতুর্দ্দিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। চূর্ণ-বিচূর্ণ উদ্যানের বীভৎসতা, বিরাট আসুরিক মৃতদেহের ভীষণতা—তাহার উপর গোপীগণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, সুন্দর হইতেও অতিসুন্দর,—"বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্"—এক কৃষ্ণবর্ণ শিশু রাক্ষসীর বিশাল বক্ষস্থলের উপর খেলা করিতেছে। শিশুর ঘনশ্যামবর্ণে চারিদিক যেন স্নিগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কুঞ্চিত কেশদাম বায়ুসঞ্চারে ইতস্ততঃ কম্পিত হইতেছে, পায়ের নূপুর ক্ষণে ক্ষণে বাজিয়া উঠিতেছে, কি ভাঙ্গিল, কে মরিল, কে আসিল, শিশুর বিশ্ববিমোহিনী কোমল দৃষ্টিতে তাহার কোন সন্ধান নাই। অতি সুন্দর ও অতি কুৎসিতের কী অপূর্ব্ব সমন্বয়!

কিন্তু বকী যে সুন্দরী রমণীরূপ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা হঠাৎ তিরোহিত হইয়া তাহার স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িল কেন? সে তো মায়াধারিণী, তাহার মায়ার আবরণ খসিয়া পড়িল কিরূপে? অনেক সময় দেখা যায় যে, মানুষ ভিতরে কামনা বাসনা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে সাধু ও সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছে,—ভিতরে ভোগবাসনা-কলুষিত মন, বাহিরে বৈরাগ্যের ছদ্মবেশ। কিন্তু অন্তরে অশুদ্ধি থাকিলে বাহিরের বেশভূষা বৈরাগ্যের অনুকরণ করিতে পারে মাত্র, ঠিক খাঁটি বৈরাগ্যের বেশ দেহের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। মানুষের মনই মানুষের দেহকে সজ্জিত করে, যেখানে ভিতরে কঠোর বৈরাগ্য নাই, সেখানে কঠোর বৈরাগ্যসূচক ছিন্নকন্থা অথবা ছিন্নবাসও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। শ্রীভাগবতের টীকাকার প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় এই বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন :—"অন্তরের অশুদ্ধি

লইয়া যদি কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি কখনও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মত কৌপীন এবং ছিন্নকন্থা ধারণ করিয়া পদব্রজে তীর্থভ্রমণ ও ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে প্রকাণ্ড আশ্রম স্থাপন, গৈরিকরাগরঞ্জিত কোট, গরদের পাগড়ী, ঘড়ি চশমা প্রভৃতি ধারণ, মোটরবাসে সহর ভ্রমণ করিতে হইবে। তাঁহাকে মায়ার সংসার ছাড়িয়া কৃষ্ণের সংসার পাতাইবার জন্য বিগ্রহসেবা স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবাকার্য্যের জন্য দাসদাসী প্রভৃতি রক্ষা, সেবানির্ব্বাহের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা, সেবাকার্য্য স্থায়ীভাবে চালাইবার জন্য সম্পত্তি ও তাহা রক্ষা করিবার জন্য মকর্দ্দমা এবং 'হরেকৃষ্ণ' বলিয়া আদালত ও উকিল বাড়িতে গমনাগমন করিতে হইবে।" তাই পূতনারাক্ষসী—মাতৃভাবের অভিনয় করিতে যাইয়া এমন বেশভূষা ধারণ করিয়াছিল যাহা বিলাসিনী নটীর পক্ষেই শোভা পায়, একটু সূক্ষ্ম বিচার করিলেই তাহার অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়িয়া যায়। ছেলের কাছে মায়ের বেশভূষার খবর থাকে না, সব আলুথালু হইয়া যায়। কিন্তু এই বৃথা পোষাকপরিচ্ছদের আড়ম্বরও পূতনা রাখিতে পারিল না—তাহার হিংস্র স্বরূপ মৃত্যুকালে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। টিয়াপাখীর ভাবলেশবিহীন শুক হরিবুলি মৃত্যুকালে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দে পরিণত হইয়া গেল। ছলনা, ছদ্মবেশ, ছদ্মকণ্ঠ, ছদ্মধ্বনি সবই হয়ত মানুষ জীবিতকালে চালাইয়া গেল, পৃথিবীকে ঠকাইয়া গেল; কিন্তু যিনি "মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহং"—আমি সর্ব্বহরণকারী মৃত্যু—সেই ভগবান অন্যসময়ে মানুষের ছলনার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করিলেও মৃত্যুকালে মানুষকে অন্তরে বাহিরে নগ্ন করিয়া তাহার স্বরূপ অথবা কুরূপ জগতের চক্ষে ভাল করিয়াই দেখাইয়াই দেন—ছলনা কিছুক্ষণ চলে, চিরদিন কখনও চলে না। তাই অসীমমায়াধারিণী পূতনাকে কনকে রতনে, বসনে ভূষণে বেশ ভালই দেখাইল, তাহার পেচকীর মুখ ঢাকিয়া পরমা সুন্দরী রমণীর মুখ বাহির হইল, কিন্তু মৃত্যুকালে মৃত্যুযন্ত্রণায় সে

আপনার স্বরূপ বাহির করিয়া ফেলিল। ইহাই সত্যস্বরূপ ভগবানের চিরদিনের সত্য-বিধান।

এদিকে গোপগোপীগণ পূতনার মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া শিশুকৃষ্ণকে নিরাপদ দেখিয়া—শ্রীহরির কৃপা স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। তখন তাঁহারা সেই পর্ব্বতপ্রমাণ দেহকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শজনিত বিশুদ্ধ মৃতদেহ হইতে অগ্নি ও ধূমের সহিত এক অপ্রাকৃত সুগন্ধ বাহির হইতে লাগিল। অতঃপর তাঁহারা শিশুকে গৃহে লইয়া যাইলে মাতা যশোদা ও রোহিণী শ্রীকৃষ্ণকে গোমূত্র ও গোধূলির দ্বারা স্নান করাইয়া গোময়ের দ্বারা তাঁহার ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে কেশবাদি দ্বাদশ নাম লিখিয়া শিশুর রক্ষাবিধান করিলেন।

নন্দ ও অন্যান্য গোপগণ গোকুলের নিকটবর্ত্তী হইবার সময় দূর হইতে পূতনার পর্ব্বতাকার মৃতদেহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, এখন নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে, মৃতদেহ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া অগ্নিসঞ্চার করা হইয়াছে। নন্দ সমস্ত ঘটনা শুনিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া ব্রজধামে গমন পূর্ব্বক শিশুকৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া সমগ্র উৎকণ্ঠার অবসান করিলেন।

এই পূতনাবধ সম্বন্ধে দুইটি বিষয় বিশেষ ভাবে পরিলক্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালে অভিনব লীলার মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান। স্বল্পদিনের শিশু একজন ভয়ঙ্করী অসুরীকে নিধন করিতেছে। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। যে শ্রীহরি, ব্রহ্মা ও দেবগণের প্রার্থনায়—ভূভারহরণের জন্য মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধুরক্ষণ ও পাপীনিধনের ইহাই প্রথম সূচনা। দ্বিতীয়তঃ, পূতনা শ্রীকৃষ্ণের মুখে স্তন প্রদান করিয়া—সেই পুণ্যবলে পরমগতি প্রাপ্ত হইল। পূতনা বিষ-মিশ্রিত স্তনদান করিলেও অভিনয় কিন্তু মাতার মতই হইল, এবং সেই

সুকৃতির জন্য শ্রীহরি তাহাকে বাৎসল্যরসের সেবার অধিকারিণী করিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান প্রদান করিলেন। ইহা যতটা বিস্ময়কর, ঠিক সেই পরিমাণেই শ্রীকৃষ্ণের অসীম দয়ার পরিচায়ক। ভক্ত উদ্ধব এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিস্ময়ের সহিত বিদুরকে বলিয়াছিলেন,

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়া পায়য়দপ্য সাধ্বী—
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৩।২।২৩

—রাক্ষসী পূতনা জিঘাংসা পরবশ হইয়া যাঁহাকে স্তনক্ষরিত বিষ পান করাইয়াও জননীর উপযুক্ত পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই গোবিন্দ ভিন্ন আর কোন্ দয়ালুর আমরা শরণাপন্ন হইব ?

ভক্তরাজ উদ্ধবই বিস্মিত হইতেছেন,—সাধারণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের তো কথাই নাই।

সপ্তম অধ্যায়ে শকট-ভঞ্জন ও তৃণাবর্ত্ত-বধ বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম যখন একাশী দিন মাত্র অর্থাৎ প্রায় তিন মাস, সেই সময়ে তিনি লীলাচ্ছলে শকটাসুরকে বধ করেন। যশোদা কর্ম্মান্তরে প্রবৃত্ত, শ্রীকৃষ্ণ একটি শকটের নীচে কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। স্তন পান করিবার জন্য শিশু কাঁদিতেছে, মা-যশোদা তাহা শুনিতে পান নাই, শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে উপরের দিকে পা ছুঁড়িতে লাগিল। এদিকে কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত শকটাসুর মায়াবলে প্রচ্ছন্নভাবে সেই শকটমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা নন্দনন্দনকে চাপিয়া বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পদসঞ্চালনে শকটটি ভাঙ্গিয়া গিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই শকটাসুরও নিহত হইল। শ্রীকৃষ্ণের যখন এক বৎসর বয়স তখন একদিন যশোদা পুত্রকে কোলে লইয়া স্তনদান ও মুখচুম্বন করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ—"গরিমাণং শিশোর্ব্বোঢ়ুং ন সেহে গিরিকূটবৎ"—

যশোদা অনুভব করিলেন, শিশু যেন পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ভারী হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহাকে কোলে রাখিতে পারিতেছেন না। মাতা শিশুকে মাটির উপর রাখিয়া দিয়াছেন এমন সময় তৃণাবর্ত্ত নামক এক দৈত্য ঘূর্ণিবায়ুরূপে সমগ্র ব্রজধামকে ধূলিরাশিতে সমাচ্ছন্ন রাখিয়া সকলের দৃষ্টির অগোচরে বালককে অপহরণ করিল। কিন্তু অধিকদূর যাইতে পারিল না,—'গলে গৃহীত উৎস্রষ্টুং নাশক্নোদদ্ভুতার্ভকম্'—শিশু তাহার গলদেশ এমন করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল যে, সে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইতিমধ্যে একদিন নন্দপত্নী যশোদা এক বৎসর বয়স্ক পুত্রকে কোলে লইয়া স্তনপান করাইতেছিলেন, কতরকম আদর করিতেছিলেন, এমন সময়ে শিশু কৃষ্ণ হাই তুলিলেন। বিস্মিতা হইয়া মা যশোদা দেখিলেন,

খং রোদসী জ্যোতিরনী কমাশাঃ সূর্য্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ,
দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৄর্বনানি ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি ॥ ১০।৭।৩৬

—পুত্রের মুখমধ্যে আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, জ্যোতির্মণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্রসমূহ, দ্বীপসমূহ, পর্ব্বতসমূহ এবং স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণী অবস্থিত।

ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-দেহে যশোদার প্রথম বিশ্বরূপ দর্শন। উদ্দেশ্য কিছুই নাই, ইহা মাতার সঙ্গে শিশুর খেলামাত্র। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতির অনন্ত ঐশ্বর্য্য—যাহা এই শ্রীকৃষ্ণজীবনে, বিশেষ করিয়া—শিশুকালে—চাপা পড়িয়া আছে,—সেই অচিন্ত্যমহৈশ্বর্য্য সময় পাইলেই শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রকাশিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিয়া লন। এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছে—অনন্ত ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অগোচরে যেন শ্রীকৃষ্ণের অনবধানতা বশতঃই মাতার এই বিশ্বরূপ দর্শন ঘটিয়া গেল। কিন্তু যাহা হঠাৎ ঘটিল, যাহা আপাতদৃষ্টিতে মাতার সহিত শিশুর খেলামাত্র,—তাহা দেখিয়া যশোদা—"সঞ্জাতবেপথুঃ" হইলেন—ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে

লাগিল, তিনি বিস্ময়ে চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করিলেন। কিন্তু পুত্রের প্রতি মাতার কোনও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আসিল না, তিনি ভাবিলেন, হয়ত বা ভুল দেখিয়াছেন, অথবা ইহা হয়ত শিশুর কোন অদ্ভুত ব্যাধির সূচনা মাত্র। তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন, ভাববিচলিত হইলেন না—এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও যশোদার অখণ্ড বাৎসল্যরস অখণ্ডই রহিয়া গেল। তিনি বিশ্বরূপ দেখিতে চাহেন নাই, তিনি শিশুকে অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি পরমপুরুষ বলিয়া জানিতে চাহেন না,—এই শিশু তাঁহার নিকট অসহায় শিশুমাত্র, যশোদা ব্যতীত ত্রিভুবনে ইঁহাকে লালন পালন করিবার, রক্ষা করিবার অপর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। এইরূপে বিশুদ্ধ-বাৎসল্যবতী যশোদার বাৎসল্য-প্রেম পরীক্ষা করিবার জন্য অনেকবার শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্বদর্শিকা মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু কোনবারই শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যমহাশক্তি যশোদার বাৎসল্য-প্রেমকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন নাই, বরং শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ মহাশক্তিই মা-যশোদার বাৎসল্য-প্রেমের অধীনতা স্বীকার করিয়া জননীর বাৎসল্যের বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন,

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে হয় সঙ্কুচিত রতি
দেখিলেও নাহি মানে কেবলার রীতি ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম,
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥

—হে অর্জ্জুন, তুমি আমার যে ঐশ্বর্য্যরূপ দর্শন করিলে তাহা অত্যন্ত দুর্ল্লভদর্শন—আমি সহসা কাহাকেও দেখাই না, কেহ দেখিতে সমর্থ নহে। দেবতাগণ পর্য্যন্ত আমার এই বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য আগ্রহশীল, কিন্তু তাঁহারাও কোনদিন ইহা দেখিবার সুযোগ অথবা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই।

কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন বলিতে পারেন—'দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম',—হে পুরুষোত্তম, আপনার অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ঈশ্বরীয় রূপ সাক্ষাৎ দেখিতে ইচ্ছা করি ; আবার যখন বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন তখন সখার মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে, তিনি বলিতেছেন, "ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে"—ভয়ে আমার মন উৎপীড়িত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সৌম্যবপু হইয়া ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন!

কিন্তু কৃষ্ণমাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহেন না, দেখাইলেও তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, যদি বিশ্বরূপ দেখিয়া তাঁহার ভয় হয় সে ভয় আপনার জন্য নহে, শিশু শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় বাৎসল্যরসসঞ্চিত মনের স্বাভাবিক উদ্বিগ্নতামাত্র—কারণ, মহাকবি কালিদাসের ভাষায় "স্নেহঃ পাপশঙ্কী"—মাতৃস্নেহ সর্ব্বদাই শিশুর অনিষ্ট আশঙ্কায় চঞ্চল। মাতা যশোদার অনির্ব্বচনীয় বাৎসল্যরসের নিকট সর্ব্বরসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অন্য সব রসই সঙ্কুচিত।

অষ্টম অধ্যায়ে কুলপুরোহিত গর্গকর্ত্তৃক রোহিণীনন্দন ও যশোদা-নন্দনের নামকরণ ও তাঁহাদের অপূর্ব্ব বাল্যলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৭)

তপস্বী গর্গকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে একটি বিষয় আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। শ্রীশুকদেব যে এই সমস্ত বাল্যলীলা বর্ণনা করিতেছেন তাহাতে শ্রীভগবানের বয়ঃক্রম-অনুসারে ঘটনাবলী ঠিক পরের পর বর্ণনা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ ছয়দিন বয়সে পূতনাবধ করেন, তাঁহার ২ মাস ২১ দিন বয়সে শকটভঞ্জন লীলা হইয়াছিল, তাঁহার তিনমাস দশদিন বয়সের সময় গর্গকর্ত্তৃক নামকরণ হইয়াছিল, তিনি এক বৎসর বয়সের সময় তৃণাবর্ত্ত

দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। বয়ঃক্রম-অনুসারে ঘটনাবলী এইরূপ পূর্ব্বাপরভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীশুকদেব ঘটনার ক্রম রক্ষা না করিয়া শকটভঞ্জন লীলার পরই তৃণাবর্ত্তবধ বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী ঘটনাটি—গর্গকর্ত্তৃক নামকরণ—তৃণাবর্ত্তবধের পর কীর্ত্তন করিয়াছেন। কারণ সহজেই অনুমেয়। শ্রীশুকদেব ভাবাবেশে শ্রীভগবানের এক ভাবের বাল্যলীলাগুলি বর্ণনা করিয়া তাহার পর আবার অন্য ভাবের বাল্যলীলাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন—ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন, সময়ের সামঞ্জস্যের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই।

একদিন যদুবংশীয়গণের পুরোহিত মহাতপস্বী গর্গ বসুদেবের অনুরোধে নন্দরাজের ব্রজধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপরাজ নন্দ তাঁহাকে পরমশ্রদ্ধাসহকারে অভ্যর্থনা করিলেন, কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,

মহৎ বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্,
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্, কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥ ১০।৮।৪

—হে ভগবন্, গৃহাদিতে আসক্ত বদ্ধজীবগণের মঙ্গলের জন্যই আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি নিজ আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহীগণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। বদ্ধজীবের পরমকল্যাণসাধন ব্যতীত অন্য কোন স্বার্থদুষ্ট উদ্দেশ্য আপনাদের থাকে না!

এইরূপে আপনার দীনতা এবং মহতের কৃপার কথা নিবেদন করিয়া নন্দরাজ ঋষি গর্গকে বলিলেন যে, তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ঐ শাস্ত্রবিচারের দ্বারা মানুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল এবং বর্ত্তমান জন্মের ভবিষ্যৎ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। গর্গাচার্য্য নন্দরাজের ইঙ্গিত বুঝিয়া রোহিণীপুত্র ও যশোদাপুত্রের নামকরণ-সংস্কার সম্পাদন করিলেন। শ্রীবলরাম শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আজ তাঁহার বয়স ৩ মাস ১৮ দিন, শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্রমাসের

কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং এখন তাঁহার বয়স ৩ মাস ১০ দিন মাত্র। আচার্য্য গর্গ অনেক হিসাব নিকাশ করিলেন, বহু জ্যোতিষগ্রন্থ নাড়াচাড়া করিলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরামের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগের চরিত্র-অনুযায়ী দুইটি নাম স্থির করিলেন। রোহিণীপুত্র স্বীয় গুণের দ্বারা আত্মীয়স্বজনগণকে আনন্দিত করিবেন, সুতরাং ইনি 'রাম' নামে পরিচিত হইবেন, আবার ইনি অমিতবলশালী হইবেন বলিয়া ইনি "বল" নামেও সুবিখ্যাত হইবেন—ইনি বলরাম, ইনিই সঙ্কর্ষণ। নন্দরাজের নবজাতক সম্বন্ধে গর্গ বলিলেন,

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ,
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১০।৮।১৩

—হে নন্দ, তোমার পুত্র সত্য-ত্রেতাদি প্রতিযুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ইনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—এইবার কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া ইঁহার নাম কৃষ্ণ হইবে।

কিন্তু এইযুগে কি একমাত্র কৃষ্ণ নামেই তিনি পরিচিত হইবেন? বিরহীমানুষ বিরহের শূন্য আকাশ পরিপূর্ণ করিবার জন্য তাহার ইষ্টদেবকে সহস্রনামে ডাকিয়া থাকে,—এক কৃষ্ণনাম চিরবিরহী মানুষের অন্তরের নামপিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে না। সব ভগবৎ-নামের মধ্যে 'কৃষ্ণ' নামই শ্রেষ্ঠ—এই নাম কুলপুরোহিত গর্গকর্তৃক প্রদত্ত—'রসেন উৎকৃষ্যতে কৃষ্ণঃ'—সমস্ত রসের দিক্ দিয়া বিচার করিলে 'কৃষ্ণ' নামই সর্ব্বাপেক্ষা সরস। তথাপি গর্গ বলিলেন,

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে,
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥ ১০।৮।১৫

—হে গোপরাজ, তোমার পুত্র যুগে যুগে বহুরূপে লীলা করিয়াছেন, বহু নামে জীব তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছে, তিনিও সেই বহুনামেই

সাড়া দিয়াছেন। সেই বহুনাম, বহুলীলা আমি সব জানি না, অপরাপর লোকেও কেহ অবগত নহে।

গর্গ এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণভজনের একটি মহৎ সত্য ইঙ্গিত করিতেছেন—কে সেই শ্রীকৃষ্ণের ইতি করিবে! তাঁহার এক নাম আছে, অষ্টোত্তর শতনামও আছে, আবার অনন্ত নামও আছে—যে নামে পরবর্ত্তী সহস্র সহস্র যুগের জীব তাঁহাকে ডাকিবে, যে নাম তাঁহার এখনও কেহ জানে না, সেও তাঁহারই নাম, সেই ডাকেও তাঁহার সাড়া পাওয়া যাইবে। যে ঠিক ঠিক জানে সে বলে—"সাকার সাধকে তুমি সে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার, কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়," সেও সেই এক অদ্বিতীয় পরমপুরুষ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তাই "বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে"—যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—এক এবং অদ্বিতীয় —তিনি কখনও কখনও ইচ্ছা করেন "বহু স্যাম্"—আমি বহু হইব, ঋষি মুনি জ্ঞানী যোগীগণ তাঁহার ইতি করিতে পারেন নাই, বেদ-বেদান্ত তাঁহার নাগাল পায় না, দুই চক্ষুই হয়তো তাঁহাকে সব সময় একরকম দেখে না, চারিটি চক্ষু তাঁহাকে কি করিয়া একরূপেই দর্শন করিবে! মানুষ তাঁহার স্বরূপ জানিতে না পারিয়া বৃথা আত্মকলহ করিয়া থাকে। 'বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে'—যিনি জানেন ইহা তাঁহারই বজ্রনির্ঘোষ—ইহা তাঁহারই সাবধান বাণী!

(৮)

শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা-ভক্ষণ ও যশোদার বিশ্বরূপদর্শন

দিন চলিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম বড় হইয়াছেন, হামা দেন; হামা দেওয়া শেষ হইল, হাঁটিয়া সমবয়স্ক বালকগণের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আরও একটু বড় হইলে কিছু কিছু দুষ্টবুদ্ধিও গজাইল—ছোটটি বড়টির অপেক্ষা বেশী চঞ্চল, বেশী দুরন্ত। গোপীগণ

বালকৃষ্ণের উৎপাতে বিরক্ত হইয়া মাতা-যশোদার নিকট নালীশ করিলেন। যশোদার আদুরে গোপাল গোদোহন করিবার পূর্ব্বেই বাছুরগুলিকে খুলিয়া দেয়, পরের বাড়ী হইতে দধি দুগ্ধ চুরি করিয়া খায়, যখন পেট ভরিয়া যায় তখন পরের দ্রব্যে দাতা সাজিয়া দধি-দুগ্ধ বানরগণের ভিতর বিতরণ করিতে থাকে; গৃহস্থ সতর্ক হইলে চুরি করিবার সুযোগ না পাইয়া তাহাদের ছোট ছোট নিরীহ ছেলেমেয়ে-গুলিকে গুঁতাগাঁতা মারিয়া পলাইয়া আসে, সিকার উপর ক্ষীর ও দুগ্ধ থাকিলে টুল আনিয়া উঁচুতে উঠিয়া পাড়িয়া খায়, টুল না পাইলে ছড়ি দিয়া ভাঁড়গুলি ছেঁদা করিয়া সমস্ত জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দেয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ধোয়া ঘরের মধ্যস্থলে মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়, গোপীগণ তাড়া করিয়া আসিলে পুত্ররত্নটি ভালমানুষ সাজিয়া যশোদার অঞ্চল ধরিয়া বসিয়া থাকে, যেন নির্দ্দোষ বালক মিথ্যা অভিযোগে কতই ভয় পাইয়াছে—এইরূপ ভান করিয়া সকলের মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকে। গুরুতর অভিযোগ যশোদার নিকট হইতেছে অথচ মাতা যশোদার মুখে বিরক্তি অথবা শাসনের লেশমাত্র চিহ্ন নাই,—ছেলেকে শাসন করা তো দূরের কথা, তিনি "প্রহসিতমুখী"—ছেলের কীর্ত্তিকলাপ শুনিয়া হাসিয়া কুটিপাটি হইতেছেন। যাহাদের ক্ষতি হয় হউক, তাঁহার কৃষ্ণতো ভালই আছে,—বরং বালকের এই দুরন্ত কার্য্যগুলি তাহার বুদ্ধিরই পরিচায়ক, বকাবকির কোনও কারণ উপস্থিত হয় নাই!

কিন্তু একদিন ব্যাপার অন্যরূপ ঘটিয়া গেল;—বালক কৃষ্ণকে শাসন করিবার প্রয়োজন হইল। আবার শাসন করিতে যাইয়া যশোদা যাহা দেখিলেন তাহা অতিশয় বিস্ময়কর।

একদা ক্রীড়মানাস্তে রামাদ্যা গোপদারকাঃ
কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্॥

সা গৃহীত্বা করে কৃষ্ণমুপালভ্য হিতৈষিণী,
যশোদা ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত ॥১০।৮।৩২,৩৩

—একদিন বলরাম ও গোপগণ খেলা করিতে করিতে আসিয়া যশোদাকে জানাইল যে, কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে।

—তখন পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষিণী মাতা যশোদা বালক কৃষ্ণের হাত ধরিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন—শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে ভয়ে যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সকলেই বলিতেছে, কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে। অপরের বাড়ী ক্ষীরসর চুরি করিয়া খাইলে, তাহাদের অনিষ্ট করিলে যাহার শাসন হয় না, সেই কৃষ্ণের আজ শাসন হইবে। মাতা যশোদা তো কৃষ্ণের "হিতৈষিণী"। মাটি খাইলে বালকের অসুখ বিসুখ করিতে পারে, সুতরাং এই অপরাধ চুরিকরা, ভাঁড়ভাঙ্গা, পরের ছেলে ঠ্যাঙান অপেক্ষা অনেক বেশী। তাই মাতা আজ বালকের কোমল হাতটি দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছেন, মাতার চক্ষে যেন নিষ্করুণ শাসনের দৃষ্টি, মুখে রুক্ষ তাড়নার তিরস্কার। কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়াও মাতার মনে করুণার উদ্রেক করিতে না পারিয়া কৃষ্ণ বলিলেন,

নাহং ভক্ষিতবানম্ব ! সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্ ॥ ১০।৮।৩৫

—কৃষ্ণ বলিলেন,—না মা, আমি মাটি খাই নাই, ইহারা সকলেই মিথ্যা কথা বলিতেছে। তুমি আমার মুখের ভিতর দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে ইহারা কিরূপ সত্যবাদী !

বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের এই মিথ্যাকথাগুলি বড়ই মধুর ও বাস্তব। মাটি তিনি খাইয়াছেন, তথাপি আত্মরক্ষার জন্য ভয়ে ভয়ে একটা মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিতেছেন,—যেমন সাধারণ বালক মায়ের তাড়নার সময় বলিয়া ফেলে। পরিণাম কি হইবে তাহা কৃষ্ণ জানেন না, তবে এই

দুরাশা মনে মনে আছে যে, মাটি তো অনেকক্ষণ আগেই খাইয়াছেন, হয়ত এখন সমস্ত মাটিই উদরসাৎ হইয়া গিয়াছে, কচি কচি দাঁতগুলিতে তাহার লেশমাত্রও লাগিয়া নাই—যদিও বা কিছু এখন লাগিয়া থাকে তাহা হইলে ভীতির অভিনয় করিয়া ২।১ বার জোরে জোরে ঢোক গিলিলেই সে মৃত্তিকাখণ্ড কোথায় উদরসাৎ হইয়া যাইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই কথাগুলি আপাতদৃষ্টিতে মিথ্যা হইলেও বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ইহার ভিতর হইতে নিগূঢ় সত্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ "সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং"—সর্ব্বকালে সর্ব্ববিষয়ে সত্যস্বরূপ—তাঁহার পক্ষে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলা সম্ভবপর নহে। তিনি বলিতেছেন, "নাহং ভক্ষিতবান্ অম্ব",—মা, আমি মাটি খাই নাই। ভক্ষণ করার অর্থ বাহিরের জিনিষ ভিতরে গ্রহণ করা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গ্রহণ অথবা বর্জ্জন কিছুই নাই, কারণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারকা, জীব ও বৃক্ষলতা "একাংশেন স্থিতো জগৎ"—তাঁহার বিরাট অনন্তদেহের এক কোণে কোথায় পড়িয়া আছে! সুতরাং মৃত্তিকা অর্থাৎ পৃথিবী যাঁহার ভিতরেই অনুক্ষণ বিরাজ করিতেছে তাঁহার পক্ষে মৃত্তিকা ভক্ষণ মোটেই সম্ভবপর নহে। তাই বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলেন,—"নাহং ভক্ষিতবান্ অম্ব" কথাগুলি সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের খাঁটি সত্য কথা, অতএব বলরাম প্রভৃতি গোপবালকগণ "সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ"—সকলেই মিথ্যাবাদী। এই কথা বালক শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি একটু দুষ্টবুদ্ধি খাটাইলেন—'পশ্য মে মুখম্'—মা, তুমি আমার মুখের ভিতর দেখ, আমি কিছুই খাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে সত্যবাদী, সত্যস্বরূপ, ইহা মাতার নিকট প্রমাণ করিবার জন্য ঐশ্বর্য্যশক্তির এই কৌশল। যাই শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিলেন, তখনই দেখা যাইল যে, তাঁহার মুখবিবরে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারকা, এমন কি সমগ্র মথুরামণ্ডল—নন্দরাজ, গোপ-গোপীগণ, স্বয়ং মাতা যশোদাও সেই

মুখগহ্বরে অবস্থিত। সুতরাং যাঁহার মুখমধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে তাঁহার পক্ষে বাহির হইতে কোন মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া তাহা উদরসাৎ করা একেবারেই অসম্ভব। তাই বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলেন যে, বালক শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কথাগুলি আপাতদৃষ্টিতে মিথ্যা বলিয়া মনে হইলেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সত্য। মৃত্তিকাভক্ষণ ও বিশ্বরূপপ্রদর্শন তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে—মৃত্তিকাভক্ষণ করেন নাই, ইহা মাতার নিকট প্রমাণ করিবার জন্য বিশ্বরূপপ্রদর্শন করাইতে হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, দাদা বলরাম ও অন্যান্য গোপবালকগণ "সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ"—সকলেই মিথ্যাবাদী। বলরাম, সুদাম, বসুদাম সকলেই অবাক্—এতবড় মিথ্যাকথা বলিতেছে, আবার সব ছেলেগুলিকেই মিথ্যাবাদী সাজাইয়া দিতেছে। অথচ মাতা যশোদার কাছে কত ভাল মানুষ—ভাষা ও ভঙ্গী যেন একটা পাকা অভিনেতাকেও হার মানাইতেছে। "নাহং ভক্ষিতবান্ অম্ব সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ"—প্রত্যেকটি অক্ষর অপূর্ব্ব কোমল, কণ্ঠের মিনতি সহজেই পরিস্ফুট,—কথাগুলির ভিতর দিয়া একটা বিরাট চিত্র পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। মা যশোদা দৃঢ়হস্তে বালককে ধরিয়া আছেন, কেশরাশি পৃষ্ঠের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার দৃঢ়মুষ্টির ঝাঁকরানি খাইয়া বালক মুহুর্মুহুঃ নড়িয়া উঠিতেছে, কাঁপিয়া উঠিতেছে, অন্যান্য গোপবালকগণ দ্বিধাগ্রস্তমন—তাহারা এতটা শাসন হইবে ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই,—একবার ভাবিতেছে, মাতা যশোদার নিকট নালিশ না করিলেই ভাল হইত, আবার দিন দুপুরে অতবড় মিথ্যাবাদী কৃষ্ণের উপর রাগ ও বিস্ময় আসিয়া পড়িতেছে; বালক কৃষ্ণের মুখখানি ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছে, কাঁদ কাঁদ ভাব, অতি নরমগলায় বলিতেছেন, 'নাহং ভক্ষিতবান্ অম্ব'—আবার পরমুহূর্ত্তেই গলা চড়িয়া যাইতেছে; ছেলেদের দিকে চোখ পাকাইয়া কোমল বাম হস্তটি চক্রাকারে ঘুরাইয়া বলিতেছেন,—"সর্ব্বে

মিথ্যাভিশংসিনঃ"—মা, ইহারা সকলেই মিথ্যাবাদী ;—এ কী অপূর্ব্ব চিত্র! ত্রিকালদর্শী শুকদেব চক্ষের সম্মুখে সবই দেখিতেছেন, কী অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও কলাকৌশলের সহিত বর্ণনা করিতেছেন ! বৈকুণ্ঠনাথ পরম পুরুষ আজ বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত,—চারিদিকে কোথাও সহানুভূতির লেশমাত্র নাই, ব্রজধামের সব ছেলের দল সারি সারি দাঁড়াইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, চিরকরুণাময়ী মাতা যশোদাও আজ বিরূপ। এমন বিপদে তো শ্রীহরি কখনও পড়েন নাই! যুগযুগান্তরের যে মানুষকে অহরহঃ তিনি শাসন করিতেছেন, জোর করিয়া মায়ার দৃঢ়মুষ্টি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, কঠোর দৃষ্টিতে তাহাদের অপরাধী মুখের দিকে চাহিয়া আছেন,—আজ সেই মায়াবদ্ধ, বিশ্বপিতার অমৃতভাণ্ডারের প্রতি উদাসীন, বিষয়-মাটি-লোলুপ মানুষ শ্রীকৃষ্ণের শাসন দেখিয়া হাসিতেছে, মনে মনে বলিতেছে —প্রভু, বেশ হইয়াছে, আমরা কামক্রোধলোভমোহের বন্ধনে যখন জব্দ হই, তখন তুমি হাস, আজ তোমার দুরবস্থা দেখিয়া আমরা পাল্‌টা একচোট হাসিয়া লই!

যশোদা বলিলেন—'যদ্যেবং তর্হি ব্যাদেহি'—যদি মাটি খাস্ নাই তাহা হইলে মুখ হাঁ কর্, দেখি। তখন "অব্যাহতৈশ্বর্য্যঃ ক্রীড়ামনুজ-বালকঃ"—যে শ্রীহরির অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যশক্তি সর্ব্বদাই তাঁহার ভিতর বিরাজমান, যিনি মাতা যশোদার বাৎসল্য-প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার ছোট পুত্ররূপে লীলা করিতেছেন,—সেই শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিলেন। কচি কচি মুখ ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম বাহির হইতেছে, মাতা যশোদা ছোট হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে কৃষ্ণের মুখখানি ভাল করিয়া ফাঁক করিয়া দাঁতের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন,—এমন সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল। আবার সেই খেলা—আবার পুত্রের মুখের ভিতর বিশ্বরূপদর্শন হইয়া যাইল। কতটুকুই বা মুখ, তাহার ভিতর কতটুকুই বা জায়গা! কিন্তু মাতা যশোদা দেখিলেন, সেই মুখবিবরে চন্দ্র-

সূর্য্যগ্রহতারকা, ব্রহ্মাণ্ড, এমন কি, সমগ্র ব্রজধামের সহিত মাতা যশোদাও তাহার ভিতরে বিদ্যমান! ইহাই মাতার দ্বিতীয়বার বিশ্বরূপদর্শন—দেখিতে চাহেন না, বুঝিতে চাহেন না, মানিতে চাহেন না,—অর্জ্জুনের একবারই বিশ্বরূপদর্শন হইয়াছিল, এ যে বারংবার অযাচিত, অপ্রত্যাশিত বিশ্বরূপদর্শন! যশোদা ভাবিলেন—"কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ"—এ কি স্বপ্ন? দেবতার মায়া? আমার বুদ্ধিভ্রম? আমার ছেলেরই কোন ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য? যশোদা চিন্তার কূল কিনারা পাইতেছেন না,—এই শিশুকৃষ্ণই হয়ত পরমপুরুষ নারায়ণ—যশোদা মায়াধীন হইয়া বুদ্ধিভ্রংশতাবশে নন্দরাজকে স্বামী, শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র বলিয়া হয়ত ভুল করিতেছেন। ঐশ্বর্য্যশক্তি ভাবিলেন, বড় বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে, একবার বিশ্বরূপ দেখাইয়া ভাল হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার দেখাইতে যাইয়া সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে। যশোদার যদি মমতা না থাকে, তাহা হইলে শ্রীভগবানের বাল্যলীলা থাকে না,—কৃষ্ণের বাল্যভাব যেরূপ যশোদার প্রার্থনীয়, সেইরূপ যশোদার মমতাও শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনীয়। তখন বৈষ্ণবী মায়া পুনরায় যশোদার উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিলেন,—"সদ্যো নষ্টস্মৃতির্গোপী"—গোপী যশোদার ভগবৎ-বিষয়ক স্মৃতি বিলুপ্ত হইল, তিনি পুত্র কৃষ্ণকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

এই কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি পুণ্যবলে নন্দ ও যশোদা এইরূপ বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসের অধিকারী হইলেন! কই, বসুদেব দেবকী তো এইরূপ অখণ্ডবাৎসল্যরস কখনও আস্বাদন করিতে পারেন নাই। তখন শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, বসুগণের মধ্যে প্রধান বসু দ্রোণ ও তাঁহার পত্নী ধরা ব্রহ্মার আদেশে গোপগোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের প্রার্থনানুযায়ী ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে অখণ্ড বাৎসল্যরস আস্বাদন করিবার বর প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণই ইহজন্মে নন্দ এবং দ্রোণপত্নী ধরা

ইহজন্মে যশোদারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। সর্ব্বদর্শী শ্রীশুকদেবের নিকট এই পূর্ব্ব-জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ নন্দ ও যশোদার অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের কারণ বুঝিতে পারিলেন।

(৯)

শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম্য ও যশোদা কর্ত্তৃক বন্ধন

নবম অধ্যায়ে যশোদাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন এবং শ্রীকৃষ্ণের "দামোদর" নামে পরিচয়ের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে।

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী
কর্ম্মান্তর নিযুক্তাসু নির্ম্মমন্থ স্বয়ং দধি ॥
যানি যানীহগীতানি তদ্বালচরিতানি চ,
দধি নির্ম্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত ॥১৭।৯।১,২

—একদিন গৃহদাসীগণ কর্ম্মান্তরে ব্যস্ত থাকিলে নন্দগৃহিণী যশোদা নিজেই দধিমন্থন করিতে লাগিলেন।

—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আমি ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের যে যে বাল্যলীলা কীর্ত্তন করিয়াছি, যশোদা দধিমন্থনকালে সেই সকল কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে রচিত গান গাহিতেছিলেন।

দেখা যাইতেছে যে, বাল্যকালেই শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপীগণের মনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে গ্রাম্যচারণগণ নন্দপুত্রের বাল্যলীলা অধিকার করিয়া ছোট ছোট গান রচনা করিয়াছিলেন— অবসরকালে কৃষ্ণ-মাতা যশোদার সেই লীলাকথা মনে পড়িতেছিল এবং তিনি সেই নবরচিত গানগুলি গাহিতে গাহিতে দধিমন্থন করিতেছিলেন। তখন নিখিল বিশ্বের মাতৃরূপী যশোদার নিতম্বপ্রদেশে চন্দ্রহার, পুত্রস্নেহে তাঁহার পয়োধর-যুগল হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতেছে, ক্লান্ত বাহুযুগল মন্থনের

দড়ি কখনও বা জোরে জোরে কখনও বা ধীরে ধীরে টানিতেছে, হাতের কঙ্কণ তালে তালে বাজিয়া উঠিতেছে, কানের কুণ্ডলদ্বয় দুলিতেছে, মুখখানিতে বিন্দু বিন্দু ঘাম, "কবরী বিগলন্মালতী"—তাঁহার বিপর্য্যস্ত কেশরাশি হইতে মালতীর মালা একটি একটি করিয়া মাটিতে খসিয়া পড়িতেছে। যশোদার হাতে কৃষ্ণসেবার কাজ, মুখে কৃষ্ণকথা, মনে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ স্তন পান করিবার ইচ্ছায় মন্থনকারিণী মাতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মন্থনদণ্ড ধরিয়া মাতার কাজটি থামাইয়া দিয়া কোলে চড়িয়া তাঁহার স্তন পান করিতে লাগিলেন। এদিকে উনুনের উপর যে সমস্ত দুধের কড়া বসান ছিল, তাহারা উৎলাইয়া উঠিয়া দুধ মাটিতে পড়িয়া যাইতে লাগিল। তাড়াতাড়ি শ্রীকৃষ্ণকে কোল হইতে নামাইয়া যশোদা উনুনের দিকে ছুটিয়া যাইলেন, মাতৃস্তন্যপানে অপরিতৃপ্ত বালক ক্রোধে অধীর হইয়া নিকটেই পতিত একখণ্ড পাথরের টুকরার দ্বারা দধিমন্থন ভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটবর্ত্তী একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জনে নবনী চুরি করিয়া খাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে যশোদা দুধের কড়াগুলি উনুন হইতে নামাইয়া পুনরায় দধিমন্থনের স্থানে আসিয়া দেখিলেন, দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গিয়াছে, পুত্রটিও অদৃশ্য। মাতা সবই বুঝিলেন এবং বালককে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে, একটি ঘরে একটি উদূখলের উপর চড়িয়া কৃষ্ণ সিকা হইতে নবনী ছড়াইয়া ফেলিয়াছে, চোরের বন্ধু অনেকগুলি চোর-বাঁদর ঘরে ঢুকিয়া সিকার তলায় দাঁড়াইয়া আছে, বালক-চোরটি মুঠা মুঠা ননী পাড়িয়া পরম উৎসাহসহকারে বানর বন্ধুদিগের ভিতর তাহা বিতরণ করিতেছে। ইতিমধ্যে যশোদা একটি ছড়ি কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বালকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে তাঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বাঁদরগুলি ছড়ি দেখিয়া জানালা দরজার ফাঁক দিয়া চারিদিকে ছুটিয়া পালাইয়াছে—কৃষ্ণ

একবার পিছন ফিরিয়া মাতার শাসনমূর্ত্তি দেখিয়া একলাফে উদূখল হইতে মাটিতে পড়িয়া তীরবেগে ঘরের বাহিরে চলিয়া যাইলেন। যশোদা ঘুরিয়া বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। মাতা কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া, "বৃহৎ চলৎ-শ্রোণীভারাক্রান্ত গতিঃ"—বৃহৎ ও কম্পিত নিতম্বদেশের ভারে যশোদার গতি বাধাপ্রাপ্ত,—তথাপি অতিকষ্টে ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে চোরকে ধরিয়া ফেলিলেন। একে ছেলেটি দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, বাঁদর দিয়া নবনী খাওয়াইয়াছে, তাহার উপর মাতাকে পিছু পিছু ছুট করাইয়াছে—স্বভাবতঃই যশোদার রাগ বাড়িয়া গেল, তিনি কৃষ্ণের হাত ধরিয়া যষ্টি আস্ফালন করিতে করিতে তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এই স্থলে শ্রীশুকদেবের বর্ণনা একখানি চিত্রবিশেষ!

কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী কষন্তমঞ্জন্মষিণী স্বপাণিনা,
উদ্বীক্ষমাণা ভয়বিহ্বলেক্ষণং হস্তে গৃহীত্বা
ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ ॥১০।৯।১১

—শ্রীকৃষ্ণ অপরাধ করিয়া ভয়ে কাঁদিতেছেন, তুই হাত দিয়া চোখ রগড়াইতেছেন, চোখের কাজল হাতের সঙ্গে সঙ্গে মুখে চোখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ভয়ে ভয়ে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, মাতা পুত্রকে বেত্রাঘাতের ভয় দেখাইয়া তিরস্কার করিতেছেন।

মুখের চারিদিকে ছাপ্-ছাপ্ কাজল লাগিয়া মুখখানি কেমন দেখাইতেছিল, কে জানে! তাহার উপর হাতের উল্টাপিঠ দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আধ-ঢাকা আধ-খোলা কাঁদিয়া লাল-হওয়া চোখের এক কোণ দিয়া মা যশোদার দিকে তাকানই বা কেমন, কে জানে! আবার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বুকটা একবার উঁচু হইতেছে, একবার নীচু হইতেছে, একটা কাতর শব্দ থাকিয়া থাকিয়া বাতাসে ভাসিয়া উঠিতেছে,—এই রূপ, এই শব্দই বা কিরূপ তাহা মানসচক্ষে দেখা বা শোনা অতি ভাগ্যবান্

ভক্তের পক্ষেও সুলভ নহে। মাতা যশোদা বুঝিলেন, আর ভয় দেখান উচিত নহে, এবং তখন ছড়িটি ফেলিয়া দিয়া "ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দাম্না"—পুত্রকে রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন।

এইবার শ্রীকৃষ্ণচরিতে বিখ্যাত দামবন্ধন লীলা আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণের বয়স এখন দুই বৎসর। মাতা যশোদা পুত্রভ্রমে নিরাকার, নিরুপাধি পরব্রহ্মকে সামান্য রজ্জুর দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন,—এই কথা স্মরণ করিয়া, যোগদৃষ্টিবলে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য পুনরায় দর্শন করিয়া মহাযোগী পরমভক্ত শ্রীশুকদেব যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার মনের উচ্ছ্বাস যেন ভাষার বন্ধন মানিতে চাহিতেছে না। শ্রীশুকদেব বলিলেন,

> ন চান্ত র্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্,
> পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
> তং মমাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্,
> গোপিকোদূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ১০।৯।১৩,১৪

—যাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার অন্তরে বাহিরে, পূর্ব্বে ও পরে বিরাজিত, এমন কি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার স্বরূপের কিঞ্চিৎ মাত্র প্রকাশ, বাৎসল্য-প্রেমময়ী যশোদা, সেই অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত পরব্রহ্মকে নিজপুত্রজ্ঞানে সাধারণ মনুষ্যশিশুর ন্যায় উদূখলে বন্ধন করিতে লাগিলেন।

পরমজ্ঞানী শ্রীশুকদেব এই শ্লোক দুইটির প্রথমদিকে তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন,—যেন জ্ঞানের প্রলেপ লাগিয়া তাঁহার ভক্তিরস চাপা পড়িয়া গিয়াছে। একটি একটি জ্ঞানপূর্ণ কথা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিতেছেন—'ন চান্তঃ'—'ন বহিঃ'—নিজে সেই পূর্ণ ব্রহ্মের চিন্তায়

ডুবিয়া যাইতেছেন ;—এই ভাষা, এই ভাব, মন্দ মন্দ উচ্চাচরণ—সব সেই ভক্তিরসে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বের শ্রীশুকদেবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে—তিনি বলিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, ডুবিয়া যাইতেছেন। কিন্তু পিতা বেদব্যাস কর্ত্তৃক তাঁহার ভক্তিরসে দীক্ষা অবশেষে জ্ঞান ছাপাইয়া ভাসিয়া উঠিতেছে ;—নাই বা থাকিল তাঁহার অন্তর ও বাহির, হইলেনই বা তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত অব্যক্তপরমপুরুষ—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,'—কিন্তু মাতা যশোদা তো তাঁহাকে সাধারণ মানব-শিশুর মত বাঁধিয়াছিলেন—বাঁধিয়াছিলেন, ইহাই তো ধ্রুবসত্য, ইহাই মুখ্য—তিনি যে 'অবাঙ্‌মনসগোচরঃ' ইহা গৌণ ;—এই দুইটি শ্লোকে পরমজ্ঞানী শ্রীশুকদেব পরাজিত, পরম ভক্ত শ্রীশুকদেব বিজয়ী।

মা যশোদা মাথার ফিতা খুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদরের চারিপাশে বাঁধিতেছেন—রজ্জু যোগাড় করিলেই হইত, কিন্তু হাতের গোড়ায় মাথার ফিতাই পাওয়া যাইল, উপরন্তু বালকের শ্যাম অঙ্গ বড়ই কোমল, মাতা যশোদা কঠোর দড়ি দিয়া কি করিয়া তাহা বন্ধন করিবেন! কতটুকুই বা উদরের পরিধি,—একটি ফিতাই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু তাহা হইল না, ফিতার পর ফিতা জোড়া হইল তথাপি উদরের চারিদিকে দুই আঙ্গুল ফিতা কম পড়িতে লাগিল। গোপীরাও দেখিতেছেন ও হাসিতেছেন, যশোদা হাঁপাইতেছেন, ছেলেকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাবিধ কৌশল করিয়া ফিতাটি উদরে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছেন না। যশোদা বিস্মিতা হইলেন না,—দুরন্ত বালক বাঁধিবার সময় ছট্‌ফট্ করিতেছে, বাধা দিতেছে, পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং ঠিক করিয়া বাঁধিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু দুই আঙ্গুল ফিতা বারংবার কম পড়িতেছে কেন? বৈষ্ণব টীকাকারগণ বলেন যে শ্রীভগবানকে পাইতে হইলে দুইটি বস্তুর প্রয়োজন—একটি জীবের ব্যগ্রতা, অপরটি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা। ইহারা পরস্পর নির্ভরশীল,

ইহারা পরস্পর নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। তাই যশোদা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিতে পারা যায় নাই, দুই আঙ্গুল পরিমাণ ফিতা কেবলই কম পড়িতেছিল; কিন্তু

স্বমাতুঃ সিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ,
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥ ১০।৯।১৮

—মাতা যশোদার শরীর ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার কবরী হইতে ফুলগুলি খসিয়া পড়িতেছে—এই দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে দয়ার উদ্রেক হইল, তিনি তখন স্বেচ্ছায় বন্ধন মানিয়া লইলেন।

মাতা যশোদা এইবার সহজেই শ্রীকৃষ্ণের উদরের চারিপাশে ফিতা বাঁধিয়া দিয়া সেই ফিতাটি আবার উদূখলে বাঁধিয়া রাখিলেন—ভারি জিনিষ টানিয়া তুরন্ত বালক বেশী দূর যাইতে পারিবে না। এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি তাঁহার বন্ধনে বাধাপ্রদান করিতেছিলেন, কিন্তু যাই কৃপাশক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য্যশক্তি তিরোহিত হইলেন। কেননা, শ্রীভগবানের কৃপাশক্তিই তাঁহার অনন্ত শক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রী এবং অধিনেত্রী। তাই জ্ঞান, যোগাভ্যাস, কিছুই তাঁহাকে পাইবার জন্য যথেষ্ট নহে, তাঁহার কৃপার প্রয়োজন হয়, এবং এই কৃপা ভক্তগণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। তাই পরমজ্ঞানী শ্রীশুকদেব সারসত্য অনুভব করিয়া রাজা পরীক্ষিৎকে বলিলেন,

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ,
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ১০।৯।২১

—হে পরীক্ষিৎ, যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগসম্পন্ন মানুষের যেরূপ সহজলভ্য হইয়া থাকেন, আত্মজ্ঞ জ্ঞানীগণের সেইরূপ সহজলভ্য হন না। কর্ম্মাদিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের তো কথাই নাই।

শ্রীকৃষ্ণের এই বাল্যলীলা—“দামবন্ধনলীলা” নামে ভক্তসমাজে পরিচিত। দাম অর্থাৎ মাথার ফিতার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উদরে বাঁধা

হইয়াছিল—দাম+উদর—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মাতার বন্ধন চিরস্মরণীয় করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে দামোদর নামে পরিচিত হইলেন। এই দামবন্ধনলীলা কার্ত্তিক মাসে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বৈষ্ণবগণ সমগ্র কার্ত্তিকমাসে পদ্মপুরাণে লিপিবদ্ধ দামোদরাষ্টক নামক প্রসিদ্ধ শ্লোকগুলি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এই লীলা কার্ত্তিকমাসের শুক্লা প্রতিপদে প্রকটিত হইয়াছিল, সেইজন্য কার্ত্তিকমাস 'দামোদর' নামে প্রসিদ্ধ। এই লীলা অবলম্বন করিয়া শ্রীসত্যব্রত মুনি 'শ্রীদামোদরাষ্টকং'নামে এক মধুর স্তোত্র পদ্মপুরাণে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ বলেন যে, এই আটটি শ্লোক অন্ততঃ সমগ্র কার্ত্তিক মাসে নিত্যপাঠ করা উচিত। কারণ, এই দামোদরাষ্টক স্তোত্র দামোদরের বশীকরণ মন্ত্র স্বরূপ। এই স্তোত্রে লিপিবদ্ধ দ্বিতীয় শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্,
মুহুঃ শ্বাসকম্পত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ—
স্থিতগ্রৈবং দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্॥

—বালক শ্রীকৃষ্ণ মাতার হস্তে যষ্টি দেখিতে পাইয়া ভয়ে কাঁদিতেছেন, হাত দুইটি উলটাইয়া চোখ মুছিতেছেন, ভয়ে ভয়ে আড়চোখে এক একবার মা যশোদার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছেন, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছেন বলিয়া গলার হার মধ্যে মধ্যে কাঁপিয়া উঠিতেছে, বাৎসল্য-রসভক্তিতে প্রবল শক্তিশালিনী মাতা যশোদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ফিতার দ্বারা উদরে বাঁধিয়া ফেলিতেছেন—এমন যে দামোদর তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।

শ্লোকটি একখানি চিত্র-বিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বৃক্ষরূপী নলকূবর ও মণিগ্রীবের উদ্ধার

পুত্র কৃষ্ণকে এইরূপে ভারী উদূখলের সহিত বাঁধিয়া মাতা যশোদা কর্ম্মান্তরে গমন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, যশোদা গৃহকর্ম্মে চলিয়া যাইবার সময় বালক কৃষ্ণকে শাসাইয়া যাইলেন—"যদি শক্নোষি গচ্ছ ত্বম্ অরে চঞ্চল চেষ্টিত!"—ওরে চঞ্চল বালক, আমি তোকে বাঁধিয়া রাখিলাম, যদি তোর সাধ্য থাকে তবে তুই বন্ধন খুলিয়া অন্যস্থানে গমন কর। মাতা যশোদা এখনও ভাল করিয়া দুরন্ত বালকটিকে চিনিতে পারেন নাই। যশোদা যতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন ততক্ষণ ছেলেটি ভালমানুষের মত নিশ্চেষ্ট ও নিরুপায় হইয়া বসিয়াছিল; যাই মাতা কর্ম্মান্তরে গমন করিলেন, তখনই চঞ্চল বালক উদূখলটি টানিতে টানিতে —"জগাম শনকৈস্তত্র যত্রাস্তাং যমলার্জ্জুনৌ"—যেখানে দুইটি সুবৃহৎ অর্জ্জুন গাছ একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে ধীরে ধীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই বৃক্ষদ্বয় পূর্ব্বজন্মে কুবেরের পুত্র ছিল— একজনের নাম নলকূবর, অপর জন মণিগ্রীব।

এই যমক অর্জ্জুন বৃক্ষ দুইটির অদ্ভুত কাহিনী দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব দামবন্ধন লীলার সঙ্গে সঙ্গেই যমলার্জ্জুন ভঞ্জন উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ, এই দুইটি ঘটনা অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট। নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীশুকদেব বৃক্ষ দুইটির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ"— ইহারা পূর্ব্বজন্মে মদমত্ততা হেতু নারদের অভিশাপে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজা পরীক্ষিতের কৌতূহল হইল যে, এমন কি অপরাধ কুবেরের পুত্রদ্বয় করিয়াছিল যাহাতে পরম বৈষ্ণব, পরম দয়াশীল দেবর্ষি নারদেরও তাহাদের উপর ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল! শ্রীশুকদেব

বলিলেন যে, কুবেরের পুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব অতিশয় গর্ব্বিত ছিল এবং সর্ব্বদাই মদিরা পান করিয়া পুষ্পিত বনমধ্যে রমণীগণের সহিত বিহার করিত। এই গুহ্যকদ্বয়ের সর্ব্বদাই যেন উন্মত্তের অবস্থা! ধনমদ, বিদ্যামদ, আভিজাত্যমদ তো তাহাদের ছিলই, তাহার উপর সেই অভিশাপের দিন অতি উগ্র বারুণীমদও ইহারা পান করিয়াছিল। এই চারিটী মদের একটী থাকিলেই মাথার ঠিক থাকে না—নলকূবর ও মণিগ্রীবের তো চারটীই একত্র জুটিয়াছিল! সেদিন তাহারা পদ্মরাজিতে পরিপূর্ণ মন্দাকিনীর জলমধ্যে অবগাহন করিয়া যুবতীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল, এমন সময় দেবর্ষি নারদ বীণাবাদন করিয়া হরি-গুণগান করিতে করিতে আকাশপথে সেই স্থান অতিক্রম করিতেছিলেন। নারদ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিলেন। দেবর্ষিকে দেখিয়া বিবস্ত্রা রমণীগণ লজ্জিত হইল এবং কতকটা ভয়ে, কতকটা ভক্তিতে তীরভূমি হইতে বস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পরিধান করিল; কিন্তু উলঙ্গ সেই কুবেরপুত্রদ্বয় মহর্ষি নারদকে দেখিয়াও কোন ভয়, লজ্জা অথবা সম্ভ্রমের পরিচয় দিল না। ইহাই স্বাভাবিক, ইন্দ্রিয়ভোগে ডুবিয়া থাকিলেও স্ত্রীলোকেরা একেবারে চৈতন্য হারাইয়া ফেলে না,—পুরুষ একেবারে উন্মত্ত হইয়া যায়;—একটি প্রচলিত বচন আছে—'কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা'—কামাতুর পুরুষের ভয় অথবা লজ্জা কিছুই থাকে না। কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। স্ত্রীলোকেরা প্রবলশক্তি পুরুষের অধীন, সুতরাং পুরুষের ইন্দ্রিয়-উপভোগের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়াও তাহারা ভিতরের চৈতন্যটুকু হারাইয়া ফেলে না—তাহারা পুরুষকে শরীর দিলেও মন সব সময়ে দেয় না। কিন্তু পুরুষ যখন কামান্ধ হয় তখন আপনার আর্থিক অবস্থা, সমাজের নিয়ম, আত্মার অধোগতি কিছুই সে মনে রাখে না,—তখন তাহার জীবনে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ হইয়া দাঁড়ায়। বিধিমতে বিবাহিত স্ত্রীর সহিত ব্যবহারেও

পুরুষের এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে—অসংখ্য পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিতেছে, লালন পালন করিবার আর্থিক সচ্ছলতা নাই, তথাপি ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি সে ছাড়িতে পারিতেছে না—উন্মত্ত মানুষ চোখ বুজিয়া নিজে ধ্বংস ও দারিদ্র্যের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে ভবিষ্যতে ভিক্ষুক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিয়া যাইতেছে, তথাপি চিত্তসংযম নাই, বিবেকবুদ্ধি নাই। অপরিমিত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা স্ত্রীলোকের স্বভাব নহে, ইহা পুরুষের দুর্ব্বলতা। তাই সেদিন দেবর্ষি নারদের সম্মুখে মন্দাকিনী-বিহারিণী নারীগণের লজ্জা হইয়াছিল, কিন্তু নলকূবর ও মণিগ্রীবের তখন ভীতি-বিহীন, লজ্জাবিহীন বিমূঢ় অবস্থা। অন্তর্য্যামী পরমদয়াল দেবর্ষি নারদ তাই উলঙ্গ রমণীগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন না, উলঙ্গ কুবেরপুত্রদ্বয়ের উন্মত্ততা বিদূরিত করিবার জন্য, তাহাদের চিত্তশুদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে অভিশাপের ভাষায় আচ্ছাদিত পরম করুণার বাণী ঘোষণা করিলেন :

> যদিমৌ লোকপালস্য পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ,
> ন বিবাসসমাত্মানং বিজানীতঃ সুদুর্ম্মদৌ ॥
> অতোঽর্হতঃ স্থাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ,
> স্মৃতিঃ স্যান্মৎপ্রসাদেন তথাপি মদনুগ্রহাৎ ॥
> বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধা দিব্যশরচ্ছতে,
> বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ ॥ ১০।১০।২০-২২

—এই নলকূবর ও মণিগ্রীব লোকপাল কুবেরের পুত্র, কিন্তু ইহারা উন্মত্ত হইয়া আপনাদের নগ্নতার জন্য লজ্জিত হইতেছে না। সুতরাং জড়ের মত বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হউক। আমার অনুগ্রহে বৃক্ষযোনিতেও ইহাদের পূর্ব্বস্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বৃক্ষযোনিতে ইহাদের দেবপরিমাণে শত বৎসর অতীত হইলে (মানুষের হিসাবে প্রায় ৩৬০০০ বৎসর) ইহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিয়া

মুক্ত হইবে, এবং পুনরায় দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইবে।

এমন অপূর্ব্ব অভিশাপ পূর্ব্বে কাহারও ভাগ্যে সংঘটিত হয় নাই। দেবর্ষি নারদ শাপচ্ছলে আজ মহাপাপীগণকে অপূর্ব্ব কৃপা করিতেছেন। এই আঘাত তো দেবর্ষির কৃপাস্পর্শ! জড়প্রকৃতি কুবেরপুত্রদ্বয় চিরদিনই পাপ করিত, তাহাদের অধোগতি হইত। তাহাদিগকে বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়া দেবর্ষি তাহাদের পাপের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন, বৃক্ষযোনিতেও শ্রীকৃষ্ণদর্শন অহরহঃ হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, তাহারা শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে মুক্ত হইয়া যাইবে, তাহাদিগের চিরকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-চরণে রতি হইবে। দেবর্ষি 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—বজ্রের মত কঠোর, আবার কুসুমের মত কোমল, মহাপাপীদ্বয় মহাভাগ্যবান্, ভক্তের সত্যরক্ষাকারী পাপীতাপীর আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ পরম দয়াল।

বহুদিন হইতেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন বৃক্ষ দুইটিকে দেখিতেছেন, কই এতদিন তো প্রভুর নারদের কথা মনে পড়ে নাই, বৃক্ষ দুইটিকে উদ্ধার করিবার জন্য মনে কৃপার সঞ্চার হয় নাই! আজ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদূখলে আবদ্ধ,—তাই বদ্ধ জীবের দুঃখ আজ প্রভু নিজের বন্ধনের ভিতর দিয়া অনুভব করিতেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ উদূখলটি টানিতে টানিতে অঙ্গনের বাহিরে যাইয়া অর্জ্জুন বৃক্ষ দুইটির প্রতি ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলেন, তাহাদের বন্ধন দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, অমোঘবাক্ নারদের অভিশাপের কথা প্রভুর মনে পড়িল, তখন "ঋষের্ভাগবতমুখ্যস্য সত্যং কর্ত্তুং বচো হরিঃ"—মহাভাগবত দেবর্ষি নারদের বাক্য সত্য করিবার জন্য হামা দিয়া উদূখলকে টানিতে টানিতে বৃক্ষদ্বয়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উদূখলটি বাঁকা হইয়া বৃক্ষ দুইটিতে আটকাইয়া গেল,—শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের ভিতর দিয়া যাইবার জন্য উদূখলটিকে আকর্ষণ করিলেন, প্রবল আকর্ষণের ফলে বৃক্ষ দুইটি সমূলে উৎপাটিত হইয়া প্রচণ্ডশব্দে ভূমিতে নিপতিত

হইল। তখন দুইজন সিদ্ধপুরুষ "শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ"—উজ্জ্বল জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বৃক্ষদ্বয় হইতে নির্গত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

> কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ
> ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥
> ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ,
> ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ ॥ ১০।১০।২৯,৩০

—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগিন্, সর্ব্বকারণ পরমপুরুষ, আপনার সমান বা অধিক কেহ নাই। চিদচিদাত্মক এই বিশ্বকে সনকাদি ব্রহ্মজ্ঞগণ আপনার রূপ বলিয়া থাকেন। আপনিই সর্ব্বজীবের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও আত্মা। আপনিই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা।

প্রাণের আবেগে ভক্তির উচ্ছ্বাসে গুহ্যকদ্বয় আরও কত কি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিলেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কতবার বলিয়া প্রাণের ক্ষুধা, বৃক্ষজন্মের ভাষাবিহীন অক্ষমতা মিটাইলেন। কৃষ্ণনামের স্বভাবই এই যে, কোন শুদ্ধচিত্ত ভক্তের রসনায় যদি একবার তাহা উচ্চারিত হয় তাহা হইলে স্বয়ংই নাম পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতে থাকে। শ্রীশুকদেব গুহ্যকদ্বয়ের শ্রীকৃষ্ণস্তুতিবর্ণন প্রসঙ্গে শ্লোকগুলিতে দুইবার মাত্র কৃষ্ণনাম উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বক্তব্য এই যে, গুহ্যকদ্বয় সহস্র সহস্র বৎসরের জিহ্বাবিহীন দীনতা সহ্য করিয়াছেন, এখন সহস্রবার কৃষ্ণনাম করিয়া তাঁহারা প্রাণের বহুযুগের পিপাসা মিটাইতেছেন। এই স্তবস্তুতির ভিতর আর একটি পরিলক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে—যাঁহারা জীবনে কখনও কৃষ্ণনাম করেন নাই, তাঁহারাও আজ শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে মহাজ্ঞানীর মত, পরম ভক্তের মত ভাষা ও ভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ধারণা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকৃপার এতই মহিমা,—তখন আর ভাষার অভাব থাকে না, ভাবের উৎস শতমুখে বাহির হইতে থাকে। এইরূপে বহু

স্তবস্তুতি করিয়া নলকূবর ও মণিগ্রীব শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই শেষ নিবেদন করিলেন :

বাণীগুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব
পাদয়োঃ নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎ প্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু
ভবত্তনূনাম্ ॥ ১০।১০।৩৮

—হে ভগবন্, আমাদের জিহ্বা যেন সর্ব্বদাই আপনার নাম কীর্ত্তন করে, কর্ণদ্বয় যেন অহরহঃ আপনার লীলাকথা শ্রবণ করে, হস্তদ্বয় যেন আপনার সেবা করে, মন যেন আপনার পাদপদ্ম চিন্তা করে, আমাদের চক্ষুদ্বয় যেন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ এবং আপনার ভক্তগণকে দর্শন করিয়া সার্থক হয়, আমাদের মস্তক যেন আপনার নিবাসস্বরূপ এই জগতের ধূলিতে সর্ব্বদাই অবনত হয়।

ইহাই নলকূবর ও মণিগ্রীবের শেষ প্রার্থনা। বালক শ্রীকৃষ্ণ সমস্তই স্থিরভাবে শুনিলেন, বুঝিলেন যে শিশুর রূপ ধরিয়া ইহাদিগকে ছলনা করা চলিবে না—তিনি ধরা পড়িয়াছেন! তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্
দর্শনাৎ নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥ ১০।১০।৪১

—সূর্য্যের দর্শনে যেমন চক্ষুর অন্ধকাররূপ বন্ধন কাটিয়া যায়, সেইরূপ যাঁহারা আত্মজ্ঞানী, যাঁহাদের চিত্ত আমাতেই সমর্পিত, তাদৃশ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুগণের দর্শনলাভে জীবের আর সংসারবন্ধন হয় না।

এইরূপে ভক্ত দেবর্ষি নারদের জয় ঘোষণা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে গুহ্যকদ্বয়ের সমস্ত প্রার্থনারই উত্তর প্রদান করিলেন। তখন নলকূবর ও মণিগ্রীব শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া "জগ্মতুর্দিশ

মুত্তরাম্”—উত্তরদিকে গমন করিলেন। ভক্ত বন্ধনমুক্ত হইল, প্রভু কিন্তু আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার বন্ধন কেহ মুক্ত করিল না।

বৃক্ষ পতনের শব্দ শুনিয়া নন্দ প্রভৃতি গোপগণ বজ্রপাতের আশঙ্কা করিয়া তথায় আগমন করিলেন এবং নন্দরাজ শ্রীকৃষ্ণকে মাতাকর্তৃক উদূখলে আবদ্ধ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন।

একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামসহ গোপগণের গোকুল পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন এবং বৃন্দাবনে গোবৎসচারণকালে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বৎসাসুর ও বকাসুর নিধন বর্ণনা করা হইয়াছে।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা চলিতে লাগিল ; কেহ যেন তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে না পারে, এইজন্য তিনি সাধারণ মানবশিশুর মত সমস্ত আচরণ করিতে লাগিলেন।

গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ
উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ ॥
বিভর্ত্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকম্,
বাহুক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাঞ্চ প্রীতিমাবহন্ ॥ ১০।১১।৭,৮

—শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের করতালিধ্বনিতে উৎসাহিত হইয়া কাষ্ঠনির্মিত পুত্তলিকার ন্যায় কখনও নৃত্য করিতেন, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন।—কখনও বা তিনি গোপীগণের আদেশে পিঁড়ি, ধান মাপিবার পাত্র এমন কি পাদুকা বহন করিয়া আনিতেন, কখনও বা নানা ভঙ্গীতে হাত ঘুরাইয়া গোপীগণের মনে আনন্দ প্রদান করিতেন।

ইহাই বোধ হয় বাল্যলীলার চরম অভিব্যক্তি। ভক্তবৎসল প্রভু, আনন্দময় প্রভু গোপীগণের আদেশে নাচিতেছেন, গান গাহিতেছেন, হাত নাড়িয়া নাড়িয়া বিশ্বজনীন শিশুলীলার অভিনয় করিতেছেন, এমন কি পাদুকা বহন করিয়া আনিতেছেন ;—এ কী বিচিত্র, কী মধুর লীলা!

গোপীগণের মন মুগ্ধ, তাঁহারা পূতনাবধ, তৃণাবর্ত্তবধ, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন ভুলিয়া যাইতেছেন—অতি সাধারণ এক মানবশিশু তাঁহাদের সম্মুখে চিরযুগের শিশুর মত লীলা করিয়া চলিয়াছে।

এদিকে ব্রজধামে ঘন ঘন উৎপাত দর্শন করিয়া সকলে মিলিত হইয়া গোকুলবাসিগণের কল্যাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সভামধ্যে উপানন্দ নামে একজন জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ গোপ নানাবিধ উৎপাতের কথা উল্লেখ করিয়া গোকুল পরিত্যাগ করিয়া সকলকে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। উপানন্দ নন্দরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

> বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্
> গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্ ॥
> তত্র তত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্ক্ত মা চিরম্
> গোধনান্যগ্রতো যান্তু ভবতাং যদি রোচতে ॥ ১০।১১।২৮,২৯

—বৃন্দাবন নামে এক বন আছে, উহা পবিত্র পর্ব্বত, তৃণ ও লতায় পরিপূর্ণ, সুতরাং গবাদি পশুগণের হিতকর। ঐ বৃন্দাবন গোপ, গোপী ও গোসমূহের বাসোপযোগী এবং নূতন নূতন ছোট ছোট কাননে পরিবেষ্টিত।

—তোমাদের সকলের যদি অভিমত হয় তাহা হইলে আজই আমরা সেই বৃন্দাবনে গমন করিব। শকটগুলি সাজাইয়া লও, বিলম্ব করিও না —গোসমূহ অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকুক।

উপানন্দের উপদেশ সকলেরই মনোমত হইল। সকলে মিলিয়া সেইদিনই বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ দুই বৎসর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। গোকুলের ক্ষুদ্র বনভূমি এখন আর তাঁহার বৃহত্তর লীলার পটভূমিকা হইতে পারে না—চতুর্দ্দিকে

অরণ্যানী পরিব্যাপ্ত বৃন্দাবনই এখন তাঁহার উপযুক্ত লীলাক্ষেত্র। গোকুল বহুজনাকীর্ণ ও সংকীর্ণ স্থান, সেখানে গোচারণের উপযুক্ত যমুনা-পুলিনের মত বিস্তৃত স্থান নাই, গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত নাই, নানাবিধ লতাকুঞ্জ পরিশোভিত বন নাই, কাজেই সেখানে লীলাময়ের সখ্যরসের পৌগণ্ডলীলা প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর নহে। এইজন্য শ্রীভগবানের লীলাশক্তি নন্দাদি গোপগণের হৃদয়ে এক অভিনব প্রেরণা জাগাইল, তাঁহারা পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে যমলার্জ্জুন ভঞ্জন পর্য্যন্ত লীলা গোকুলেই হইয়াছিল। ইহার পরে শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, সুবল প্রভৃতি গোপবালকগণসহ গোচারণাদি পৌগণ্ডলীলা এবং গোপরমণীগণের সহিত রাসাদি কৈশোর লীলা শ্রীবৃন্দাবনেই প্রকাশিত হয়। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপবালকগণের সহিত প্রত্যহই যমুনার সৈকতভূমিতে গোবৎসচারণ করিতে যান। ব্রজেন্দ্রনন্দন এখন চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। প্রায় এক বৎসর হইল বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, ইহার মধ্যেই বৃন্দাবনের বনানী, পর্ব্বত ও যমুনাপুলিন তাঁহার নিকট পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। কখনও বা তাঁহারা গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া বেণুবাদন করেন, কখনও বা বন্যফল পাড়িয়া পরস্পরের গায়ে ছুঁড়িয়া মারেন, কখনও বা কিঙ্কিণী ধ্বনি করিতে করিতে ফল লইয়া বল খেলার অনুকরণ করেন, কখনও গায়ে কম্বল জড়াইয়া বৃষ সাজিয়া পরস্পর যুদ্ধ করেন; কখনও বা হংস বা ময়ূরের শব্দ অনুকরণ করিয়া আনন্দে বনভূমিতে বিচরণ করিতে থাকেন। এইরূপে লীলারসে দিনগুলি কাটিতে কাটিতে একদিন এক বৎসরূপী অসুর বালকগণের অনিষ্ট করিবার জন্য উপস্থিত হইল, শ্রীকৃষ্ণ সেই বৎসাসুরকে বধ করিলেন। অপর একদিন এক মহাবলশালী অসুর বকের রূপধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হঠাৎ গ্রাস করিয়া ফেলিল, কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ কৃষ্ণকে উদরের মধ্যে সহ্য

করিতে না পারিয়া বকাসুর তাঁহাকে উদ্গার করিয়া ফেলিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার দুইটি ঠোঁট ধরিয়া তাহাকে চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘাসুর কংসকর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার চেষ্টা করিল। সে এক বিরাট সর্পদেহ পরিগ্রহ করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক নিশ্চলভাবে বৃন্দাবনের বনমধ্যে পড়িয়া রহিল। বালক শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অঘাসুর মৃত্যুমুখে পতিত হইল! শ্রীকৃষ্ণ যখন অঘাসুরকে বধ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র। কিন্তু শ্রীশুকদেব বলিলেন,

এতৎ কৌমারজং কর্ম্ম হরেরাত্মাহি মোক্ষণম্
মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে বালাঃ দৃষ্ট্বোচুর্বিস্মিতা ব্রজে ॥ ১০।১২।৩৭

—শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অঘাসুরকে বধ করিয়া তাহার করালগ্রাস হইতে গোপবালকগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, অথচ গোপ-বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বৃন্দাবনে বলিয়াছিল—"অদ্যই এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে।"

'কৌমারজং কর্ম্ম'—অর্থাৎ পাঁচ বৎসর বয়সে অনুষ্ঠিত লীলা, "পৌগণ্ডকে"—অর্থাৎ ষষ্ঠবর্ষ বয়সের ঘটনা বলিয়া গোপবালকগণ কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে প্রচারিত হইল।—'কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি', —অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স কৌমার, ষষ্ঠ বর্ষ হইতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড নামে পরিচিত। পঞ্চম বর্ষ বয়সের ঘটনা ষষ্ঠ বর্ষ বয়সের ঘটনা বলিয়া রটনা হইতেছে কেন? ভিতরের একবৎসর কোথায় গেল? মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন, প্রশ্ন শুনিয়াই শ্রীশুকদেবের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, তাঁহার মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীকৃষ্ণসাগরে নিমজ্জিত হইয়া যাইল, তিনি সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু "কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধ বহির্দৃশি শনৈঃ"—শ্রীশুকদেব অতি কষ্টে পুনরায় বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া

ধীরে ধীরে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। মহাযোগী শ্রীশুকদেব মূর্চ্ছিত হইলেন কেন? পরবর্তী অধ্যায় দুইটিতে র্ণিত ব্রহ্মার মোহ ও শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত লীলাশক্তি স্মরণ করিয়া শুকদেব সমাধি নিমগ্ন হইয়াছিলেন,—সেই ঘটনাবলী পরবর্ত্তী অধ্যায় দুইটিতে বর্ণনা করা হইতেছে।

(১১)

ব্রহ্মার মোহ এবং গোপবালক ও গোবৎসহরণ

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার জন্য শ্রীশুকদেব মোহাবিষ্ট ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোবৎস ও গোপবালকগণের অপহরণ বৃত্তান্ত এবং অতঃপর মোহমুক্ত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবকীর্ত্তন করিতেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়টি "ব্রহ্মমোহঃ", চতুর্দ্দশ অধ্যায়টি "ব্রহ্মস্তুতিঃ" নামে পরিচিত। অঘাসুর বধ হইয়া গিয়াছে, গোপবালকগণ নিশ্চিন্ত। যমুনাপুলিনে আসিয়া কৃষ্ণ গোপবালকগণকে বলিলেন যে, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরাতীত, গোবৎসগণ এবং গোপবালকগণ সকলেই ক্ষুধার্ত্ত সুতরাং বিস্তীর্ণ তৃণখণ্ডে গোবৎসগণকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা সকলেই যমুনাপুলিনে ভোজন করিতে বসিবেন। সকলেই সম্মত হইলেন, খাদ্যপূর্ণ শিকাগুলি লইয়া সকলেই আনন্দ করিয়া বন-ভোজন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মধ্যে কৃষ্ণ বসিয়াছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে শ্রীদাম, সুবল, স্তোক-কৃষ্ণ, অংশু, অর্জ্জুন, বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ প্রভৃতি বারজন প্রিয় সখা বসিয়াছেন, তাহার পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মণ্ডলাকারে একদল গোপবালক, তাহার পর আবার আর একদল,—এইভাবে পরপর অসংখ্য মণ্ডল রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিন্দু করিয়া চক্রাকারে গোপবালকগণ উপবেশন করিলেন। দেখিতে

মনে হয় যেন একটি সুবৃহৎ পদ্ম, কৃষ্ণ যেন তাহার মধ্যে উপবিষ্ট মধুপান-মত্ত ভ্রমর এবং গোপবালকগণ সেই পদ্মের মণ্ডলাকৃতি দলরাজি।

এইবার গোপবালকগণ নিজ নিজ শিকা হইতে মিষ্টান্ন, পিষ্টক প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য বাহির করিলেন এবং বৃক্ষত্বক্, পদ্মের পাতা, পাথরের খণ্ডগুলিকে ভোজনপাত্ররূপে ব্যবহার করিয়া আনন্দসহকারে হৈচৈ করিতে করিতে খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহার যে খাবারটি ভাল লাগিতেছে তাহাই আধখানা খাইয়া কখনও বা কৃষ্ণের মুখে, কখনও বা অন্য গোপবালকগণের মুখে তুলিয়া দিতেছেন। সেদিন যমুনাপুলিনে স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরকে মধ্যে রাখিয়া গোপবালকগণ বিরাট ভোজনযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন—সে আনন্দ শত অশ্বমেধের গৌরব ও আনন্দকে ছাড়াইয়া গিয়াছে! ব্রহ্মা ও দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে গোপবালকগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া সকলের দিকে চাহিয়া আছেন।

এমন সময়ে গোবৎসগণ তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে তৃণলোভে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া গোপবালকগণের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গেল। যখন বালকগণের নজর পড়িল তখন তাঁহারা বৎসগণের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া গোবৎসগণকে খুঁজিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন,—তাই শ্রীকৃষ্ণের ভোজনকালে যেমন তাঁহার বামদিকের কোমরে বাঁশীটি অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ছিল, বামকক্ষে শিঙা ও বেত্রদণ্ড ছিল, দক্ষিণ হস্তে দধিমাখা অন্নের গ্রাস ছিল, ঠিক সেইরূপ অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণ ধেনুগুলিকে খুঁজিতে যাইলেন। শীঘ্রই তো ফিরিয়া আসিবেন!

এদিকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার মাধুর্য্য গাঢ়তরভাবে অনুভব করিবার জন্য ব্রহ্মা গোবৎসগুলিকে হরণ করিয়া এক নির্জ্জন গিরিগুহায় তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখিলেন। আবার যেই শ্রীকৃষ্ণ ধেনুগুলিকে খুঁজিতে যাইলেন,

তখন ব্রহ্মা গোপবালকগণকে মায়ামুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকেও অচেতন অবস্থায় সেই একই গিরিগুহামধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্বই ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অপহৃত হইল।

সন্ধ্যা সমাগত, সকলের বাড়ী ফিরিবার সময় উপস্থিত। যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত ও বিনষ্ট হইতেছে, সেই অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি পরমপুরুষ মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐশ্বর্য্যশক্তিরপ্রভাবে ব্রহ্মার অদ্ভুত কার্য্য বুঝিতে পারিয়া উপনিষদের ব্রহ্মের মত—'একোঽহং বহুস্যাম্'—এক অদ্বিতীয় আমি, বহুরূপে লীলা করিব—এই সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপবালক ও গোবৎসরূপ পরিগ্রহ করিয়া শূন্য যমুনা-পুলিন পরিপূর্ণ করিয়া গোধূলিলগ্নে ব্রজপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যতগুলি গোপবালক ও গোবৎস ছিল, তাহাদের যে পরিমাণ দেহ ছিল, যেরূপ করচরণাদি ছিল, যাহার হাতে যেভাবে যেরূপ শিকা ছিল, অঙ্গে যে যে আভরণ ছিল, পরিধানে যাহার যেমন বস্ত্র ছিল, তাহার কিছুই বাদ পড়িল না, শ্রীকৃষ্ণ অবিকল সেই সেই রূপেই বহুমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। বাৎসল্যবতী গোপরমণীগণ প্রতিদিন দিবাবসানকালে যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও গোপবালকগণের আগমনসূচক বেণুরব শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকেন, আজও সেইরূপ ছিলেন। সেই উৎকণ্ঠা, সেই প্রতীক্ষা, সেই আনন্দ! কিন্তু আজ একটু পার্থক্য হইল ;—অন্যদিন ব্রজনারীগণ একে একে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলিয়া লন, পরে নিজ নিজ পুত্রকে স্নেহ চুম্বন করেন ; আজ কিন্তু গোপীগণ নিজ পুত্রগণকেই প্রথমে কোলে তুলিয়া লইলেন। গাভীগণও গোশালার অতি ছোট স্তন্যপায়ী বৎসগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবৃত্ত অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ধেনুগুলির প্রতি অধিকতর স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিল ;—তাহাদের গা চাটিয়া দিতে লাগিল, স্নেহবশে তাহাদের দর্শনমাত্র গাভীগুলির স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল।

এমন তো কোন দিন হয় না! ইহার পর হইতে প্রতিদিন গোষ্ঠে গমন এবং গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় অপূর্ব্ব স্নেহের লক্ষণসমূহ গাভী ও গোপীগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে প্রায় একবৎসর কাটিয়া যাইতেছে—বৎসর পূর্ণ হইবার আর মাত্র পাঁচ ছয় দিন বাকী। বৃন্দাবনে যে এতবড় একটা স্নেহের বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে তাহা এতদিন কেহই লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু বর্ষাকাল শেষ হইবার পাঁচ ছয়দিন পূর্ব্বে এই পরিবর্ত্তন বলরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি বুঝিলেন যে একটা কিছু ঘটিয়াছে, নতুবা গোপী অথবা গাভীগণের এই অপূর্ব্ব স্নেহের অভিব্যক্তি কখনও সম্ভবপর ছিল না। যেদিন ব্রহ্মা গোপবালক ও ধেনুগণকে হরণ করেন, সেইদিন বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোষ্ঠে গমন করেন নাই। সেদিন বলরামের জন্মনক্ষত্র-যোগ হওয়ায় মাঙ্গলিক কার্য্যানুষ্ঠান করিবার জন্য রোহিণী তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনে যাইতে দেন নাই, সুতরাং ব্রহ্মার কার্য্যকলাপ এবং শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুতলীলা বলরামের অগোচরেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু লীলা অবসানের পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সমস্তই বুঝাইয়া দিলেন,—বলরামের এতদিনের পুঞ্জীভূত কৌতূহল নিবৃত্ত হইল।

এদিকে পূর্ণ বৎসরকাল অতিবাহিত হইলে ব্রহ্মা বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন যে ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, গোপবালক ও গোবৎসগণ-সহ পূর্ব্ববৎ বাল্যলীলা করিতেছেন। যেখানে বালক ও ধেনুগুলিকে মায়ামুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই পর্ব্বত-কন্দরে যাইয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, তাঁহারা সকলেই সেইরূপ অচৈতন্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন। বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল;—ব্রহ্মা স্থির-নেত্রে নূতন গোপবালকগণের দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়ারত গোপবালক ও গোবৎসগণ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী

মূর্ত্তিতে ব্রহ্মার নয়নসম্মুখে প্রতিভাত হইলেন। ব্রহ্মার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ। ১০।১৩।৪৪

—এইরূপে যিনি স্বয়ং মোহরহিত অথচ জগন্মোহন, সেই সর্ব্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণকে সম্মোহিত করিতে যাইয়া ব্রহ্মা নিজ মায়াজালে নিজেই বিমোহিত হইয়া পড়িলেন।

অতঃপর ব্রহ্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়া ভূতলে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং—"কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ সবেপথুর্গদ্গদয়ৈল তেলয়া"—বিনীত ও সমাহিতচিত্ত হইয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মা তাঁহার মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিলেন।

উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে
কিমস্তি নাস্তিব্যপদেশ ভূষিতং তবাস্তি কুক্ষেঃ
কিয়দপ্যনন্তঃ॥ ১০।১৪।১২

—হে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত, গর্ভস্থ শিশু যে জননীর গর্ভের ভিতর পদসঞ্চালন করে, সেই পদসঞ্চালন কি মাতার নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়? তুমি সমস্ত কার্য্য ও কারণের আধারস্বরূপ। আমি তোমার ভিতরে থাকিয়াই অপরাধ করিয়াছি। সুতরাং মাতা যেমন সন্তানের অপরাধ সহ্য করেন, সেইরূপ তুমিও আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

ব্রহ্মার এই আত্মনিবেদন এবং ক্ষমাপ্রার্থনা মর্ম্মস্পর্শী। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বব্যাপী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার যেন নূতন করিয়া জ্ঞান হইয়াছে, তিনি পরব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন,

একস্ত্বমাত্মা-পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ,
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়োমুক্ত-
উপাধিতোঽমৃতঃ ॥ ১০।১৪।২৩

—হে ভগবন্, তুমি সত্য, নিত্য, অক্ষয়, অনন্ত, সনাতন পুরুষ, স্বপ্রকাশ, নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ, তুলনারহিত, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বকারণস্বরূপ, সর্ব্বদোষবর্জ্জিত, উপাধিশূন্য ও অমৃত।

ব্রহ্মস্তুতির এই অপূর্ব্ব শ্লোকটি বেদান্তের পরমব্রহ্ম, ভক্তের ভগবান ও যোগীগণের পরমাত্মাকে সমষ্টিগতভাবে এক করিয়া সংক্ষেপে সর্ব্বশাস্ত্রের অন্বেষণীয় তত্ত্বকে প্রকাশিত করিতেছে। এই শ্লোকটির প্রত্যেকটি শব্দ দীর্ঘকাল উপলব্ধির বিষয়। অতঃপর ব্রহ্মা গোপীগণের সৌভাগ্য উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন,

অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্ ॥ ১০।১৪।৩২

—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, অবাঙ্মনসগোচর পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের মিত্র, সেই নন্দ গোপ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের সীমা নাই, ভাগ্যের সীমা নাই!

এইরূপে নানাভাবে নানাভাষায় শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিয়া ব্রহ্মা অবশেষে বলিলেন,

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ, সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্,
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্ ॥ ১০।১৪।৩৯

—হে কৃষ্ণ, তুমি অখণ্ড জ্ঞানময়, তুমিই জগতের প্রভু, তুমিই জগতের আধারস্বরূপ। প্রভু, অনুমতি দাও, আমি সত্যলোকে ফিরিয়া যাইব।

কী মিনতির ভাষা! ব্রহ্মার অন্তঃকরণ ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে, ভাব স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে, ভাষার ছটা নাই—মধুর ছন্দ-সংযোগে অতি কোমল শব্দসমষ্টি ব্রহ্মার প্রাণের ধ্বনিটিকে ভক্তের

প্রাণের ভিতর প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ একটি কথাও কহিলেন না, চক্ষুর ইঙ্গিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ ও তাঁহার শ্রীচরণযুগলে প্রণাম করতঃ অভীষ্টধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এইরূপে ব্রহ্মস্তুতি কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন যে, ব্রহ্মার মায়ায় বিমোহিত হইয়া গোপবালকগণ এই এক বৎসরের কোন সংবাদই জানিতেন না, সুতরাং এক বৎসর পরে মায়ামুক্ত হইয়া যেদিন তাঁহারা ব্রজধামে গমন করিলেন, সেইদিনই তাঁহারা অঘাসুরবধ সংঘটিত হইয়াছে মনে করিয়া সকলের নিকট তাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঘটনাটি হইল শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চম বর্ষ বয়সের সময়, কিন্তু তাঁহার ষষ্ঠ বর্ষ বয়সে এই ঘটনা গোপগণের শ্রুতিগোচর হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ধেনুকাসুরবধ এবং কালিন্দীর বিষাক্ত জলপানে অচেতন গো ও গোপগণের পুনর্জ্জীবন লাভ বর্ণনা করা হইয়াছে।

এতদিন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোবৎসগুলি চারণ করিতেন, কিন্তু ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়া বড় বড় গাভীগুলিকে চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলরাম শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা মাত্র আট দিনের বড়, সুতরাং সমবয়স্ক। পদ্ম-পুরাণে কার্ত্তিকমাসের মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে যে, কার্ত্তিকমাসের শুক্লাষ্টমীকে বৈষ্ণবগণ গোপাষ্টমী বলিয়া থাকেন, কারণ এই দিনেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম প্রথম গাভীগুলিকে চারণ করিবার অধিকার লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা বৎসচারণ করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমি স্বভাবতঃই কোমল তৃণ পত্রাদিতে সমাচ্ছন্ন, নানাবর্ণের নানা-গন্ধের কুসুম ফুটিয়া বনভূমি গন্ধযুক্ত ও সুশোভিত। এইস্থানে নানাবিধ বাল্যলীলার ভিতর দিয়া গোপবালকগণের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কখনও বলরাম ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া গোপগণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পা টিপিয়া

দিতেন, কখনও বা সমবেতকণ্ঠে বনভূমিকে নিনাদিত করিয়া বালকগণের গান চলিত। একদিন শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি সখাগণ নিকটস্থ তালবৃক্ষে পরিশোভিত এক সুবৃহৎ বন হইতে তাল আনিয়া খাইবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু সেখানে ভয় আছে—গর্দ্দভরূপধারী মহাবলশালী ধেনুকাসুর বহু জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া সেখানে বাস করে। নরমাংসভোজী সেই অসুরের ভয়ে ঐ তালবনে কেহ যাইতে সাহস করে না। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, গোপবালকগণের তাল খাইবার কথা শুনিয়া হাসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই তালবনে প্রবেশ করিয়া ফল পাড়িতে লাগিলেন। ধেনুকাসুর ছুটিয়া আসিল, বলরাম তাহার পশ্চাতের দুইটি পা ধরিয়া ফেলিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বধ করিয়া তাহাকে তালবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ধেনুকাসুরের আত্মীয়স্বজনগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে আক্রমণ করিল, তখন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে সেই অসুরগুলিকে নিহত করিলেন। ইহার পর হইতেই মনুষ্যগণ নির্ভয়ে তালবনে যাতায়াত করিতে লাগিল এবং গো-মহিষাদি পশুগণও তথায় তৃণভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

(১২)

কালিয় দমন

একদিন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত কালিন্দী নদীর তীরে গমন করিলেন। সেদিন বলরাম বাড়িতেই ছিলেন, গোপবালকগণের সহিত গোচারণে বাহির হন নাই। তখন মধ্যাহ্নকাল। একে তো দারুণ গ্রীষ্ম, তাহাতে আবার মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর কিরণে যেন চারিদিক দগ্ধ হইয়া যাইতেছে;—এমন সময় যমুনাতীরে উপস্থিত হইবামাত্র প্রবল পিপাসাতুর গোবৃষাদি পশুগণ দ্রুতবেগে যমুনায় গিয়া জলপান আরম্ভ করিল। যমুনার জল সর্ব্বত্রই সুস্বাদু ও সুখকর, কিন্তু সেই স্থানটিতে জল

বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার কারণ ছিল। যমুনানদীর সন্নিকটে একটি হ্রদ ছিল, কালিয় নাগের বিষাগ্নির দ্বারা উহার জল সর্ব্বদাই যেন ফুটিতে থাকিত। পক্ষিগণ ঐ হ্রদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইলে বিষের জ্বালায় ছটফট করিতে করিতে হ্রদমধ্যে নিপতিত হইত। সেই বিষাক্ত কালিয়হ্রদের তীরে বৃক্ষ ছিল না, পশুপক্ষী তাহার নিকট যাইত না। একটি মাত্র কদম্ববৃক্ষ সেই হ্রদের তীরে পরিদৃষ্ট হইত। বহুদিন পূর্ব্বে গরুড় অমৃত আহরণ করিয়া ঐ কদম্ববৃক্ষে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাই অমৃতস্পর্শে একটিমাত্র কদম্ববৃক্ষই বিষের ক্রিয়া অতিক্রম করিয়া সঞ্জীবিত ছিল। সেবার প্রবল বর্ষায় হ্রদের বিষাক্ত জল কূলপ্লাবিত করিয়া যমুনায় প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং যমুনার সেই অংশটুকু বিষাক্ত জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পিপাসাপ্রপীড়িত গাভী ও বালকগণ অজ্ঞানতাবশতঃ যমুনার সেই বিষাক্ত জল পান করিয়া তৎক্ষণাৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন সখা-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ অমৃতবর্ষিণী কৃপাদৃষ্টির দ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। এইরূপে ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত কালিয়দমনের সূচনা হইল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে কালিয়-দমন এবং নাগপত্নীগণের ভগবৎ-স্তুতি বর্ণিত করা হইয়াছে। শ্রীশুকদেব বলিলেন,

বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ,
তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ ॥ ১০।১৬।১

—সর্ব্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমুনা নদীকে কালসর্প কালিয়ের বিষে দূষিত হইতে দেখিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই সর্পকে তথা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

এই শ্লোকটিতে 'কৃষ্ণাং'—অর্থাৎ যমুনা, 'কৃষ্ণঃ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, 'কৃষ্ণাহিনা' অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ সর্প—এই তিনটি কৃষ্ণধ্বনিবাচক মধুর শব্দ-সংযোজনা পরিলক্ষণীয়।

বৃন্দাবন তটবাহিনী যমুনার দক্ষিণভাগে এক সুবিস্তৃত ও সুগভীর জলপূর্ণ হ্রদ ছিল। কালিয়সর্পের আবাসভূমি সেই হ্রদটির জল সর্ব্বদাই বিষাক্ত হইয়া থাকিত, কিন্তু এইবার প্রবল বর্ষায় হ্রদ প্লাবিত করিয়া সেই বিষাক্ত জল যমুনায় প্রবেশ করিয়াছিল। মহাপুণ্যবতী নদী যমুনা শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। সেই লীলাভূমিকে কলুষিত ও বিষদুষ্ট দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কালিয়-দমন করিতে সংকল্প করিলেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ "গাঢ়রশনঃ" —কটিদেশে বস্ত্র দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া—হ্রদের তীরভূমিস্থ অতি উচ্চ কদম্ব-বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক প্রবলবেগে সেই বিষাক্ত হ্রদের জলমধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন—চারিদিকের কষায়বর্ণ জল স্ফীত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যেন জল-প্লাবনের সৃষ্টি করিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই অগাধ জলরাশিমধ্যে সাঁতার দিতে লাগিলেন—যিনি অমৃতস্বরূপ তিনি বিষসিন্ধুতে সন্তরণ করিতেছেন! কালিয় সর্প তৎক্ষণাৎ আসিয়া "সন্দশ্য মর্ম্মসু রুষা ভুজয়া চ্ছাদ"—তাঁহার মর্ম্মস্থলে দংশন করিতে করিতে নিজ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিসর্পিল দেহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-দেহ আবেষ্টন করিল—কালোয় কালো মিশাইয়া যাইল। প্রভু সর্পের আবেষ্টনীর মধ্যে নিশ্চল হইয়া রহিলেন—যেন বিষের নিকট অমৃতের পরাজয় ঘটিল—তীরভূমিতে দণ্ডায়মান গোপ-বালকগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে দুঃসংবাদ ছড়াইয়া পড়িল—দেখিতে দেখিতে নন্দ, যশোদা ও অন্যান্য গোপগোপীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মাতা যশোদা সর্পহ্রদে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। সকলেই কাঁদিতেছেন, সকলেই হাহাকার করিতেছেন—এইরূপ শোক-মোহাচ্ছন্ন জনতার ভিতর একজন পর্ব্বতের মত অচল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, যাঁহারা বিষাক্ত হ্রদে লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত, তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং প্রভু বলরাম।

এইবার হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহ অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত হইতে লাগিল, এবং ধীরে ধীরে কালিয় সর্পের আবেষ্টনীর মধ্য হইতে মুক্ত হইল।

কালিয় সর্প তো এমন অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন শিশু কখনও দেখে নাই;—সে তাহার একশত মস্তকের একশত চক্র বিস্তার করিয়া দুইশত আরক্ত চক্ষু দিয়া এক-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের পানে চাহিয়া রহিল। শ্রীকৃষ্ণ সর্পের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন, কালিয় দ্রুতগতিতে তাঁহার চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে দংশন করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ একটা হাতের দ্বারা কালিয়ের মাথাটি কিঞ্চিৎ নীচু করিয়া তাহার প্রশস্ত ফণার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং—"তন্মূর্দ্ধরত্ননিকর স্পর্শাতিতাম্র-পাদাম্বুজোঽখিল কলাদি গুরুর্ননর্ত্ত"—অখিল গুরু শ্রীকৃষ্ণ সর্পের মস্তকে পরিশোভিত মণির আভায় রঞ্জিত পাদদ্বয় লইয়া তাহার মস্তকের উপর নৃত্য করিতে লাগিলেন। কালিয়নাগের মুখ ও নাসিকা দিয়া তীব্র ধারায় রক্ত বাহির হইতে লাগিল, ফণাসকল ভাঙ্গিয়া যাইল, দেহ নিশ্চেষ্ট ও অবসন্ন হইয়া আসিল, বিপদে পড়িয়া কালিয়সর্প—"স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম"—চরাচরগুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণকে মনে মনে স্মরণ করিল। নামী অপেক্ষা নামই প্রবল, নামীকে না চিনিয়া নামগ্রহণ করিলেও পাপীতাপীর উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইয়া যায়। কালিয় জানে না যে, যাঁহাকে সে স্মরণ করিতেছে তিনি তাহার মস্তকের উপরেই বিরাজিত, তাঁহার শ্রীচরণ তাহাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, তথাপি অজ্ঞানে শ্রীহরির নামগ্রহণ করিয়া সে বিপন্মুক্ত হইয়া গেল। তখন কালিয়নাগের পত্নীগণ নিজ নিজ শিশু সন্তানগুলিকে সঙ্গে লইয়া পতির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিতে লাগিল। অনেক সময় দেখা যায়, পুরুষের অপেক্ষা নারীই সহজে শ্রীহরিকে বুঝিতে পারে, চিনিতে পারে। নাগপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি ভাব ও ভাষায় সমগ্র ভাগবতে বহু শ্রেষ্ঠ স্তবস্তুতির মধ্যে অন্যতম।

নাগপত্নীগণ স্বামী কালিয়সর্পের অপরাধ মানিয়া লইল—"ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিন্ তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়"—প্রভু, অপরাধী সর্প-

রাজের প্রতি আপনি যে দণ্ডবিধান করিয়াছেন তাহা উপযুক্ত; "তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়"—আপনি দুষ্টদমন করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু সর্পরাজ নিশ্চয়ই বহু সুকৃতির অধিকারী, নতুবা যে পদধূলি লক্ষ্মীদেবীরও কামনীয়, সেই শ্রীচরণধূলি সর্পরাজ কিরূপে অনায়াসে প্রাপ্ত হইল! এই পদধূলি মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। নাগপত্নীগণ জানে যে,

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্,
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎ পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ১০।১৬।৩৭

—যাঁহারা আপনার পদধূলি প্রাপ্ত হন, তাঁহারা স্বর্গ কামনা করেন না, পৃথিবীর একাধিপত্য কামনা করেন না, ব্রহ্মপদ প্রাপ্তিতে তাঁহাদের লোভ নাই, রসাতলের আধিপত্য তাঁহারা চাহেন না, এমন কি যোগসিদ্ধি কিংবা মুক্তিও তাঁহারা প্রার্থনা করেন না।

নাগপত্নীগণের এই পরম জ্ঞান ও পরমভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় সকলেরই বিস্ময়সূচক। স্বামী কালিয় সেই পরমপদ শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্মপদ তো তাঁহার নিকট এখন তুচ্ছ হওয়াই সম্ভব। অবশেষে কালিয়-সর্পের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নাগপত্নীগণ মিনতির কণ্ঠে বলিল,

অপরাধঃ সকৃদ্ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ,
ক্ষন্তুমর্হসি শান্তাত্মন্, মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ ॥ ১০।১৬।৫১

—হে কৃষ্ণ, দাসের অপরাধ প্রভুর সহ্য করা উচিত। হে শান্তমূর্ত্তি, এই সর্পরাজ মূঢ়, আপনাকে চেনে না, তাই না জানিয়া অপরাধ করিয়াছে, আপনি ক্ষমা করুন।

এই মিনতিপূর্ণ প্রার্থনায় দুইটি বিষয় পরিলক্ষণীয়। প্রথমতঃ সর্পরাজ শ্রীকৃষ্ণকে চেনে না কিন্তু নারীগণ তাঁহাকে চিনিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণের তখন তো রুদ্রমূর্ত্তি, অথচ তাঁহাকে "শান্তাত্মন্" বলিয়া সম্বোধন

করিতেছে। এই রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাহিরের রুদ্রমূর্ত্তি ভেদ করিয়া তাঁহার অন্তরের চিরশান্ত, চিরকরুণাময় স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছে।—এই সত্যদৃষ্টি যোগীগণের পক্ষেও দুর্লভ।

অতঃপর কালিয় শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, সর্পজাতি স্বভাবতঃই খল এবং অতিশয় ক্রোধী। তাহার নিজের অপরাধ কি? —'স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ!'—হে নাথ, জীবের নিজস্বভাব পরিত্যাগ করা কঠিন। গীতায় তো শ্রীমুখেই উক্ত হইয়াছে—প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি।—জীবগণ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। এই ক্রোধ তো শ্রীভগবানের মায়াপ্রসূত কালিয় সর্পের স্বভাব। তাহার স্বভাবে অমৃত নাই, গরল আছে, সেই সর্ব্বস্ব গরলই আজ সে নিঃশেষে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছে! এখন "অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্বিধেহি নঃ"—এখন আপনি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ যাহা ভাল মনে করেন, আমার প্রতি তাহাই বিধান করুন। শ্রীকৃষ্ণ কালিয় নাগের এই যুক্তিপূর্ণ কথাগুলির উত্তর দিতে পারিলেন না, শুধু আদেশ করিলেন যে এই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞাতি, পুত্র ও স্ত্রীগণকে সঙ্গে লইয়া কালিয় এখনই সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করুক। তদবধি যমুনা বিষশূন্য ও অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু জলসমন্বিত হইল।

এইস্থানে একটি বিষয় পরিলক্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণ ছয়বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া সেই বৎসরের কার্ত্তিক মাসে গোচারণ আরম্ভ করেন, গ্রীষ্মকালে কালিয়দমন এবং ভাদ্রমাসে ধেনুকাসুর নিধন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশুকদেব বর্ণনার সময় এই ঘটনা-পারম্পর্য্য রক্ষা করেন নাই, তিনি কালিয়দমন লীলার পূর্ব্বেই ধেনুকাসুর বধ বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ কালিয়দমন লীলা যে ধেনুকাসুর বধের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশ গ্রন্থদ্বয়ে সুস্পষ্ট ভাবেই লিখিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতেও কালিয়দমন উপলক্ষ্যে শুকদেব বলিয়াছেন যে গোপবালকগণ দারুণ গ্রীষ্মে

সন্তাপিত হইয়া যমুনার বিষাক্ত জল পান করিয়াছিল। ধেনুকাসুর বধ বৃত্তান্তেও শ্রীশুকদেব বলিতেছেন যে সুপক্ক তালফল খাইবার ইচ্ছায় ধেনুকাসুরের তালবনে বালকগণ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সহিত অভিযান করিয়াছিল। সুতরাং ধেনুকাসুর বধ ভাদ্রমাসেই ঘটিয়াছিল, কারণ ভাদ্রমাসেই তাল পরিপক্ক হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একজাতীয় লীলাগুলি একই স্থানে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য শ্রীশুকদেব ঘটনাগুলির সময়ের ধারা সব সময় রক্ষা করেন নাই।

(১৩)

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বংশীবাদন

একবিংশ অধ্যায় "বেণুগীত" নামে পরিচিত। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক বেণুবাদন এবং সেই গীতশ্রবণে গোপীগণের মনোহরণের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

সমগ্র শ্রীভাগবতে নয়টি "গীত" আছে। সমস্ত গীতগুলির মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিলে মনে হয় প্রাণের উচ্ছ্বাসে আকুলভাবে হৃদয়ের ভাব-প্রকাশই ভাগবতের গীত। ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে রুদ্রগীত, দেবগীত, বেণুগীত, গোপীগীত, যুগ্মগীত, ভ্রমরগীত, ভিক্ষুগীত, ঐলগীত, ভূমিগীত—এই নয়টি গীত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গোপীগীত ও ভ্রমর-গীতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

তখন শরৎকাল, বনে জলাশয় সকল স্বচ্ছ হইয়াছে, পদ্মফুলের সংস্পর্শে বায়ু গন্ধযুক্ত এবং সুশীতল। শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া বংশীবাদন করিলেন, তখন গোপীগণ সেই "বেণুগীতং স্মরোদয়ম্"—কাম উদ্রেককারী বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সখীগণের নিকট নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বংশীধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে,—বনভূমি

প্রকম্পিত করিয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্য প্লাবিত করিয়া, ব্রজধামে সকলকে উৎকর্ণ করিয়া, ভাবরসে অভিভূত করিয়া বাঁশী বাজিতেছে, গৃহকর্ম্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ঘরে বসিয়া বসিয়াই গোপীগণ সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন, আর শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণগানে ডুবিয়া যাইয়া নিজ নিজ সখীর নিকট প্রাণের ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। গোপীগণ দেখিতেছেন

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্,
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশৎ গীতকীৰ্ত্তিঃ ॥ ১০।২১।৫

—নটের ন্যায় পরমরমণীয় বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ শোভিত মুকুট, কর্ণদ্বয়ে ফুল, পরিধানে সুবর্ণ সদৃশ বসন, গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা। তিনি বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করিতেছেন। গোপবালকগণ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুণগান করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে বৃন্দাবন রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

গোপীগণ ঘরে বসিয়াই তদগতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের এই নটবর বেশ পরিদর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। এইরূপে মোহন মুরলীরব শ্রবণ করিয়া গোপীগণ বৃন্দাবনকে ধন্য মনে করিলেন, বন্য পশুগণের সৌভাগ্য তাঁহাদের যেন ঈর্ষ্যার বিষয় হইল, পক্ষীগণ যেরূপ নীরবে বৃক্ষশাখায় বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিতেছে তাহাতে গোপীগণের মনে হইতেছে যে "বিহগাঃ মুনয়ো বনেঽস্মিন্"—এই বনের তন্ময় পক্ষীগণ হয়ত পূর্ব্ব জন্মে মুনি ছিল, আর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতও ধন্য হইয়া যাইতেছে। এইরূপে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া "বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ"—পরস্পর সেই সকল লীলা বর্ণনা করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অবচেতন মনে তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে।

গোপীগণের কাত্যায়নী পূজা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বস্ত্রহরণ

দ্বাবিংশ অধ্যায়ে গোপকুমারীগণের কাত্যায়নী পূজা এবং শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক তাঁহাদের বস্ত্রহরণ ও বরপ্রদান বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বস্ত্রহরণ লীলা রাসলীলার পূর্ব্ব সূত্র।

ব্রজবাসিনী কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা ভেদে দ্বিবিধ। বিবাহিতা গোপীগণের কাহারও কাহারও নাম পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কুমারী গোপীগণের কাহারও নাম কোনও পুরাণাদিতে উল্লিখিত হয় নাই।

তখন হেমন্তকাল, শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম সাত বৎসর, কুমারী গোপীগণের বয়স চারি বৎসর হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত। এই সময়ে কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পরদিন হইতে একমাস-ব্যাপী ব্রত গ্রহণ করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করতঃ দেবী কাত্যায়নীর পূজা আরম্ভ করিলেন। কে এই কাত্যায়নী ?—ইনি ব্রজধামে উপাসিতা শ্রীহরির পরমাশক্তিস্বরূপিণী দেবী মহামায়া। আদ্যাস্তোত্রে ইঁহার কথাই বলা হইয়াছে—'কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা'—মহামায়া কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী এবং ব্রজধামে কাত্যায়নী রূপে সুপূজিতা। কিন্তু ব্রজধামেও তিনি কখনও কাত্যায়নী, কখনও মহামায়া, কখনও বা ভদ্রকালীরূপে অভিহিতা হইতেন। ভক্তের নিকট দেবীর সহস্র নাম; শ্রীশুকদেব ২।৩টি নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া তাঁহার অসংখ্য নামের আভাষ প্রদান করিয়াছেন। কুমারীগণ প্রতিদিন অরুণোদয়ে যমুনার জলে স্নান করিয়া বালুকাময়ী কাত্যায়নী-প্রতিমা নির্ম্মাণকরতঃ পত্র, পুষ্প, ফলমূল, ধূপদীপ ও নবপল্লবের দ্বারা দীর্ঘ একমাস নিত্য তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রজপও চলিতেছিল।

কাত্যায়নি, মহামায়ে, মহাযোগিন্যধীশ্বরি,
নন্দ-গোপসুতং দেবি, পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ ১০।২২।৪

—হে কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনি, হে সর্ব্বেশ্বরি, তুমি প্রসন্না হইয়া নন্দগোপের পুত্রকে আমার পতি করিয়া দাও।

এইরূপে একমাস অতিবাহিত হইলে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গোপকুমারীগণ যমুনাতীরে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র তীরে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে আনন্দের সহিত জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব ব্রতের ফলদাতা শ্রীকৃষ্ণ তখন গোপীগণকে ব্রতের ফল প্রদান করিবার জন্য সখাগণে পরিবৃত হইয়া নদীতীরে আগমন করিলেন। তিনি কুমারীগণের বস্ত্র অপহরণ করিয়া সমীপস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করতঃ কুমারীগণকে নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। গোপীগণ শীতল জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া লজ্জায় ও শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,

শ্যামসুন্দর, তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্,
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ, নো চেদ্ রাজ্ঞে ব্রুবামহে ॥১০।২২।১৫

—হে শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী, তুমি অন্য যাহা বলিবে আমরা তাহাই করিব। কিন্তু হে ধর্ম্মজ্ঞ, আমাদিগের বস্ত্রগুলি প্রত্যর্পণ কর, নতুবা আমরা রাজার নিকট সব বলিয়া দিব।

শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিলেন না, কদম্ববৃক্ষতলে আসিয়া বস্ত্র লইয়া যাইতে বলিলেন। রাজভয় দেখাইতেছে?—'কিং বৃদ্ধো রাজা করিষ্যতি'—বৃদ্ধ রাজা শ্রীকৃষ্ণের কি করিবেন!—নন্দরাজ স্নেহশীল, কংসরাজ বৃদ্ধ ও অক্ষম। তখন গোপকুমারীগণ নিরুপায় হইয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কদম্ববৃক্ষের তলায় যাইয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এইরূপে গোপীগণ যখন স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ রত্ন লজ্জা শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ

করিলেন, তখন সেই আত্মনিবেদনের ফলে তাঁহাদের মাসব্যাপী ব্রত উদ্‌যাপিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন।

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্থথ ক্ষপাঃ,
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ ॥ ১০।২২।২৭

—হে অবলাগণ, তোমাদের কাত্যায়নী পূজা সিদ্ধ হইল, তোমাদের কামনা পূর্ণ হইবে। শরৎকালে শারদীয়া পূর্ণিমা যামিনীতে তোমরা আমার সহিত মিলিত হইবে। এখন তোমরা ব্রজে গমন কর।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া গোপকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণ-মিলনের অধিকারী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(১৫)

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ ও গোবর্দ্ধন ধারণ

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ এবং পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া ইন্দ্রকোপ হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, ব্রজধামে মহাধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে, ইন্দ্রের পরিতুষ্টির জন্য গোপগণ এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিতেছে। "সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ"—সর্ব্বান্তর্য্যামী ও সর্ব্বদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন কৌতূহলী হইয়া পিতা নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

কথ্যতাং মে পিতঃ, কোহয়ং সম্ভ্রমো বঃ উপাগতঃ,
কিং ফলং কস্য বোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ ॥ ১০।২৪।৩

—হে পিতঃ, আপনাদের এই কোন্ বিষয়ের উদ্যোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আমাকে বলুন। ইহা কি যজ্ঞের আয়োজন? এই যজ্ঞের

ফল কি ? কোন্ দেবতার উদ্দেশে এই যজ্ঞ হইবে ? কিসের দ্বারা এই যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইবে ?

পিতা নন্দ বলিলেন যে, সুবৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশে এই যজ্ঞ পরিকল্পিত। তিনি বর্ষণ না করিলে কৃষিকার্য্যের জন্য মানুষের পুরুষকার নিষ্ফল হইয়া যায়। দৈবনিরপেক্ষ পুরুষকার কখনও ফলদায়ক হয় না। সুতরাং প্রতিবৎসরের মত এই বৎসরও ইন্দ্রপূজার জন্য আয়োজন চলিতেছে। পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, মেঘসমূহ রজোগুণে চালিত হইয়া সর্ব্বত্র বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, সেই মেঘসমূহের সাহায্যে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া জীবগণ প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে,—'মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি'—জীবগণের পুষ্টি ও রক্ষণ ব্যাপারে ইন্দ্র কি করিবেন, সুতরাং ইন্দ্রকে ভয় করিয়া পূজা প্রদান করিবার কোন প্রয়োজন নাই ; বরং গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হউক। সেই যজ্ঞে শ্রীহরি-নিবেদিত অন্ন দীন, দুঃখী, চণ্ডাল, কুকুর ও পতিত জীবগণের মধ্যে বিতরণ করা হউক, গোসমূহকে তৃণ প্রদান এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে পূজা ও মাল্য প্রদান করা হউক। নন্দ প্রভৃতি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া তাঁহার কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করিয়া সকলে গোব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জীবগণের সেবা করিয়া গোবর্দ্ধন-গিরির নিকটে যাইয়া সেই পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিলেন। এইরূপে ব্রজধামে ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ হইয়া গেল, গোপগোপীগণ পূজা সমাপ্ত করিয়া ব্রজধামে ফিরিয়া আসিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা হইল না, ইন্দ্র কুপিত হইলেন। শ্রীশুকদেব বলিলেন,

> ইন্দ্রস্তদাত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ,
> গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চুকোপহ ॥ ১০।২৫।১

—ইন্দ্র নিজের পূজা নিবারিত হইতে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণই যাহাদের রক্ষক সেই নন্দ প্রভৃতি গোপগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন।

"কৃষ্ণনাথেভ্যো" কথাটি পরিলক্ষণীয়—শ্রীকৃষ্ণই যাহাদের নাথ তাহাদের উপর ইন্দ্রের ক্রোধ!—ফল কি হইবে তাহা শ্রীশুকদেবের 'কৃষ্ণনাথেভ্যঃ'—এই একটি কথা হইতেই বুঝিতে পারা যাইল।

দেবরাজ ইন্দ্র ব্রজবাসিগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজভূমি ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দেবেন্দ্র মেঘসমূহকে প্রবল বারিবর্ষণ করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন,

> অহো! শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্
> কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দ্দেবহেলনম্ ॥
> বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্
> কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপাঃ মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥ ১০।২৫।৩,৫

—ঐশ্বর্য্যমদের কি মাহাত্ম্য! ইহার ফলে বনবাসিগণ সামান্য মনুষ্য কৃষ্ণের কথায় নির্ভর করিয়া দেবতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিল।—কৃষ্ণ এক বাচাল নরবালক, মূর্খ অথচ পাণ্ডিত্যাভিমানী। এরূপ সামান্য মনুষ্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া ইহারা আমার পূজা বন্ধ করিতেছে!

ইন্দ্রের এই আস্ফালন কিন্তু বড়ই হাস্যোদ্দীপক। যে নিজে উন্মত্ত, সে আপনাকে সুস্থ মনে করিয়া পৃথিবীর অপর সকলকেই পাগল বলিয়া মনে করে। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত অথচ তিনি ব্রজবাসিগণের "শ্রীমদমাহাত্ম্যং" দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র যখন ব্রহ্মার সহিত ক্ষীরোদসাগরতীরে শ্রীহরির নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজেই শুনিয়াছিলেন যে, শ্রীহরি মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর পাপভার হরণ করিবেন; আবার যখন শ্রীকৃষ্ণ কংসকারাগারে মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখনও ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণের সহিত সেখানে যাইয়া গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন। অথচ আজ ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত

ইন্দ্রের স্মৃতিভ্রংশ হইতেছে, তিনি ব্রজবাসিগণের পূজা ও নমস্কার না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছেন।

প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল, শরৎ-ঋতুর শেষভাগে কার্ত্তিকমাসে এ-প্রকার প্রবল বর্ষণ, ঝঞ্ঝাবাত ও শিলাবৃষ্টি সাধারণতঃ হয় না; সুতরাং অসময়ে এই দুর্য্যোগ যে ইন্দ্রের কোপপ্রসূত তাহা বুঝিতে ব্রজবাসিগণের বিলম্ব হইল না। প্রবল বৃষ্টিবর্ষণের প্রারম্ভেই গোপগোপীগণ গৃহমধ্যে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ভীতিজনক মেঘগর্জ্জনের সহিত অবিরলধারায় বৃষ্টিপাত হইয়া "জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা ভূর্নাদৃশ্যত নতোন্নতম্"—পৃথিবী জলপ্লাবিত হইয়া তাহার উচ্চনীচ স্থানসমূহ একাকার হইয়া গেল, তখন "গোপাঃ গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ"—শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন, চারিদিকে কাতরধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

> কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাভাগ, তন্নাথং গোকুলং প্রভো,
> ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাৎ ভক্তবৎসল! ১০।২৫।১৩

—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে প্রভো, তুমিই আমাদের রক্ষক। কুপিত ইন্দ্র হইতে গোসমূহকে ও আমাদিগকে রক্ষা করিতে তুমিই সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণ অভয় প্রদান করিলেন এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া দুই হস্তে পর্ব্বতরাজকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া "দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব বালকঃ"—বালক যেমন অনায়াসে একহস্তে ছত্রধারণ করে সেইরূপ অনায়াসে একহস্তে উহাকে উত্তোলিত করিয়া ধরিলেন। তখন গোপগোপীগণ, গোসমূহ, শকট-ভৃত্যপুরোহিত সকলে পর্ব্বতের নীচে গর্ত্তমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতেছে; এ যেন প্রলয়কালের বৃষ্টি—সমস্ত সৃষ্টি যেন ধ্বংস হইয়া যাইবে। সপ্তমবর্ষীয় বালক শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তে বিশাল পর্ব্বত ধারণ করিয়া আছেন, দক্ষিণ কটিতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত রাখিয়াছেন,

গ্রীবা বঙ্কিমভাব ধারণ করিয়া সুন্দর দেখাইতেছে, শ্রীচরণ দুইটি অপূর্ব্ব ছাঁদে বিজড়িত হইয়া এক কোমল ও কঠিন চিত্রের মায়া উৎপাদন করিতেছে। কার্ত্তিকমাসের শুক্লা তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত সাতদিন সাতরাত্রি বৃষ্টি হইল, পৃথিবী জলে জলময় হইয়া গেল, কিন্তু যাহারা শ্রীকৃষ্ণের মহাবাহুর নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের লেশমাত্র ভীতি অথবা অসুবিধা ঘটিল না। এই দৃশ্য দেখিয়া দেবরাজের মোহ বিদূরিত হইল, "নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসঙ্কল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ"—তাঁহার ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব দূরীভূত হইল, তিনি ব্রজবিনাশের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া মেঘসমূহকে প্রত্যাহার করিলেন। ইন্দ্র বুঝিলেন যে, যাঁহার নিকট হইতে তিনি পূজা, ও নমস্কার আশা করিয়াছিলেন তিনি জগৎপূজ্য, "ন তৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ"—তাঁহার অপেক্ষা কাহারও বড় হওয়া দূরের কথা, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার সমানও কেহই নাই; তিনিই শ্রীমুখে একদিন বলিয়াছেন, "বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্"—আমিই সকলের বুদ্ধির মূলকারণ, আমার তেজের কণিকামাত্র পাইয়া জীব আপনাকে তেজস্বী মনে করে। ইন্দ্র তখন কৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিলেন,—"পিতাগুরুস্ত্বং জগতামধীশঃ"—আপনি জগতের গুরু জগদীশ্বর,—"ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ"—অতএব সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বগুরু ও সর্ব্বজীবের আশ্রয় আপনার আমি শরণাগত হইতেছি। বৃষ্টি থামিল, ব্রজবাসীগণ ব্রজধামে ফিরিয়া যাইল, ইন্দ্রের পূজা চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া যাইল, গোবর্দ্ধনের পূজা প্রচলিত হইল, ব্রজধামে আবার পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

(১৬)

রাসলীলা

উনত্রিশ অধ্যায় হইতে তেত্রিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পাঁচটি অধ্যায়কে সমষ্টি-ভাবে রাস-পঞ্চাধ্যায় বলা হইয়া থাকে। রাসলীলা শ্রীভাগবতের এক প্রসিদ্ধ অংশ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন, তাঁহারাও রাসলীলার নাম শুনিয়াছেন এবং ভাগবতের অন্যান্য বিষয়ে সম্যক্‌রূপে অবহিত না হইয়াও অনেকে রাসলীলা শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু রাসলীলা সমগ্র ভাগবতে এক নিগূঢ় মহারহস্যময় ব্যাপার—ব্রজলীলার মধ্যে রাসলীলাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলা। বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এই রাসলীলার বহুবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বহুবিধ পরস্পরবিরোধী অভিমতের দ্বারা ভাগবতের এই অংশ কণ্টকিত। একবার তরঙ্গসঙ্কুল পাণ্ডিত্যের সমুদ্রে প্রবেশ করিলে এই রাসলীলা জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিবে; সুতরাং মূলকথাটি আমাদের সহজভাবে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করাই উচিত।

আপাতদৃষ্টিতে স্থূলভাবে এই রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অসংখ্য গোপীগণের বিহারমাত্র। প্রথমেই আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম তখন কিঞ্চিদধিক আট বৎসর মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং আশ্বিন মাসে পূর্ণিমার দিন রাসলীলা আরম্ভ হয়; সুতরাং সঠিক হিসাবে তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স আট বৎসর একমাস বাইশ দিন; গোপীগণের বয়স আরও কম, হয়ত ছয় সাত বৎসর মাত্র। কোন কোন গোপী যুবতী, পতিপুত্র লইয়া সংসার করেন। এই কারণে কেহ বা এই লীলাকে রূপক, কেহ বা পরমাত্মার লীলা, কেহ বা ইহাকে বালকবালিকার কামনাগন্ধবিহীন ক্রীড়ামাত্র, আবার কেহ বা

ভাগবতের এই অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নানা পণ্ডিতের নানা মত, সাধারণ পাঠকের পক্ষে সেইজন্য ঘটনাটি জটিল ও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে-কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে রাসলীলা বর্ণনার পটভূমিকা মনে রাখিতে হইবে। এই রাসলীলা বিষয়টি বর্ণনা করিতেছেন পরমসন্ন্যাসী শ্রীশুকদেব। এই শুকদেব মহাজ্ঞানী, বিষয়বিরক্ত এবং স্ত্রীপুরুষের বিভেদদৃষ্টিবর্জ্জিত। স্থান মহাপুণ্যময় গঙ্গাতীর—বিলাসের রঙ্গভূমি নহে,—যে গঙ্গানাম উচ্চারণ করিলে মানুষ পবিত্র হইয়া যায়, যে গঙ্গাবারিস্পৃষ্ট বাতাস মানুষের মনের জমাটবাঁধা কামনাবাসনা তরল করিয়া দেয়, যে গঙ্গাতীর মানুষের জীবনমরণে আশ্রয়স্বরূপ, সেই গঙ্গাতীরে এই রাসলীলা কীর্ত্তন হইতেছে। প্রধানতঃ যাঁহার উদ্দেশ্যে এই আখ্যান কীর্ত্তন করা হইতেছে তিনি মৃত্যুপথযাত্রী মহারাজ পরীক্ষিৎ—মৃত্যু তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার দেহত্যাগের আর দেরী নাই। আরও, শুনিতেছেন অসংখ্য মহর্ষি, রাজর্ষি, বৃদ্ধনরনারী, শুনিতেছেন পিতা ও পুত্র, দেবর্ষি নারদ, শুকদেবের মহাজ্ঞানী বৃদ্ধপিতা স্বয়ং ব্যাসদেব। এইরূপ ক্ষেত্রে কি হালকা প্রেমঘটিত কাহিনী রচিত অথবা কীর্ত্তিত হইতে পারে? সুতরাং বক্তা, শ্রোতা, মনের অবস্থা, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি—এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তবে আমাদিগকে রাসপঞ্চাধ্যায়ের অর্থসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আর একটি কথা; সমগ্র রাসলীলা বর্ণনা করিয়া শুকদেব রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলিলেন—এই লীলাকথা বর্ণনা করিলাম, যে এই রাসলীলা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিবে অথবা কীর্ত্তন করিবে, সে অচিরেই ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়া অতিশীঘ্র কামব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিবে। কত বড় কথা! শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের রমণের বর্ণনা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া মানুষের পশুপ্রবৃত্তি কামনা-বাসনা তিরোহিত হইয়া যাইবে।

এইস্থানে পদ্মপুরাণে উল্লিখিত দুইটি শ্লোক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্য বাসিনঃ
রামং দৃষ্ট্বা হরিং তত্র ভোক্তু মৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥

—ত্রেতাযুগে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ রামচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার সহিত উজ্জ্বলরস উপভোগ করিবার বাসনা অনুভব করেন। তাহার পর সেই সমস্ত ঋষিগণ স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হইয়া গোকুলে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মধুররস উপভোগ করিয়া অবশেষে মুক্তি প্রাপ্ত হন।

সুতরাং দণ্ডকারণ্যের মুনিঋষিগণই গোকুলের গোপরমণী।

এই সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলে দুইটি সত্য অবিসংবাদিতভাবে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে—একটি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের মিলন সাধারণ বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মানুষের স্ত্রী-পুরুষ মিলনের মত নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে এই লীলা শ্রবণের ফলে কামপ্রবৃত্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনের ইন্ধনযোগে আরও উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। কিন্তু শ্রীশুকদেবের তাহা উদ্দেশ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, এই লীলাকথা প্রধানতঃ মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের জন্য, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, দেবমানব ঋষির জন্য;—ইহা পিতাপুত্র, গুরুশিষ্য সকলের একই সঙ্গে শ্রবণ করিবার উপযোগী ধর্ম্ম কথা। সুতরাং এই রাসলীলা পশুবৃত্তিসম্পন্ন বিষয়কীটের জন্য নহে, লীলাকথা সাধারণ নরনারীদেহের সংযোগ-বিলাস নহে; ইহা একটি অপ্রাকৃত কামগন্ধবর্জ্জিত বিরাট ঐশ্বরিক অভিব্যক্তি। যে কোন ব্যাখ্যা ইহার হউক না কেন, ইহা কামের ইন্ধন প্রদানকারী একটা ঘটনার কবিত্বছটায় রসপ্রকাশ মাত্র নহে।

আর একটি কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কোনও ঘটনার বিশুদ্ধতা অথবা অশ্লীলতা মানুষের নিজের মন অথবা দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। এই বিষয়ে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কবির "শ্রেষ্ঠভিক্ষা" বলিয়া একটি বিখ্যাত কবিতা আছে, তাহার বিষয়বস্তুটি ভগবান্ বুদ্ধের জীবনের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বুদ্ধের অনাথপিণ্ডদ নামক জনৈক ভক্ত শিষ্য শ্রাবস্তিপুরীতে তাঁহার প্রভুর জন্য ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিতেছেন। কত লোকে কত কি দিল—"বসনে ভূষণে ঢাকি গেল ধূলি, কনকে রতনে খেলিল বিজুলী"—তথাপি অনাথপিণ্ডদ তাহার কিছুই গ্রহণ করিলেন না, পথ বাহিয়া চলিয়াছেন, "ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ, মিলে না প্রভুর যোগ্য কোন ভেট!" এমন সময়ে এক দীনা নারী আসিয়া

অরণ্য আড়ালে রহি কোনমতে,
একমাত্র বাস নিল গাত্র হ'তে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে ॥

নারীর শ্রেষ্ঠধন লজ্জা—সেই শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া

ভিক্ষু উর্দ্ধভুজে করে জয়নাদ,
কহে, "ধন্যমাতঃ, করি আশীর্ব্বাদ,
মহাভিক্ষুকের পূরাইলে সাধ পলকে ॥"

এইরূপ অপূর্ব্ব ভাষায় রবীন্দ্রনাথ দীনা নারীর আত্মনিবেদন ও বস্ত্র-হরণ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কবিতাটি যখন বাহির হইল, একজন পণ্ডিত লোক যাইয়া রবীন্দ্রনাথের কুরুচির নিন্দা করিলেন,—'একমাত্র বাস নিল গাত্র হ'তে'—এতো অশ্লীলতার চিত্র! রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলুম।"

এখন এই ভাষা এবং অশ্লীলতার নিন্দা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। ব্যাপারটি এই যে, সেই পণ্ডিতমহাশয় 'একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে' ভাষাটির ভিতর দিয়া দেখিলেন নারীদেহের কুৎসিত নগ্নতা, সুতরাং চিত্রটি নিশ্চয়ই কুৎসিত! কিন্তু এই ভাষার অন্তরালে যে একটি সুন্দর চিত্র রহিয়াছে তাহা পণ্ডিতমহাশয়ের দেহবুদ্ধি এবং বস্তুবুদ্ধির দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। দীনা নারী প্রভু বুদ্ধকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিতেছে, আত্মনিবেদন করিতেছে, তাহার মুখ অপূর্ব্ব আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, নগ্নস্তন, নগ্নদেহের কথা সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত;—প্রভুবুদ্ধ তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই ভাবই তাহার সমস্ত দেহ ও মনকে উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে। অনাথপিণ্ডদ দীনা নারীর এই অপূর্ব্ব আত্মনিবেদন দেখিতেছেন, পণ্ডিতমহাশয় দেখিতেছেন নারীদেহের কুৎসিত নগ্নতা। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য মাত্র! সেইরূপ, গোপীগণের বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার ঘটনা দুইটি শ্রীভাগবতের কষ্টিপাথরস্বরূপ;— শ্রোতার মন সোনা অথবা লোহা তাহা এই কষ্টিপাথরে ফেলিলেই চেনা যাইতেছে। কেহ দেখিতেছেন গোপীগণের নগ্নতা, গোপীগণের দেহের বিচিত্রতা, আবার কেহ বা দেখিতেছেন অখণ্ড আনন্দঘনমূর্ত্তি,—আনন্দের আলোকে দেহ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, আত্মনিবেদনের তিলক ললাটে পরিয়া গোপীগণ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মারূপে প্রতিভাত হইতেছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য মাত্র; বিষয়বস্তু উপলক্ষ্য, মানুষের মনই সুন্দর অথবা কুৎসিত সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তাই একটা সাবধানবাণী শ্রীশুকদেব সমগ্র জগতের শ্রোতৃগণকে রাসলীলা বর্ণনার প্রারম্ভে এবং পরিশেষে প্রদান করিয়াছেন। রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শব্দটি "ভগবান্"—ইহা ভগবানের কথা, ইহা ভগবানের লীলাকথা,—হে শ্রোতৃগণ, মন সংযত কর, যদি রাসলীলা সম্বন্ধে কিছু ভ্রান্তধারণা মনের কোণে পোষণ করিয়া থাক তাহা পরিত্যাগ কর।

কারণ ইহা ভগবানের কথা। যে মন লইয়া পূজার আসনে বসিতে যাও, যে মন লইয়া বেদবেদান্ত, গীতা উপনিষৎ পাঠ কর, সেই শুদ্ধদেহ ও শুদ্ধমন লইয়া রাসলীলা কাহিনী শ্রবণ কর। আবার রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ কথাটি "ধীরঃ"—চিত্তসংযত মনোবৃত্তিনিরোধকারী শ্রোতা। যাহার মন কামনা-বাসনার তরঙ্গাঘাতে নিয়ত চঞ্চল, সে লোক "ধীরঃ" নহে। এইরূপ "ধীরঃ" শ্রোতা যদি "শ্রদ্ধান্বিতঃ" শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই লীলাকথা শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার কামপ্রবৃত্তি চিরদিনের মত বিদূরিত হইয়া যায়। সুতরাং ভগবানের এই রাসলীলা শ্রবণ করিবার একমাত্র অধিকারী সংযতচিত্ত শ্রদ্ধান্বিত মানুষ। কারণ, তাহারই "কামং হৃদ্রোগং"—কামরূপ হৃদয়ের ব্যাধি এই লীলাকথাশ্রবণে আরোগ্য হইয়া যায়,—অপর কোন শ্রোতার নহে। শ্রীশুকদেবের এই কথাগুলি মনে রাখিয়া আমাদিগকে রাসলীলা কীর্ত্তন অথবা শ্রবণ করিতে হইবে। আরও কথা আছে। এই রাসলীলা মধুররসের চরম অভিব্যক্তি। বৈষ্ণব দর্শনাচার্য্যগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচপ্রকার রসের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের সহিত অধিকারীভেদে এই পাঁচ প্রকার সম্বন্ধই স্থাপিত হইতে পারে, এবং ইহার যে-কোন একটি ভাব হইতেই ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। মুনিঋষিগণ নির্জ্জন অরণ্যে শান্তভাবে ভগবৎচিন্তন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতেছেন; উদ্ধব, প্রহ্লাদ ও হনুমান, দাস্যভাবের দ্বারাই মহান্; শ্রীদাম, সুদাম, সখ্যভাবে পরমপুরুষের সেবা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার মনেও ঈর্ষ্যা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিলেন; বাৎসল্যরসদ্বারা মাতা যশোদা কৃতার্থা এবং আরও অনেকে আজিও বাল-গোপালের সেবা করিয়া নিত্যই আনন্দ পাইতেছেন, গোপীগণ মধুররসে আপ্লুত হইয়া দেহ, মন ও আত্মা শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবেদিত করিয়া ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন;—নানা মত, বহু পথ, কিন্তু গন্তব্যস্থল সকলেরই এক। তাই একটি প্রাচীন শ্লোকে লিখিত আছে:

উদূখলং বা যমিনাং মনো বা
গোপাঙ্গনানাং স্তনকুট্টলং বা
মুরারিনাম্নঃ করভস্য বিষ্ণোঃ
আলানমাসীৎ ত্রয়মেব লোকে ॥

—বাৎসল্যরসে অভিসিঞ্চিত যশোদার উদূখল, শান্তরসপ্রধান মুনিগণের মন, এবং গোপীগণের মধুররসে উচ্ছ্বসিত স্তনযুগল—এই তিনটিই শ্রীকৃষ্ণরূপ চঞ্চল হস্তিশাবককে বাঁধিয়া রাখিবার সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ।

অথচ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি রসের মধ্যে শেষ কথা মধুররস। শান্তরস নিঃসঙ্গ ও নির্জ্জন, দাস্যরসে শান্ত ও দাস্যরস উভয়ই বিদ্যমান, সখ্যরসে শান্ত, দাস্য ও সখ্য তিনটি সেবাই রহিয়াছে, বাৎসল্যরসে পূর্ব্বের তিনটি ও নিজের অপূর্ব্ব রসও বিদ্যমান, কিন্তু মধুররসে পাঁচটি রসই একত্র আছে বলিয়া ইহা যত মধুর, ইহার সাধনা ততই কঠিন। ভক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসগুলি সাধন করিতে করিতে তবে মধুররসের অধিকারী হইয়া থাকে; কারণ, শ্রীহরির সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে এই উজ্জ্বলরসসম্বন্ধই শেষ সম্বন্ধ। মধুররসের অধিকারী হইতে হইলে বহুজন্মে অন্যান্য রসসাধনার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, একেবারে লাফাইয়া মধুররস ধরিতে যাইলে হাত ফস্‌কাইয়া যায়, সব গোলমাল হইয়া যায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই পথের পথিকের পক্ষেও এই মধুররসসাধনা করা কঠিন, অথচ কামক্রোধলোভমোহগ্রস্ত বিষয়কীট, শ্রীভাগবতের দামবন্ধনলীলা, প্রহ্লাদচরিত, উদ্ধবসংবাদ না পড়িয়া একেবারে রাসপঞ্চাধ্যায় শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। অনেক সময় দেখা যায়, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কোথাও শ্রীভাগবত পাঠ করিতে গিয়াছেন, গৃহী শ্রোতাগণের আদেশ হইল, রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিতে হইবে। ভয়ে ভয়ে আচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা ভাগবতের অন্যান্য অংশ ভাল করিয়া শুনিয়াছেন?'—উত্তর হইল—"না, তাহাতে কি আসিয়া

যায়, আমরা রাসপঞ্চাধ্যায়ই শুনিব।" বৈষ্ণব মহাশয়ের প্রত্যাখ্যান করিবার সাহস নাই, সেইরূপ মূর্খ শ্রোতাকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া চলিয়া যাইবার নৈতিক দৃঢ়তা নাই, কারণ সেখানে হয়ত শ্রোতা এবং আচার্য্যের মধ্যে অর্থের আদানপ্রদানে প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ পরিস্থাপিত হইয়াছে—শ্রোতার আদেশ মতই আচার্য্যকে পাঠ করিতে হইবে। ইহার ফলে বাংলা দেশের বহুস্থানে শ্রীভাগবতের মূলকথায় অনভিজ্ঞ শ্রোতা প্রথমেই রাস পঞ্চাধ্যায় শুনিয়া শ্রীভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিতেছেন, এবং আপনার সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছেন। তাই, শ্রীশুকদেবের সাবধানবাণী আমাদের মনে রাখিতে হইবে—ইহা সকলের জন্য নহে,—ইহা ভগবানের কথা, ইহা একমাত্র ধীর ও শ্রদ্ধাশীল শ্রোতার জন্য।

তবে এই রাসলীলার নিগূঢ় অর্থ কি? জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার লীলা? যিনি শুদ্ধ অন্তঃকরণে এই রাসলীলাকে এইভাবে দেখিবেন, তাঁহার রাসলীলার ব্যাখ্যা সত্য, তাঁহার ভক্তিসাধন সার্থক। যিনি ইহাকে পরম প্রিয়জনের নিকট গোপীগণের চরম আত্মনিবেদন বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাঁহার নিকটও এই রাসলীলা সত্য ও মধুর। সব ব্যাখ্যানই মনের অবস্থাভেদে, অধিকারভেদে সত্য। আবার, এই রাসলীলার আর একটি হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। পরমপুরুষকে উপনিষদে "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" বলা হইয়াছে। তিনি স্বয়ং রসস্বরূপ, তাঁহার রস উপলব্ধি করিলে জীব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রাসলীলায় তাঁহার যে রসস্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, সেরূপ আর কোন শাস্ত্রে কোনও ঘটনার ভিতর দিয়া ইহজগতে প্রকাশিত হয় নাই। রাসলীলাই সর্ব্বরসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড রসঘন মূর্ত্তি। যিনি স্বয়ং রসস্বরূপ, তিনি এই রাসলীলায় স্বরূপানন্দ আস্বাদন করিতেছেন, অনাবিল আনন্দ বিতরণ করিতেছেন—কৃষ্ণ ও গোপী উভয়েই সেই আনন্দের প্রবাহে একাকার হইয়া যাইতেছেন। কিন্তু এই আনন্দের

উৎস কোথায়—সাধারণ রমণ, সাধারণ বিহারের একটা জ্বালা আছে, দীর্ঘকালব্যাপী অবসাদ আছে, খণ্ড রসোপলব্ধির একটা সুদূরপ্রসারী নীরসতা আছে। পরম বৈষ্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার "মনস্তত্ত্ব ও মনোজয়" গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "জগতের তুচ্ছ রূপরসাদি অত্যন্ত পরিমিত, ক্ষণবিধ্বংসী ও দুঃখপ্রদ আভাসমাত্র। জগতের কোন রূপেরই আকাঙ্ক্ষানুরূপ আস্বাদন হয় না, ক্ষণকাল পরেই পুরাতন বলিয়া মনে হয়, কিম্বা নষ্ট হইয়া যায় এবং একটি পাইলে অপর আর একটির অভাব উদ্বোধিত হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের নিত্যনবনবায়মান ও অপরিসীম রূপরসাদি আস্বাদন করিয়া ভক্তের কখনও অলংবুদ্ধি হয় না এবং সে আস্বাদনে তদিতর সকল আস্বাদ্যেরই অভাব চিরকালের জন্য বিদূরিত হইয়া যায়।" এই রাসলীলা সেই প্রাকৃত জ্বালা বর্জ্জিত, অভাববোধবর্জ্জিত, অপ্রাকৃত মধুর লীলা। এই অপ্রাকৃত রসোপলব্ধি কিরূপে হইতেছে? ইহা কামসম্ভূত নহে, ইহা প্রেমসম্ভূত। কাম ও প্রেমের পার্থক্য শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন:

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

—আপনার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যে কার্য্য তাহা কাম, কৃষ্ণের প্রীতির জন্য যাহা করা হয় তাহাই প্রেম।

গোপীগণের হৃদয়ে কামগন্ধ নাই, আছে প্রেম—তাহাদের কামই প্রেম, প্রেমই কাম—তাহারা প্রিয়েরে দেবতা করে, দেবতারে প্রিয়। গোপীগণের সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব কখনও কাম, কখনও প্রেমশব্দ নির্ব্বিচারে ব্যবহার করিয়াছেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া দুইটি শব্দের সাধারণ অর্থ বজায় রাখিয়া তাঁহাকে লীলাকীর্ত্তন করিতে হয় নাই, কারণ পৃথিবীতে লীলাময়ের সমগ্র লীলার ইতিহাসে একমাত্র এই গোপীগণের হৃদয়ক্ষেত্রেই কাম ও প্রেম মিশাইয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল।

তাই আমরা দেখিতে পাই যে, যিনি স্বয়ংপূর্ণ, স্বপ্রকাশ, রসস্বরূপ—তিনি মুনিঋষিগণেরও পরিসেব্য, পরিপূজ্য!

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাঃ অপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

—যে মুনিঋষিগণ পরমাত্মাদর্শন করিয়া সমস্ত কামনাবাসনার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই সর্ব্ব বন্ধনবিহীন সর্ব্ব কামনাবিহীন শান্ত ঋষিগণও শ্রীকৃষ্ণে অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, শ্রীহরিতে এমনই গুণের আকর্ষণ আছে।

কেন? যাঁহারা 'আত্মারাম' হইয়াছেন, তাঁহারা তো সব শেষ করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের আবার ভক্তির কথা উঠে কেন? কারণ আছে। তাঁহারা আত্মোপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু 'রসো বৈ সঃ'—তাঁহাদের সেই অখণ্ডরসমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণসেবন এখনও বাকী থাকিয়া গিয়াছে। রসের মোহ অপ্রতিহত, রসের আকর্ষণ সর্ব্ববিধ প্রতিকারবিহীন—রসের ভিতর ডুব দেওয়া ছাড়া রসোপলব্ধির আর কোন উপায় নাই। তাই রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড রসলীলা রাসলীলা শুনিবার জন্য, তাহাতে ডুব দিবার জন্য মুনি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, বৃদ্ধ পিতা বেদব্যাস দিবারাত্র বসিয়া আছেন, রৌদ্রবৃষ্টিতে বসিয়া আছেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন। এই সেই রসলীলা, রাসলীলা, শ্রীকৃষ্ণ-গোপী মিলন-সংবাদ।

কিন্তু রাসলীলার কোন্ ব্যাখ্যাটি সত্য ও সুন্দর, সে প্রশ্ন হয়তো এখনও থাকিয়া গেল, মীমাংসা হইল না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ইহার সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা নাই, প্রত্যেক ভক্তকে নিজ নিজ অবস্থা ও মনোবৃত্তি-অনুযায়ী ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে, অপরের কথায় কিছুই হইবে না, নিজের অনুভূতি দিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। রাসলীলার মর্ম্মকথা কে জানে? শ্রীকৃষ্ণ জানেন, গোপীগণ জানেন, শ্রীশুকদেব হয়ত জানেন, আর যে ভক্ত বহুজন্ম সাধনভজনের ফলে মধুররস গ্রহণের

অধিকারী হইয়াছেন তিনিও হয়তো রাসলীলার মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাধারণ পণ্ডিত এবং আচার্য্যগণের বাক্যচ্ছটার উপর নির্ভর করিলে সমস্ত বস্তুটিই ঘোলাটে হইয়া যাইবে। কারণ, পণ্ডিতগণ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জিনিষটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সাধনভজন করিয়া হৃদয় দিয়া অনুভব করেন নাই,—বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে পারা এবং হৃদয়ের সাহায্যে অনুভব করার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। যিনি নিজেই বুঝিতে পারেন নাই,—এখনও কামনাবাসনার দাস হইয়া দিগ্বিদিকে উন্মত্তের মত ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, তিনি অপরের মনে কিরূপে বিশুদ্ধ প্রেরণার সৃষ্টি করিবেন! তাই রাসলীলা চিরদিনই মহারহস্যময়ী লীলা, হয়ত চিরদিনই নিগূঢ়রসে আচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে। শ্রীশুকদেবের মত পরমসন্ন্যাসীর মুখে রাসলীলা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের মত মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের মনেই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল—এই রাসলীলা তো "পরদারাভিমর্শনং"—ধর্ম্মবিরুদ্ধ পরস্ত্রীসংসর্গ মাত্র! শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের এই সন্দেহ নিরসনের জন্য অবশেষে আরও কত কথা বলিলেন, যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু পরীক্ষিৎ নীরব রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না, হয়তো তাঁহার সন্দেহ থাকিয়াই গেল, রাসলীলার মর্ম্মকথা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। যদি স্বয়ং শ্রীশুকদেবের মুখে শুনিয়াও রাজা পরীক্ষিতের মত শ্রোতার মনে সন্দেহ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণ আচার্য্যগণের মুখে রাসলীলা শুনিয়া বদ্ধজীবের মনের অবস্থা কি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়! তাই শেষ কথা এই যে, রাসলীলা কীর্ত্তন এবং শ্রবণ সাধারণ মানুষের জন্য নহে।

রাসলীলা। আজ পূর্ণিমা তিথি, শরৎকাল, আশ্বিন মাস। বৃন্দাবনের নিকুঞ্জসমূহ বর্ষাবিধৌত হইয়া শ্যামশোভা ধারণ করিয়াছে। এমন দিনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন। তিনি গোপীগণকে বলিয়াছিলেন যে, শারদীয় পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহাদের কাত্যায়নী পূজার

উদ্দেশ্য সফল হইবে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবেন।
শ্রীশুকদেব বলিলেন,

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১০।২৯।১

—ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালীন প্রস্ফুটিত মল্লিকাকুসুম-সমূহে সুশোভিত রাত্রিসমূহ সমাগত দেখিয়া যোগমায়া নাম্নী স্বীয় মহাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন।

ইহাই রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শ্লোক। এই বিখ্যাত শ্লোকে শ্রীশুকদেব কয়েকটি সুচিন্তিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহার সমষ্টিগত অর্থ গ্রহণ করিলে রাসলীলার মর্ম্মকথার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। যিনি এই রাস-লীলায় প্রবৃত্ত হইতেছেন তিনি 'ভগবান্'। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য অহরহ বিরাজ করিতেছে। সুতরাং তিনি আপনার আনন্দে আপনি বিভোর, তাঁহার অভাববোধ নাই। অথচ এইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় প্রবৃত্ত, সুতরাং ইহা অভাববোধবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-অন্বেষণশীল নরনারীর মিলন নহে। সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সুতরাং ইহা কেবলমাত্র রমণ নহে, ইহা ভগবানের রমণ। রমণ শব্দের অর্থ আনন্দাস্বাদন এবং তাহা জীব এবং ভগবান্ উভয়েরই হইতে পারে। জীবের আনন্দ উপভোগ আবার দ্বিবিধ—বিষয়াসক্ত জীব ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে যে সুখ পায় তাহাও সাধারণ ভাষায় আনন্দ, আবার বিষয়বিরক্ত মানুষ আত্মোপলব্ধিতে যে সুখ পায় তাহাও আনন্দ। কিন্তু স্বরূপানন্দ বিতরণ করিয়াই ঈশ্বরের আনন্দ। জীবের আনন্দাস্বাদনের উদ্দেশ্য দুঃখনিবৃত্তি, ভগবানের আনন্দাস্বাদনের উদ্দেশ্য তাঁহার স্বাভাবিক লীলা—তিনি আনন্দময়, তাঁহার নিকট হইতে নানাভাবে আনন্দ বিচ্ছুরিত হয়, তিনি আনন্দ বিতরণ করিয়া আনন্দ

পাইয়া থাকেন। জীব আনন্দ গ্রহণ করিতে, উপভোগ করিতে চায়; ভগবান আনন্দ প্রদান করিতে চান। সুতরাং ভগবানের রমণের অর্থ এই যে, তিনি অনন্ত আনন্দ প্রদান করিতেছেন, অনন্ত আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন।

শ্রীশুকদেব বহির্মুখ জীবগণকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন,—বুদ্ধি পরিশুদ্ধ কর, তোমরা রমণ বলিতে যাহা এতদিন বুঝিয়া আসিতেছ, ইহা সে রমণ নহে—ভগবানের রমণ, সুতরাং ইহাতে অপূর্ব্ব বিচিত্রতা আছে। শুকদেব যেন বলিতেছেন, হে শ্রোতাগণ, তোমাদের সংযত মন, সাধনভজন-প্রসূত শুদ্ধ দৃষ্টি লইয়া প্রস্তুত হও, তবে আধ্যাত্মিক কল্পনাসহায়ে এই রাসলীলা উপলব্ধি করিতে পারিবে। সেই রাত্রিগুলি "শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ"—শরৎকালে প্রস্ফুটিত শুভ্র মল্লিকাফুলে চতুর্দ্দিক সাদা দেখাইতেছে, শুভ গন্ধ বনভূমি প্লাবিত করিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। এই শুভ্র চন্দ্রকিরণ ও শুভ্র মল্লিকাফুলের সমাবেশে একটা শুচিশুভ্র সত্ত্বগুণময়ী পটভূমিকার সৃষ্টি করিতেছে, সেখানে কামনাবাসনার অরুণিমা নাই,—শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ গোপীগণের গৌরবর্ণ অঙ্গ সবই শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব পবিত্রতার ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। কিন্তু ভগবান্ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরমপুরুষ, তিনি গোপীগণের দেহ ও মন লইয়া রাসলীলা করিবেন কিরূপে! সুতরাং তাহাকে "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" হইতে হইল, তিনি অঘটনঘটনপটীয়সী, অচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই কথাটি বুঝিয়া দেখিতে হইবে। শ্রীভগবান্ তাঁহার মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ মূর্ত্তিতে অসুরমারণ, ভূভারহরণ, ধর্ম্মসংস্থাপন লীলা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মবিমোহিনী যোগমায়াশক্তি প্রকাশের কোন প্রয়োজন হয় নাই, তাঁহার ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি শক্তি প্রকাশেই সেই সকল লীলা সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভগবানের রাসলীলায় এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে, তাহাতে তাঁহার আত্মবিস্মৃত না হইলেই

চলিবে না। তাঁহাকে ব্রজরমণীগণের প্রেমের অনুরূপ ভাবে লীলা করিতে হইবে; সুতরাং সর্ব্বলীলার মধ্যে এই কেবলমাত্র রাসলীলাতেই শ্রীহরি তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্যমহাশক্তি অবলম্বন করিয়া নিজ মায়ায় নিজে বিমোহিত হইয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া, ব্রজরমণীগণের প্রেমভাবে ভাবিত হইয়া, প্রেমানুরূপ সজ্জিত হইয়া, প্রেমানুরূপ লীলায় লীলায়িত হইয়া অভিনব রাসলীলা আস্বাদন করিতেছেন। তাই রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ আজ "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ"।

এইবার শ্রীকৃষ্ণ "জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্"—সুন্দরী ব্রজনারীগণের মনোহারী সুমধুর বংশীবাদন করিলেন। সেই বংশীধ্বনি চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত করিয়া দূর ব্রজপল্লীর কুটীরে কুটীরে প্রবেশ করিল, সমস্ত গোপীগণকে চকিত করিয়া তাহাদের হৃদয়ের প্রতিরন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই বংশীধ্বনি এখনও হারায় নাই, এখনও বায়ুসমুদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে সেই অশ্রুত বংশীধ্বনির চক্রলহরী—কোনও কোনও ভাগ্যবান্ শুনিবারে পায়। প্রতি রন্ধ্রে বাঁশী বাজিতে লাগিল, উচ্চ হইতে উচ্চতর নিনাদ, শতছিদ্রপথে গোপীবক্ষে প্রবেশ করিয়া সহস্র স্বরের ঝঙ্কার তুলিল, আবার বায়ুতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে আসিয়া গোপীহৃদয়ের মায়া সৃষ্টি করিল। কোনও গোপী তখন গোদোহন করিতেছিলেন, কেহ পরিবারবর্গকে অন্ন পরিবেশন করিতেছিলেন, কেহ বা আপন শিশুপুত্রকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, কেহ বা পতি-সেবা করিতেছিলেন—সব কাজই অসমাপ্ত রহিয়া গেল, সর্ব্বনাশা, কর্ম্মনাশা বাঁশী সব ভুলাইয়া দিল, কাজ করা আর হইল না। কোনও গোপী তখন বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিতেছিলেন, বক্ষের উত্তরীয় বস্ত্ররূপে পরিধান করিলেন, বস্ত্র উত্তরীয় হইয়া গেল, কটিদেশের চন্দ্রহার কণ্ঠে উঠিল, কণ্ঠের হার কটিদেশে স্থান পাইল। সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে, মন বাড়ীতে নাই, পতিপুত্রের দিকে নাই, নিজ শরীরের দিকে নাই, শরীরের বেশভূষা

ও সৌন্দর্য্যের দিকে নাই—সকলে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে বনভূমির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। গোপীগণ স্বামী, পিতা, ভ্রাতা কাহারও বারণ মানিলেন না,—যাঁহারা পরিজন কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া গৃহে অবরুদ্ধ রহিলেন, তাঁহারা নয়ন মুদ্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন।

গোপীগণ—কুমারী ও বিবাহিতা—সকলেই যমুনাতীরে নির্জ্জন বনকুঞ্জসমীপে উপস্থিত হইলেন। সকলে পতিপুত্র, পিতামাতা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি যেন তাঁহাদের মনের আবেগ যথেষ্টরূপে প্রকাশিত হয় নাই, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ'—তোমাদের কি প্রিয়কার্য্য আমি সম্পাদন করিব,—বনভূমির ভয় প্রদর্শন করিয়া লোকলজ্জার ইঙ্গিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ব্রজপুরীতে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন।

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা,
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥
মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ,
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্ ॥ ১০।২৯।১৯,২০

—হে সুন্দরীগণ, এই রাত্রিকাল নির্জ্জন ও ভয়ঙ্কর এবং হিংস্র জন্তুগণ এই সময়ে বিচরণ করিয়া থাকে। তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও, এই সময়ে এই নির্জ্জনস্থানে আমার নিকট স্ত্রীলোকের থাকা উচিত নহে।

—তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিগণ তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া নিশ্চয়ই এতক্ষণ অন্বেষণ করিতেছেন, তোমরা এখানে দেরী করিয়া আত্মীয় স্বজনের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করিও না—এখনই ব্রজে ফিরিয়া যাও।

গোপীগণ কি বলিবেন! যাঁহার জন্য তাঁহারা এতদূর ছুটিয়া আসিয়াছেন, পতি পিতা ত্যাগ করিয়াছেন, হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি অতিক্রম

করিয়াছেন, তাঁহার এই ছলনাময়ী কথা শুনিয়া গোপীগণ কি বলিবেন ? তাঁহারা কি কাছে পাইয়াও শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া আবার ব্রজপুরীতে ফিরিয়া যাইবেন ? তাঁহাদের বিম্বফলসদৃশ অধর দীর্ঘ নিশ্বাসে শুষ্ক হইয়া গেল, অশ্রুধারায় স্তনলিপ্ত কুঙ্কুম ধুইয়া যাইতে লাগিল, শ্রীচরণের অঙ্গুষ্ঠ দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন, তাঁহারা নীরবে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে মনোবেগ প্রশমিত হইলে তাঁহারা বলিলেন,—"তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ! দেহি দাস্যম্"—হে পুরুষরত্ন, তোমাকে দেখিয়া আমরা কামাগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে তোমার দাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া লও,—'নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো, তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্'—হে তাপিত হৃদয়ের একমাত্র শরণ, তুমি এই দাসীগণের উত্তপ্ত স্তনযুগলে ও মস্তকে তোমার করকমল স্থাপন কর।

শ্রীশুকদেব বলিলেন,

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ,
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ ১০।২৯।৪২

—তখন যোগেশ্বরগণেরও পরম ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন এবং স্বয়ং আত্মারাম হইলেও গোপীগণের নিকট প্রেমাধীন হইয়া তাঁহাদিগের সহিত রমণ করিলেন।

শ্রীশুকদেব আবার বলিলেন, "বাহুপ্রসার পরিরম্ভ করালকোরু-নীবীস্তনালভন নর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ"—শ্রীকৃষ্ণ তখন বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক গোপীগণকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিয়া তাঁহাদের হস্ত, গণ্ডদেশবিলম্বিত কেশগুচ্ছ, উরু, কটিবন্ধন ও স্তনযুগল স্পর্শ করিয়া, নখরজালের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

ত্রিংশ ও একত্রিংশ অধ্যায়ে বিরহসন্তপ্তা গোপীগণ অতি দীর্ঘ নিশায় উন্মত্তবৎ বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

বিরহ মিলনেরই অঙ্গ—বিরহ ও মিলন অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। যেমন জীবন ও মৃত্যু পরস্পর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ—একটি থাকিলেই আর একটি থাকিবে,—সেইরূপ মিলন ও বিরহ একসঙ্গেই বিরাজ করে, উভয়কে একত্র করিয়া তবে প্রেমময়ের প্রেমলীলা সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের যে মিলন আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি তাহা এই অধ্যায়ে বিরহে পরিণত হইয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণবিরহি-ব্রজরমণীগণ উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতেছেন এবং বৃক্ষলতাদি যাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন তাহাকেই কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যাইল না। তখন তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া পুনরায় একত্র মিলিত হইলেন এবং কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের বাহ্যদৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং তাঁহারা স্মৃতিপটে সমুদিত লীলাসমূহের ভাবে ভাবিত হইয়া সেই সকল লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কেহ বলরাম সাজিলেন, কেহ বা কৃষ্ণ, কেহ বা গোপবালক সাজিয়া বৎসাসুর, বকাসুর প্রভৃতি অসুরগণের বধলীলা অভিনয় করিতে লাগিলেন ;—এইরূপে গোবর্দ্ধনধারণ, কালিয়-দমন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সমুদয় বাল্যলীলাই সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনীতে নির্জ্জন বনপ্রদেশে পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইতে লাগিল।

গোপীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ একজন গোপীকে সঙ্গে লইয়া অন্যান্য গোপীগণের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন এক নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়াছেন।

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ,

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ১০।৩০।২৮

—শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া কোন গোপরমণী নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছে। আমাদের কৃষ্ণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সেই ভাগ্যবতী রমণীকে লইয়া নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়াছেন।

এই শ্লোকটি শ্রীভাগবতে বিশেষ পরিচিত। কারণ, 'আরাধিতঃ' কথাটির উপর নির্ভর করিয়া কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, রাধার সহিত গোপনে বিহার করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হইয়াছেন। 'আরাধিতঃ' কথাটির সহজ অর্থ 'আরাধিত'—কিন্তু যদি কথাটিকে "রাধিতঃ" বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে "রাধাসহিত", এই অর্থও সম্ভবপর হইতে পারে।

শ্রীভাগবতে তথা রাসপঞ্চাধ্যায়ে শ্রীরাধার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নাই, গোপীগণের মধ্যে কাহারও নাম উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গর্গসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরাধা এবং গোপীগণের নাম স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সমালোচনায় জানা যায় যে, এই কৃষ্ণসঙ্গিনী ব্রজরমণীই কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকা। যাহাই হউক, গোপীগণ সেই পরম সৌভাগ্যশালিনী শ্রেষ্ঠ গোপীকার পদচিহ্ন ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা সম্ভবপর হইল না। কিছুদূর যাইয়া দেখা গেল, সেই কৃষ্ণপ্রিয়ার পদচিহ্ন আর নাই। তখন গোপীগণ অনুমান করিলেন যে, বোধহয় সেই গোপরমণী বনভ্রমণ হেতু পরিশ্রান্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন। এইরূপে নানাবিধ অনুমান করিতে করিতে গোপীগণ চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়াও যখন শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা বিফলমনোরথ হইয়া যমুনাপুলিনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলাসম্বন্ধীয়

গান গাহিতে লাগিলেন। কৃষ্ণলীলায় বিমোহিত হইয়া কৃষ্ণলীলা বলিতে বলিতে শুনিতে শুনিতে গোপীগণ বলিলেন,

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্,
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ জনাঃ॥ ১০।৩১।৯

—তোমার বিরহজ্বালায় যাহারা সন্তপ্ত হয়, তোমার কথামৃত তাহাদের জীবনপ্রদ, উহা পাপবিনাশন ও অশেষ কল্যাণকর। অতএব যে ব্যক্তি তোমার কথা কীর্ত্তন করিয়া উহা মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়, তাহার মত দাতা আর কেহই নাই।

এই শ্লোকটি মধুর, এবং ভক্তগণের মনের কথা। বিশেষ করিয়া, এই শ্লোকটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণবসমাজে চিরপরিচিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে, রাজা প্রতাপরুদ্রের মুখে এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া শ্রীমহাপ্রভু ভাবাবেশে অধীর হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়াছিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের দর্শন ও কৃপালাভের চেষ্টা করিতেছিলেন, অথচ ভোগবিলাসী রাজাকে শ্রীচৈতন্য দেখিবেন না, স্পর্শ করিবেন না, এই সঙ্কল্প ভক্তমণ্ডলীর নিকট বারংবার প্রকাশ করিতেছিলেন। ঘটনাচক্রে একদিন ব্যাপার অন্যরূপ ঘটিয়া যাইল। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ

'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল,
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল।
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন।
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার
দুইজনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার।
"ভূরিদা" "ভূরিদা" বলি করে আলিঙ্গন
ইহা নাহি জানে এহো হয় কোন জন॥

তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই মধুর শ্লোকটি অপূর্ব্ব শক্তি-সম্পন্ন, শ্রীচৈতন্যের বিরুদ্ধ মনোভাব জয় করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত চৈতন্যের মিলন সংঘটিত করিয়াছিল।

এইরূপে অনেক চেষ্টা করিয়া অন্বেষণ সত্ত্বেও যখন শ্রীকৃষ্ণদর্শন ঘটিল না, তখন গোপীগণ স্থির হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

বত্রিশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া কিরূপে গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করেন তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ,
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ॥ ১০।৩১।২

—যাঁহার বদনকমলে নিয়ত হাস্য বিরাজ করিয়া থাকে সেই পীতাম্বর-ধারী বনমালী সাক্ষাৎ মদনমোহনরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক গোপীগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

এই শ্লোকটির মধ্যে "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ" কথাটি বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত। টীকাকারগণ ইহার বহুবিধ জটিল অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সবগুলিই ভাবসঙ্গত এবং ব্যাকরণসম্মত কিন্তু ইহার সহজ অর্থটি ধরিবার জন্য পাণ্ডিত্যের বিকাশ প্রয়োজন হয় না। শ্রীধরস্বামী মহাশয় বলিতেছেন—'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথো জগন্মোহনস্য কামস্যাপি মনসি উদ্ভূতঃ কামঃ সাক্ষাৎ তস্যাপি মোহক ইত্যর্থঃ'—অর্থাৎ যে কামদেব সমগ্র জগৎকে বিমোহিত করিয়া থাকেন, সেই কামদেবের মনে উদিত যে কাম তাহাও যাঁহার শ্রীরূপ দর্শন করিলে চিরচরিতার্থ হইয়া যায়—তিনিই "মন্মথ-মন্মথঃ"। সহজ ভাষায়, যিনি কন্দর্পকেও রূপে পরাজিত করিয়া থাকেন, যিনি সকল কামনাহরণ, সেই শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া বিরহাতুর গোপী-গণকে দর্শন প্রদান করিলেন, তাঁহাদের সকল বিরহ, সকল কামনা তাঁহার দর্শনমাত্রেই তাঁহার শ্রীরূপের মধ্যে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইল। কোন গোপী

কৃষ্ণের হস্তধারণ করিলেন, কেহ বা অঞ্জলি পাতিয়া কৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিলেন, কেহ বা তাঁহার চরণযুগল নিজ স্তনযুগলের উপর স্থাপন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, গোপীগণ লোকাচার, বেদাচার ও আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া—"দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য"—দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আজ নির্জ্জন বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের ঋণ স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু ইহার প্রতিদানে গোপীগণকে দিবার মত তাঁহার কিছুই নাই।

তেত্রিশ অধ্যায়টি রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে রাসবিহারীর রাসলীলা যে সর্ব্ববিধ দোষশূন্য এবং মানুষের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর, তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাসলীলা পুনরায় আরম্ভ হইল। শ্রীশুকদেব বলিলেন,

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১০।৩৩।৩

—গোপীগণ পরস্পর হস্তধারণ করিয়া মণ্ডলাকারে দাঁড়াইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগৈশ্বর্য্যপ্রভাবে বহু হইয়া তাঁহাদের দুই দুইজনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাসলীলা আরম্ভ করিলেন।

রাসলীলা চলিতেছে—বহু গোপী, বহু কৃষ্ণ। প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রতি গোপীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, দর্শনোৎসুক দেব-দেবীগণের বিমানে আকাশ পথ ছাইয়া গিয়াছে, স্বর্গে দুন্দুভি বাজিতেছে, পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, গন্ধর্ব্বগণ শ্রীভগবানের গুণগান করিতেছে। মর্ত্ত্যধাম আজ আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতিথিতে চন্দ্রকিরণে বিধৌত হইয়া, ফুলে ফুলে সজ্জিত হইয়া, সুগন্ধময় বাতাসে পুলকিত হইয়া স্বর্গের সুষমাকেও পরাজিত করিয়াছে; রূপ, রস, শব্দ ও গন্ধের একটা অনাবিল প্রবাহ চতুর্দ্দিকে তরঙ্গায়িত হইতেছে—স্বয়ং মন্মথমন্মথ রূপের ছটায় স্বর্গমর্ত্ত্য প্লাবিত করিয়া আজ রাসমহোৎসব করিতেছেন। নৃত্য ও সঙ্গীতে

চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছে;—ইন্দ্রের সভায় তো উর্ব্বশী, মেনকার নৃত্যগীত অহরহ হইয়া থাকে, কিন্তু এই রাসলীলার নৃত্যগীত উপভোগ করিয়া দেবগণের নিকট ইন্দ্রসভার নৃত্যগীত আলুনি হইয়া গিয়াছে—মুগ্ধ দেবগণ তো এমনটি আর কখনও দেখেন নাই!

বলয়ানাং নৃপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ১০।৩৩।৬

—তখন রাসমণ্ডলে প্রিয়তমের সহিত সম্মিলিত গোপীগণের হাতের বলয়, কটিদেশের কিঙ্কিণী, পায়ের নূপুর তালে তালে বাজিতে লাগিল।

বাজে লক্ষ বলয়া, বাজে লক্ষ কিঙ্কিণী, বাজে লক্ষ নূপুর—বাজে ঝম্ঝম্ঝম্, বাজে ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্, বাজে ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্। সে যেন লক্ষ সোনার হারের মধ্যে লক্ষ লক্ষ নীলকান্তমণি—মণ্ডলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে একসঙ্গে দুলিয়া উঠিতেছে, একসঙ্গে নাচিয়া উঠিতেছে, একসঙ্গে বাজিয়া উঠিতেছে। লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণের জমাট বাঁধা একখানি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘের চক্র দেখা যাইতেছে, হঠাৎ তাহার ভিতর চারিদিকে এক একবার লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতের রেখা চমকিয়া উঠিতেছে—কোনও সময় কেবল মেঘ, কখনও বা বিদ্যুতের ঝল্কানী—কখনও দেবগণ দেখিতেছেন, নবমেঘরূপী শ্রীকৃষ্ণ, কখনও উজ্জ্বলা গোপীগণের রূপচ্ছটায় ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ হারাইয়া যাইতেছেন। এক একবার মনে হইতেছে, সেই লক্ষ গোপী ও লক্ষ কৃষ্ণকে লইয়া একখানি অখণ্ড আনন্দের সত্তা জমাট বাঁধিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে;—স্থির হইলে বহু গোপী, বহু কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে প্রতীয়মান হইতেছে। একবার এক অখণ্ড সত্তা, আবার বহু বহু গোপী ও বহু বহু কৃষ্ণ। মুখগুলিতে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা যাইতেছে, চাঁদের কিরণে নৃত্যের অঙ্গভঙ্গীতে সেই স্বেদবিন্দুগুলি হীরকখণ্ডের মায়া সৃষ্টি করিতেছে, কবরীবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, ফুল খসিয়া পড়িয়া তৃণভূমি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বহুরূপ কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিতেছেন,

নানাবিধসুর একত্র হইয়া একটা মহামোহময় সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছে। দেবগণ এমন নৃত্য, এমন গান তো কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। মানুষ তো দেখেই নাই, কোন মানুষ সেখানে ছিল না। "এবং পরিষঙ্গ-করাভিমর্শ—স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দাম বিলাস হাসৈঃ, রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভিঃ" —যিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপতি, নিত্য যিনি বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবীর সেবা গ্রহণ করেন, লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিলাস করিয়া থাকেন সেই "রমেশ" আজ ব্রজসুন্দরীগণের সহিত আলিঙ্গন, করমর্দ্দন, প্রণয়নিরীক্ষণ, উদ্দামবিলাস ও হাস্য করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তাহা হইলে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর সহিতও বিলাসলীলায় যাঁহার পরিতৃপ্তি হয় নাই সেই রমাপতি কি আজ গোপীবল্লভ সাজিয়া তাঁহার অতৃপ্ত বাসনা পরিতৃপ্ত করিতেছেন! চতুর্দ্দিকে একটা আনন্দের শিহরণ। গোপীগণের মালা ও অলঙ্কার আর দেহে নাই, কখন খসিয়া মাটিতে পড়িয়াছে কেহ জানিতে পারে নাই, তাঁহাদের কেশের বন্যায় শ্রীকৃষ্ণবক্ষ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, গোপীগণের পরিধানের বস্ত্র ও "কুচপট্টিকা"—স্তনবস্ত্র শিথিল হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ ১০।৩৩।২০

—শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, সুতরাং তাঁহার আনন্দ বাহিরের বস্তু নিরপেক্ষ হইলেও তিনি যতসংখ্যক গোপী আপনাকে ততসংখ্যক করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যমুনা-সৈকতে স্থলক্রীড়া সমাপ্ত করিয়া পরিশ্রান্ত কৃষ্ণ ও গোপীগণ যমুনার জলে অবগাহন করিলেন এবং সেই জলমধ্যে "রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ"—মদোন্মত্ত গজেন্দ্র যেমন হস্তিনীগণের সহিত জলক্রীড়া করে সেইরূপ সকলে মিলিয়া জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ইহার পর কুঞ্জক্রীড়া আরম্ভ হইল, শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমর ও গোপীগণে

পরিবৃত হইয়া পুষ্পরেণুগন্ধময় যমুনার উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব রাসমহোৎসব—সৈকতলীলা, জললীলা, কুঞ্জলীলা-বর্ণনা শেষ করিয়া শ্রীশুকদেব বলিলেন,

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ,
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥

১০।৩৩।২৬

—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা কামজয়ী এবং সত্যসঙ্কল্প। তিনি গোপীগণকে কথা দিয়াছিলেন যে শারদীয়া পূর্ণিমা তিথিতে গোপীগণের কামনাপূরণ করিবেন। তাই স্বয়ং কামগন্ধবিবর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্বরসময়ী শরৎকালীন পূর্ণিমা রাত্রিতে গোপীগণের সহিত আনন্দ উপভোগ করিলেন।

রাসলীলা বর্ণনার এই শ্লোকটি বিখ্যাত এবং বিশেষ ভাবে পরিলক্ষণীয়। "অবরুদ্ধসৌরতঃ" অর্থাৎ যাঁহার কামভোগোপলিপ্সা অবরুদ্ধ সুতরাং বিলুপ্ত—শ্রীকৃষ্ণ চিরব্রহ্মচারী, ইন্দ্রিয়জয়ী, পরমপুরুষ। শ্রীধর স্বামী মহাশয় 'অবরুদ্ধসৌরতঃ' কথাটির টীকা করিয়া বলিয়াছেন "অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ ন তু স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ"—অর্থাৎ যাঁহার বীর্য্যস্খলন হইল না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কামজয়ী। এই শ্লোকে আর একটি কথা লক্ষ্য করিতে হইবে,—"সত্যসঙ্কল্পঃ"। শ্রীকৃষ্ণ সত্যস্বরূপ। তিনি বলিয়াছেন—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে সেইভাবেই আমি তাহাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া থাকি—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প। এই সত্যসঙ্কল্পের অধীন শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট প্রতিশ্রুত শারদী পূর্ণিমায় রাসলীলা করিয়া গোপীগণের মনের অনুরূপ আনন্দ প্রদান করিতেছেন।

এই শেষ শ্লোক বলিয়া শ্রীশুকদেব তাঁহার অপূর্ব্ব রাসলীলাবর্ণন পরিসমাপ্ত করিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে গোপীগণ নিজনিজ গৃহে গমন করিলেন। রাসলীলা শেষ হইয়াও শেষ হইল না, শেষের

মধ্যেও অশেষ থাকিয়া গেল,—রাসলীলা আকাশে বাতাসে, যমুনাতীরে কুঞ্জবনে, বায়ুতরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কিছুই হারাইল না,—অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—কোন কোন ভাগ্যবান্ এখনও দেখিতে ও শুনিতে পান।

কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের মনে একটা খট্‌কা থাকিয়া গেল—এ কী শুনিলাম! পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ পরদার লইয়া রতি করিলেন—জগদীশ্বরের আচরণ তো সমাজবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইল! রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন, যে কৃষ্ণ "সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য"—ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথচ "প্রতীপং আচরৎ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্"—হে ব্রহ্মন্, তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ পরস্ত্রীসংসর্গ কিরূপে আচরণ করিলেন! তখন শুকদেব, রাজা পরীক্ষিৎ ও সমবেত শ্রোতাগণের মনের সংশয় দূর করিবার জন্য কতকগুলি যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলেন। শ্রীশুকদেব প্রথমেই বলিলেন,

তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥ ১০।৩৩।৩০

—তেজস্বিব্যক্তির কোন কার্য্য কখনও দোষলিপ্ত হইতে পারে না, যেমন অগ্নির স্পর্শদোষ হয় না, অগ্নিতে যাহাই পড়ুক তাহাই পুড়িয়া শুদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ তেজস্বী ব্যক্তির অসাধারণ মনঃশক্তির নিকট সমস্ত আচরণই বিশুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়।

এই পংক্তিটি প্রসিদ্ধ। অনেক সময় লোক সাধারণ মানুষের দোষ ঢাকিবার জন্য এই শ্লোকটির দোহাই দিয়া থাকে। কোন মানুষ হয়ত বহু অর্থসঞ্চয় করিয়াছে, উচ্চপদে আরূঢ়, সমাজে প্রবল প্রতাপসম্পন্ন, হয়ত গুণযুক্ত, এইরূপ মানুষের দোষত্রুটি ঢাকিবার জন্য তাহার চাটুকারগণ এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া থাকে—তেজীয়সাং ন দোষায়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। তেজস্বী পুরুষ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একজনই আছেন, আর দ্বিতীয়ব্যক্তি কেহই নাই ;—যিনি একদিন বলিয়াছিলেন,

"তেজ স্তেজস্বিনাম্ অহম্"—তিনিই ক্ষুদ্র তেজস্বিরূপে অভিনয়কারী জনগণের তেজঃস্বরূপ, সুতরাং ধারকরা তেজ লইয়া যাহারা তেজস্বিতার বড়াই করে তাহারা মূর্খ, কারণ খাঁটি তেজস্বী,—আপনার তেজে আপনি দীপ্তিশীল, পুরুষ-প্রধান একজনই আছেন, এবং "তেজীয়সাং ন দোষায়" কথাগুলি একমাত্র তাঁহার জীবনেই প্রযোজ্য। শুকদেব বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের মত আচরণ অপর কাহারও অনুকরণীয় নহে—মহাদেব বিষভক্ষণ করিয়াও মৃত্যুঞ্জয়ী, কিন্তু সেই আচরণের অনুকরণ করিতে যাইলে, সাধারণ জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরের বচন গ্রহণীয়, তাঁহাদের বচনের অনুযায়ী আচরণও গ্রহণীয়, কিন্তু তাঁহাদের আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ জীবের পক্ষে গ্রহণীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণ অপরের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ, তাঁহার নিজের ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম নাই, সুতরাং তাঁহার কর্ম্মবন্ধনও নাই। গোপীকাগণ কৃষ্ণসঙ্গে বিহার করিলেও তাঁহাদের পতিগণ কৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত হইয়া আপন আপন বনিতাকে নিজ পার্শ্বেই অবস্থিত মনে করিয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের মনে কোন দ্বেষবুদ্ধি উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে শ্রীশুকদেব নিম্নে উল্লিখিত শ্লোকটি বলিয়া রাজা পরীক্ষিৎ, দেবর্ষি, রাজর্ষি ও মহর্ষিগণ এবং চিরযুগের ভক্তবৃন্দ সকলের মনের সমস্ত সন্দেহ নিরসন করিয়া রাসপঞ্চাধ্যায় শেষ করিলেন।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথবর্ণয়েদ্ যঃ,
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ
ধীরঃ ॥ ১০।৩৩।৪০

—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গোপীগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করেন অথবা কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরেই ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়া শরীরের রোগের ন্যায় মনের অনিষ্টকর কামপ্রবৃত্তি দূর করিতে সমর্থ হন।

সুতরাং রাসলীলার পূর্ব্বকথা, মধ্যকথা, শেষ কথা—এই যে, কামবিবর্জ্জিত মন লইয়া রাসবিহারীর রাসমহোৎসব শ্রবণ করিতে হইবে, উজ্জ্বলরসের কথা শ্রবণ করিতে করিতে মনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইবে, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে সেই মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের কাম-প্রবৃত্তি চিরদিনের মত নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। যাহার মন এখনও শুদ্ধ হয় নাই সে রাসলীলা শ্রবণ করিবার অধিকারী নয়, শ্রবণ করিলে তাহার অশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত সর্পরূপী এক বিদ্যাধরকে এক পদাঘাতের দ্বারা মুক্ত করিলেন,—এই সর্প নন্দরাজকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত, কুবেরের এক অনুচর গোপীগণকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করায় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিলেন। বৃষভাকার অরিষ্টাসুর, কংসপ্রেরিত অশ্বরূপধারী কেশীনামক অসুর, ময়দানবের পুত্র মহামায়াবী ব্যোমনামক অসুর—ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইল।

এদিকে ভগবান নারদ একদিন কংসসমীপে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভ বলিয়া প্রসিদ্ধা যে কন্যা সে যশোদার কন্যা এবং যশোদার পুত্ররূপে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণই দেবকীর অষ্টমগর্ভের পুত্র, এবং রোহিণীর পুত্র বলরাম দেবকীর সপ্তমগর্ভের পুত্র। দেবকীর সপ্তম গর্ভ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া যে একটা জনশ্রুতি উঠিয়াছিল তাহা মিথ্যা। বসুদেব কংসভয়ে ভীত হইয়া নিজপুত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে তাঁহার মিত্র নন্দরাজের নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

নিশম্য তং ভোজপতিঃ কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ
নিশাতমসিমাদত্ত বসুদেবজিঘাংসয়া ॥ ১০।৩৬।১৮

—ভোজরাজ কংস দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপবশতঃ বিচলিতচিত্ত হইয়া তখনই বসুদেবকে বধ করিবার ইচ্ছায় তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করিলেন।

দেবর্ষি কংসকে বুঝাইলেন যে, বসুদেবকে হত্যা করিয়া তাঁহার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তখন কংস বসুদেবকে বধ করিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে পুনরায় পত্নী দেবকীর সহিত শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

এইবার কংস শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে বধ করিবার জন্য এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা সৃষ্টি করিলেন। কংসের চানূর ও মুষ্টিক নামে দুইজন মল্লযোদ্ধা ছিল। ইহাই স্থির হইল যে ধনুর্যাগপর্ব্ব উপলক্ষে পুরবাসীগণের আনন্দের জন্য এক বিরাট্ মল্লযুদ্ধের প্রদর্শনী হইবে। দেশবিদেশের মল্লগণকে প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান করা হইবে, তাহার ভিতর বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে আমন্ত্রণ প্রেরিত হইবে। বহুমঞ্চ-পরিশোভিত মল্লযুদ্ধক্ষেত্রের দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় নামক এক দুরন্ত হস্তীকে রাখিয়া দেওয়া হইবে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দ্বারদেশে আসিলেই সেই হস্তীর আক্রমণে তাঁহারা নিহত হইবেন। যদি কোনরূপে সেই করালমূর্ত্তি হস্তীর আক্রমণ হইতে ইঁহারা রক্ষা পান তখন মল্লযুদ্ধ-বিশারদ চানূর ও মুষ্টিক তাঁহাদিগকে অনায়াসে বধ করিয়া ফেলিবে। এইরূপে চারিদিকে আটঘাট বাঁধিয়া মহরাজ কংস শ্রীকৃষ্ণবধের এক বিরাট পরিকল্পনা খাড়া করিয়া ধনুর্যাগপর্ব্বের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। মন্ত্রীগণের সহিত কংসের আরও অনেক ছোটখাট পরামর্শ অনবরতই চলিতে লাগিল।

(১৭)

অক্রূরের গোকুলে আগমন ও গোপীদের আশঙ্কা

অক্রূরের ডাক পড়িল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ-ভক্ত অক্রূর মথুরাতেই বাস করিতেছিলেন, তিনি কংসের অত্যাচারসত্ত্বেও অন্য কোথাও পলাইয়া যান নাই। কংসরাজ অক্রূরকে নিজদলভুক্ত, সুতরাং নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং তাঁহাকে কৃষ্ণবধের

উপায়স্বরূপে ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়া কংস আপনার বিরাট হত্যা-পরিকল্পনার সমস্ত কথা অক্রূরের নিকট অকপটে ব্যক্ত করিলেন। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে ধনুর্যাগ ও যদুপুরীর শোভা দর্শন করিবার জন্য আহ্বান করিয়া মথুরায় লইয়া আসুন, তখন মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত হইলেই চানূর ও মুষ্টিক তাঁহাদিগকে হত্যা করিবে। কংসের সুচিন্তিত পরিকল্পনার কথা শুনিয়া অক্রূর মনে মনে হাসিলেন, কংসের দূতরূপে ব্রজধামে যাইতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,

রাজন্, মনীষিতং সধ্র্যক্ তব স্বাবদ্যমার্জ্জনম্,
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং কুর্য্যাৎ দৈবং হি ফলভাবনম্ ॥ ১০।৩৬।৩৮

—হে রাজন্, নিজের মৃত্যু এড়াইবার জন্য যে উপায় আপনি স্থির করিয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে, তবে ফলাফল দৈবায়ত্ত, সুতরাং কার্য্য সিদ্ধির কথা যেমন ভাবিতেছেন তেমনি অসিদ্ধির কথাও আপনার ভাবিয়া রাখা উচিত।

অক্রূর পরদিন প্রভাতে রথে আরোহণ করিয়া নন্দগোকুলে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন,—শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার আশায় তাঁহার মন প্রফুল্ল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ "ঈক্ষত্যমলেন চক্ষুষা" —তাঁহার সর্ব্বদর্শী চক্ষুর দ্বারা অন্তর ও বাহির সকলই দেখিতে পান, সুতরাং তিনি অক্রূরকে কংসদূত মনে করিয়া ঘৃণা করিবেন না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অক্রূর সন্ধ্যাবেলায় গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ ও ঘনশুভ্র বলরাম গো-দোহনস্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, বসনে-ভূষণে উভয়েই সজ্জিত, তাঁহাদের জ্যোতিতে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে। তখন অক্রূর "স্নেহবিহ্বলঃ পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্ রামকৃষ্ণয়োঃ"—প্রেমে বিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের চরণসমীপে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। কুশল সংবাদ গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অক্রূরকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইলেন এবং

"প্রক্ষাল্য বিধিবৎ পাদৌ"—বিধি অনুসারে তাঁহার পাদদ্বয় স্বহস্তে ধৌত করিয়া দিলেন, পরিশ্রান্ত অতিথির পদসেবা করিলেন, এবং অক্রূরের মধ্যাহ্নভোজন সমাপ্ত হইলে তাম্বুলাদি মুখশুদ্ধি ও কর্পূরপুষ্পাদি গন্ধমাল্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন। এইরূপে যথারীতি কংসদূত অক্রূরের অভ্যর্থনা ও সেবা হইয়া গেল—যে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর ও বাহির সমস্তই দেখিতে পান,—"ন তস্য কশ্চিৎ দয়িতঃ সুহৃত্তমো ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা"—যাঁহার প্রিয়-অপ্রিয়, বন্ধু-শত্রু, উপেক্ষণীয় অথবা বিদ্বেষের পাত্র কেহই নাই—যিনি সর্ব্বজীবে সমদর্শী, কর্ম্মফল-প্রদাতা সেই শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

ভক্ত অক্রূর সমস্ত ঘটনাবলী সবিস্তারে শ্রীকৃষ্ণের নিকট বর্ণনা করিলেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি নন্দব্রজে আসিয়াছেন তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কংসের ধনুর্যাগ, শ্রীকৃষ্ণবধের সমস্ত পরিকল্পনা, অক্রূরের দৌত্যের উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া "প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞাদিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ"—হাসিলেন এবং পিতা নন্দের নিকট মহারাজ কংসের ধনুর্যজ্ঞে আমন্ত্রণের কথা নিবেদন করিলেন। তখন নন্দরাজের আদেশে মথুরাযাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল।

গোপীগণ শুনিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য কংসদূতরূপে অক্রূর আসিয়াছেন, গোপীগণ দেখিলেন যে, মহাসমারোহে চারিদিকে মথুরাযাত্রার আয়োজন চলিতেছে। তাঁহারা ভাবী কৃষ্ণ-বিরহের আশঙ্কায় দুঃখিত হইলেন—"ভীতাঃ বিরহকাতরাঃ সমেতাঃ সঙ্ঘশঃ প্রোচুরশ্রুমুখ্যোহ'চ্যুতাশয়াঃ"—তাঁহারা ভাবী বিরহে কাতরা, ভীতা ও অশ্রুমুখী হইয়া নিজ নিজ গৃহ হইতে আসিয়া স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিদারুণ বিরহবিধানকারী বিধাতাকে দোষ দিলেন, কৃষ্ণহরণকারী নির্দ্দয় অক্রূরের নাম 'ক্রূর' হওয়াই উচিত ছিল বলিলেন, মথুরানগরবাসিনী রমণীগণের সৌভাগ্যের

কথা ভাবিয়া ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিলেন—ভাবিলেন মথুরা সহরের মার্জ্জিতরুচি, মনোহর হাবভাববিশিষ্টা রমণীগণের "মধুমঞ্জু ভাষিতৈঃ গৃহীতচিত্তঃ"—সুমধুর কোমলবচনে মুগ্ধ হইয়া "গ্রাম্যাঃ" গ্রামবাসিনী, ভ্রূবিলাস ও রূপ পরিচর্য্যায় অনভিজ্ঞা, প্রেমের চতুর কথা বলিতে অশিক্ষিতা সেই ব্রজবধূগণের নিকট তাঁহাদের প্রাণেশ্বর রাসবিহারী আর ফিরিয়া আসিবেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, "আমরা আহিরিণী কুরূপিণী কৃষ্ণ-সেবার কিবা জানি, তাইতো আমাদের এত ভয়।" শ্রীকৃষ্ণবিরহে উন্মত্তা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের উপর অভিমান করিয়া বলিলেন,

ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত,
বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীংস্তদ্দাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥
১০।৩৯।২২

—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ক্ষণভঙ্গুর, তিনি নিত্য নূতন নূতন রমণীপিয়াসী। একদিন তিনি নিজ প্রেমে আমাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া গৃহ, স্বজন, পতিপুত্র সবই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দাসী হইয়াছিলাম, আজ তিনি সমস্ত ভুলিয়া মথুরায় গমন করিতেছেন।

কী হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস, কী দুঃসহ দুঃখ, কী প্রেমরঞ্জিত অভিমান, কী মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদ, এই কথাগুলির পশ্চাতে রহিয়াছে তাহা কিছু কিছু অনুমান করা যায় মাত্র। কে সেই গোপীগণের বিরহের ব্যথা অনুভব করিতে পারিবে! যিনি চিরদিন তাঁহাদের বক্ষে বক্ষ সংলগ্ন করিয়া, সুখ-দুঃখের স্পন্দন প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণও আজ নিষ্ঠুর, বধির ও উদাসীন। ইহারই নাম বিরহ, ইহাই বিরহের জ্বালা—অথচ এই বিরহই মিলনের অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য পরিণাম! যদি বিরহের এত জ্বালা থাকে তবে মিলন এত মধুর হইল কেন—মিলন যদি মধুর হইতেও সুমধুর, তাহা অপেক্ষাও মধুর না হইত তাহা হইলে বিরহের তো এত জ্বালা

থাকিত না। আজ আসন্ন বিরহের অনন্ত শূন্যতার প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া তাঁহারা নূতন করিয়া বংশীধ্বনি শুনিতেছেন, নূতন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন বস্ত্রহরণ করিতেছেন, আজ আবার রাসলীলা হইতেছে—সেই বনক্রীড়া, সেই জলকেলি, সেই কুঞ্জোৎসব,—সেই গলায় হাত দিয়া, বক্ষে বক্ষ দিয়া, চরণে চরণ দিয়া মহামহোৎসব—আজ নিষ্ঠুর অক্রুর সব মিথ্যা করিয়া দিবার আয়োজন করিতেছে। আজ আসন্ন বিরহের আশঙ্কায় গোপীগণের প্রতি অঙ্গ কৃষ্ণ-ক্ষুধাতুর হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছেন, শুধু দেহ দূরে যাইতেছে নয়, তাঁহার প্রেমময় মন আজ মথুরাবাসিনী রমণীদের মধ্যে হারাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে,—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ আজ নিষ্ঠুর হইয়াছেন! আসন্ন শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগণের নিশ্বাসে ব্রজপুরী উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, বাতাস মর্ম্মভেদী বিলাপধ্বনিতে মুখরিত হইতেছে, নারীসুলভ লজ্জা নাই, বস্ত্র, অলঙ্কার, কুসুম সবই শিথিল হইয়া পড়িতেছে, 'গোবিন্দ', 'দামোদর', 'মাধব'—সহস্র কৃষ্ণনাম উত্থিত হইয়া বিরহের আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, অশ্রুজলে পথের ধূলি ভিজিয়া যাইতেছে।

সমগ্র শ্রীভাগবতের মধ্যে এই বিরহবর্ণনা সর্ব্বাপেক্ষা করুণ। মানুষ শ্রীভাগবত কীর্ত্তন করে, শ্রবণ করে, এই বিরহলীলা অনুভব করিবার চেষ্টা করে কিন্তু গোপীগণের মর্ম্মব্যথা উপলব্ধি করিবার হৃদয় অথবা কল্পনাশক্তি মানুষের নাই। সুরম্য, সুশীতল কক্ষে বিদ্যুৎবাহীপাখার নিম্নে শত শত সুসজ্জিতা নরনারী সমবেত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা কীর্ত্তিত হইতেছে;—ইহা তো গোপীবিরহ উপলব্ধি করিবার অনুকূল পরিস্থিতি নহে, ইহা তো সমগ্র দেহ ও মনকে কৃষ্ণোন্মুখী করিয়া গোপীগণের মনকে আপনার মনের ভিতর টানিয়া আনিবার অনুকূল অবস্থা নহে। শ্রীকৃষ্ণ যেদিন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সেদিন সমগ্র জগতে যে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল তাহাও আজিকার বিরহব্যথাতুর

গোপীগণের আর্ত্তনাদের সহিত তুলনীয় নহে। এ তো দেহের বিচ্ছেদে দেহের ক্রন্দন নহে, এ পরমাত্মার বিরহে জীবাত্মার চিরকালের রোদন-ধ্বনি। সেদিন গোপীগণের রোদনধারার ভিতর যুগযুগান্তরের নিখিল বিশ্বজনের বিরহীমনের রোদনধারা মিশাইয়া গিয়াছিল বলিয়াই গোপীগণের বিরহকাহিনী আমাদের কাছে এত করুণ, এত মর্ম্মস্পর্শী। এই ধ্বনির আভাসমাত্র বর্ষাকালে বিদ্যাপতির হৃদয়ে একদিন প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল; তিনি বলিয়াছিলেন,

তিমির দিক্ ভরি ঘোরা যামিনী
অথির বিজুলিকা পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঁয়ায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

এই ধ্বনির কিঞ্চিৎমাত্র আভাস মদনভস্মের পর রতিবিলাপে শুনিতে পাওয়া যায়, কালিদাসের সমগ্র মেঘদূতে ইহার একটা ক্ষীণ রেশ শ্রুতিগোচর হয়। "কুমারসম্ভবে" তপস্বিনী উমার "শনৈঃ শনৈঃ শ্যামিকয়া কৃতং পদং"—সুদীর্ঘ নয়নপ্রান্তে ধীরে ধীরে ঘনায়মান কালিমার রেখায় এই বিরহের চিত্র যেন মুহূর্ত্তের জন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৃক্ষতলনিবাসী বৈষ্ণবচূড়ামণি সনাতনের দেহে শুষ্কপত্র পড়িয়া যখন দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিল, সেই উত্তপ্ত দেহের ভিতর দিয়া বিরহিণী গোপীগণের মনের অবস্থা যেন কতকটা দেখা যাইতে লাগিল। মানুষ আজ কি করিয়া গোপীগণের মনের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবে!

এতবড় একটা শোকসঙ্কট ব্রজধামে উপস্থিত হইল অথচ অক্রূরের সেদিকে কোন দৃষ্টি নাই, রথযাত্রার আয়োজন চলিয়াছে। সূর্য্যদেব উদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণবলরামকে লইয়া অক্রূরের রথ চলিতে লাগিল, নন্দ-প্রমুখ গোপগণ মহারাজ কংসের জন্য নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া অন্যান্য

শকটযোগে তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। গোপীরা রথের অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন। একদিন যে গোপীগণ নিতম্বের ভারে নিপীড়িতা হইয়া চেষ্টা করিয়াও দ্রুতবেগে হাঁটিয়া যাইতে পারেন নাই, আজ অশ্বযোজিত রথের সহিত তাঁহারা ছুটিয়া চলিয়াছেন—তাঁহারা যে আজ পাগলিনী! আজ কি আর সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি আছে, নারীসুলভ লজ্জার কথা মনে আছে, দেহ-বুদ্ধি আছে! আজ বিরহের ব্যথায় তাঁহারা কৃষ্ণময়-দেহ কৃষ্ণময়-মন হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং ছুটিয়া ছুটিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে অনিমেষদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া রাজপথ অতিক্রম করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু আত্মারামের রথের গতি শিথিল হইতেছে না। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত দূত আসিয়া গোপীগণকে আশ্বাস দিল, শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসিবেন। গোপীগণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, "যাবদালক্ষ্যতে কেতু র্যাবদ্রেণু রথস্য চ"—যতক্ষণ রথের পতাকা দেখা যাইতে লাগিল; যতক্ষণ রথচক্রোত্থিত ধূলিসমূহ পরিদৃষ্ট হইল, ততক্ষণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় গোপীগণ পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্রজপুরীতে আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল, সমগ্র ব্রজধাম উড়িয়া-যাওয়া পাখীর শুষ্ক ও শূন্য নীড়ের আকার ধারণ করিল।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম "রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্" —বায়ুর ন্যায় বেগগামী রথে করিয়া পাপনাশিনী যমুনার তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যমুনাজলে অবগাহন করিয়া রথে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অক্রুর তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া যমুনায় স্নান করিতে যাইলেন। অক্রুর জলে নিমগ্ন হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার এক অদ্ভুত দর্শন হইল,—তিনি সেই জলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের যুগল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। বিস্মিত হইয়া তীরে উঠিলেন—রথমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বসিয়া আছেন। পুনরায় অবগাহন করিলেন, পুনরায়

জলমধ্যে তাঁহার দিব্যদর্শন হইল,—তিনি নাগরাজ শেষ ও নাগরাজ শেষের ক্রোড়দেশে ঘনশ্যাম, পীতকৌষেয়বসন, চতুর্ভুজ প্রশান্তমূর্ত্তি এক পরমপুরুষকে দর্শন করিলেন। তখন তিনি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।

(১৮)

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আগমন

মথুরা। অপরাহ্ন সময়ে রথ আসিয়া মথুরার সন্নিকটস্থ উপবনে উপস্থিত হইল। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণবলরামকে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, যদুকুলদ্রোহী কংসকে বধ করিয়া তাঁহারা দুইজনে অক্রূরের গৃহে গমন করিবেন। অক্রূর বিমনা হইয়া প্রস্থান করিলেন এবং মহারাজ কংসকে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মথুরায় আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। অক্রূর চলিয়া যাইলে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণে পরিবৃত হইয়া মথুরাপুরী দর্শন করিবার ইচ্ছায় নগরীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অপূর্ব্ব মথুরানগরী, অপূর্ব্ব তাহার প্রাসাদ, রাজপথ, অপূর্ব্ব তাহার নরনারী! শ্রীকৃষ্ণ রাজপথ দিয়া নগর পরিদর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন এমন সময়ে "বিলোক্য কুব্জাং যুবতীং বরাননাং পপ্রচ্ছ যান্তীং প্রহসন্ রসপ্রদঃ"—সুন্দরবদনবিশিষ্টা এক কুব্জা রমণীকে দেখিতে পাইয়া রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন। কুব্জা বলিল যে, তাহার গ্রীবা, বক্ষ ও কটিদেশ বক্র বলিয়া সে ত্রিবক্রা নামে পরিচিতা, সে কংসরাজের অনুলেপন সম্পাদন-কারিণী দাসী। কুব্জা তখন শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মহারাজ কংসের জন্য প্রস্তুত অনুলেপনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের অঙ্গশোভা রচিত করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে কুব্জার বক্রতা আরোগ্য হইয়া গেল, সে

সুন্দরী রমণী মধ্যে পরিগণিতা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন "উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য স্ময়ন্তী জাতহৃচ্ছয়া"—তাহার মনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিবার ইচ্ছা উদিত হওয়ায় সে হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বগৃহে যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইল। শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে কুব্জার প্রেমাভিলাষ দর্শন করিয়া হাসিলেন এবং স্বীয় কার্য্যসাধন করিয়া পরে কুব্জার গৃহে গমন করিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদান করিলেন। অতঃপর দুই ভ্রাতা মথুরাপুরবাসীগণের নিকট ধনুর্যজ্ঞশালার সন্ধান লইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন এবং কংসরাজের বহু অনুচরগণকর্ত্তৃক রক্ষিত ও সংপূজিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় এক অদ্ভুত ধনু দেখিতে পাইলেন। রক্ষীগণের বারণ উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই ধনু গ্রহণ করিলেন এবং নিমেষ মধ্যে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া ইক্ষুদণ্ডের মত দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। ধনুকটি যখন ভাঙ্গা হইল, তখন তাহার শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইল এবং "কংসস্ত্রাসমুপাগমৎ"—কংস অত্যন্ত ত্রাসপ্রাপ্ত হইলেন। সন্ধ্যা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নগরের বহির্দ্দেশে পরিস্থাপিত শকটসমূহের নিকট আসিলেন এবং পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক দুগ্ধমিশ্রিত অন্নভোজন করিয়া সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

(১৯)

কংস বধ

রাত্রি প্রভাত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মল্লরঙ্গভূমির দ্বারদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে সেদিন এক বিরাট উৎসব। চতুর্দ্দিকে তূর্য্য ভেরী প্রভৃতি বাজিতেছে, মাল্য ও পতাকার দ্বারা বহু রঙ্গমঞ্চ পরিশোভিত করা হইয়াছে, নন্দ প্রভৃতি সামন্তরাজগণ বিভিন্ন মঞ্চে আরোহণ করিয়া বসিয়া আছেন, অমাত্যগণপরিবেষ্টিত মহারাজ কংস প্রধান রঙ্গমঞ্চে অধিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে

যাইবেন এমন সময় দেখিলেন যে এক মাহুত কুবলয়াপীড় নামক একটি পর্ব্বত সদৃশ হস্তীস্কন্ধে আরোহণ করিয়া দ্বাররোধ পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, মাহুত শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে হস্তীকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার দিকে হস্তীকে পরিচালিত করিল। শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে কুবলয়াপীড়কে বধ করিলেন এবং তাহার উভয় দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম প্রত্যেকে একটি করিয়া সেই বিশাল গজদন্ত স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক মল্লরঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঞ্চ হইতে নরনারীগণ এবং অমাত্য-পরিবৃত মহারাজ কংস, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে একরূপ দেখিতেছেন না, মনের ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন লোক তাঁহাকে বিভিন্নরূপে দর্শন করিলেন। শ্রীশুকদেব একটি বিখ্যাত শ্লোকে কংসসভায় শ্রীকৃষ্ণপ্রবেশের এক অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্,
গোপানাং স্বজনো হ'সতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্ব-
পিত্রোঃ শিশুঃ,
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ
সাগ্রজঃ ॥ ১০।৪৩।১৭

—শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মল্লগণের মনে হইল, তিনি বজ্রের মত ভীষণ, সাধারণ মানুষের নিকট নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীলোকগণের নিকট মূর্ত্তিমান কন্দর্প, গোপগণের নিকট পরমাত্মীয়, দুষ্ট রাজগণের নিকট দণ্ডধর বলিয়া প্রতিভাত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা তাঁহাকে কোমল শিশুরূপে দেখিলেন, কংসের মনে হইল স্বয়ং যমরাজ উপস্থিত, মূর্খেরা তাঁহাকে জড়পিণ্ডমাত্র মনে করিল, যোগিগণ তাঁহাকে পরমাত্মারূপে দেখিলেন,

বৃষ্ণিগণের নিকট তিনি পরম ঈশ্বররূপে প্রতীয়মান হইলেন। এইরূপে বিভিন্ন মানুষের নিকট বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম তখন এগার বৎসর। শ্রীকৃষ্ণ চানূরের ও বলরাম মুষ্টিকের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সমবেত মহিলাগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন :

ক্ব বজ্রসারসর্ব্বাঙ্গৌ মল্লৌ শৈলেন্দ্রসন্নিভৌ
ক্ব চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্ত যৌবনৌ॥ ১০।৪৪।৮

—ইহা কিরূপ অদ্ভুত মল্লযুদ্ধ! কোথায় বা বজ্রের ন্যায় কঠিন ও পর্ব্বততুল্য চানূর ও মুষ্টিক, কোথায় বা কিশোরবয়স্ক সুকুমার দেহ এই বালকদ্বয়!

কিন্তু সব তর্কবিতর্ক, প্রীতি ও স্নেহের-সন্দেহ নিরসন করিয়া মল্লযুদ্ধ অচিরেই শেষ হইল—চানূর ও মুষ্টিক নিহত হইল। তখন একে একে আরও মল্ল শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু তাহারাও প্রচণ্ড আঘাতে নিহত হইলে, অপরাপর মল্লগণ ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। তখন কংস কতকটা ভয় এবং কতকটা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্ষিপ্তবৎ আদেশ প্রদান করিলেন যে, এখনই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে নগর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হউক, নন্দরাজকে বন্ধন করিয়া গোপগণের ধনসম্পত্তি রাজকোষে সংগৃহীত হউক, বসুদেব ও উগ্রসেনকে এখনই বধ করা হউক। কংস এইরূপে উন্মত্তবৎ আচরণ করিতেছেন, রঙ্গমঞ্চের দর্শকবৃন্দ বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ "লঘিম্নোৎপত্য তরসা মঞ্চমুত্তুঙ্গমারুহৎ"—হঠাৎ লঘুভাবে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক কংসাধিষ্ঠিত উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সুদৃঢ়হস্তে কংসের কেশরাশি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে উচ্চমঞ্চ হইতে ভূমির উপর তীব্রবেগে নিক্ষেপ করিলেন এবং

স্বয়ং লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার দেহের উপর পতিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহের ভারে নিষ্পেষিত হইয়া মহারাজ কংস প্রাণত্যাগ করিলেন। চতুর্দ্দিকে সমবেত জনগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। কংস নিহত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্যরূপ মুক্তিলাভ করিলেন। কারণ

স নিত্যদোদ্বিগ্নধিয়া তমীশ্বরং পিবন্নদন্ বা বিচরন্ স্বপন্
শ্বসন্,
দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যতস্তদেব রূপং দুরবাপমাপ ॥
১০।৪৪।৩৯

—কংস পান, ভোজন, বিচরণ, নিদ্রা ও জাগরণ সকল অবস্থায় সতত উদ্বিগ্নচিত্তে সেই চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেন, সুতরাং এক্ষণে কংস শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত হইয়া মৃত্যু সময়ও তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে করিতে দুষ্প্রাপ্য সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।

কংস নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ শোকার্ত্ত কংসপত্নীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কংসের মৃতদেহ দাহ করাইলেন এবং পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁহাদের চরণবন্দনা করিলেন।

কংসের মৃত্যু হইলে "ভগবান্ দেবকীসুতঃ মাতামহংত্বুগ্রসেনং যদূনাম-করোৎ নৃপম্"—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাতামহ উগ্রসেনকে মথুরামণ্ডলীর রাজা করিলেন। যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ ও কুকুর প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ কংসের ভয়ে আকুল হইয়া চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া বাস করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া ধনসম্পত্তি প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক পুনরায় মথুরামণ্ডলীতে বাস করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নন্দরাজ গোপগণের সহিত ব্রজধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর বসুদেব পুরোহিত

গর্গাচার্য্য ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুত্র বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন-সংস্কার যথাবিধি সম্পাদন করাইলেন। উভয় ভ্রাতা গর্গাচার্য্যের নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া অবন্তিপুর নিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় সান্দীপনি নামক মুনির নিকট বিদ্যালাভ করিবার জন্য গমন করিলেন। তাঁহারা সংযতচিত্ত হইয়া যথানিয়মে গুরুগৃহে বাস ও গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন, এবং গুরুর কৃপায় শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গ বেদ ও উপনিষদ্ শিক্ষা করিলেন। গুরুগৃহে বাস ও শিক্ষালাভ শেষ হইলে ভ্রাতৃদ্বয় গুরুদক্ষিণা দিবার অভিপ্রায় নিবেদন করিলে গুরু সান্দীপনি তাঁহার মৃতপুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য শিষ্যদ্বয়কে অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যমরাজের নিকট হইতে গুরুদেবের মৃতপুত্রকে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন এবং গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(২০)

উদ্ধবের ব্রজধামে গমন ও গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদান

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ একদিন তাঁহার প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে আহ্বান করিয়া —"গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং"—প্রীতিভরে উদ্ধবের হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,

গচ্ছোদ্ধব! ব্রজং সৌম্য, পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ,
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্ব্বিমোচয়॥ ১০।৪৬।৩

—হে উদ্ধব, তুমি ব্রজে যাও। সেখানে আমাদের পিতা-মাতা নন্দ ও যশোদাকে আমাদের কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের মনে প্রীতি-সম্পাদন কর এবং গোপীগণের মদ্বিরহজনিত মনোদুঃখ দূর কর।

শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতা নন্দ-যশোদার সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু গোপীগণের কথা মনে পড়িতেই তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, তিনি হঠাৎ বহুভাষী হইয়া উঠিলেন। তিনি উদ্ধবকে উপলক্ষ করিয়া যেন আপনি আপনাকেই বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন :

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ,
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহম্ ॥
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ,
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ, বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ ॥
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন,
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥ ১০।৪৬।৪-৬

—গোপীগণের মন আমাতেই সমর্পিত, আমিই তাহাদের প্রাণস্বরূপ, আমার জন্যই তাহারা দৈহিক সুখসাধন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা মনের দ্বারা প্রিয়তম আত্মা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা লোকধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম সবই আমার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে সুখী করা আমার কর্ত্তব্য।

—হে উদ্ধব, আমি তাহাদের প্রিয়তম অথচ আমি এখন দূরে মথুরা-পুরীতে অবস্থান করিতেছি। এই বিরহের অবস্থায় গোপীগণ আমাকে স্মরণ করিতে করিতে উৎকণ্ঠাজনিত দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে।

—আমি ব্রজ হইতে মথুরায় যাত্রা করিবার সময় মদ্গতচিত্ত গোপীগণকে ফিরিয়া যাইব এই আশ্বাস দিয়াছিলাম, সেই আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া আজিও তাহারা কোনপ্রকারে প্রাণধারণ করিয়া আছে।

প্রভু সবই বুঝিতেছেন, সবই জানিতেছেন অথচ নিত্যবুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ পরমপুরুষ যেন নির্লিপ্ত হইয়া গোপীগণকে না দেখিয়াও অনাসক্ত-

চিত্তে মথুরায় দিন যাপন করিতেছেন। তাঁহার কথা ও আচরণে আজ যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে তাহা প্রেমময় ভগবান্ ও নিরুপাধি পরম পুরুষের মধ্যে পার্থক্য মাত্র। প্রাণে যেন অনুভব আছে—গোপী-বিরহের জন্য সহানুভূতি আছে, প্রাণের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে অথচ তাঁহার আচরণে যেন একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে,—প্রভুকে দুইটি রূপে দেখা যাইতেছে—একবার তিনি ভক্তের ভগবান্, আবার যোগিগণের নিরূপাধি পরমাত্মাস্বরূপ।

উদ্ধব রথে আরোহণ পূর্ব্বক ব্রজধামের দিকে যাত্রা করিলেন এবং সন্ধ্যার সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপরাজ নন্দ ভক্ত উদ্ধবকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন, উদ্ধবের জন্য পরমান্ন আনীত হইল, ভৃত্যগণ তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল। নন্দ উদ্ধবকে বহু প্রশ্ন করিলেন,—ব্রজধামের সকলকে কৃষ্ণের মনে আছে কি? কৃষ্ণ কি ব্রজে একবার আসিবে? নন্দ শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র বাল্য ও পৌগণ্ডলীলা বর্ণনা করিতে করিতে আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যশোদা? পুত্রস্নেহে যশোদার স্তনযুগল হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল, তিনি অবিরলধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

তখনও প্রভাত হয় নাই, উদ্ধব শয্যায় শয়ন করিয়াই চতুর্দ্দিকে গোপীগণের দধিমন্থনের কোলাহলধ্বনি ও উচ্চৈঃস্বরে গোপীগণকর্ত্তৃক গীত শ্রীকৃষ্ণলীলাসমূহ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। গোপীগণের সহিত এখনও তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। সূর্য্যোদয় হইল, ব্রজবাসিনী গোপীগণ নন্দালয়ের দ্বারদেশে স্বুবর্ণময় রথ দেখিতে পাইয়া কাহার রথ জানিবার জন্য পরস্পর জিজ্ঞাসা ও অনুমান আরম্ভ করিলেন। আবার কি অক্রূর আসিয়াছে? একবার তো অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইয়া গোপীগণকে মৃতকল্প করিয়া গিয়াচে, আবার কি এখন গোপীগণের মৃত্যু দেখিবার জন্য

অক্রূর নন্দধামে আগমন করিয়াছে? এইরূপ তর্ক, জিজ্ঞাসা ও অনুমান চলিতেছে, এমন সময় ভক্ত উদ্ধব আহ্নিককার্য্য সমাপন করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্ধবের বাহু আজানুলম্বিত, নয়নদ্বয় নব কমলসদৃশ, পরিধানে পীতবসন, গলদেশে পদ্মের মালা, কর্ণদ্বয়ে উজ্জ্বল কুণ্ডল। এ যে শ্রীকৃষ্ণের মত বেশভূষা! গোপীগণ দলে দলে আসিয়া উদ্ধবের চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইলেন। গোপীগণ শিষ্টাচারবশতঃ উদ্ধবকে কিছু না বলিয়া একটি ভ্রমরকে উপলক্ষ করিয়া তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণের দূত কল্পনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানাবিধ অভিযোগ প্রকাশ করিলেন। উদ্ধব সমস্তই শুনিলেন এবং গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের মনে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন সেই সকল পরমতত্ত্ব-সংযুক্ত কথা উদ্ধবের মুখে শ্রবণ করিয়া গোপীগণ শান্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন—"অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরাৎ মামুপৈষ্যথ"—হে গোপীগণ, মিলন ও বিরহ একই লীলার দুইটি দিক মাত্র; মূলকথা এই যে আমাকে স্মরণ করিয়া সতত আমার ধ্যান করিলে তোমরা আমাকে অচিরেই প্রাপ্ত হইবে।

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজে আস্থিতাঃ
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্ম্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া॥ ১০।৪৭।৩৭

—আমি বৃন্দাবনে শারদীয়া পূর্ণিমা রাত্রিতে রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে যে সকল গোপী পতিপুত্র কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া রাসমহোৎসবে যোগদান করিতে পারে নাই, সেই গোপীগণ আমার গুণাবলী নিরন্তর চিন্তা করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের এই নিগূঢ়রহস্যময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া গোপীগণের চৈতন্য হইল, তাঁহারা বুঝিলেন যে, রাসলীলা উপলক্ষ মাত্র, শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ, ভজন ও চিন্তনই সর্ব্বধর্ম্মসার। রাসলীলায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব

সঙ্গলাভ তাঁহারা করিয়াছিলেন; এক্ষণে বিরহের সময় শ্রীকৃষ্ণচিন্তন ও শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্ত্তন করিলে তাঁহারা সমভাবেই ফলপ্রাপ্ত হইবেন— তাঁহাদের আত্যন্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্তি ঘটিবে। যাঁহারা রাসলীলায় যাইতে পারেন নাই তাঁহারাও তো সেই শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন! শ্রীশুকদেব বলিলেন,

ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্ব্ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ
উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুর্জ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজম্॥ ১০।৪৭।৫৩

—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, উদ্ধবের মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় অর্থপূর্ণ বাণী সকল শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মা বুঝিতে পারিয়া গোপীগণের বিরহসন্তাপ দূর হইয়া যাইল। তখন তাঁহারা পরম সমাদরে উদ্ধবের সেবা ও সৎকার করিলেন।

উদ্ধব এইরূপে গোপীগণের বিরহ ব্যথা দূর করিয়া কয়েকমাস গোকুলে বাস করিলেন এবং "কৃষ্ণলীলাকথাং গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্"— ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা কীর্ত্তন করিয়া সমগ্র গোকুলবাসীগণকে আনন্দিত করিলেন। অতঃপর মহাত্মা উদ্ধব গোপীগণ, নন্দ ও যশোদার অনুমতি লইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(২১)

কুব্জা সংবাদ

শ্রীকৃষ্ণ কথা দিয়াছিলেন যে একদিন তিনি কুব্জা ও অক্রুরের গৃহে গমন করিবেন। আটচল্লিশ অধ্যায়ে কুব্জার মনোরথ পূরণ ও ভক্ত অক্রুরের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণনা করা হইয়াছে।

একদিন ভক্ত উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ "সৈরিন্ধ্র্যাঃ কামসন্তপ্তায়াঃ" —কামসন্তপ্তা গন্ধানুলেপন-প্রস্তুতকারিণী কুব্জার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কুব্জা শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই জানিত কিনা

তাহা স্থির নাই, কিন্তু সেদিন তাহার গৃহ মুক্তামালা, পতাকা, শয্যা, আসন, ধূপদীপ ও মাল্যে পরিশোভিত হইয়া একটা উৎসবের আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। কুব্জা উজ্জ্বল বসনভূষণ পরিধান করিয়া গন্ধমাল্যে সুসজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাশে আসিয়া বসিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। শ্রীশুকদেব বলিলেন, এই "দুর্ভাগা"—হতভাগিনী রমণী শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে পাইয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না, তাঁহাকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখপ্রদ পুরুষমাত্র জানিয়া চিরদিনের মত বঞ্চিত হইল। মূর্খ রমণী শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিল,—"সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ! দিনানি কতিচিন্ময়া"—হে প্রিয়তম, তুমি এই গৃহে আমার সহিত কয়েকদিন বাস করিয়া বিহার কর। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিলেন,

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্,
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ ॥ ১০।৪৮।১১

—যে ব্যক্তি ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর দুরারাধ্য বিষ্ণুকে সেবার দ্বারা প্রীত করিয়া তাঁহার নিকট প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সুখ প্রার্থনা করে সেই ব্যক্তি কুবুদ্ধিসম্পন্ন।

কুব্জার ভুল হইল;—এইরূপ ভুল অহরহঃ এই পৃথিবীর বিষয়াসক্ত মানুষ করিয়া ফেলিতেছে, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইতেছে, তথাপি চৈতন্য হয় না। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী, তিনি বলেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তান্ তথৈব ভজাম্যহম্"—যে আমাকে যে-ভাবে ভজনা করে আমি তাহার সেইভাব অনুযায়ী ফলপ্রদান করিয়া থাকি, সুতরাং সর্ব্ববিধ ফলপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ "তোমার কামনা পূর্ণ হইবে" বলিয়া কুব্জার গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মাটির মানুষ মাটিতেই পড়িয়া রহিল—কে আসিয়াছিলেন, কে চলিয়া যাইলেন, কুব্জা কি প্রার্থনা করিয়াছিল, কি পাইল তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

কুব্জার কাহিনীর মর্ম্মকথা জগতের সর্ব্বজীবের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ। শ্রীভাগবতে কুব্জাকে "উপস্থসুখলম্পটা"—ইন্দ্রিয়সুখলোভী—বলিয়া চিরদিনের জন্য নিন্দাভাজন করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানব উপস্থসুখলম্পট, সুতরাং কুব্জাকে দেখিয়া আমাদের কাহারও হাসিবার বা নিন্দা করিবার অধিকার নাই। মানুষের চেতন এবং অবচেতন মনে ইন্দ্রিয়-উপভোগের বাসনা অবস্থাবিশেষে প্রসুপ্ত অথবা জাগ্রত হইয়া চিরদিন রহিয়াছে। যখন মানুষ কোন নারীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়, অথবা যখন পথেঘাটে, গৃহে-প্রান্তরে পরনারীর প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন সে মানুষ তাহার জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে কুব্জার মত উপস্থসুখলম্পট হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ আনন্দের পূজারী, আনন্দের পিছু পিছু মানুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আনন্দের উৎস শ্রীসচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ। মানুষ বুদ্ধিদোষে অখণ্ড আনন্দকে বিকৃত করিয়া, অর্থ যশ, মান, পদগৌরব, শিশ্ন ও উদরের সেবা করিয়া সুখী হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হয় না—আনন্দময়ের নিকট ক্ষুদ্র ও খণ্ড সুখের প্রার্থনা করিয়া তাহারা চিরকালের জন্য বঞ্চিত হয়। ক্ষুদ্র সুখ অথবা বৃহৎ সুখ, সর্ব্বসুখের আধারস্বরূপ সেই এক ও অখণ্ড আনন্দময় পুরুষ। যে যেমন চায় সে সেইরূপ সুখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কুব্জা উপস্থসুখ প্রার্থনা করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সেই তুচ্ছ সুখই প্রদান করিয়াছিলেন, অন্যদিকে গোপীগণ তাহাদের লজ্জা, ভয়, সমাজ, সংসার সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছিল, তাহাদের জীবনে কাম ও প্রেমের কোন প্রভেদ ছিল না, তাই তাহাদের রাসলীলা চিরগৌরবের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। কুব্জা "উপস্থসুখলম্পটা"—সে কাম বুঝিত, প্রেম তাহার সামান্য নারীবুদ্ধির অগোচর। তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিকট প্রেমের ঠাকুর, চিরমিলনের

চিদ্‌ঘন আনন্দময় পুরুষ ; কুব্জার নিকট শ্রীকৃষ্ণ তুচ্ছসুখপ্রদ ক্ষুদ্র মানুষ মাত্র। গীতার সেই অমর বাণী—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যে মানুষ যেভাবে আমার উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণকেই প্রার্থনা করে সে মানুষ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যে কৃষ্ণসেবা করিয়া যশ, মান, অর্থ ও ইন্দ্রিয়সুখ প্রার্থনা করে, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই যশ মান, অর্থ ও ইন্দ্রিয়সুখ। কিন্তু যে মানুষ তাঁহাকে এইরূপেই দেখিল সে অনন্ত সচ্চিদানন্দকে কতটা ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিল! মূর্খ মানুষের এইরূপ বুদ্ধিভ্রংশ লক্ষ্য করিয়া শরশয্যায় শায়ীন ভীষ্মদেব একদিন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন :

যতঃ সর্ব্বে প্রসূয়ন্তে হ্যনঙ্গাত্মাঙ্গদেহিনঃ
উন্মাদঃ সর্ব্বভূতানাং তস্মৈ কামাত্মনে নমঃ ॥

—অর্থাৎ যাহাদের মনে কাম এবং অঙ্গবিশেষে কাম প্রবল সেইরূপ সমস্ত প্রাণী যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং যিনি সেই সমস্ত প্রাণীর কামোন্মাদকতা জন্মাইয়া থাকেন,—সেই কামরূপী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। তাই শ্রীশুকদেব আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন যে আমরা অধিকাংশ মানুষই কুব্জামনোবৃত্তিসম্পন্ন মূর্খ পুরুষ, আমরা সকলেই উপস্থসুখলম্পট, ক্লেদ কৃমি সমাকীর্ণ ক্ষণভঙ্গুর এই দেহের উপভোগ লালসায় আমরা ছুটিয়া বেড়াইতেছি,—কি চাহিতেছি, কি পাইতেছি, এইরূপ চাওয়া-পাওয়ার পরিণতি কি তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত ধৈর্য্য অথবা বুদ্ধি আমাদিগের নাই। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"যত চাই তত চেয়ে চেয়ে, তত পেয়ে পেয়ে চাওয়া মোর পাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায়।" অনন্ততৃষ্ণানিপীড়িত মানবজীবনের এই ছবি কুব্জার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অক্রূরের হস্তিনাপুরে গমন ও কুন্তীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ একদিন অক্রূরকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিবার ইচ্ছায় বলরাম ও উদ্ধবের সহিত তাঁহার ভবনে গমন করিলেন। অক্রূর তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং প্রাণের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের বহু স্তবস্তুতি করিলেন এবং "কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াৎ"—কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও শরণাপন্ন হইতে পারে!—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূজা, স্তুতি ও আত্মনিবেদন গ্রহণ করিলেন, কিন্তু লোকাচার অনুবর্ত্তন করিয়া দেহ-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ অক্রূরকে প্রশ্ন করিয়া বলিলেন,

ত্বং নো গুরুঃ পিতৃব্যশ্চ শ্লাঘ্যো বন্ধুশ্চ নিত্যদা,
বয়ন্তু রক্ষ্যাঃ পোষ্যাশ্চ অনুকম্প্যাঃ প্রজা হি বঃ ॥
ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ
শ্রেয়স্কামৈ র্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থাঃ ন সাধবঃ ॥
ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ১০।৪৮।২৯-৩১

—আপনি আমাদিগের গুরু, পিতৃব্য ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু; আমরা আপনার রক্ষণ, পোষণ ও অনুকম্পার পাত্র, কারণ আমরা আপনার পুত্রতুল্য।

—যাহারা নিজ হিত কামনা করে তাহাদের সর্ব্বদা আপনার মত সাধুর সেবা করা কর্ত্তব্য। দেবগণ স্বার্থপর—যতটুকু পূজা ততটুকুই ফল তাঁহারা প্রদান করেন। কিন্তু সাধুগণ অহেতুকী কৃপা করিয়া থাকেন।

—গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি জলময় তীর্থসমূহ ও দেবগণ বহুদিন সেবিত হইলে তবে জীবগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন কিন্তু সাধুদর্শন হইলে তৎক্ষণাৎ সুফলপ্রাপ্তি হয়।

শেষের শ্লোকটি অপূর্ব্ব সাধুপ্রশস্তি। এই শ্লোক শ্রীভাগবতে তিনবার উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীশুকদেব মানবজীবনে সাধুকৃপার প্রভাব অত্যন্ত অধিক বলিয়া বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। 'সাধুকৃপাবাহনা ভগবৎকৃপা'—সাধুকৃপা না হইলে ভগবৎ-কৃপা পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সাধুসঙ্গ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই স্থলে গঙ্গা যমুনা, তীর্থস্থান এমনকি দেবগণের উর্দ্ধেও সাধুসন্ন্যাসীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমগ্র শ্রীভাগবতে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধুসঙ্গের কথা আমরা অহরহ শ্রবণ করিয়া থাকি, অথচ সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের অনেকেরই নাই। ভক্ত বলেন,

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়,
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

ক্ষণকালমাত্র সাধুসঙ্গ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা সাধারণভাবে প্রায়ই সাধুসঙ্গ করি, সাধু কখনও কখনও গৃহীর বাড়িতে আসেন, গৃহী অনেক সময় সাধুদের আশ্রমে যান, কখনও বা সাধুর মঠে গৃহী রাত্রিযাপন করিয়া থাকেন। ইহাই যদি সাধুসঙ্গ হয় তাহা হইলে গৃহীর জীবনে শাস্ত্রবাক্য সফল হয় না কেন? কই, আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি তো হয় না! যে মাটির ঢেলা সেই মাটির ঢেলাই তো আমরা থাকিয়া যাই! সাধুসঙ্গ অর্থে সাধুর সান্নিধ্য অথবা সাধুর সহিত একত্র অবস্থান অথবা সাধুকে প্রণাম করা মাত্র বুঝায় না;—সাধুসঙ্গ মনের একটি বিশিষ্ট অবস্থা। সাধুর গৃহে কীটপতঙ্গ, সর্প, বৃশ্চিক থাকিতে পারে, তাহারা অহরহ সাধুকে দেখিতেছে, তবু তাহাদিগের সাধুসঙ্গের ফল হয় না, তাহাদের চিত্তবৃত্তির কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন দেখা গিয়াছে যে গৃহী বহুবর্ষ ধরিয়া সাধুর মঠে যাইতেছে, সাধু তাহার গৃহে আসিতেছেন, রাত্রিযাপন করিতেছেন, অথচ ঈর্ষ্যা, দ্বেষ,

পরশ্রীকাতরতা লোভ মোহ কিছুই গৃহীর কমে নাই। এইরূপ গৃহীর সাধুসঙ্গ হয় নাই, কারণ তাহার মনোবৃত্তি হয়ত সাধুসঙ্গের পক্ষে অনুকূল ছিল না।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সাধুসঙ্গের পূর্ণ ফললাভ করিতে হইলে অনুকূল মনোবৃত্তির একান্ত প্রয়োজন। এই অনুকূল মনোবৃত্তি আমাদিগকে একটু বুঝিয়া দেখিতে হইবে। শ্রীভাগবতে লিখিত হইয়াছে "সাধবো দীনবৎসলাঃ"—সাধুগণ দীনের প্রতি কৃপাশীল। দীন কে? দরিদ্র, সহায়সম্পদবিহীন মানুষ কি দীন? না। যিনি আপনাকে সর্ব্বরিক্ত করিয়াছেন, তিনিই দীন, তিনিই সাধুর কৃপার পাত্র। অর্থের অনটনে মানুষ দীন হয় না, অহঙ্কার বিমুক্ত, কাম ক্রোধ লোভ মোহ বিবর্জ্জিত মনই দীন। অনেক দরিদ্র আছে যাহারা অপেক্ষাকৃত ধনীলোকের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত, কটূভাষী ও দাম্ভিক। এমন দরিদ্রলোক দীন নহে—এমন লোকের অপেক্ষা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ধনীলোকের পক্ষে সাধুকৃপা-লাভ অনেক সহজ। কোন গৃহী হয়ত মনে মনে তাহার পার্থিব উন্নতির জন্য সাধুসঙ্গ করিতেছে, সাধুর নিকট নিত্য যাতায়াত করিতেছে, সাধুসন্নিধানে বসিয়া নীরবে অথবা প্রকাশ্য ভাষায় ছেলের ডেপুটিগিরি, স্ত্রীর উৎকট ব্যাধির আরোগ্য, মকর্দ্দমায় জিত, ব্যবসাক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতি কামনা করিতেছে। এইরূপ বাসনাকলুষিত মন সাধুসঙ্গের প্রবল অন্তরায়। তাই প্রথমতঃ মনের সর্ব্বরিক্ততা, দ্বিতীয়তঃ ষোল আনা মনের আত্মনিবেদন, তৃতীয়তঃ পাটোয়ারী বুদ্ধি পরিত্যাগ—এই তিনটি একত্র হইলে তবেই সাধুসঙ্গের প্রকৃত ফল পাওয়া যায়। গৃহীর এইরূপ মন সাধুসঙ্গের অনুকূল অবস্থা।

গৃহীর কথা বলা হইল, এখন সাধুগণের সম্বন্ধেও ভাবিয়া দেখিবার আছে। সাধুসঙ্গ মানেই গৃহীর মন ও সাধুর মনের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম। ভিতরের মন লইয়াই তো মানুষ সাধুপদবাচ্য হইয়া থাকেন, বাহিরের

বেশভূষা, মঠ, তীর্থভ্রমণ এ সকল তো সাধুজীবনের আনুষঙ্গিক উপকরণ মাত্র। বর্ত্তমানযুগে আমরা যে সকল সাধু দর্শন করিয়া থাকি তাঁহাদের অধিকাংশই বিষয়কর্ম্ম লইয়া থাকেন, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু গৃহীর মনের সহিত তাঁহাদের মনের বিশেষ পার্থক্য নাই। শ্রীভাগবতে লিখিত হইয়াছে যে "বেণুভির্ণ ভবেৎ যতিঃ"—যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ নহে তিনি কেবলমাত্র বংশদণ্ড ধারণ করিয়াই যতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। মহাভারতে বনপর্ব্বে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে অনুরূপ কথাই উল্লিখিত হইয়াছে—"সর্ব্বাণ্যেতানি মিথ্যা স্যুর্যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ", অর্থাৎ সন্ন্যাসীর মনের ভাব নির্ম্মল না হইলে বাহিরের সন্ন্যাসচিহ্ন সমস্তই নিষ্ফল। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে অনেক সাধুদের আশ্রমসংলগ্ন জমিতে ধান অথবা আলুর চাষ হয়, আশ্রমের সীমানার পুষ্করিণীতে মাছের পোণা ছাড়িয়া আশ্রমবাসিগণের ব্যয়সাধন অথবা উদর পূরণ হইয়া থাকে।

আবার দেখা যায় যে, সন্ন্যাসীগণ জনহিতকর কার্য্য করিতে সমুৎসুক; —পুষ্করিণীখনন, হাসপাতাল ও বিদ্যালয় স্থাপন, দুর্ভিক্ষে অন্নদান, এই সমস্ত কার্য্য সন্ন্যাসীগণ করিতেছেন। কিন্তু এই সমস্ত জনহিতকর সামাজিক কার্য্য রাজা এবং গৃহীর কর্ত্তব্য, ইহা সর্ব্বরিক্ত, সর্ব্বত্যাগী, ভজনামোদী সন্ন্যাসীর কার্য্য নহে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় পূতাগ্নির সম্মুখে সন্ন্যাসী যে সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন তাহার ভিতর হাসপাতাল-পুষ্করিণীর জন্য কোন মন্ত্র ঋষিগণ রচনা করিয়া যান নাই। কখনও বা আশ্রমের বিষয়সম্পত্তি রক্ষার জন্য সাধুকে মামলা-মকর্দ্দমায় জড়াইয়া পড়িতেও দেখা যায়। এইরূপ জীবনযাত্রাপ্রণালীতে সন্ন্যাসীর নিজেরই কোন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয় না, সুতরাং এইরূপ সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়া গৃহীলোক সাধুসঙ্গের লেশমাত্র ফলও প্রাপ্ত হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য। তাই বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হইয়া

দাঁড়াইয়াছে, অথচ সাধুসঙ্গ ব্যতীত ঈশ্বরলাভ অসম্ভব—ইহা ভাগবতে বারংবার ঘোষণা করা হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে হস্তিনাপুরে যাইয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণের অবস্থা জানিবার জন্য অনুরোধ করিয়া স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহাত্মা অক্রূর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ জানিবার অভিপ্রায়ে হস্তিনাপুরে যাইয়া তথায় কয়েকমাস বাস করিলেন। কুন্তী ও বিদুর, কৌরবগণ-কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণকে বিষপ্রদান, যতুগৃহে পুড়াইয়া মারিবার প্রচেষ্টা ও অন্যান্য বহুবিধ নির্য্যাতনের কথা অক্রূরের নিকট নিবেদন করিলেন। কুন্তী এই সমস্ত দুঃখের কথা বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া দুঃখ ও শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং যেন শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ

কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাযোগিন্, বিশ্বাত্মন্, বিশ্বভাবন,
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ, শিশুভিশ্চাবসীদতীম্ ॥
নান্যাৎ তব পদাম্ভোজাৎ পশ্যামি শরণং নৃণাম্,
বিভ্যতাং মৃত্যুসংসারাৎ ঈশ্বরস্যাপবর্গিকাৎ ॥
নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে,
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতা ॥ ১০।৪৯।১১-১৩

—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, মহাযোগিন্, বিশ্বাত্মন্, গোবিন্দ, আমি শিশুপুত্রগণের সহিত শত্রুমধ্যে বাস করিয়া দুঃখ পাইতেছি, আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

—হে ভগবান, মনুষ্যগণ মৃত্যু ও সংসারভয়ে ভীত; সর্ব্বেশ্বর আপনার সর্ব্বক্লেশনাশক চরণ-কমল ব্যতীত জীবের অন্য কোনও আশ্রয় নাই।

—হে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মা, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, আমি তোমার শরণ লইতেছি।

বিধবা কুন্তী আজ দীনাতিদীনা—আত্মীয়নামধারী নিষ্ঠুর শত্রুগণে পরিবেষ্টিত। তাঁহার সুখৈশ্বর্য্য নাই, সহায়সম্বল নাই, অতি দরিদ্রের জীবনও হয়ত নিরাপদ, কিন্তু কুন্তীর পুত্রগণ সর্ব্বদাই যেন মৃত্যুর মধ্যে বাস করিতেছে। তাই আজ কৃষ্ণদূতকে নিকটে পাইয়া তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণকেই সম্মুখে দেখিতেছেন, প্রাণের ভিতর হইতে একটা গভীর আর্ত্তনাদ উঠিতেছে, মনের সংযম হারাইয়া গিয়াছে, হৃদয়ের দুইকূল প্লাবিত করিয়া ভাষার প্রবাহ যেন তরঙ্গভঙ্গে কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে। এই বিপদই তো ভক্তের সৌভাগ্য—জীবের এই অসহায় আর্ত্তনাদই তো শ্রীকৃষ্ণের পরম সুযোগ! অবশেষে কুন্তী রোদন করিতে লাগিলেন;—তখন আর ভাষা নাই। কবির কথায় এ যেন "পরিপূর্ণ তোমার সম্মুখে থেমে যাবে সকল কল্লোল!"

অতঃপর অক্রূর মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে একবার রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত দেখা করিতে যাইলেন। অক্রূর রাজাকে কুন্তীপুত্রগণের প্রতি সমভাবাপন্ন হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন, পুত্রস্নেহে মোহিত হইয়া অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন।

অক্রূর বলিলেন,

> একঃ প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে,
> একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্‌,
> তস্মাৎ লোকমিমং রাজন্‌, স্বপ্নমায়ামনোরথম্‌,
> বীক্ষ্যাযম্যাত্মনাত্মানং সমঃ শান্তো ভব প্রভো॥ ১০।৪৯।২১,২৫

—জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, একাকী সঞ্চিত পুণ্যকর্ম্ম ভোগ করে, একাকীই পাপের জন্য শাস্তিভোগ করিয়া থাকে।

—অতএব হে রাজন্‌, হে প্রভো, এই প্রাকৃত জগৎকে স্বপ্ন, মায়া ও কামনা বাসনার মত অনিত্য উপলব্ধি করিয়া আপনি বিবেকবুদ্ধির

দ্বারা মনকে সংযত করুন এবং রাজ্যলোভ ও পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলের প্রতি সমবুদ্ধি হউন।

ধৃতরাষ্ট্র ধীরভাবে কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, কথাগুলি ভালই লাগিল; কিন্তু সাধারণ বদ্ধজীব যেমন হিতকথা শ্রবণ করিয়া, বুঝিয়াও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না, রাজার ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইল। তিনি বুদ্ধিমান্ লোক, সুতরাং তাঁহার নিজের মনের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিলেন এবং অক্রূরকে বলিলেন ঃ

তথাপি সুনৃতা সৌম্য, হৃদি ন স্থীয়তে চলে,
পুত্রানুরাগবিষমে বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা॥ ১০।৪৯।২৭

—হে সৌম্য, আপনার কথাগুলি সত্য ও যুক্তিযুক্ত, তথাপি আমার হৃদয় পুত্রানুরাগবশতঃ বিষমভাবাপন্ন ও চঞ্চল। বিদ্যুৎ যেমন আকাশে স্থির হইয়া বসিতে পারে না সেইরূপ আপনার হিতকারীবাক্য আমার হৃদয়ে স্থির হইয়া প্রবেশ করিতেছে না।

ইহাই সমস্ত বদ্ধ জীবের মনের প্রকৃত অবস্থা। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সংসারীলোকের প্রতীক স্বরূপ, তাঁহার কথাগুলি সাধারণ মানুষের অন্তরের কথা।

মহাত্মা অক্রূর মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(২৩)

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা

শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা শেষ হইল, তিনি দ্বারকালীলার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পঞ্চাশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে জরাসন্ধের বহুবার পরাজয়, কালযবনের মথুরাপুরী আক্রমণ এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সমুদ্রমধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ ও তথায় স্বজনগণের স্থাপন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে।

কংসের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পত্নী—অস্তি ও প্রাপ্তি—তাহাদের পিতা মগধরাজ জরাসন্ধের নিকট যাইয়া সমস্ত দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিল। জরাসন্ধ কন্যাস্নেহে বিমোহিত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং "অযাদবীং মহীং কর্ত্তুং চক্রে পরমমুদ্যমম্"—পৃথিবীকে যাদবশূন্য করিবার জন্য প্রবল উদ্‌যোগ আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে জরাসন্ধ অসংখ্য সৈন্য লইয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া জরাসন্ধের সৈন্য নিধন করিলেন এবং "জগ্রাহ বিরথং রামো জরাসন্ধং মহাবলম্"—বলরাম রথচ্যুত মহাবলশালী জরাসন্ধকে বন্দী করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে মুক্ত করিয়া দিলেন। পরাজিত এবং শত্রুকর্ত্তৃক উপেক্ষিত মগধরাজ জরাসন্ধ দুঃখিতচিত্তে মগধদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

জরাসন্ধ নিরুৎসাহ হইল না। সে বহু সৈন্য পুনঃ পুনঃ সংগ্রহ করিয়া যদুগণের সহিত সপ্তদশবার যুদ্ধ করিল, এবং প্রতিবারেই পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া লজ্জা ও দীনতার সহিত মগধদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এইরূপে বহু যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্যক্ষয় হইল, পাপীগণকে ধ্বংস করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে লাগিলেন, তাঁহার সেই সত্যসঙ্কল্প সফল হইল :

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

—আমি লোকক্ষয়কারী সাক্ষাৎ মহাকাল। এখন লোকসংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অষ্টাদশবারের যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইলে কালযবন তিনকোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য সঙ্গে লইয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিলেন যে, কালযবনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যদি ঠিক সেই সময়ে মগধরাজ জরাসন্ধ আসিয়া ইহার সহিত যোগদান করে তাহা হইলে অসংখ্য যদুগণ

উভয় সৈন্যের মধ্যে পড়িয়া নিহত হইবে। এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত এক দুর্গ ও সেই দুর্গের মধ্যে এক আশ্চর্য্য নগরী নির্ম্মাণ করিলেন। পুষ্পিত তরুলতা, স্ফটিকময় অট্টালিকা, সুবর্ণনির্ম্মিত দেবমন্দির পরিশোভিত এই নগরী দ্বারকা নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত। একদিন যোগমায়ার প্রভাবে বলরামসহায়ে কালযবনের অজ্ঞাতসারে শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র মথুরাবাসী স্বজনগণকে নব নির্ম্মিত নগরে অপসারিত করিলেন এবং কালযবনকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে একাকী মথুরাপুরী হইতে বাহির হইলেন।

এইস্থলে একটি বিষয় পরিলক্ষণীয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কৃষ্ণচরিত পাঠ করিয়া বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ও দ্বারকার কৃষ্ণ বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বিভিন্ন প্রকারের ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শনে অন্যান্য অবতারগণকে অতিক্রম করিয়াছেন, অথচ তাঁহারই জীবনের শেষভাগে দ্বারকাবাসীরূপে তাঁহার বিশেষ কোন ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখা যায় না। বরং কালযবনের ভয়ে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া রাজপুতনা ও সিন্ধুদেশের মরুভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক সমুদ্রতটে কুশস্থলী দেশে গমন করিয়া তথায় দ্বারকা-নগরী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই তর্কযুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে ; বহুবিধ উদাহরণের প্রয়োজন নাই, শুধু এইটুকু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে বাল্যের মত অসংখ্য ও অত্যাশ্চর্য্য বিভূতিলীলা না থাকিলেও দ্বারকালীলার ভিতরও তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ অদ্ভুত ও অনন্যসাধারণ। উপরন্তু, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ যেমন শৈশবকালে শ্রীকৃষ্ণদেহে পুনঃপুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবনেও প্রয়োজনমত এই লীলাময় বিগ্রহ ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছেন। কালযবনের মৃত্যুর পরও মুচুকুন্দ এই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি

দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্ববয়সে শ্রীকৃষ্ণ সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ লীলাময় পরমপুরুষ, "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এক এবং দ্বিতীয়-রহিত।

কালযবন দেখিল, কে একজন পুরুষ পুরদ্বার দিয়া বাহিরে যাইতেছে, দেবর্ষি নারদের মুখে সে শুনিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৎসচিহ্নলাঞ্ছিত, চতুর্ভুজ, কমললোচন ও বনমালাধারী। এই অদ্ভুত পুরুষ তো তাহা হইলে সেই বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ! কালযবন আর বিলম্ব না করিয়া একাকী শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করিতে করিতে সে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিল। অন্ধকারে ভাল দেখা যাইতেছে না, কালযবন চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে লক্ষ্য করিল, কে একজন পর্ব্বতগুহায় শয়ন করিয়া আছে। এই তো কৃষ্ণ, নিদ্রার ভান করিয়া কালযবনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে! কালযবন ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শয়ান দেহের উপর পদাঘাত করিল। সেই নিদ্রিত পুরুষ কালযবনের পদাঘাতে জাগরিত হইয়া ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলেন, তাঁহার দৃষ্টিপাতে কালযবন দগ্ধ হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্মরাশিতে পরিণত হইল।

এই অপূর্ব্ব বিবরণ শ্রবণ করিয়া কৌতূহলী মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

কো নাম স পুমান্ ব্রহ্মন্, কস্য কিং বীর্য্যঃ এব চ,
কস্মাৎ গুহাং গতঃ শিশ্যে কিং তেজো যবনার্দ্দনঃ ॥ ১০।৫১।১৩

—হে ব্রহ্মন্, যিনি কালযবনকে ভস্মীভূত করিলেন সেই পুরুষ কে? তাঁহার নাম কি? তিনি কোন্ বংশীয়? কিরূপ প্রভাবশালী? কি কারণেই বা তিনি পর্ব্বতগুহায় শয়ন করিয়াছিলেন?

শ্রীশুকদেব বলিলেন, সেই পুরুষ ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি মুচুকুন্দ নামে বিখ্যাত, তাঁহার পিতার নাম মান্ধাতা। পূর্ব্বে

দেবতাগণ অসুরভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া যুদ্ধে মুচুকুন্দের সাহায্য গ্রহণ করিতেন, কিন্তু পরে কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া মুচুকুন্দকে অবসর প্রদান করিলেন। মুচুকুন্দের সমস্ত সাহায্য স্বীকার করিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে দেবগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

বরং বৃণীষ ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ,
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ১০।৫১।২০

—আপনার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আপনি আমাদিগের নিকট মোক্ষ ব্যতীত অপর যে কোন বর ইচ্ছা প্রার্থনা করুন, আমরা প্রদান করিব। কিন্তু মোক্ষ দিবার শক্তি আমাদের নাই, একমাত্র অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ।

তখন মুচুকুন্দ দেবতাগণের নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া কালযাপন করিবেন, এবং যে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। সেই মুচুকুন্দ বৃথা নিদ্রার বর প্রাপ্ত হইয়া এতদিন মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, আজ স্বয়ং নারায়ণ গিরিগুহামধ্যে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ তখন কৃপা করিয়া মুচুকুন্দকে নিজ স্বরূপ দর্শন করাইলেন, বিস্মিত ও পুলকিত মুচুকুন্দ দেখিলেন ঘনশ্যাম, পীত কৌষেয় বসন, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষ, চতুর্ভুজ এক পরমসুন্দর পুরুষ স্বীয় জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। মুচুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? অগ্নি? চন্দ্র? সূর্য্য? দেবরাজ ইন্দ্র? আপনার নাম কি? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন:

জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ,
ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুম্ অনন্তত্বাৎ ময়াপি হি ॥ ১০।৫১।৩৬

—হে মুচুকুন্দ, আমার সহস্র সহস্র জন্ম, কর্ম্ম ও নাম আছে; অনন্ত নাম বলিয়া সেই সকল আমিও গণনা করিতে সমর্থ নহি।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, হয়ত পৃথিবীর সমস্ত ধূলিকণা গণনা করাও সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অসংখ্য নাম কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না,—শ্রেষ্ঠ ঋষিগণও তাঁহার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হন না। তবে এখন তিনি বসুদেবপুত্র বাসুদেব নামেই পরিচিত। "প্রার্থিতঃ প্রচুরং পূর্ব্বং ত্বয়াহং ভক্তবৎসলঃ"—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল, পূর্ব্বে মুচুকুন্দ তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহু প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাই আজ প্রভু ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। মুচুকুন্দ তখন শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিলেন, এবং প্রীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, মুচুকুন্দ ইহজন্মে মৃগয়াদির দ্বারা বহু পাপ সঞ্চিত করিয়াছেন, এখন হইতে সমাহিতচিত্তে শ্রীহরির ভজনা করিয়া পাপক্ষয় হইলে তিনি পরজন্মে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন এবং অবশেষে শ্রীহরির চরণ প্রাপ্ত হইয়া জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে মুচুকুন্দ বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নেতাবিহীন ম্লেচ্ছ-সৈন্যগণকে বধ করিলেন এবং তাহাদের বসনভূষণাদি ধন সম্পত্তি দ্বারকায় লইয়া যাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পুনরায় জরাসন্ধ বহুসৈন্য লইয়া পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে আক্রমণ করিল। তাঁহারা ভীতির অভিনয় করিয়া যবনসৈন্যের সমস্ত লুণ্ঠিত ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগতিতে পলায়নের উপক্রম করিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম বহুদূর অতিক্রম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া প্রবর্ষণ নামক এক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ঐ পর্ব্বতে লুকাইয়া আছেন জানিতে পারিয়া রাজা জরাসন্ধ চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সেই পর্ব্বত দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তখন জরাসন্ধের অলক্ষিতে পর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজপুরী দ্বারকায় পুনরায় আগমন করিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম

দগ্ধ হইয়াছেন মনে করিয়া রাজা জরাসন্ধ নিজের সৈন্যগণকে ফিরাইয়া লইয়া মগধদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অতঃপর মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রুক্মিণী হরণের সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিয়া শুকদেবকে বলিলেন :

ব্রহ্মন্, কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যাঃ মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ
কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বানঃ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ॥ ১০।৫২।২০

—হে ব্রহ্মন্, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র কর্ণযুগলের সুখকর, জীবের পাপনাশক ও পুণ্যফলপ্রদ। এই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি হয় না, উত্তরোত্তর যেন নূতন বলিয়াই মনে হয়।

(২৪)

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণীহরণ

পরীক্ষিতের আগ্রহ দর্শন করিয়া শুকদেব শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীর কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিদর্ভদেশে ভীষ্মক নামে এক নরপতি ছিলেন, তাঁহার পাঁচপুত্র এবং রুক্মিণী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রুক্মিণী বাল্যকাল হইতেই পিতৃগৃহে সমাগত জনগণের মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও পরাক্রমের কথা শ্রবণ করিতেন এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল কৃষ্ণপ্রেম বশতঃ তাঁহাকেই মনে মনে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও রুক্মিণীর রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করেন। সকলেই এই বিবাহ অনুমোদন করিলেন কিন্তু ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠপুত্র রুক্মী কৃষ্ণবিদ্বেষী বলিয়া এই বিবাহে বাধাপ্রদান করিল এবং চেদিরাজ শিশুপালের হস্তে ভগ্নীকে সমর্পণ করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। রুক্মিণী দুঃখিতা হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণপূর্ব্বক গোপনে এক পত্র লিখিয়া জনৈক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের হস্তে

সেই পত্র কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই পত্র পাঠ করিলেন —রুক্মিণী সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন— "মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাৎ গোমায়ুবৎমৃগপতের্ব্বলিমম্বুজাক্ষ!"— হে কমললোচন, আপনি বীর, আমি আপনার বস্তু। সিংহের ভোগ্যবস্তু শৃগাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়ার ন্যায় আপনার উদ্দেশে নিবেদিত আমার এই দেহ চেদিরাজ শিশুপাল আসিয়া যেন স্পর্শ না করে।

সুদীর্ঘ প্রেমপত্র শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়া তাহাদের সমক্ষ হইতেই রুক্মিণীকে আনয়ন করিবেন।

তৃতীয় রাত্রিতে শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ স্থির হইয়াছিল সুতরাং সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ সেই রাত্রিতে সারথি দারুককে রথ যোজনা করিতে আদেশ দিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া বিদর্ভদেশে গমন করিলেন। রাজধানী কুণ্ডিননগরে তখন রাজকন্যার আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে মহামহোৎসব। ধ্বজা, পতাকা, গন্ধ, মাল্য পরিশোভিত বিদর্ভ রাজধানী তখন অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়াছে। কন্যার পিতা রাজা ভীষ্মক পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা শেষ করিয়াছেন, পাত্রের পিতা রাজা দমঘোষও বিবাহের সমস্ত মাঙ্গলিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, পাত্র শিশুপাল মদস্রাবী হস্তী, স্বর্ণমালাবিভূষিত রথ ও অশ্বে পরিবৃত হইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিতেছে। শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ এবং পৌণ্ড্রক প্রভৃতি অসংখ্য বরপক্ষীয় রাজগণও উপস্থিত।

বিবাহ আসন্ন। পত্রবাহক ব্রাহ্মণ এখনও ফিরিয়া আসেন নাই, রুক্মিণীর মনে সে কী দারুণ উৎকণ্ঠা ও নৈরাশ্য। তিনি ভাবিতেছেন :

দুর্ভগয়া ন মে ধাতা নানুকূলো মহেশ্বরঃ
দেবী বা বিমুখা গৌরী রুদ্রাণী গিরিজা সতী ॥ ১০।৫৩।২৫

—আমি দুর্ভাগা, আমার প্রতি বিধাতা ও মহেশ্বর প্রসন্ন নহেন। আমাদের কুলদেবতা পর্ব্বতনন্দিনী সতী গৌরীও কি আমার প্রতি প্রসন্না নহেন!

কাত্যায়নীদেবীর পূজা করিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আজ পার্ব্বতীর পূজা করিয়া রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণমহিষী হইবার আশায় প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। এমন সময়ে হঠাৎ পত্রবাহক ব্রাহ্মণ রুক্মিণীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন;—শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডিননগরে উপস্থিত হইয়াছেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া রুক্মিণী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন —দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কোনও উপহার দিবার কথা ভুলিয়া যাইলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

রাজা ভীষ্মক শুনিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁহার কন্যার বিবাহ-উৎসব দেখিবার জন্য কুণ্ডিননগরে আগমন করিয়াছেন। রাজা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহাদের বাসের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে কুলপ্রথা অনুসারে রুক্মিণীদেবী সখীগণে পরিবৃতা হইয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে দেবী অম্বিকার মন্দিরে পূজা দিতে চলিয়াছেন। সেদিন রাজপথের কী শোভা, কী আনন্দস্রোত! মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রুক্মিণীদেবী অম্বিকার বন্দনা করিলেন:

নমস্যে ত্বাম্বিকেঽভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবাম্,
ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাম্॥ ১০।৫৩।৪৬

—হে মাতা অম্বিকা, গণেশাদি সন্তানগণসমন্বিতা, মঙ্গলস্বরূপিণী তোমাকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি হউন, তুমি আমাকে এই বরপ্রদান কর।

রুক্মিণীদেবী মন্দির হইতে বাহির হইয়া চতুর্দ্দিকে সমাগত নৃপতিগণকে দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণকেও দেখিতে পাইলেন, এবং পুলকিতা হইয়া

রথে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপাল প্রভৃতি শত্রুগণের সমক্ষেই রুক্মিণীকে হরণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন ক্ষত্রিয় নরপতিগণ বাহনে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। যদুসেনাপতিগণের সহিত ক্ষত্রিয়রাজগণের প্রবল যুদ্ধ হইল, রাজগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় আনয়ন করিয়া বিধি অনুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। সমগ্র পুরীতে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

শ্রীশুকদেব পঞ্চমদিবসে শ্রীভাগবতের এই পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া তাহার প্রাসাদে প্রবেশ পূর্ব্বক ষোড়শ সহস্র ক্ষত্রিয়কন্যাকে অবরুদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় মত শ্রীকৃষ্ণ সেই ষোলহাজার রমণীকে নিজে ষোড়শ সহস্র দেহ ধারণ করিয়া একই শুভলগ্নে বিবাহ করিলেন। এইরূপে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন রমণীগণকে বিবাহ করিলে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বসমেত ষোলহাজার একশত আটজন মহিষী হইলেন। এই সমস্ত কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে আটজন মহিষী প্রধানা বলিয়া পরিগণিতা হইতেন;—রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, কালিন্দী, লক্ষণা, মিত্রবিন্দা, ও ভদ্রা। এই ষোড়শ সহস্রাধিক মহিষীগণের প্রত্যেকের একশতজন করিয়া দাসী ছিল, তথাপি পতিভক্তিপরায়ণা মহিষীগণ নিজেরাই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সমাদর, আসন প্রদান, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বুলপ্রদান, পাদমর্দ্দন, বীজন, গন্ধমাল্যপ্রদান, কেশপ্রসাধন, শয্যারচনা ও স্নানসম্পাদন প্রভৃতি সমস্ত সেবাকার্য্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে প্রত্যেক মহিষীর গর্ভে দশজন করিয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ "যথেতরো গার্হকমেধিকাংশ্চরন্"—সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

(২৫)

নৃগরাজার উপাখ্যান

চৌষট্টি অধ্যায়ে নৃগনামক রাজার উপাখ্যান এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বজনগণের প্রতি উপদেশ বর্ণনা করা হইয়াছে।

একদিন প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, চারু, ভানু ও গদ প্রভৃতি কৃষ্ণপুত্রগণ ক্রীড়া করিবার জন্য উপবনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহারা বহুক্ষণ ক্রীড়া করিয়া পিপাসিত হইলেন এবং জল অন্বেষণ করিতে করিতে কোন একটি জলশূন্য কূপে এক অদ্ভুত প্রাণীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ প্রাণী একটি কৃকলাস। বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট সেই কৃকলাসকে দেখিয়া কুমারগণ বিস্মিত হইলেন এবং তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কূপসমীপে আসিয়া স্বীয় বামহস্তের দ্বারা অনায়াসে কৃকলাসকে কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন। তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল,—শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্পর্শ পাইবামাত্র কৃকলাসটি তৎক্ষণাৎ তপ্তকাঞ্চনসদৃশ মনোহর বর্ণবিশিষ্ট, অলঙ্কার, বস্ত্র ও মাল্যধারী এক দেবমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই পুরুষ তখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃগ নামক নরপতি। তিনি রাজত্বকালে অসংখ্য গাভী ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন, যজ্ঞ করিয়াছিলেন, কূপখনন ও অন্যান্য জনহিতকর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। একদিন রাজার ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত হইল। সেদিন তিনি কোন এক ব্রাহ্মণকে বহুগাভী দান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি গাভী দলভ্রষ্ট হইয়া রাজার গাভীগুলির সহিত মিলিত হইল, এবং নৃগ ভুল করিয়া সেই গাভীটিকেই

অন্য একজন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে গাভী লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল, উভয়ে বিচারের জন্য রাজসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন ব্রাহ্মণ রাজাকে দাতা বলিলেন, অপরজন অপহর্ত্তা বলিয়া নিন্দা করিলেন, রাজা এই ধর্ম্মসঙ্কটে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। নৃগ একটি গাভীর পরিবর্ত্তে লক্ষ গাভী দিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু উভয় ব্রাহ্মণই লক্ষগাভী গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া সেই একই গাভীকে দাবী করিলেন; কিছুই মীমাংসা হইল না। অবশেষে উভয় ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া সেই গাভীটিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কালক্রমে রাজা নৃগের মৃত্যু হইল। যমরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে শুভ অথবা অশুভ কোন্ কর্ম্মের ফল তিনি প্রথমে ভোগ করিতে চাহেন। নৃগ অশুভকর্ম্মের ফলগ্রহণ প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কৃকলাসরূপে পরিণত হইয়া কূপমধ্যে পতিত হইলেন। কিন্তু দাতা, ব্রাহ্মণগণের হিতকারী ও শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত রাজার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইল না, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। এখন রাজা নৃগ মুক্ত হইয়া আনন্দচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন ঃ

দেবদেব, জগন্নাথ, গোবিন্দ, পুরুষোত্তম,
নারায়ণ, হৃষীকেশ, পুণ্যশ্লোকাচ্যুতাব্যয় !
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ, যান্তং দেবগতিং প্রভো,
যত্র ক্বাপি সতশ্চেতো ভূয়াৎ মে ত্বৎপদাস্পদম্ ॥ ১০।৬৪।২৭,২৮

—হে দেবদেব, হে জগন্নাথ, হে গোবিন্দ, হে পুরুষোত্তম, হে নারায়ণ, হে হৃষীকেশ, হে পুণ্যশ্লোক, হে অচ্যুত, হে অব্যয়, হে শ্রীকৃষ্ণ, হে প্রভো! আমাকে দেবলোকে যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করুন। আমি যেখানেই থাকি, আমার মন যেন আপনার শ্রীচরণ স্মরণ করিতে পারে।

আজ মহারাজ নৃগ বহুদিনের পর ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে পারিয়াছেন, তাই নাম করিয়া যেন তৃপ্তি হইতেছে না, অসংখ্য নাম অনায়াসে অনর্গল ধারায় তাঁহার জিহ্বা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রার্থনাটি বড়ই চমৎকার—যেখানেই থাকি, যে জন্মই হউক, হে প্রভু, যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই। ভগবানকে বিস্মৃত হওয়ার মত জীবের দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই! পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির কথা মনে পড়ে।

কিয়ে মানুষ পশু পাখী হয়ে জনমিয়ে
অথবা কীটপতঙ্গ,
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥

নিজ প্রার্থনা জানাইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া মহারাজ নৃগ প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকাবাসীগণকে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন—"দুর্জ্জরং বত ব্রহ্মস্বং ভুক্তমগ্নের্মনাগপি" —যেমন অগ্নির সামান্য একখণ্ড উদরসাৎ করিলে তাহা পরিপাক না হইয়া যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণের ধন জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে অপহৃত হইলে মানুষের ইহকাল ও পরকালে পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। অতএব

যথাহং প্রণমে বিপ্রান্ অনুকালং সমাহিতঃ,
তথা নমত যূয়ঞ্চ যোঽন্যথা মে স দণ্ডভাক্ ॥ ১০।৬৪।৪২

—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যেমন আমি সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ণ চিত্তে ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করি, সেইরূপ তোমরাও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিবে। অন্যথা করিলে আমার নিকট দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

দ্বারকাবাসীগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজভবনে প্রবেশ করিলেন।

বলরামের গোকুলে গমন

পঁইষট্টি অধ্যায়ে বলরামের গোকুলে গমন, নন্দরাজ ও গোপগণ কর্ত্তৃক সমাদরে গ্রহণ এবং কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণের সহিত তাঁহার কথোপকথন বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রীশুকদেব বলিলেন যে বহুদিন পরে অবসর পাইয়া ভগবান বলরাম বন্ধুবান্ধবগণকে দেখিবার জন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক নন্দগোকুলে গমন করিলেন। তথায় নন্দ ও যশোদাকে প্রণাম করিলে তাঁহারা বলরামকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহাশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন। গোপীগণও আসিলেন এবং পরিহাস করিয়া বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণঃ পুরস্ত্রীজনবল্লভঃ"—শ্রীকৃষ্ণ এখন নগরবাসিনী রমণীগণের বল্লভ হইয়াছেন। তিনি সুখে আছেন তো ? গোপীগণ পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন অথচ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া আসিবেন বলিয়াছিলেন, তাঁহার সেই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গোপীগণ আজিও প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। আবার, কোন কোন গোপী অভিমান করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা না হয় গ্রামবাসিনী সরল গোপরমণী—তাঁহারা সহজেই বঞ্চিত হইতে পারেন, কিন্তু পুরবাসিনী চতুর রমণীগণ কি করিয়া সেই "অনবস্থিতাত্মনো বচঃ কৃতঘ্নস্য"—চঞ্চলচিত্ত ও কৃতঘ্ন শ্রীকৃষ্ণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে। অভিমানিনী অপর কোন গোপী সখিদের বলিলেন,

কিং নস্তৎকথয়া গোপ্যঃ, কথাঃ কথয়তাপরাঃ,
যাত্যস্মাভির্বিনা কালো যদি তস্য তথৈব নঃ ॥ ১০।৬৫।১৪

—হে গোপীগণ, তাঁহার কথায় আমাদের প্রয়োজন কি ? অন্য কথা বল। আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যদি তাঁহার সময় কাটিয়া যায়, আমরাও তাঁহাকে ভুলিয়া দিন কাটাইতে পারিব।

কথাগুলি বড়ই চমৎকার। যাঁহারা বারংবার বলিয়াছেন—"তুভ্যজন্তং কথার্থঃ"—কৃষ্ণের কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারি না, যাঁহারা কৃষ্ণবিরহে অহরহঃ কৃষ্ণকথা স্মরণ করিয়া, কৃষ্ণলীলা গান গাহিয়া, কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দিন যাপন করিতেছেন, কৃষ্ণকথাই যাঁহাদের প্রাণের নিশ্বাসবায়ু—সেই কৃষ্ণসর্ব্বস্ব গোপীগণ আজ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকিবেন বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিতেছেন। কত বড় বিরহ ও নৈরাশ্যের ব্যথা আজ তাঁহাদিগের মনকে পীড়িত করিতেছে তাহা ধারণা করা কঠিন। কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকিলেও দিন কাটিবে—এই কথা বলিয়াই তাঁহারা "স্মরন্ত্যো রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ"—শ্রীকৃষ্ণলীলা স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গোপীগণের মনের যে দ্বন্দ্ব, মনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের যে ঘাতপ্রতিঘাত তাহা কে বিশ্লেষণ করিতে পারিবে ?—এই গোপীপ্রেমের তুলনা গোপীপ্রেম—'গগনং গগনাকারং'—নীল অনন্ত আকাশই নীল অনন্ত আকাশের একমাত্র তুলনা!

ভগবান্ বলরাম গোপীগণকে সান্ত্বনা দিলেন এবং চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস গোকুলে বাস করিয়া তাঁহার অনুরাগিণী অন্য অন্য গোপীগণের সহিত বিহার করিলেন।

ছেষট্টি অধ্যায়ে রাজা পৌণ্ড্রক ও তাহার বন্ধু কাশিরাজের নিধনবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে।

(২৭)

রাজা পৌণ্ড্রকের উপাখ্যান

শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, করূষদেশের অধিপতি পৌণ্ড্রক দেশ বিদেশে প্রচার করিল যে, সে নিজেই বাসুদেব, দ্বারকায় যিনি বাসুদেব নামে পরিচিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতেছেন তিনি প্রকৃত বাসুদেব নহেন। উপাসকেরও অভাব হইল না, বহুলোক বলিতে লাগিল—'ত্বং বাসুদেবো

ভগবানবতীর্ণো জগৎপতিঃ'—আপনি জগৎপতি ভগবান বাসুদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পৌণ্ড্রকের মাথা ঘুরিয়া গেল, একে তাহার মনে বিকৃতমস্তিষ্কপ্রসূত ঐরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহাতে আবার তোষামোদশীল মূর্খ পুরবাসিগণ ইন্ধন প্রদান করিল। তখন পৌণ্ড্রক দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করিল—শ্রীকৃষ্ণ যেন বাসুদেব বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান না করেন, কারণ "বাসুদেবোঽবতীর্ণোঽহমেক এব ন চাপরঃ"—সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র আমিই বাসুদেব—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—অপর দ্বিতীয় বাসুদেব কেহ হইতে পারে না। দূতের কথা শুনিয়া সকলেই হাসিলেন।

পৌণ্ড্রক তখন তাহার বন্ধু কাশিরাজের সহিত অবস্থান করিতেছিল, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে কাশীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। করূষদেশের অধিপতি পৌণ্ড্রক তখন বহুসৈন্যপরিবৃত হইয়া এবং তাহার মিত্র কাশিরাজকে পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করিয়া নগরের বাহিরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। সমবেত সৈন্যগণ ও করূষবাসী সকলেই দেখিল যে পৌণ্ড্রক শঙ্খচক্রগদাখড়্গ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন অঙ্কিত, গলায় বনমালা ও কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীতকৌষেয়বসন, তাহার রথের ধ্বজায় কৃত্রিম গরুড় চিহ্ন। অপূর্ব্ব পরিবেশ! দুইজন বাসুদেব আজ কাশীধামের বহির্দেশে পরস্পর যুদ্ধ করিবার জন্য সম্মুখীন, হঠাৎ আসল ও নকল ধরিতে পারা যায় না। যুদ্ধ হইল, পৌণ্ড্রক ছিন্নমস্তক হইয়া বাসুদেবলীলা সংবরণ করিল, নকল বাসুদেবের সাহায্যকারী কাশিরাজও নিহত হইল। অবশেষে পৌণ্ড্রক তাহার মিথ্যাচিহ্নলাঞ্ছিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির সাধর্ম্যরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইল। শ্রীশুকদেব বিস্মিত পরীক্ষিৎকে বলিলেন:

স নিত্যং ভগবদ্ধ্যানপ্রধ্বস্তাখিল বন্ধনঃ
বিভ্রাণশ্চ হরে রাজন্ স্বরূপং তন্ময়োঽভবৎ॥ ১০।৬৬।২৪

—পৌণ্ড্রক সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ চিন্তন করিত বলিয়া তাহার কর্ম্মবন্ধন ধ্বংস হইয়া যাইল এবং সে শ্রীহরির স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিত্যধামে গমন করিল।

পৌণ্ড্রকের এই উপাখ্যান বড় কৌতুকপ্রদ। বিশেষ করিয়া যেন বর্ত্তমান যুগের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া যোগিরাজ শ্রীশুকদেব পৌণ্ড্রকের ঘটনার ভিতর দিয়া মানুষকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বাংলাদেশে—কোন সাধু কিছুদিন সাধন ভজন করিয়া বহু শিষ্যসংগ্রহ করিলেই আপনাকে অবতার বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাকে অবতাররূপে ঘোষণা করিবার জন্য ভক্ত ও স্তাবকেরও অভাব হয় না। ইহার ফলে আজ ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনে যত অবনতি আরম্ভ হইয়াছে তত দ্রুতবেগে এবং সেই অনুপাতে অবতারসংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। সাধু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, মহাপুরুষ নাই বলিলেও চলে;—সকলেই অবতার! শিষ্যগণের ভিতর অধিকাংশেরই সাধনভজন নাই, উৎকটরূপে গুরুভক্তি প্রদর্শনের দুরাকাঙ্ক্ষা তাহাদিগকে ধরিয়া বসিয়াছে। এই সকল অবতারবিলাসী, বাক্যবাগীশ শিষ্যগণ কি করিয়া নিজ নিজ গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবে সেই মতলব খাটাইতেই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। তাহারা অনুক্ষণ গুরুর অলৌকিক বিভূতি-শক্তি দর্শন করিতেছে, স্থানে অস্থানে, ট্রামে রাস্তায়, সভায় বাড়িতে সেই সমস্ত বিভূতির কথা প্রচার করিতেছে। গুরু দুর্ব্বলচিত্ত হইলে তাঁহার মনে একটা ভ্রান্ত ধারণার ফলে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। শিষ্যগণ গুরুর নিকট জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিয়া যেন গুরুকে আলোক প্রদান করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। ফলে গুরুবাদ এখন শিষ্যবাদে পরিণত হইয়াছে। কোন গুরু হয়ত বহুমূল্য সিল্কের গেরুয়াকাপড়ে সমগ্র দেহ আবৃত করিয়া বিলাসী বাবুর মত কেশবিন্যাস করিয়া ধূপ-ধূনায় কক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া অসংখ্য নরনারী পরিবৃত হইয়া বিরাজ

করিতেছেন—সমগ্র সভাস্থল যেন ইন্দ্রসভার বিভ্রম সৃষ্টি করিতেছে;—তিনি শ্রীহরির অবতার! কোন-গুরুর হয়ত চিরদিনের সাধনা আজ সিদ্ধ হইয়াছে—তিনি একজন মহান্ত হইয়া অগাধ দেবসম্পত্তির অধিকারী-রূপে সংসারের অতৃপ্তবাসনা অবৈধ সন্ন্যাসজীবনের ভিতর দিয়া মিটাইয়া তুলিতেছেন, দেবসেবার নামে বিরাট ভোজের আয়োজন হইতেছে,—কোন মহারাজার প্রাসাদে নিত্য উত্থিত "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ধ্বনির মত ভোগবিলাসের শব্দ আশ্রমস্থলীকে মুখরিত করিতেছ। তাহাতে দেবতার উচ্ছিষ্ট প্রসাদের পবিত্রতা নাই, সংযম নাই, অনাড়ম্বর সহজ অভিব্যক্তি নাই, আছে শুধু রজতমোগুণপ্রসূত লোভ ও বাহাদুরীর জয়ডঙ্কা। বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীর জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য,—ঘটনাটি তাঁহারই এক ভক্ত শিষ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গুরু শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার একজন মন্ত্রশিষ্য উৎকট ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গুরুদেব ও উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলীকে তাক্ লাগাইবার জন্য বলিলেন, তাঁহার গুরুদেবের মত শ্রেষ্ঠ পুরুষ ত্রিভুবনে আর নাই;—মহাদেবী মহেশ্বরী তাঁহার পায়ের তলায় পড়িয়া আছেন। গুরুদেব কিন্তু পরমসন্ন্যাসী—তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—বিরক্ত হইয়া বলিলেন—এরূপ ধর্ম্মবিরোধী কথা বলিলে শিষ্যের "মুখ খসে পড়বে" এবং এই বলিয়া সাধুমহাশয় যেন ধৈর্য্য হারাইয়া সেই শিষ্যের অশুচিসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কক্ষান্তরে গমন করিলেন। ইহাই তো গুরুর আদর্শ! হয়তো গুরুদেবের এই তীব্রপ্রতিবাদ ও নিন্দাসূচক বাণী শ্রবণ করিয়া শিষ্যের চৈতন্য হইল, তাহার চিরকল্যাণ সাধিত হইল। আর একজন ভারতবিখ্যাত সন্ন্যাসীর কথা। সেই গুরুকে বড় করিয়া তাঁহার স্বার্থান্বেষী এক শিষ্য তাঁহারই প্রতিফলিত গৌরবে নাম, যশ, খ্যাতি অর্জ্জন করিতে চায়, গেরুয়া পরিয়া লোক ভুলাইতে চায়! গুরুদেব সমস্তই বুঝিলেন—মূর্খের মিথ্যা-প্রয়াসে বিরক্ত হইয়া চিঠি

লিখিলেন, "তুমি কি দীক্ষা লইয়া আমার মাথা কিনিয়াছ যে তোমার যত সব আজগুবী বুজরুকী আমাকে শুনিতে হইবে।……গেরুয়া পরিব, কাছা দিব না, মোটা রুদ্রাক্ষমালা গলায় ঝুলাইব—এই সকল বাসনা তোমায় জালাতন করিতেছে।……যত হাবাতে চেলা করিয়া জালাতন……" চিঠিখানি ছাপিয়া বাহির হইয়াছে। শিষ্যের অপপ্রচেষ্টা এইরূপে গুরুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই মঙ্গল। কিন্তু অধিকাংশ গুরুই দুর্ব্বলচিত্ত, শিষ্যের প্রতি অযথা স্নেহশীল,—তাহার মনের প্রতি মমতা আছে, তাহার আত্মার দিকে দৃষ্টি নাই। সেইজন্য শিষ্যের সমস্ত অপপ্রচেষ্টার মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় অপকর্ম্ম—গুরুকে অবতার সাজাইবার কণ্ডুয়ন—সেই অপচেষ্টার প্রতি অধিকাংশ গুরুই উদাসীন। তাহার ফলে দেশেদেশে গ্রামেগ্রামে পৌণ্ড্রক গজাইয়া উঠিতেছে;—গেরুয়া পরিয়া গণ্ডাকতক চেলা করিতে পারিলেই অবতার! এই অবতারজর্জ্জরিত দেশের পরিণতি কোথায়!

(২৮)

দেবর্ষি নারদের দ্বারকাদর্শন

উনসত্তর অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদের দ্বারকায় আগমন ও শ্রীকৃষ্ণ-বৈভব-দর্শন বর্ণনা করা হইয়াছে।

দেবর্ষি নারদ একদিন ভাবিলেন যে, এক শ্রীকৃষ্ণ যোলহাজারের অধিকসংখ্যক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতেছেন, ইহা বড়ই বিস্ময়জনক। কি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই অপূর্ব্ব লীলা সম্পাদন করিতেছেন তাহা দেখিবার জন্য দেবর্ষি কৌতূহলী হইয়া একদিন দ্বারকানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুষ্পিত উপবন ও উদ্যানসমূহে পরিশোভিত নয় লক্ষ প্রাসাদবিশিষ্ট

মনোহর দ্বারকাপুরী দর্শন করিয়া দেবর্ষি চমৎকৃত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে ষোড়শ সহস্রাধিক প্রাসাদ ষোড়শসহস্রাধিক মহিষীগণের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই বিশাল পরিধিমণ্ডিত রাজ অন্তঃপুরে অবারিতগতি দেবর্ষি নারদ প্রবেশ করিলেন। যে প্রাসাদটিতে নারদ প্রথমে প্রবেশ করিলেন সেখানে রুক্মিণীদেবী সহস্র দাসীর সহিত মিলিত হইয়া যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নারদকে দেখিতে পাইয়া তখন শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার কিরীটপরিশোভিত মস্তক ভূমিতে অবনত করিয়া দেবর্ষি নারদকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার নিজ শয্যার উপর তাঁহাকে উপবেশন করিতে বলিলেন। দেবর্ষি উপবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার চরণদ্বয় ধৌত করিয়া ঋষিপাদপ্রক্ষালিত জল নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আদর্শ গৃহস্থোচিত শিষ্টাচার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন দেবর্ষি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের "যোগমায়া বিবিৎসয়া"—যোগমায়া জানিবার ইচ্ছায় অন্য এক মহিষীর প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। বিস্মিত নারদ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মহিষী ও ভক্ত উদ্ধবের সহিত পাশক্রীড়া করিতেছেন। যেন পূর্ব্বে নারদের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই, এরূপভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্থান এবং আসন-প্রদানের দ্বারা পরমভক্তি সহকারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। দেবর্ষি অপর এক প্রাসাদে যাইয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ শিশুপুত্রগণের লালনপালন করিতেছেন। এইরূপে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদান্তরে যাইতে যাইতে দেবর্ষি দেখিতে পাইলেন যে, সেই একই কৃষ্ণ যোগমায়াপ্রভাবে বহু দেহ ধারণ করিয়া বিভিন্ন মহিষীগণের ভবনে কোথাও বা মধ্যাহ্নস্নানের উদ্‌যোগ করিতেছেন, কোথাও বা অগ্নিতে হোম করিতেছেন, কোথাও বা ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিতেছেন, কোথাও শ্রীকৃষ্ণ একাকী বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, কোথাও বহুলোকের সহিত বচসায় নিযুক্ত, কোথাও বা

সন্ধিস্থাপন করিতেছেন ; কোথাও বা তিনি পুত্রবধূগণকে পিতৃগৃহ হইতে আনিবার জন্য পুত্রগণকে প্রেরণ করিতে ব্যস্ত, কোথাও কন্যা-জামাতা-গণকে বিদায় দিতেছেন, কোথাও বা কূপখনন, দেবালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন। দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ যোগমায়া-বৈভব দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,

বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দ্দর্শা অপি যোগিনাম্,
যোগেশ্বরাত্মন্ নির্ভাতা ভবপাদ নিষেবয়া ॥ ১০।৬৯।৩৮

—হে যোগেশ্বর, আপনার যোগমায়া যোগিগণের দুর্জ্ঞেয়। তথাপি আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম সর্ব্বদা সেবা করি বলিয়া আপনার সেই যোগ-বিভূতি আমি জানিতে পারিয়াছি।

সত্তর অধ্যায়ে বন্দীরাজগণের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূতের আগমন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিতে আহ্বান বর্ণনা করা হইয়াছে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া নিত্যকৃত্য সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহার সুধর্ম্মা নাম্নী মহতী সভাকক্ষে প্রবেশ করিলেন। এমন সময়ে সভামণ্ডপের দ্বারদেশে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দূত আসিয়া উপস্থিত হইল, দ্বারপালগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া তাহাকে রাজসমীপে লইয়া আসিল। দূত নিবেদন করিল যে, মগধরাজ জরাসন্ধের দিগ্বিজয়কালে যে সকল রাজা তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন নাই সেই বিশ হাজার রাজাকে জরাসন্ধ গিরিব্রজনামক দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মগধরাজ এই সমস্ত রাজগণকে মহাভৈরবযজ্ঞে বলিদানের নিমিত্ত আয়োজন করিতেছিল। সেই সকল হতভাগ্য রাজগণ আজ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছে—"প্রপন্নাঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্"—রাজগণ আপনার শ্রীচরণে প্রণাম জানাইয়াছেন, আপনি সেই দীন

রাজগণের মঙ্গল বিধান করুন। শ্রীকৃষ্ণ তখনও কিছু উত্তর প্রদান করেন নাই, এমন সময়ে

রাজ্ঞদূতে ব্রুবত্যেবং দেবর্ষিঃ পরমদ্যুতি,
বিভ্রৎপিঙ্গজটাভারং প্রাদুরাসীৎ যথা রবিঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ,
ববন্দ উত্থিতঃ শীর্ষ্ণা সসভ্যঃ সানুগো মুদা ॥ ১০।৭০।৩২-৩৩

—পিঙ্গলবর্ণ জটাজুটধারী অত্যুজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট দেবর্ষি নারদ সূর্য্যের ন্যায় চারিদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। তখন সর্ব্ব লোকমহেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সভ্যগণের সহিত উত্থিত হইয়া আনন্দের সহিত অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দেবর্ষি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতেছেন, এবং সেই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে তথায় আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ উভয়সঙ্কটে পড়িলেন—বন্দীরাজগণের মুক্তিপ্রার্থী হইয়া দূত দাঁড়াইয়া আছে, আবার দেবর্ষি হস্তিনাপুরে যাইবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। কোন্ কার্য্য প্রথমে করণীয় তাহা যেন শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না! এইরূপ কর্ত্তব্যসঙ্কটে অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধবের শরণাপন্ন হইলেন।

ত্বং হি নঃ পরমং চক্ষুঃ সুহৃন্মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ,
তথাত্র ব্রূহ্যনুষ্ঠেয়ং শ্রদ্দধ্মঃ করবাম তৎ ॥ ১০।৭০।৪৬

—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে উদ্ধব, তুমি আমাদের বন্ধু, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণের চক্ষুস্বরূপ এবং মন্ত্রণাদাতা। অতএব, এই কর্ত্তব্যসঙ্কটে আমার কি করা উচিত তাহা তুমি বল। তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই শ্রদ্ধার সহিত পালন করিব।

কী অপূর্ব্ব বিনয়, কী অপূর্ব্ব ভক্তবৎসলতা! তখন উদ্ধব—"ভর্ত্রা সর্ব্বজ্ঞেনাপি মুগ্ধবৎ"—সর্ব্বজ্ঞানময় তাঁহার প্রভুর অজ্ঞজনোচিত এইরূপ

কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া উত্তর দিলেন।

উদ্ধব বলিলেন যে, পূর্ব্বে দিকসমূহ জয় করিয়া তবে রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে; কারণ, দিক্‌বিজয় রাজসূয়যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ। সুতরাং, পূর্ব্বে দিক্‌বিজয় উপলক্ষে জরাসন্ধকে বধকরিয়া তাহার পর রাজসূয়যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণঅবতারের প্রধান উদ্দেশ্য পরিত্রাণায় সাধূনাং—সাধুগণকে পরিত্রাণ করা, বন্দীরাজগ্রণ নিরপরাধ, সুতরাং তাহাদের উদ্ধারসাধন শ্রীকৃষ্ণের প্রধান কর্ত্তব্য; এই রাজগণকে উদ্ধার করিতে হইলে "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং"—দুষ্কর্ম্মকারী জরাসন্ধকে বধ করিতে হইবে, এবং তাহার পর "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়"—ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্য স্বয়ং যজ্ঞেশ্বররূপে রাজসূয়যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞের ফল গ্রহণ করিবেন। উদ্ধবের এই কথাগুলি সকলেই অনুমোদন করিলেন, এবং প্রথমতঃ ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া তথা হইতে জরাসন্ধবধের পরিকল্পনা স্থির হইয়া যাইল।

শ্রীকৃষ্ণ দূতকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—'মা ভৈষ্ট দূত! ভদ্রং বো ঘাতয়িষ্যামি মাগধম্'—হে দূত, ভয় করিও না, তোমাদের মঙ্গল হইবে, জরাসন্ধকে বধ করাইব। শ্রীকৃষ্ণ নিজ পত্নীগণকে উৎসব উপলক্ষে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন এবং নিজেও তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের আনন্দের সীমা নাই, স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর উপস্থিত,—রাজসূয় যজ্ঞ নিশ্চয়ই শুভভাবে নিষ্পন্ন হইবে।

গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ
পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমোদোপহতো নৃপঃ ॥ ১০।৭১।৩৯

—মহারাজ যুধিষ্ঠির অতি সমাদরে সর্ব্বদেবপূজিত শ্রীকৃষ্ণকে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া আনন্দে এতই অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, কৃষ্ণ-পূজার বিধান সমস্তই ভুলিয়া যাইলেন।

ইহাই তো স্বাভাবিক! যতক্ষণ ঈশ্বর সম্মুখে নাই, ততক্ষণ পূজা, আসন, মন্ত্রবিধি—যখন তিনি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তখন পরিপূর্ণ তাঁহার সম্মুখে সব ভুল হইয়া যায়,—তখন মন্ত্র নাই, বিধি নাই, আবাহন নাই—তখন ভক্তের দেহ, মন ও প্রাণ একখানি প্রদীপ হইয়া ভগবানের মুখের সম্মুখে জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

উপরের শ্লোকটিতে ধর্ম্ম সাধনের যে গভীর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে পরিলক্ষণীয়। ফলমূল, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, বাতাসা পূজার প্রয়োজনীয় উপকরণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; দেবতার পূজায় মন্ত্রপাঠ তো অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু এ সমস্তই পূজার বহিরঙ্গ, দেবতার সহিত প্রাণের সংযোগস্থাপনই শ্রেষ্ঠ পূজা এবং ইহাতেই সর্ব্ববিধ পূজা আরাধনার শেষ পরিণতি। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতেছেন, —সে এক বিরাট ব্যাপার। মহারাজের মন সর্ব্বদাই সচেতন, এত বড় একটি যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে হইবে। তথাপি যাই যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া যুধিষ্ঠিরের সব ভুল হইয়া যাইল,—তখন কোথায় বা ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন, কোথায় বা রাজমহিষী দ্রৌপদী, কোথায় ইন্দ্রতুল্য মহাবীর ভ্রাতাগণ, কোথায় বা রাজসূয় যজ্ঞ, হুতাগ্নি, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিকগণ। সব ভুল হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড মনের ভিতর যুধিষ্ঠিরের খণ্ড মনটি হারাইয়া যাইতেছে। মন্ত্র কে উচ্চারণ করিবে! মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখন যুধিষ্ঠিরের মনের অবস্থা—

হয়ত তখন কণ্ঠহারা
মুখের পানে রব চেয়ে॥

দেখা গিয়াছে ভক্ত তারকেশ্বরে পূজা দিতে গিয়াছেন, পুরোহিত তাঁহাকে বিশ্বনাথের নিকট লইয়া বসিয়াছেন। চারিদিকে বিভিন্ন বিভিন্ন পুরোহিতের সহিত বিভিন্ন বিভিন্ন ভক্তের ক্ষুদ্র দলগুলি

তারকেশ্বরকে ঘিরিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, বিল্বপত্র ও আকন্দের ফুল প্রভুর মাথার উপর ঢালিয়া দিতেছেন। চারিদিকে মন্ত্রমুখরিত কোলাহলে মন্ত্র সকলে সুস্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন না, একটা ভাঙ্গাভাঙ্গা অপরিশুদ্ধ মন্ত্রের দ্বারাই ভগবানের পূজা করিতেছেন। কিন্তু দেখা যাইল একজন ভক্ত শিবলিঙ্গের নিকট বসিয়া আছেন, অবিরলধারায় তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুনির্গত হইতেছে, তাঁহার হাতের ফুলবিল্বপত্র হাতেই থাকিয়া গিয়াছে, মুখ হইতে কোন মন্ত্রধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে না। এই ভক্তের অবস্থা ঠিক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরূপ। গভীর অনুভূতির ভাষা নাই, মন্ত্র নাই, পূজা নাই; যখন অনুভূতি অগভীর তখন ফলমূল, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র সবই মনে পড়িতেছে, কোনটির পর কোনটি দেবতার চরণে দিতে হইবে তাহাতে লেশমাত্রও ভুল হইতেছে না। এমন ভক্তের পূজা সম্বন্ধে ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে
হয়নি আমার পাওয়া॥

তাঁহাকে পাইলে তো "পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমাদোপহতো নৃপঃ॥" —মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দে এতই অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, কৃষ্ণ-পূজার বিধান সমস্তই ভুলিয়া যাইলেন—সকলেরই এইরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

জরাসন্ধ বধ

রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন চলিতে লাগিল, যুধিষ্ঠিরের চারিজন ভ্রাতা চারিদিকে দিগ্ বিজয় করিতে বাহির হইলেন। সবই হইল, কিন্তু জরাসন্ধ-বধ তখনও বাকী রহিয়াছে। উদ্ধবের পরিকল্পনা অনুসারে একদিন ভীমসেন, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে ইঁহারা তিনজন জরাসন্ধের নিকট যাইয়া অতিথি-সেবা প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিশীল জরাসন্ধ ব্রাহ্মণ-সেবা করিতে প্রস্তুত হইয়া অতিথিগণের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের সকলেরই মণিবন্ধস্থান ধনুকের জ্যা-চিহ্নিত, তাঁহাদের কণ্ঠস্বর ও আকৃতিও ব্রাহ্মণের মত নহে, এবং পূর্ব্বে ইঁহাদিগকে কোথাও যেন দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল, সুতরাং ছদ্মবেশধারী ক্ষত্রিয়গণকে চিনিতে পারিয়া জরাসন্ধ মনে মনে ভাবিল :

রাজন্যবন্ধবো হ্যেতে ব্রহ্মলিঙ্গানি বিভ্রতি
দদামি ভিক্ষিতং তেভ্য আত্মানমপি দুস্ত্যজম্ ॥ ১০।৭২।২৩

—ইঁহারা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়াধম অথচ ব্রাহ্মণবেশধারী। যাহা হউক, ব্রাহ্মণের চিহ্নও আমার পূজনীয় ; সুতরাং যদি ইঁহারা প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে অতি প্রিয় দেহও আমি ইঁহাদিগকে সমর্পণ করিব।

জরাসন্ধ ব্রাহ্মণলিঙ্গী ক্ষত্রিয়গণকে অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করিতে বলিল, সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ তখন জরাসন্ধের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা ক্ষত্রিয়, দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থী হইয়া জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

অসৌ বৃকোদরঃ পার্থস্তস্য ভ্রাতার্জ্জুনো হ্যয়ম্
অনয়োঃ মাতুলেয়ং মাং কৃষ্ণং জানীহি তে রিপুম্ ॥১০।৭২।২৭

—ইনি কুন্তীনন্দন ভীমসেন, ইনি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জ্জুন, আর আমাকে ইহাদের মাতুলপুত্র ও তোমার শত্রু কৃষ্ণ বলিয়া জানিবে।

এই কথা শুনিয়া মগধরাজ জরাসন্ধ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এই স্থলে রাজা জরাসন্ধের চরিত্র বিশেষ পরিলক্ষণীয়। সে বুদ্ধিমান, ছদ্মবেশধারী ক্ষত্রিয়গণকে চিনিতে পারিয়াছে, শত্রু বলিয়াও সন্দেহ হইতেছে। অথচ ব্রাহ্মণের চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের কোন ক্ষতি সাধন করিতেছেন না, বরং তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণ করিবার জন্য প্রস্তুত। এইরূপ অসাধারণ ব্রাহ্মণ-ভক্তির উদাহরণ সমগ্র শ্রীভাগবতে বিরল। জরাসন্ধের চরিত্রের আর একটি বিশিষ্টতা প্রশংসনীয়। সে যখন স্পষ্টভাবেই শুনিল যে, তাহার চিরশত্রু শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে উপস্থিত, তখন সেই সহায়সম্বলবিহীন ছদ্মবেশী শত্রুকে সে তাহার প্রাসাদমধ্যে পাইয়াও সৈন্য-সামন্তের দ্বারা অভিভূত এবং অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল না। কারণ ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহাদের দেহে ব্রাহ্মণের চিহ্ন, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত। দ্বন্দ্বযুদ্ধ কয়েকদিন ধরিয়াই চলিয়াছিল, এবং ভীম ও জরাসন্ধ উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। সুতরাং তখন জরাসন্ধ হতাশ হইয়া শত্রুগণকে গভীর রাত্রিতে হত্যা করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু সে চেষ্টাও সে করে নাই। প্রতি রাত্রিতে অথিতির প্রতি সে মিত্রের মত ব্যবহার করিত, অতিথির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহাদের আহার শয্যা বাসগৃহ প্রতিদিনই ব্যবস্থা করিয়া দিত। এইরূপ সত্যসন্ধী, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিমান্, ধর্ম্মভীরু জরাসন্ধ সহজেই আমাদের মনে বিস্ময় ও সহানুভূতির উদ্রেক করে।

মগধরাজ জরাসন্ধ বলিল, শ্রীকৃষ্ণ ভীরু; কারণ, তাহার ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণ তাহার উপযুক্ত দ্বন্দ্বযোদ্ধা নহেন। অর্জ্জুন বয়ঃকনিষ্ঠ সুতরাং সে

জরাসন্ধের কৃপার পাত্র। একমাত্র ভীমসেনই তাহার তুল্য বলশালী, সুতরাং জরাসন্ধ ভীমসেনকে একটি সুদৃঢ় ও সুগঠিত গদা প্রদান করিয়া সমতলক্ষেত্রে যাইয়া তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিল। গদা দুইটি ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইল, তখন মুষ্টিদ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। উভয়েই তুল্য বলশালী, সুতরাং যুদ্ধের মীমাংসা কিছুই হইল না। এইরূপে সাতাশ দিন কাটিয়া যাইল, প্রতিদিন দিবাভাগে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীমসেন জরাসন্ধের প্রাসাদে অতিথির সমাদর প্রাপ্ত হইয়া মিত্রের ন্যায় রাত্রি যাপন করেন। অবশেষে একদিন ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণকে নির্জ্জনে বলিলেন—'ন শক্তোঽহং জরাসন্ধং নির্জ্জেতুং যুধি মাধব!'—হে মাধব, আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে জরাসন্ধের সহিত পারিয়া উঠিতেছি না। ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণের তখন জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত মনে পড়িল, তিনি তাহার মৃত্যুর উপায় ভীমসেনকে বলিয়া দিলেন।

জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ অপুত্রক বলিয়া বনে গমন করেন। তথায় চণ্ডকৌশিক নামক এক ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঋষি তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহাকে একটি আম্রফল প্রদান করেন—সেই আম্র-ফলটি খাইলেই মহিষীর পুত্রসন্তান হইবে। পত্নীবৎসল রাজা বৃহদ্রথ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই আমটি দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুই পত্নীকে সমান ভাগে খাইতে দেন এবং তাহার ফলে দুইজন রাজ্ঞী গর্ভবতী হইয়া প্রত্যেকে অর্দ্ধখণ্ড শিশুদেহ প্রসব করেন। বৃহদ্রথ দুঃখিত হইয়া ঐ শিশুখণ্ড দুইটিকে শ্মশানে পরিত্যাগ করেন। তখন জরা নাম্নী এক রাক্ষসী কৌতূহলক্রমে সেই খণ্ড দুইটিকে যোজনা করিবামাত্র একটি পূর্ণাঙ্গ বালক সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। জরা তখন শিশুটিকে রাজা বৃহদ্রথের নিকট প্রদান করিয়া বলিয়া দেয় যে, পুনরায় দুইখণ্ডে বিভক্ত না হইলে এই বালকের মৃত্যু হইবে না। জরারাক্ষসীকর্ত্তৃক সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত বলিয়া বালক জরাসন্ধ নামে পরিচিত হইল।

পরদিন যুদ্ধে ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণসঙ্কেত গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধকে দুইখণ্ডে বিদারিত করিয়া ফেলিলেন, চতুর্দ্দিকে প্রজাগণের মধ্যে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল।

জরাসন্ধ নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বন্দী কুড়িহাজার আটশত রাজাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সম্মুখে ঘনশ্যাম, পীতকৌষেয়বসন পরমপুরুষ শ্রীহরি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিলেন এবং অবশেষে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে,
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥১০।৭৩।১৬

—প্রণতগণের ক্লেশনাশক, বাসুদেব, শ্রীহরি, পরমাত্মা, গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা বারংবার প্রণাম করি।

অতঃপর রাজগণ নিজ নিজ দেশে চলিয়া যাইলে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীমসেন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট সমস্ত যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

(৩০)

শিশুপাল বধ

ছয়াত্তর অধ্যায়ে রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন ও শিশুপালবধ বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাজসূয়যজ্ঞ আরম্ভ হইল, মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন বেদবাদী ব্রাহ্মণগণকে ঋত্বিকপদে বরণ করিলেন, বহু ঋষি ও মুনি আসিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য আসিলেন, পুত্রগণের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র আসিলেন, মহামতি বিদুর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ আসিলেন, বহু রাজা ও তাঁহাদের প্রজাগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া রাজসূয়যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। তখন উপস্থিত ঋষি, মুনি, ব্রাহ্মণ ও রাজগণের মধ্যে কে অগ্রে অর্ঘ্য পাইবার উপযুক্ত সেই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। মাদ্রীপুত্র সহদেব বলিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অগ্রপূজা পাইবার যোগ্য; সকলেই 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া সহদেবের কথা সমর্থন করিলেন। তখন দমঘোষনন্দন শিশুপাল স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইল এবং অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া সভামধ্যে বাহু উত্তোলন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তীব্র নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপালক, সুতরাং ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিগণকে অতিক্রম করিয়া যজ্ঞস্থলীতে অগ্রপূজা পাইবার অধিকারী নহেন। শ্রীকৃষ্ণ নিন্দা শ্রবণ করিলেন কিন্তু "নোবাচ কিঞ্চিৎ ভগবান্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্"—শৃগালের চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া যেমন সিংহ তাহার প্রতিনিনাদ করে না, সেইরূপ শিশুপালের নিন্দাসূচক বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটি কথারও প্রতিবাদ করিলেন না, নীরব হইয়া সভাস্থলীতে বসিয়া রহিলেন। এদিকে সভাসদ্‌গণ দুঃসহ ভগবৎ-নিন্দা শ্রবণ করিয়া চেদিরাজকে তিরস্কার করিতে করিতে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক সভাকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীশুকদেব বলিলেন,

> নিন্দাং ভগবতঃ শৃন্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা
> ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥ ১০।৭৪।৪০

—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যে ব্যক্তি ভগবানের কিংবা ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির নিন্দা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে চলিয়া না যায় সেই ব্যক্তি পুণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে।

বীরগণ শিশুপালকে বধ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সকলকে নিবারণ করিয়া একাকী সুদর্শনচক্রের দ্বারা শিশুপালের মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন এক অপূর্ব্ব ঘটনা সকলের দৃষ্টিগোচর হইল।

চৈদ্যদেহোত্থিতং জ্যোতির্বাসুদেবমুপাবিশৎ
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানামুল্কেব ভুবি খাচ্চ্যুতা ॥১০।৭৪।৪৫

—আকাশ হইতে বিচ্যুত উল্কা যেমন পৃথিবীতে প্রবেশ করে, সেইরূপ চেদিরাজ শিশুপালের দেহ হইতে সমুত্থিত এক অপূর্ব্ব জ্যোতি সর্ব্বলোকের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দেহের ভিতর মিশাইয়া যাইল।

মহারাজ পরীক্ষিৎ বিস্মিত হইলেন,—প্রবল শত্রু শিশুপাল সারূপ্য মুক্তির অধিকারী কিরূপে হইল! শ্রীশুকদেব বলিলেন,

জন্মত্রয়ানুগুনিত বৈরসংরব্ধয়া ধিয়া,
ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্॥ ১০।৭৪।৪৬

—হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও শিশুপাল এই তিনজন্মে পুঞ্জীভূত যে বৈরভাব, তাহার ফলে শিশুপালের সমগ্র মন ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুর পর ভগবানের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইল। সতত ধ্যানই ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপতা-প্রাপ্তির একমাত্র কারণ।

অতঃপর নির্ব্বিঘ্নে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদিত হইল। এই বিরাট্ যজ্ঞে ভীমসেন পাকশালার ভার গ্রহণ করিলেন, দুর্য্যোধন কোষাধ্যক্ষ হইলেন, সহদেব জনগণের অভ্যর্থনা, নকুল দ্রব্যসংগ্রহ, অর্জ্জুন সজ্জনগণের চন্দনলেপনাদি সেবা, দ্রৌপদী পরিবেশন, কর্ণ যথাযোগ্য দান, এবং শ্রীকৃষ্ণ অতিথিগণের পাদ-প্রক্ষালন কার্য্য করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণ সমগ্র মুনিঋষি সাধুব্রাহ্মণ, রাজা মহারাজাকে অতিক্রম করিয়া যজ্ঞের অগ্রপূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণই আবার তাঁহার কিরীট-পরিশোভিত মস্তক ধূলিতে অবনত করিয়া সকলের পাদ ধৌত করিয়া দিলেন। প্রভু আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়। শিশুপাল তাঁহাকে কি করিয়া চিনিবে! 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ'—আমি যোগমায়ায় সমাবৃত বলিয়া সকলে আমাকে চিনিতে পারে না।

বন্ধুগণের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে কয়েকমাস অবস্থান করিয়া অবশেষে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিতে করিতে মহারাজ পরীক্ষিতের কৌতূহল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। তিনি শুকদেবের নিকট বলিলেন,—'বীর্য্যাণ্যনন্তবীর্য্যস্য শ্রোতুমিচ্ছামহে প্রভো',—প্রভো, অনন্ত বীর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণের আরও বীর্য্যকাহিনী শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। কারণ,

> সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ
> স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥
> শিরশ্চ তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ
> অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥
>
> ১০।৮০।৩-৪

—যে বাক্যের দ্বারা সেই পবিত্রকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ কীর্ত্তন করা হয় তাহাই প্রকৃত বাক্য; যে হস্ত তাঁহার অর্চ্চনাদি কর্ম্ম করে তাহাই প্রকৃত হস্ত; যে মন তাঁহাকে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বপদার্থে অবস্থিত বলিয়া স্মরণ করে তাহাই প্রকৃত মন; যে কর্ণ তাঁহার পবিত্র লীলাকথা শ্রবণ করে তাহাই প্রকৃত কর্ণ; যে মস্তক তাঁহার বিষ্ণুমূর্ত্তিকে ও বৈষ্ণবমূর্ত্তিকে প্রণাম করে তাহাই প্রকৃত মস্তক; যে চক্ষু তাঁহার ঐ উভয় মূর্ত্তিকে দর্শন করে তাহাই প্রকৃত চক্ষু; আর যে সকল অঙ্গ সেই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের পাদোদক নিত্য ধারণ করে, সেই সকলই প্রকৃত অঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীদাম সংবাদ

রাজা পরীক্ষিতের এইরূপ কৌতূহল ও কৃষ্ণভক্তি দর্শন করিয়া আশি অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব শ্রীদামনামক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন।

শ্রীদাম নামে জনৈক ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যেরদ্বারা জীবনধারণকরতঃ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিতেন। সর্ব্বদাই অন্নবস্ত্রের অনটন;—পতিব্রতা তাঁহার স্ত্রী জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করিতেন। ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইল যে আর যেন চলে না। একদিন ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ-পত্নী স্বামীর নিকট যাইয়া বলিলেন যে তিনি শুনিয়াছেন দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সখা,—বাল্যকালে একসময়ে তাঁহারা উভয়েই সান্দীপনি মুনির আশ্রমে থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। এখন তো শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার অতুল ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছেন, তিনি হয়ত ব্রাহ্মণের এই দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারিলে বাল্যকালের মিত্রতা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়সমূহ প্রদান করিবেন। অতএব শ্রীদামের একবার দ্বারকায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত।

শ্রীদাম কিন্তু খাঁটি ব্রাহ্মণ, তিনি বিষয়বস্তুতে বিগতস্পৃহ, বিশেষতঃ বন্ধুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর, আবার প্রত্যাখ্যানেরও ভয় আছে! যদি প্রার্থনা করিয়াও কিছু না পান তখন সেই প্রত্যাখ্যান তাঁহার নিকট মৃত্যুতুল্য হইবে। তাই পত্নীর উপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রথমে নীরব হইয়া রহিলেন, আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলেন কিন্তু ক্ষুধিতা ও পরিক্লিষ্টা সহধর্ম্মিণী বারংবার একই কথা বলিতে থাকিলে ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,—সখার নিকট কিছু চাহি

বা নাই চাহি, চাহিয়া পাই বা নাই পাই তথাপি—"অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমঃ শ্লোকদর্শনম্"—দ্বারকা যাইলে অন্ততঃ একবার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ঘটিবে—এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনই পরম লাভ। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ সুতরাং সুকৃতিবশে জীবনের সারকথা তিনি বুঝিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণদর্শনেই শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ফলপ্রাপ্তি—শ্রীকৃষ্ণদর্শনই উপায়, শ্রীকৃষ্ণদর্শনই উদ্দেশ্য। অর্থ, যশঃ, পদগৌরবপ্রাপ্তি তো শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ফল নহে;—ইহারা তো গৌণ, যে চাহে সে পাইতে পারে, যে চাহে না সে-ও পাইতে পারে, আবার চাহিয়াও হয়তো না পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেনাপাওনার সম্বন্ধ স্থাপন করিলে ভুল হইবে,—শ্রীকৃষ্ণদর্শনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ শ্রীদাম সখা কৃষ্ণকে দর্শন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু বহুদিনের পর দেখা, শ্রীকৃষ্ণের জন্য কিছু উপহার লইয়া যাইতে পারিলে ভাল। তখন দরিদ্রা ব্রাহ্মণী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের জন্য ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন। সেই দরিদ্র পল্লীতে সহজেই কি ভিক্ষা পাওয়া যায়! বহু গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের বাড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে চারমুষ্টি চিঁড়া পাওয়া যাইল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, ভালই হইল—গোয়ালার ছেলে আজ রাজা হইয়াছে; তথাপি চিরকাল গোপ-পিতার বাড়িতে খাওয়া চিঁড়া ও দুগ্ধের আস্বাদ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই ভুলিতে পারেন নাই। উপরন্তু চিঁড়া দেখিলে দ্বারকায় অধুনা-বিস্মৃত ব্রজধামের বাল্যলীলা তাঁহার মনে পড়িবে,—সেই সকালে ক্ষীর সর ননী খাইয়া সখাগণের সহিত গোচারণে গমন, সেই বনভূমিতে বৃক্ষতলে বসিয়া সহস্র সখামণ্ডলে পরিবৃত হইয়া মাতা যশোদাপ্রদত্ত চিঁড়া ও দধি ভক্ষণ, সেই সন্ধ্যাবেলা ধূলিধূসরিত দেহে নন্দগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন,—সবই চিঁড়া দেখিয়া মনে পড়িয়া যাইবে। আরও মনে পড়িবে সেই রাস-মহোৎসব, সেই গোপীগণের প্রেম, সেই ব্রজধাম হইতে চিরবিদায়ের দিনে গোপীগণের অশ্রু ও

বিরহ। চিঁড়া যে ব্রজলীলার প্রতীকস্বরূপ—চিঁড়া যে ব্রজজীবনের সঙ্গে, গোপ-জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াইয়া আছে! তাই ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, চিঁড়াই গোপপুত্র দ্বারকারাজের উপযুক্ত উপহার—হয়ত রাজভোজ্য জিনিষে পরিতৃপ্তির পর শ্রীকৃষ্ণের অবচেতন মন চিঁড়ার সহিত ব্রজলীলা নূতন করিয়া আস্বাদনের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। চিঁড়াই ভাল, আর যদি ভাল না-ই হয়, দরিদ্র কৃষ্ণসখা মহারাজ কৃষ্ণের জন্য, হীরামণিমাণিক্যের উপহার কোথায় পাইবেন! ব্রাহ্মণ একখানি জীর্ণ ন্যাকড়ায় সেই চারমুষ্টি চিঁড়া বাঁধিয়া লইয়া দ্বারকা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বারকা;—লক্ষ লক্ষ প্রাসাদে পরিশোভিত দ্বারকা, শ্রীবিরাজিত, মহামহিমামণ্ডিত দ্বারকা! এমন ঐশ্বর্য্য তো দরিদ্র শ্রীদাম কখনও দেখেন নাই! এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তো হারাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি? ভয়ে ভয়ে শ্রীদাম অগ্রসর হইতেছেন—একবার আশা, একবার ভয়, একবার অনুশোচনা! খুঁজিতে খুঁজিতে রাজপ্রাসাদ পরিদৃষ্ট হইল,—তিনটি সৈন্যব্যূহ অতিক্রম করিয়া অবশেষে ষোড়শ সহস্রাধিক প্রাসাদ-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর পাওয়া যাইল। ব্রাহ্মণ এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে বিস্মিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন,—এ যেন গ্রামবাসী কৃষকের প্রথম কলিকাতা দর্শন! সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বচক্ষু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই শ্রীদামকে লক্ষ্য করিয়াছেন; তিনি রুক্মিণী দেবীর শয্যা হইতে—"সহসোত্থায় চাভ্যেত্য দোর্ভ্যাং পর্য্যগ্রহীন্মুদা"—সহসা উত্থিত হইয়া, ব্রাহ্মণ-সখার নিকটে আসিয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে বাহুযুগল দিয়া আলিঙ্গন করিলেন। মহারাজার সহিত ভিখারীর আলিঙ্গন, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন, সর্ব্বোপরি বাল্যকালের স্মৃতিবিজড়িত দুইটি মনের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ—যে বাল্যকালের লীলাতে ঐশ্বর্য্যবোধ থাকে না,

যেখানে কাহার বাবা ধনী, কাহার বাবা দরিদ্র সে সন্ধান নাই, যে ক্রীড়াভূমিতে রাজপুত্র ও প্রজার পুত্র, প্রভু ও ভৃত্যের পুত্র এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে,—কোনও পার্থক্যবোধ, আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনও সচেতনতাই তাহার মধ্যে নাই!

উভয়ে উভয়কে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইয়া ব্রাহ্মণসখার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে! এইবার যেন শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য হইল, রাজা তখন ব্রাহ্মণকে শয্যার উপর বসাইয়া তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং সেই পাদধৌতজল নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন, তাহার পর দিব্য গন্ধ, চন্দন ও অগুরু দিয়া সখার অঙ্গসমূহ লেপন করিয়া দিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ব্রাহ্মণের দেহ মলিন ও কৃশ, পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র; রস ও পুষ্টির অভাবে সর্ব্বশরীরে স্থূল শিরাসমূহ দেখা যাইতেছে। সেই দেহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজ হস্তে চন্দনচর্চ্চিত করিয়া দিয়াছেন, মহারাণী রুক্মিণী সেই জীর্ণ ও মলিন দেহকে চামর দিয়া বাতাস করিতেছেন!

দুই সখার পূর্ব্বস্মৃতিপূর্ণ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। দুইজনের গুরুগৃহবাসকালে একটি ঘটনা শ্রীকৃষ্ণের মনে পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে ঘটনাটি মনে পড়াইয়া দিয়া তাহার বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন তাঁহারা গুরুপত্নীর আদেশে কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য এক সুবৃহৎ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন অকালে অতিশয় তীব্র ঝড়বৃষ্টি ও ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, মেঘ-ঝড়ে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে, প্রবল বর্ষণে নিম্নস্থান ও উচ্চস্থান ডুবিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে শুধু জমাটবাঁধা অন্ধকার,—কাছের মানুষকেও দেখা যাইতেছে না। তখন দিক্-নির্ণয় করিতে না পারিয়া দুইসখা—নন্দরাজপুত্র ও ব্রাহ্মণপুত্র—পরস্পর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মাথায় কিন্তু গুরুর কাষ্ঠভার ঠিক আছে—

এত বিপদের মধ্যেও জীবনের কর্ণধারস্বরূপ গুরু সান্দীপনির সেবার কথা ভুলেন নাই। ওদিকে গুরু শিষ্যদ্বয়ের জন্য চিন্তাকুলিত হইয়া পড়িয়াছেন—শিষ্যেরা এই দুর্য্যোগে কোথায় পথ হারাইয়াছে! গুরু শিষ্যদ্বয়কে খুঁজিতে খুঁজিতে বনমধ্যে আসিয়া শিষ্যদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। সান্দীপনি অন্য লোক পাঠান নাই, সেই রাত্রিতে স্বয়ং শিষ্যগণকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন! গুরুভক্তি ও শিষ্যপ্রীতি সম-অনুপাতেই হ্রাসবৃদ্ধি হয়—একটিকে বাদ দিয়া আর একটার অনুশীলন হইতে পারে না। শিষ্যগণের এইরূপ গুরুভক্তি ও আত্মসমর্পণ দর্শন করিয়া গুরু বলিলেন,—"তুষ্টোঽহং বো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ, সত্যাঃ সন্তু মনোরথাঃ।" —হে শিষ্যগণ, আমি প্রীত হইয়াছি, তোমাদিগের মনোরথ সিদ্ধ হউক। এইরূপে পূর্ব্বস্মৃতি অনুশীলন করিতে করিতে উভয় সখা পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, সময় কোন্ দিক্ দিয়া কাটিয়া যাইল তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণ শ্রীদাম কিছুই বলিতেছেন না, সবই শুনিতেছেন, মাথা নাড়িয়া সায় দিতেছেন, অন্য চিন্তাও এক একবার আসিয়া তাঁহার মনে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, সামান্য চারমুঠা চিঁড়া আনিয়া তিনি কি বিপদেই পড়িয়াছেন! এতবড় রাজা, এতবড় রাজপ্রাসাদ—এই রাজাধিরাজের জন্য ছিন্ন বস্ত্রে বাঁধা চারমুষ্টি চিপিটক! ব্রাহ্মণ যেন ইহা ভাবিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছেন! দীনদয়াল সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাহা জানিতে পারিয়াছেন। এইবার ব্রাহ্মণকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন,—"কিমুপায়নমানীতং ব্রহ্মন্, মে ভবতা গৃহাৎ"—হে ব্রহ্মন্, তুমি সখার জন্য বাড়ি হইতে কি উপহার আনিয়াছ? ব্রাহ্মণ সঙ্কুচিত হইয়া চিঁড়ার পুঁটুলিটি ভাল করিয়া কাপড়ের তলায় লুকাইলেন। ভক্তগণের পরম অভয়স্বরূপ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন,

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি,
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ১০।৮১।৪

—হে ভক্ত, ভয় কি! আমাকে কিছু দিতে তোমার সঙ্কোচ কেন? আমাকে রাজাধিরাজ মনে করিয়া ভয় পাইও না। ভক্ত যদি আমাকে ভক্তি করিয়া পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রদান করে সেই তুচ্ছ জিনিষও আমি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। জিনিষ নিজে বড় নয়—ভক্তিই আমার কাছে বড় জিনিষ। এই শ্লোকটি নবম অধ্যায় গীতা হইতে উদ্ধৃত।

তথাপি ব্রাহ্মণের সাহস হয় না, কি করিয়া তিনি সামান্য চিপিটক রাজাধিরাজকে প্রদান করিবেন! তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের মনের ভাব অবগত হইয়া—"স্বয়ং জহার কিমিদমিতি পৃথুকতণ্ডুলান্"—তোমার কাপড়ের নীচে লুকান "এইটি কি" "এইটি কি" বলিতে বলিতে স্বয়ং কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের বস্ত্রখণ্ডবদ্ধ চিপিটকগুলি টানাটানি করিয়া বাহির করিলেন এবং সেই মলিন বস্ত্রখণ্ড হইতে চিঁড়া খুলিয়া তৎক্ষণাৎ একমুষ্টি মুখে ফেলিয়া দিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে চিবাইতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় মুষ্টি আবার মুখে তুলিয়াছেন এমন সময়ে মহারাণী রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে নিবারিত করিলেন। রুক্মিণী স্বামীকে বলিলেন যে, ভগবান পরমপুরুষ এক মুষ্টি চিপিটক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই ব্রাহ্মণকে ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট,—আর দ্বিতীয়মুষ্টি খাইবার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া রুক্মিণী নিজেই অবশিষ্ট চিপিটকগুলি গ্রহণ করিলেন—সে চিঁড়াতো ভগবানের সর্ব্বকল্যাণকর প্রসাদ, হয়তো সেই ব্রাহ্মণের সখ্যরস ও ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত চিঁড়ার একটি খণ্ড গ্রহণ করিয়াও মহারাণীগণ পুত্রকন্যাগণের সহিত কৃতার্থা হইয়া যাইবেন, সমগ্র পুরীর পরমকল্যাণ সাধিত হইবে।

ব্রাহ্মণ শ্রীদাম রাজপ্রাসাদে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে নিজ গৃহে গমন করিবার উপক্রম করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কতকপথ অগ্রসর হইয়া অবশেষে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সবই তো হইল, শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইল, সখার সহিত পুরাতন স্মৃতিকথার আদান প্রদান হইল, রাজপ্রাসাদে বহু সমাদর প্রাপ্তি ঘটিল, রাজ-সমারোহে ভোজন সম্পাদিত হইল, সুখনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত হইল, শ্রীকৃষ্ণকে চিপিটক দেওয়া এবং খাওয়ানও হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণের দ্বারকাযাত্রা সফল হইল কি? কই, ঐশ্বর্য্য তো কিছুই পাওয়া যাইল না,—ব্রাহ্মণ লজ্জায় সখার নিকট কিছুই চাহিতে পারিলেন না,—যে দরিদ্র সেই দরিদ্র থাকিয়াই পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। মনে নানাবিধ চিন্তার উদয় হইতেছে। ব্রাহ্মণী তো পথ চাহিয়া কত আশা করিয়া বসিয়া আছেন—সেই কথা ভাবিয়া ব্রাহ্মণের যেন লজ্জা করিতে লাগিল। আবার মনের মোড় ঘুরিয়া যাইতেছে!—যে-বক্ষ স্বয়ং লক্ষ্মী-দেবীকে আলিঙ্গন দেয় সেই বক্ষ ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিয়াছে, মহারাজা-ধিরাজ নিজ বাহুযুগলের দ্বারা দরিদ্র সখাকে প্রীতিভরে আকর্ষণ করি-য়াছেন, মহারাণী রুক্মিণীদেবী নিজহস্তে তাঁহাকে চামরব্যজন করিয়াছেন, রাত্রিতে শয়ন করিবার পূর্ব্বে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার পদসেবা করিয়াছেন! এ কি কম সৌভাগ্য—নাই বা টাকাকড়ি পাওয়া যাইল! ব্রাহ্মণের তখন মনে হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ হয়ত অনেক চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণের কল্যাণের জন্য তাঁহাকে অর্থসম্পদ প্রদান করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছেন,

> অধনোঽয়ং ধনংপ্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ,
> ইতি কারুণিকোনূনং ধনং মেঽভূরি নাদদৎ॥ ১০।৮১।২০

—এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধন পাইয়া মদমত্ত হইয়া আর আমাকে স্মরণ করিবে না—ঐশ্বর্য্য তাহার চরম অধঃপতনের কারণ হইবে;—ইহা

বিবেচনা করিয়াই পরমদয়াল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অল্প ধনও প্রদান করিলেন না। অল্পধন পাইলেও দরিদ্র্যের মাতাল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

এই সকল নানাবিধ চিন্তা ব্রাহ্মণের মনে আনাগোনা করিতেছে, এমন সময় শ্রীদাম আসিয়া নিজ কুটীরের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এ কী! কোথায় সেই কুটীর।—সেই স্থান তো তিনি ভাল করিয়াই চিনিতে পারিতেছেন অথচ তাঁহার চিরপরিচিত কুটীরের পরিবর্তে তথায় এক সুবৃহৎ প্রাসাদ, চতুর্দ্দিকে পদ্মপরিশোভিত সরোবর সমূহ, অসংখ্য দাসদাসী ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। বিস্মিত ব্রাহ্মণ ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছেন না, এমন সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বহুমূল্য অলঙ্কারে পরিশোভিতা হইয়া নিকটে আসিয়া ব্রাহ্মণ স্বামীকে পরমসমাদরে গ্রহণ করিলেন। তখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে আজ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর এমন ঐশ্বর্য্যের অভ্যুদয়!

ব্রাহ্মণ তখন নিরাসক্তহৃদয়ে বহুদিন সুখসম্পদ্ উপভোগ করিয়া অবশেষে পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন।

(৩২)

শ্রীহরির মহত্ত্ব বর্ণন

অতঃপর শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, একসময়ে ঋষিগণ যজ্ঞ করিবার জন্য সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন জন দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয় অধিকার করিয়া তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইল। কিছুই মীমাংসা হইল না। তখন সকলে মিলিয়া ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুমুনিকে এই বিষয় স্থির করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। ভৃগু তাহা নিশ্চয়রূপে জানিবার জন্য প্রথমেই

ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন। ভৃগুমুনি সেই সভায় উপস্থিত হইয়া সকলের সমক্ষে যেন অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য ব্রহ্মাকে প্রণাম অথবা স্তব কিছুই করিলেন না। তখন—"তস্মৈ চুক্রোধ ভগবান্ প্রজ্বলন্ স্বেন তেজসা"—ভগবান ব্রহ্মা স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া ভৃগুর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহার পর ভৃগুমুনি কৈলাসে গমন করিলেন। তখন দেব-দেব মহেশ্বর তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দে উত্থিত হইলেন এবং আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিলেন। কিন্তু ভৃগুমুনি মহাদেবকে উৎপথগামী বলিয়া নিন্দা করিলেন এবং তাঁহার আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করিলেন। মহাদেব অপ্রত্যাশিত অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া শূল উত্তোলন পূর্ব্বক ভৃগুমুনিকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর ভৃগুমুনি তথা হইতে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। তখন শ্রীহরি লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়দেশে শয়ন করিয়াছিলেন, ভৃগুমুনি হঠাৎ সেই স্থলে যাইয়া লক্ষ্মীঅঙ্কশায়ী শ্রীহরির বক্ষে পদাঘাত করিলেন। শ্রীহরি তখন শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া ভৃগুমুনিকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃগুমুনির আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বে জানিতে না পারায় তাঁহাকে প্রণাম করিতে শ্রীহরির বিলম্ব হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভগবান নারায়ণ ভৃগুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। শ্রীভগবান আরও বলিলেন :

অতীব কোমলৌ তাত, চরণৌ তে মহামুনে,
বজ্রকর্কশ মদ্বক্ষঃ স্পর্শেন পরিপীড়িতৌ ॥ ১০।৮৯।১০

—হে মহামুনে, আপনার চরণযুগল কত কোমল, আর আমার বক্ষ বজ্র অপেক্ষাও কঠিন! না জানি আমার বক্ষের সংঘাতে আপনার পদযুগল কত ব্যথিত হইয়াছে।

কী অপূর্ব্ব বিনয়, কী অপূর্ব্ব ভক্তবৎসলতা, অপূর্ব্ব সাধুপ্রশস্তি! শ্রীহরির এই কথা শুনিয়া ভৃগুমুনি অশ্রুপূর্ণনয়নে নীরব হইয়া কিয়ৎকাল

তথায় অবস্থান করিলেন। অতঃপর তিনি যজ্ঞস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার সমগ্র অভিজ্ঞতা ঋষিগণের নিকট বর্ণনা করিলেন।

তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ,
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্ব্বিষ্ণুং যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ম্ ॥ ১০।৮৯।১৪

—তখন মুনিগণ ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত ও সংশয়মুক্ত হইলেন, এবং ভগবান বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠতম দেবতা বলিয়া তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস হইল, কারণ একমাত্র বিষ্ণু হইতেই পরমশান্তি ও অভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একাদশ স্কন্ধ

একাদশ স্কন্ধের প্রধান বিষয় নবযোগীন্দ্র-সংবাদ ও শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ। এই দুইটি সংবাদের ভিতর দিয়া এই স্কন্ধে সমগ্র শ্রীভাগবতের সারতত্ত্ব সঙ্কলিত হইয়াছে।

(১)

যদুবংশ ধ্বংসের কারণ

দশম স্কন্ধের শেষভাগে সংক্ষেপে কৃষ্ণলীলার অনুশীলন এবং কৃষ্ণলীলা শ্রবণাদির ফল বর্ণন করিয়া একাদশ স্কন্ধের প্রথমেই রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব যদুকুলের প্রতি ব্রহ্মশাপের কারণ এবং যদুকুল-ধ্বংস বিবৃত করিতেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু দৈত্য বধ করিয়া রাজন্য-গণের মধ্যে প্রবল কলহ সৃষ্টি করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের দ্বারা "ভুবঃ অবতারয়ৎ ভারং"—পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে—"যাদবং কুলমহো অবিষহ্যমাস্তে"—অসহনীয় যাদবকুল অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন—"অন্তঃ কলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণুস্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম"—বাঁশ যেমন বায়ুসংযোগে বাঁশবনের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করিয়া সেই বনকে ও আপনাকেও বিনাশ করে, সেইরূপে আমি যদুকুলের মধ্যে কলহ উৎপাদন করিয়া যদুকুল বিনাশ করতঃ শান্তিময় নিজলোক বৈকুণ্ঠে গমন করিব। এইরূপ মনস্থ করিয়া "সত্যসঙ্কল্পঃ ঈশ্বরঃ"—সত্য সঙ্কল্প শ্রীহরি ব্রহ্মশাপচ্ছলে নিজ কুলের উপসংহার করিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপের কারণ জানিতে চাহিলে শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, বসুদেবের গৃহে যজ্ঞাদি সম্পাদন করাইয়া বিশ্বামিত্র, দুর্ব্বাসা, বশিষ্ঠ ও নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ দ্বারকার নিকটবর্ত্তী

পিণ্ডারক নামক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তখন যদুকুমারগণ জাম্ববতী-পুত্র সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া ঋষিগণের নিকট যাইয়া প্রশ্ন করিলেন—এই স্ত্রীলোকটি কন্যা অথবা পুত্র প্রসব করিবে তাহা বলিয়া দিন। ঋষিগণ এইরূপ ধৃষ্টতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—'জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুষলং কুলনাশনম্'—রে মূর্খগণ, এই কল্পিতা রমণী তোমাদিগের কুলনাশক এক মুষল প্রসব করিবে। ঋষিগণের অভিশাপবাক্য শ্রবণ করিয়া যদুগণ ভীত হইল এবং সাম্বের বস্ত্রমধ্যে গর্ভাকারে লুক্কায়িত লৌহময় মুষলটি লইয়া রাজা উগ্রসেনের নিকট যাইয়া তাহাদের বিপদের কথা নিবেদন করিল। তখন যদুরাজ উগ্রসেন সেই মুষলটিকে চূর্ণ করাইয়া সেই লৌহচূর্ণ ও চূর্ণাবশিষ্ট লৌহখণ্ড সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই লৌহখণ্ড এক মৎস্য গ্রাস করিয়াছিল এবং লৌহচূর্ণগুলিও তরঙ্গ-সংঘাতে সমুদ্রতীরে সংলগ্ন হইয়া এরকাবনে পরিণত হইয়াছিল। এদিকে জরা নামক এক ব্যাধ মৎস্যের উদরগত লৌহখণ্ডটিকে পাইয়া উহাকে স্বীয় শরের অগ্রভাগে সংযোজিত করিয়া রাখিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মশাপ অবগত হইলেন, এবং ব্রহ্মশাপ কিরূপে পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাও বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু 'অন্যথা কর্তুং নৈচ্ছৎ বিপ্রশাপং'—সেই ব্রহ্মশাপকে অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

(২)

নবযোগীন্দ্র-সংবাদ

পঞ্চম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, ঋষভদেবের একশত পুত্রের মধ্যে কবি প্রভৃতি নয়জন যোগীন্দ্র ভাগবত-ধর্ম্মের প্রদর্শক ছিলেন এবং তাঁহাদিগের চরিত্র পরে বর্ণিত হইবে। এখন একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত বসুদেব-নারদ-সংবাদ অবলম্বন করিয়া সেই ঋষভ-পুত্র নয়জন যোগীন্দ্র কর্তৃক রাজা নিমির প্রতি ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ-

প্রদান বর্ণিত হইতেছে। শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, "কৃষ্ণোপাসনলালসঃ" —শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় সতত প্রীতিযুক্ত দেবর্ষি নারদ তখন দ্বারকা নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ বসুদেবের গৃহে যাইলে দেবর্ষিকে অভিবাদন করিয়া বসুদেব বলিলেন,

ভগবন্, ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃ শ্লোকবর্ত্মনাম্ ॥
ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ, সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥১১।২।৪,৬

—হে ভগবন্, পিতামাতা যেমন সন্তানগণের কল্যাণকামী, সেইরূপ নিখিলজনগণের কল্যাণকামী ভগবদ্ভক্ত মহাজনগণের আগমন দীনচিত্ত গৃহিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকে। আমার গৃহে আপনার আগমনও সেইরূপ আমার এবং সকলের পক্ষে শুভকর বলিয়া মনে করি।

যাঁহারা যে প্রকারে দেবতাগণের ভজনা করেন, আশ্রয়ানুসারিণী ছায়ার ন্যায় কর্ম্মসাপেক্ষ দেবগণও তাঁহাদিগকে সেইরূপই ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। সাধুগণ কিন্তু দীনবৎসল, তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে লোকের মঙ্গল বিধান করেন।

এইরূপে দেবর্ষির নিকট আত্মনিবেদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব যে উপায়ে নানাবিধ ক্লেশপূর্ণ ও সর্ব্বপ্রকারে ভয়াবহ এই সংসার হইতে অনায়াসেই মুক্ত হইতে পারেন সেই পরমার্থপ্রদ উপদেশ জানিতে চাহিলেন। তখন দীনদয়াল দেবর্ষি নারদ নবযোগীন্দ্র ও বিদেহরাজ নিমির পুরাতন ইতিহাস বর্ণনা করিলেন।

ঋষভদেবের শত পুত্রের মধ্যে নয়জন দিগম্বর যোগীন্দ্র, আত্মবিদ্যায় পারদর্শী ও ভগবৎতত্ত্বোপদেষ্টা হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেন। তাঁহাদের নাম—কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন। ইঁহারা ভাগবতে নবযোগীন্দ্র নামে

সুপরিচিত। একদিন তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাত্মা নিমির যজ্ঞস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদেহরাজ নিমি তাঁহাদিগকে যথাযোগ্যরূপে পূজা করিয়া বলিলেন,

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥
অতঃ আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥

১১।২।২৯,৩০

—দেহধারী জীবগণের দেহ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও মনুষ্যদেহ দুর্ল্লভ, সেই মনুষ্যদেহে আবার ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণের দর্শন সুদুর্ল্লভ। মহাসৌভাগ্য ফলেই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া আমি আজ আপনাদিগের দর্শন লাভ করিলাম।

হে মুনিগণ, যেহেতু এই সংসারে সাধুসঙ্গ ক্ষণার্দ্ধকাল স্থায়ী হইলেও উহা মনুষ্যগণের পক্ষে পরম কল্যাণপ্রদ, অতএব আমি আপনাদিগের নিকট আত্যন্তিক মঙ্গলের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

বিদেহরাজ নিমি কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া নবযোগীন্দ্রগণ নিমির সমস্ত সন্দেহ একে একে পৃথক্‌ভাবে মীমাংসা করিয়া দিলেন। এই নবযোগীন্দ্র-সংবাদ দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রথমেই যোগীন্দ্র কবি বলিলেন—'মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্রনিত্যং'—ইহ সংসারে ভগবান অচ্যুতের চরণকমল সেবনই আত্যন্তিক মঙ্গল বলিয়া মনে করি। তিনি বলিলেন যে পরমেশ্বর নারায়ণে সমর্পিত শাস্ত্রীয় সমস্ত কার্য্যই ভাগবত-ধর্ম্ম।

এই উপদেশ গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-কথিত উপদেশের প্রতিধ্বনি মাত্র।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ,
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৯।২৭

—হে কৌন্তেয়, যাহা অনুষ্ঠান কর, যাহা আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর ও যে তপস্যা কর সেই সমস্ত আমাকে অর্পণ করিবে।

এই বিখ্যাত শ্লোকের টীকা করিয়া শ্রীমধুসূদন সরস্বতী মহাশয় বলিয়াছেন, "অবশ্যম্ভাবিনাং কর্ম্মণাং ময়ি পরমগুরৌ সমর্পণমেব মদ্ভজনং, নতু তদর্থং পৃথক্ ব্যাপারঃ কশ্চিৎ কর্ত্তব্যঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ।"—অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি পরমগুরু পরমেশ্বরে সমর্পণই তাঁহার ভজন। এই জন্য অন্য কোন পৃথক্ অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই। অনাত্মবস্তুতে আত্মাভিমান বশতঃ মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। যিনি শ্রীহরির লীলাকথা শ্রবণ এবং আত্মনিবেদনরূপ ব্রত ধারণ করিয়াছেন তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া কখনও উন্মাদের ন্যায় উচ্চহাস্য করেন, কখনও বা রোদন, কখনও বা গান অথবা নৃত্য করেন।

এইবার নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোকে কবি বলিতেছেন যে, হরিলীলা শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তি, ভগবৎদর্শন ও সংসারে বিরক্তি যুগপৎ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এইরূপ লীলাকথা শ্রবণের পরিপাকে ভক্তগণ পরমশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই দুইটি শ্লোক শ্রীভাগবতে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ,
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্ব্বিরক্তির্ভগবৎ
প্রবোধঃ,
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্, ততঃ পরাং শান্তি-
মুপৈতিসাক্ষাৎ ॥ ১১।২।৪২,৪৩

—যেমন প্রতি গ্রাস অন্নের সহিত ভোজনকারীর সুখ, উদরপূরণ ও ক্ষুধার নিবৃত্তি একসঙ্গেই হইতে থাকে, সেইরূপ ভগবৎলীলা কীর্ত্তনকারী

ব্যক্তির ভক্তি, ভগবৎস্বরূপদর্শন, ও সংসারে বিরক্তি সমকালেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হে রাজন্, এইরূপ শরণাগতির দ্বারা শ্রীহরির চরণসেবা করিলে ভক্তি, সংসারে বিরক্তি এবং ভগবৎস্বরূপের অনুভূতি হইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সাক্ষাৎ পরমশান্তি লাভ হইয়া থাকে।

অতঃপর রাজা নিমি ভগবানের ভক্তগণের আচার ব্যবহার এবং তাঁহাদের ভিতর যে সমস্ত চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। তখন যোগীন্দ্র হরি বলিলেন, যে-ভক্ত সর্ব্বকারণ পরমাত্মা ভগবানের প্রকাশ সর্ব্বভূতে দর্শন করেন এবং জগদাত্মা ভগবানেই সর্ব্বভূত অবস্থিত অনুভব করেন তিনিই 'ভাগবতোত্তমঃ'—ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যিনি সর্ব্বানুভূতির অভাববশতঃ ভগবানের প্রতি প্রেম, ভগবৎ-ভক্তগণের প্রতি মিত্রতা, অজ্ঞগণের প্রতি কৃপা ও ভগবৎ-বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন—'স মধ্যমঃ'—সেই ভেদদর্শী ব্যক্তি মধ্যম ভাগবত। আর যিনি শ্রদ্ধা সহকারে কেবল প্রতিমাদিতেই শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন, হরিভক্তগণের অথবা সর্ব্বভূতের ভিতর শ্রীহরির প্রকাশ দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন না "স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ"—সেই ভক্ত ভজনারম্ভকারী অর্থাৎ অপক্ক ভক্ত বলিয়া অভিহিত হন। এই শ্লোকের টীকা করিয়া শ্রীশুকদেব স্বামী মহাশয় বলিতেছেন,—'স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ প্রকৃতিঃ প্রারম্ভঃ তত্র ভবঃ কৃতভজনারম্ভঃ ইত্যর্থঃ। এবকারেণ সর্ব্বগতত্ব-ভক্তপ্রিয়ত্বাদি ভগবদ্গুণান্ স ন জানাতীতি সূচিতম্।'—অর্থাৎ, সেইরূপ ভক্ত ভক্তিসাধন নূতন শিক্ষা করিতেছেন, ইহাই অর্থ। এইরূপ সাধক ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং ভক্তপ্রিয়ত্ব জানেন না, ইহাই বুঝা যাইতেছে। যোগীন্দ্র হরি আরও বলিলেন যে, ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও যে-ভক্ত ভগবানের লীলাস্মরণ

হইতে ক্ষণমুহূর্ত্তও বিচলিত হন না, যিনি জানেন, ত্রৈলোক্যসুখ অনিত্য, ভগবৎ-প্রাপ্তি সুখ নিত্য, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।

এইবার রাজা নিমি পরম আনন্দিত হইয়া বলিলেন যে সংসারতাপের পরম ঔষধিস্বরূপ হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শুনিবার আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি "মায়িনামপি মোহিনীম্ মায়াং" —শ্রীহরির যে মায়া ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণেরও মোহকর, সেই মায়ার তত্ত্ব জানিতে সমুৎসুক। রাজার এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যোগীন্দ্র অন্তরিক্ষ বলিলেন যে, মহাভূতের দ্বারা ভগবান্ জীবসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবগণ দেহকেই আত্মা মনে করিয়া এই শরীরের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে। এই আসক্তিপ্রসূত বাসনা-প্রবাহ হইতে কর্ম্ম করিতে করিতে জীবগণ সুখদুঃখ ভোগ করিয়া এই সংসারে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া অবশভাবে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে। অবশেষে প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে শতবর্ষ ব্যাপিয়া অতিভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি হইবে এবং প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড উত্তপ্ত কিরণজালের দ্বারা ত্রিলোককে অতিশয় সন্তপ্ত করিবে। অতঃপর সৃষ্টিকালের বিপরীত ভাবে পঞ্চভূত ও অহঙ্কারসমূহ স্বীয় কারণ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে। অন্তরিক্ষ এইরূপে ভগবানের সৃষ্টিস্থিতি ও সংহারকারিণী ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার কথা বর্ণনা করিয়া নিমিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ?'—রাজন্, আর কি জানিতে ইচ্ছা কর ?

তখন রাজা নিমি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,

যথৈতাং ঐশ্বরীং মায়াং দুস্তরাং অকৃতাত্মভিঃ,
তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষে ইদমুচ্যতাম্ ॥ ১১।৩।১৭

—হে মহর্ষিগণ, আত্মজ্ঞানবিরহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে এই মায়া দুস্তরণীয়, কিন্তু এই ঐশ্বরী মায়াকে স্থূলবুদ্ধি লোকেরাও যাহাতে অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে সেই উপায় বলিয়া দিন।

তখন যোগীন্দ্র প্রবুদ্ধ বলিলেন যে, দুঃখনাশ ও সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাহারা কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহারা যে কর্ম্মসমূহের বিপরীত ফল ভোগ করিয়া থাকে, ইহাই সর্ব্বপ্রথম পরিলক্ষণীয়। মায়াতরণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মজনিত স্বর্গলোককেও নশ্বর বলিয়া জানা উচিত, এবং স্বর্গলোকেও সমানের প্রতি স্পর্দ্ধা, শ্রেষ্ঠের প্রতি অসূয়া এবং বিনাশভয় বিদ্যমান আছে, তাহা মনে রাখিতে হইবে। মায়াবন্ধন ছেদন করিতে হইলে শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে তত্ত্বজ্ঞ গুরুর শরণাগত হওয়া প্রয়োজন। তাহার পর তিনি গুরুর নির্দ্দেশমত অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরির লীলাকথায় মন নিয়োজিত করিবেন।

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া,
নারায়ণপরো মায়াং অঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্॥ ১১।৩।৩৩

—হে বিদেহরাজ, নারায়ণের উপাসক এইরূপ ভাগবত ধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিতে করিতে নারায়ণীভক্তির দ্বারা দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন।

এই সমস্ত ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া রাজা নিমি পুনরায় বলিলেন যে, তিনি নারায়ণ নামক পরমাত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার জন্য আগ্রহশীল। তখন যোগীন্দ্র পিপ্পলায়ন বলিলেন যে যিনি বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কারণস্বরূপ, যিনি স্বয়ং কারণরহিত, যিনি অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বাধাররূপে সতত বর্ত্তমান আছেন, আর দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন যাঁহার দ্বারা প্রাণবন্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংজ্যোতি, স্বয়ংসিদ্ধ পরমাত্মাই নারায়ণ। মোক্ষকামী ব্যক্তির চিত্ত যখন শ্রীহরির চরণকমল চিন্তন করিতে করিতে পরিশুদ্ধ হইবে, তখন নির্ম্মল চক্ষুতে সূর্য্যের প্রকাশের মত, তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্তে পরমাত্মার প্রকাশ অনুভূত হইবে।

রাজা নিমি পুনরায় বলিলেন যে, যেরূপ কর্ম্মযোগের দ্বারা মানুষ বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ইহলোকেই পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে পারে,

সেই কর্ম্মযোগ জানিবার জন্য তিনি সমুৎসুক। তখন যোগীন্দ্র আবির্হোত্র বলিলেন যে বেদে সমগ্র কর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—কর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত আচরণ, অকর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত অনাচরণ ও বিকর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ। সুচিকিৎসক যেমন মিষ্টদ্রব্যে আসক্ত বালককে মিষ্টদ্রব্যের দ্বারা প্রলোভিত করিয়া তাহার রোগনিবৃত্তির জন্য ঔষধ পান করাইয়া থাকেন, সেইরূপ এই ব্রহ্মবিষয়ক বেদ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের শিক্ষার নিমিত্ত স্বর্গ-ফলের দ্বারা প্রলোভিত করিয়া সংসার-নিবৃত্তির জন্য কর্ম্মসমূহ বিধান করিয়াছেন। "স্বর্গকামো যজেত"—স্বর্গকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন, এইরূপ যে সকল বেদবিধান আছে তাহা মানবগণের কর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য। যজ্ঞ প্রভৃতি বেদবিহিত কর্ম্ম উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নহে। মানুষ ক্রমশঃ স্বর্গাদি ভোগে নিস্পৃহ হইয়া ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মফল সমর্পণ পূর্ব্বক কেবলমাত্র বেদবিহিত কর্ম্ম করিতে করিতে অবশেষে কর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ভগবৎবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

যোগীন্দ্র আবির্হোত্রের উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজা নিমি বলিলেন যে, ভগবান শ্রীহরি যে যে অবতারের দ্বারা জগতে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন, সেই অবতারগণের লীলা শ্রবণ করিতে নিমি আগ্রহশীল। তখন যোগীন্দ্র দ্রুমিল বলিলেন যে, "রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিল শক্তিধাম্নঃ"—সুদীর্ঘ কালের দ্বারা কেহ হয়ত পৃথিবীর সমস্ত ধূলিকণা গণনা করিতে সমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বশক্তির আধার ভগবানের লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই বলিয়া ঋষি দ্রুমিল সংক্ষেপে কারণসলিলশায়ী আদিপুরুষ এবং তাঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের সৃষ্টি বর্ণনা করিলেন। কালক্রমে ধর্ম্মের ঔরসে দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে প্রশান্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ ও নর এই দুইজন জন্মগ্রহণ করিলেন। ভগবান

বিষ্ণুই জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত নিজ অংশে হংস, দত্তাত্রেয়, সনকাদি কুমারদ্বয় এবং নবযোগীন্দ্রের পিতা ঋষভদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছেন। সেই ভগবান বিষ্ণুই হয়গ্রীব অবতারে মধু দৈত্যকে বধ করিয়া তাহার কবল হইতে বেদসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতঃপর বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামনদেব, পরশুরাম, রামচন্দ্র প্রভৃতি অবতারের কথা উল্লেখ করিয়া অবশেষে যোগীন্দ্র দ্রুমিল বলিলেন,

ভূমের্ভরাবতরণায় যদুষ্বজন্মা জাতঃ করিষ্যতি সুরৈরপি দুষ্করাণি,
বাদৈর্বিমোহয়তি যজ্ঞকৃতোঽতদর্হান্ শূদ্রান্ কলৌ ক্ষিতিভুজো
ন্যহনিষ্যদন্তে ॥ ১১।৪।২২

—জন্মরহিত ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীর ভার হরণ করিবার নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া দেবতাগণেরও দুষ্কর কর্ম্মসমূহ করিবেন। তিনি আবার বুদ্ধ অবতারে অনধিকারী অথচ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত অসুরভাবাপন্ন মানবগণকে অহিংসাবাদের দ্বারা বিমোহিত করিবেন, এবং কলির শেষে কল্কি অবতারে তিনিই শূদ্র রাজাদিগকে বধ করিবেন।

অবশেষে দ্রুমিল বলিলেন যে, "এবম্বিধানি কর্ম্মাণি জন্মানি চ জগৎপতেঃ ভূরীণি"—জগৎপতি বিষ্ণুর এইরূপ বহু বহু জন্ম ও কর্ম্ম ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে।

এইবার বিদেহরাজ নিমি অসংযতচিত্ত, ভোগে অপূর্ণকাম অথচ শ্রীহরির ভজনবিমুখ ব্যক্তিগণ কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা জানিতে কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। তখন যোগীন্দ্র চমস বলিলেন যে, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যাহারা বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের মধ্য দিয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করে না তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে। যাহাদিগের ভাগ্যে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন ঘটে না, তাহারা সত্য সত্যই করুণার পাত্র। যাহারা মূর্খ অথচ আপনাকে

পণ্ডিত বলিয়া মনে করে তাহারা "দাম্ভিকাঃ মানিনঃ পাপাঃ বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্"—দাম্ভিক ও অভিমানী হয় এবং সেই পাপিষ্ঠগণ ভগবৎপ্রিয় সাধুগণকে উপহাস করিয়া থাকে। এই সকল লোক মৈথুনসুখপ্রধান গৃহে বাস করিয়া স্ত্রীসঙ্গ, মাংস-ভক্ষণ ও সুরাপান করিয়া বেদবিধান লঙ্ঘন করে। কিন্তু,

যদ্ ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যা ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্ ॥১১।৫।১৩

—শাস্ত্রে কর্ম্মবিশেষে সুরার ঘ্রাণগ্রহণই বিহিত হইয়াছে, পান করা বিহিত হয় নাই; সেইরূপ স্থানবিশেষে দেবতার উদ্দেশ্যে পশুবধ বিহিত হইয়াছে, জিহ্বার লালসায় জীবহিংসা বিহিত হয় নাই; স্ত্রীসঙ্গ সন্তানোৎপত্তির জন্যই বিহিত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার জন্য নহে। এই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম মূর্খগণ বুঝিতে পারে না, সুতরাং মোহিত হইয়া থাকে।

অতএব

যে ত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।
দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১১।৫।১৪,১৫

—শাস্ত্ররহস্যে অনভিজ্ঞ, অবিনয়ী, স্বয়ং সাধু বলিয়া অভিমানী ও আত্মকার্য্যে অতিবিশ্বাসী যে সকল অসাধু ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য যজ্ঞ করিবার ছলে পশুগণকে বধ করে, নিহত পশুগণ পরলোকে গমন করিয়া সেইসকল জিহ্বালম্পট ব্যক্তিগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।

সেই অসাধু ব্যক্তিগণ এই মরণশীল নিজ দেহে ও পুত্রকলত্রাদিতে আসক্ত হইয়া ইহাদের পোষণের জন্য পশুহিংসা করতঃ স্বীয় আত্মাকে, সেই হিংসিত পশুর দেহস্থিত আত্মাকে এবং উভয়দেহে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত শ্রীহরিকে দ্বেষ করিয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে। অতি পরিশ্রমে

লোকে যে সকল গৃহপুত্রাদি সংগ্রহ করে 'বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ'—বাসুদেবের প্রতি পরাঙ্মুখ এই সকল লোকেরা অবশেষে "কালধ্বস্তমনোরথাঃ"—কালকর্ত্তৃক ভ্রষ্টমনোরথ হইয়া সেই সঞ্চিত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া জন্ম-মরণপ্রবাহরূপ সংসারে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আটজন যোগীন্দ্রের উপদেশবচন শ্রবণ করিয়া অবশেষে বিদেহরাজ নিমি নবমতম যোগীন্দ্র করভাজনকে বলিলেন যে, ভগবান এই জগতে কোন্ যুগে কিরূপ বর্ণবিশিষ্ট ও কিরূপ আকারবিশিষ্ট হইয়া কি নাম ও বিধির দ্বারা মনুষ্যগণের নিকট পূজিত ও পরিচিত হইয়া থাকেন তাহা জানিবার জন্য তিনি সমুৎসুক। ঋষি করভাজন বলিলেন যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে ভগবান শ্রীহরি নানাবিধ বর্ণ, নানাবিধ নাম ও নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া নানাপ্রকার বিধির দ্বারা মনুষ্যগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। সত্যযুগে ভগবান শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণ এবং কলিযুগে তিনি কৃষ্ণবর্ণ।

> কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ
> যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥
> কৃতাদিষু প্রজা রাজন্, কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্
> কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥১১।৫।৩৬, ৩৮

—গুণজ্ঞ সারগ্রাহী শিষ্ট জনগণ কলিযুগের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। ঐ কলিযুগে কেবল ভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্ব পুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হে বিদেহরাজ, সত্যাদি যুগত্রয়ে অবস্থিত জনগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কলিযুগেই নারায়ণপরায়ণ ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিবেন।

তাই কলিযুগ ধন্য! বহু ভক্ত বৈষ্ণবের পদধূলিতে ধরিত্রী কৃতার্থা। বহু "নারায়ণপরায়ণাঃ" পরম বৈষ্ণব এই কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,

জন্মগ্রহণ করিতেছেন, জন্মগ্রহণ করিবেন। বদ্ধজীবের চক্ষু নাই, তাই তাহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না।

এই নবযোগীন্দ্র-সংবাদ পাঠ করিয়া আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে, ভাগবত গ্রন্থ শ্রুতিপ্রতিপাদিত অদ্বৈততত্ত্ব ও বৈষ্ণবদর্শনের দ্বৈততত্ত্ব—এই আপাতবিরোধী মতদ্বয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ মতুয়াবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া একপেশে ভাবগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে ধর্ম্মগ্রন্থ অনুশীলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ফলে যে ভাগবত গ্রন্থ একেবারেই অসাম্প্রদায়িক, তাহা পণ্ডিতের মনের রংয়ে রঞ্জিত হইয়া এক কঠোর ও অবাস্তব সাম্প্রদায়িক চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ বেদান্ত-প্রতিপাদিত অদ্বৈততত্ত্ব ভাগবতের মধ্যদিয়া দ্বৈততত্ত্বরূপে প্রকাশিত হইয়া এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার মহিমাই প্রকাশিত করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতকে এইজন্যই বেদান্তের ভাষ্য বলা হইয়া থাকে। বেদান্ত বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদবুদ্ধি হইতেই সকল প্রকার ভয় ও দুঃখ উপস্থিত হয়; জীব যে পর্য্যন্ত না সেই অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত নিজের অভিন্নতা অনুভব করিবে ততদিন তাহার ভয়, শোক ও মোহ দূরীভূত হইতে পারে না। আবার, শ্রীভাগবতও বলেন যে, ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ এবং সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন না করিলে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া দুঃখ ও শোক ভোগ করিতে থাকে। একই ভাব, একই সত্য, কেবলমাত্র ভাষার বিভিন্নতা। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'ও যাহা, 'ঈশ্বর সর্ব্বজীব সর্ব্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন'—এই দুইই মূলতঃ একতত্ত্ব। ভক্ত নিগূঢ় রসাস্বাদনের জন্য তদ্‌ভাব-ভাবিত, তদাকারকারিত একটা শুদ্ধবুদ্ধি রাখিয়া দেন—ইহাই মাত্র প্রভেদ। তবে বেদান্তের পন্থা দুরূহ, ভক্তির পথ অপেক্ষাকৃত সহজ—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বর্ত্তমান পরিস্থিতি, বর্ত্তমান কালগতি, বর্ত্তমান গৃহীগণের শরীর ও মনের অবস্থা বিবেচনা করিলে বেদান্তের আত্মানুভূতি

অপেক্ষা ভাগবতের আত্মনিবেদনই সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ ও সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া মনে হইবে। মূল কথা যিনি ভগবৎরসের রসিক তাঁহার নিকট "রসো বৈ সঃ"—তিনি রসস্বরূপ—বেদান্তীর নিকটও রসস্বরূপ, ভাগবতী ধর্ম্মসাধকের নিকটও তিনি রসস্বরূপ। একমাত্র পাণ্ডিত্যের সমুদ্রে সন্তরণপটু অশান্ত তীরভ্রষ্ট শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিতের নিকট তিনি বহু, তিনি জটিল, তিনি দুষ্প্রাপ্য।

এইরূপে নবযোগীন্দ্রগণের উপদেশাবলী বসুদেবের নিকট বর্ণিত করিয়া দেবর্ষি নারদ বলিলেন যে, অতঃপর সিদ্ধ নয়জন মুনি অন্তর্হিত হইলে রাজা নিমি ভাগবত ধর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন। দেবর্ষি আশ্বাস দিলেন যে বসুদেবও এই ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিলে পরমপুরুষকে লাভ করিতে পারিবেন, মায়ামনুষ্যভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত কিন্তু তিনি সেই এক অব্যয় সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর। বসুদেব এই পরমেশ্বরের প্রতি মায়া-মোহিত হইয়া সাধারণ পুত্রবুদ্ধি করিলে বঞ্চিত হইবেন।

শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিলেন,

> এতচ্ছ্রুত্বা মহাভাগো বসুদেবোঽতিবিস্মিতঃ,
> দেবকী চ মহাভাগা জহতুর্ম্মোহমাত্মনঃ ॥১১।৫।৫১

—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবর্ষি নারদের কথা শ্রবণ করিয়া মহাভাগ্যবান বসুদেব ও দেবকীদেবী বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রবুদ্ধিরূপ আত্মমোহ পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীশুকদেব বসুদেব-নারদ সংবাদ ও নবযোগীন্দ্র-সংবাদ বর্ণনা করিয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে পুনরায় যদুবংশের প্রতি ব্রহ্মশাপের কথা উত্থাপন করিতেছেন। যদুকুল ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হওয়ার পর দেবতা ও প্রজাপতিগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারকায় আসিলেন। স্বয়ং মহাদেবও ভূতগণের সহিত দ্বারকায় আসিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মানুষলীলা

শেষ হইয়া আসিতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া আশু বিরহবিচ্ছেদকাতর দেবগণ 'ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্'—অপরিতৃপ্তনয়নে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা ও দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিয়া বলিলেন,

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য, দুরাশয়ানাং বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়ন-
দানতপঃক্রিয়াভিঃ,
সত্ত্বাত্মনামৃষভ, যে যশসি প্রবৃদ্ধ-সচ্ছ্রদ্ধয়াশ্রবণসম্ভৃতয়া
যথা স্যাৎ॥১১।৬।৯

—হে বন্দনীয়, হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আপনার লীলাগুণ শ্রবণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রদ্ধার দ্বারা সাত্ত্বিকচিত্ত মুমুক্ষুগণের যে প্রকার শুদ্ধি হয়, বেদার্থশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা ও কর্ম্মসমূহের দ্বারা কামনাবাসনাযুক্ত জীবগণের সেইপ্রকার শুদ্ধি সম্ভবপর হয় না।

ব্রহ্মা পুনরায় বলিলেন,

ভূমের্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো,
ত্বমস্মাভিরশেষাত্মন্, তৎ তথৈবোপপাদিতম্॥
ধর্ম্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্বয়া
কীর্ত্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্ব্বলোকমলাপহা॥
যানি তে চরিতানীশ, মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ,
শৃণ্বন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসাতমঃ॥
ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে
স লোকান্ লোকপালান্ ন পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্॥
১১।৬।২১,২২,২৪,২৭

—হে প্রভো, পূর্ব্বে আমরা পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য আপনাকে জানাইয়াছিলাম, আপনি সেই ভূভারহরণরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

আপনি সত্যসঙ্কল্প সাধুগণের মধ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বলোকের পাপনাশিনী আপনার কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়াছেন। হে পরমেশ্বর, কলিযুগে সাধু মনুষ্যগণ আপনার ঐ সকল চরিত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে অনায়াসে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবেন। অতএব আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এখন স্বীয় পরমধাম বৈকুণ্ঠে গমন করুন এবং লোকসমূহের সহিত আপনার সেবক আমাদিগকে পালন করুন।

ব্রহ্মা ও দেবগণের স্তব শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, তিনি সমস্ত দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, এখন যদুকুল ধ্বংস হইলেই তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। যদি যদুকুলের বিনাশসাধন না করিয়া তিনি লীলা-সংবরণ করেন তাহা হইলে "লোকোঽয়মুদ্বেলেন বিনঙ্ক্ষ্যতি"—বীর্য্য শৌর্য্য সমন্বিত, সম্পদে উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল এই যাদবগণের দ্বারা লোক-সমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া গমন করিলে—'অথ তস্যাং মহোৎপাতান্ দ্বারবত্যাং সমুত্থিতান্'—সেই দ্বারকাপুরীতে নানাবিধ প্রাকৃতিক উৎপাত পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ যাদবগণকে বলিলেন যে, দ্বারকাপুরীতে নৈসর্গিক অনিষ্ট ও যাদবকুলের উপর ব্রহ্মশাপ—এই উভয় বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রাণধারণ করিতে হইলে তাঁহাদের কাহারও আর দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করা যুক্তিসঙ্গত নহে, সুতরাং 'প্রভাসং সুমহৎপুণ্যং যাস্যামঃ অদ্যৈব মা চিরম্'—আজই আমরা পরম পবিত্র প্রভাসতীর্থে গমন করিব, ক্ষণমাত্র বিলম্ব করাও সমীচীন হইবে না। শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া যাদবগণ প্রভাসতীর্থে গমন করিবার জন্য রথসমূহ যোজনা করিতে লাগিলেন।

(৩)

শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব মিলন ও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত নিত্যদাস ভক্ত উদ্ধব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে বলিয়াছিলেন যে দ্বারকাপুরীতে নৈসর্গিক উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, যদুবংশের উপর ব্রহ্মশাপও রহিয়াছে সুতরাং দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে তাঁহারা হয়ত সহজেই প্রাণধারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু পরমভক্ত উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় উদ্দেশ্য অবিদিত রহিল না। উদ্ধব আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দনা করিয়া বলিলেন, —'সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সন্ত্যক্ষ্যতে ভবান্'—হে প্রভু, আপনি নিশ্চয়ই যদুকুল সংহার করিয়া এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিবেন। উদ্ধব ক্ষণার্দ্ধকালও শ্রীকৃষ্ণচরণ পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন না, অতএব—'স্বধাম নয় মামপি'—হে প্রভু, আমাকেও আপনার নিজধামে লইয়া চলুন। উদ্ধব বলিলেন,

> তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ, নৃণাং পরমমঙ্গলম্,
> কর্ণপীযুষমাস্বাদ্য ত্যজত্যন্যস্পৃহাং জনঃ ॥
> শয্যাসনাটনস্থান স্নানক্রীড়াশনাদিষু,
> কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেমহি ॥ ১১।৬।৪৪,৪৫

—মনুষ্যগণের পরমমঙ্গলস্বরূপ ও কর্ণের অমৃততুল্য ভবদীয় লীলা-চরিত্রের রস আস্বাদন করিলে মানুষের আর অন্য কামনা থাকে না। আমরা আপনার দাস হইয়া শয়ন, উপবেশন, পর্য্যটন, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনাদি কার্য্যে সর্ব্বদা আপনার সেবা করিয়া এখন আপনাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কি প্রকারে বাঁচিয়া থাকিব?

এই কথা বলিয়া ভক্ত উদ্ধব প্রভুকে উদ্দেশ্য করিয়া যেন উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন যে, প্রভুর মায়ায় এই আত্মীয় যাদবগণ এবং সমগ্র বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত কিন্তু দাস উদ্ধবকে প্রভু সেই মায়ার দ্বারা বিমোহিত করিতে পারিবেন না। আজ ভক্ত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ-সেবার গৌরবে মহীয়ান্, তিনি দৃঢ়কণ্ঠে মায়ামানব শ্রীকৃষ্ণকে শুনাইয়া দিতেছেন যে, তিনি ছলনার দ্বারা উদ্ধবকে ভুলাইতে পারিবেন না, প্রভুর সমস্ত মায়া দাস জয় করিবে।

ত্বয়োপভুক্ত স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ,
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসা স্তব মায়াং জয়েমহি ॥ ১১।৬।৪৬

—হে ভগবন্, আপনার সেবায় নিয়োজিত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও ভূষণ আমি মস্তকে ধারণ করিয়া থাকি, আমি আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস। আমি নিশ্চয়ই আপনার মায়াকে জয় করিতে পারিব।

দাস উদ্ধবের এই উক্তি যেমন বিস্ময়কর, তেমনই ভক্তগণের আনন্দপ্রদ। উদ্ধব ইঙ্গিত করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিমোহিনী মায়া দাসের নিকট প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইবে। যে দাস নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-নিবেদিত মালা, গন্ধ, বস্ত্র ও ভূষণ ভক্তিপূর্ব্বক নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া আসিতেছে, সেই সেবার বিজয়-মুকুটধারী সেবকের নিকট মহামায়ার শক্তি পরাজিত; যে দাস নিত্য শ্রীকৃষ্ণ নিবেদিত পবিত্র অন্ন ভোজন করিয়া নিজ দেহ ও মন শুদ্ধ ও পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহার দেহ তো চিন্ময়, সেখানে মায়ার মলিনতা কি করিয়া প্রবেশ লাভ করিবে, সেই সেবা-পরিশুদ্ধ মনকে মায়া কিরূপে বিমোহিত করিয়া বিষয়ভোগের প্রতি আকৃষ্ট করিবে? এই তেজোদৃপ্ত সেবাধিকারে গর্ব্বিত উদ্ধবকে যেন আমরা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। রথ, রথী ও অশ্ব-সমূহের গতিবিধিতে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত, যাদবগণ দ্বারকাপুরী পরিত্যাগের দুঃখে ম্রিয়মাণ, আবার প্রভাসতীর্থে গমন করিবার উদ্যোগে কর্ম্মচঞ্চল। এই কোলাহলপূর্ণ, কর্ম্মমুখর বিরাট রঙ্গভূমির একপার্শ্বে নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্যসহচর উদ্ধব মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, প্রভু নির্ব্বাক্

বিস্ময়ে মৃহু মৃহু হাসিতেছেন, এক একবার দাসের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। এদিকে ভক্তপ্রবর উদ্ধব অনিমেষনেত্রে প্রভুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সেবকের গর্ব্বে গর্ব্বিত উচ্চশির, সেবা-গৌরবে স্ফীত ও বিস্তৃত বক্ষ লইয়া বিরাট্ পর্ব্বতের মত সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভু শুনিতেছেন যে, দাস তাঁহার সেবায় নিয়োজিত বস্ত্র ও পুষ্পমাল্য গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে, তাঁহার উচ্ছিষ্ট অন্ন দাসের দেহ ও মন চিরদিন পরিপুষ্ট করিয়াছে, আজ প্রভু পরিত্যাগ করিয়া যাইলে তাঁহার উচ্ছিষ্টপুষ্ট এই ভক্তদেহ অপর কাহার অন্ন ভোজন করিয়া সুখী হইবে? অঘটনঘটনপটীয়সী কৃষ্ণমায়ার এমন অপূর্ব্ব পরাজয় আর কখনও ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয় নাই। তাই উদ্ধবের কথাগুলি সেদিন যেমন মেঘমন্দ্রস্বরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দ্বারকার চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, সেইরূপ যুগযুগান্তর ধরিয়া সেই বাণীর চক্রলহরী বায়ুসমুদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজিও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-দাসগণের বক্ষে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিতেছে—'উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি',—হে প্রভো, আমি তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস—আমি কি তোমার মায়াকে ভয় করি!

এইবার শ্রীকৃষ্ণ উত্তর প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ সপ্তম অধ্যায় হইতে ঊনত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণের এই সুচিন্তিত ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশের অধিকারী পরমভক্ত ও পরমজ্ঞানী উদ্ধব। একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণকথিত এই উপদেশাবলীর ভিতর সর্ব্বধর্ম্মমতের সমন্বয় পরিলক্ষণীয়। প্রবল ধর্ম্মকথার প্রবাহে এই অধ্যায়গুলি যেমন জটিল, তেমনই নিগূঢ় অর্থব্যঞ্জক। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিয়া চিন্তাশক্তিকে আক্রমণ করিতেছে, মন এক জায়গায় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া যেন কিছুই বিচার করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যেটা আসিতেছে তখনকার মত সেইটাই যেন সত্য বলিয়া মনে হইতেছে,

আবার পরের একটা ভাবতরঙ্গ আগের চিন্তাধারাকে ভাসাইয়া দিয়া একটা নূতন স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের দ্বারা এই সমস্ত ধর্ম্মকথা উপলব্ধি করা যায় না। বিভিন্ন ধর্ম্মমতসমূহের বিশদ্ব্যাখ্যা এবং অতঃপর তাহাদের শ্রীকৃষ্ণসূত্রে গ্রথিত হইয়া এক অখণ্ড সারধর্ম্মে পরিণতি লক্ষ্য করিতে হইলে শুষ্ক পাণ্ডিত্য অপেক্ষা সরস অনুভূতিই অধিকতর প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ এই স্কন্ধে উদ্ধবকে উপদেশচ্ছলে চিরযুগের জগৎগুরুর আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন এবং বদ্ধমুক্তের লক্ষণ, সৎসঙ্গের মহিমা, অণিমাদি যোগসিদ্ধি, ব্রহ্মচারিধর্ম্ম, গৃহস্থধর্ম্ম, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং সাংখ্যযোগ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। কেবলমাত্র ভাসাভাসা ভাবে এই অধ্যায়গুলি পাঠ করিলে মনে হইবে যে বিভিন্ন ধর্ম্মপথগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ, —ইহাদের মধ্যে যোগসূত্র কিছুই নাই। কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, পূর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত মন লইয়া অগ্রসর হইলে আমরা ভক্ত উদ্ধবের সুকৃতির অধিকারী হইব এবং শ্রীভাগবতগ্রন্থ আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে সুপ্রকাশিত হইবেন। তখন আমরা দেখিতে পাইব যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম ও অন্যান্য নানাবিধ শুভ উপায়কে ওতপ্রোত ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, আপাতবিরুদ্ধ সর্ব্বধর্ম্মপথের সমন্বয় করিতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরাভক্তি। যে পথই মানুষ অবলম্বন করুক, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি না থাকিলে সেই পথ, সে সাধনভজন নিরর্থক। সুতরাং মানবজীবন ও পরমাত্মতত্ত্বের যোগসূত্র পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তাই এই শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব মিলন শ্রীভাগবতে এক অপূর্ব্ব ঘটনা।

শ্রীউদ্ধব-সংবাদের ভিতর বৈষ্ণবদর্শনের নিগূঢ় পঞ্চভাবের রহস্য সহজ-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে বৈষ্ণবদর্শনের মর্ম্মকথা আমরা বুঝিতে পারিব।

সেই জন্য ভাগবতের এই তেইশটি অধ্যায় ভক্তের নিকট পরম গৌরবময়। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের দাস, সুতরাং শ্রীভাগবতে উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের ভিতর দিয়া মুখ্যতঃ দাস্যভাব সহজ ও সরলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিয়া থাকেন, জীর্ণ ও পরিত্যক্ত বস্ত্র মাথায় পাগ্‌ড়ী করিয়া ব্যবহার করেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করিবার পর শুষ্ক মাল্যখানি উদ্ধব পথে না ফেলিয়া আপনার গলায় মালার মত করিয়া রাখেন, শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিলে তাঁহার ভোজনপাত্রের অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন পরম তৃপ্তি ও সমাদরের সহিত প্রসাদরূপে সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিলে দ্বারদেশে প্রহরী হইয়া জাগ্রত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় সময় অতিবাহিত করেন। রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রসুপ্ত হইলে নিকটস্থ কোন কক্ষে উদ্ধব অর্দ্ধ-জাগ্রত অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় বিশ্রাম করেন—কান যেন খাড়া হইয়া আছে, কখন শ্রীকৃষ্ণের কি প্রয়োজন হয়। কখন তিনি উদ্ধবকে খোঁজ করেন তাহার ত স্থিরতা নাই। উদ্ধব কৃষ্ণ-দাস, শ্রীভাগবতে দাস্যরসের তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক। বৈষ্ণব দর্শনকারগণ পাঁচটি রসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মানুষের জিহ্বা ছয় প্রকার রসের কথা জানে—কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল ও মধুর ;—পরস্পর বিরোধী রস। অলঙ্কার শাস্ত্রকারগণ নবরসের উল্লেখ করিয়া থাকেন—আদি, হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, ও শান্ত রস ;—ইহারাও পরস্পর বিরোধী রস। কিন্তু বৈষ্ণবদর্শনের পঞ্চরস জটিল হইলেও একধর্ম্মী—পরস্পর নিগূঢ়সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই উদ্ধবের দাস্যভাব বুঝিতে পারিলেই আমরা অন্যান্য ভাবগুলি সহজেই বুঝিতে পারিব।

বৈষ্ণব দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসের মধ্যে মধুররসের সাধনাই শ্রেষ্ঠ। এই মধুররসের অপর নাম উজ্জলরস। এই ভাগবতে আমরা গোপীগণকে মধুর রসের উপাসিকা

দেখিতে পাই, উদ্ধব দাস্যরসের সাধক বলিয়া সকলের নিকট সুপরিচিত। এই গোপীগণ ও উদ্ধব উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত, ইঁহাদের মধ্যে ছোট বড়র কথা উঠে না। আমরা উদ্ধবের দাস্যরসের কথা বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছি। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণ দাস উদ্ধবকে বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী বন্ধুর সমাদর প্রদান করিতেছেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া শুনিলেন যে দ্বারদেশে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দূত আসিয়া উপস্থিত। দূত নিবেদন করিলেন যে, রাজা জরাসন্ধের গিরিব্রজ নামক দুর্গে অবরুদ্ধ বিশ হাজার রাজন্যবর্গকে মহাভৈরবযজ্ঞে বলিদানের নিমিত্ত জরাসন্ধ আয়োজন করিতেছেন। সেই বিশ হাজার রাজন্যবর্গ তাঁহাদের রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট শরণাগত। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতেছেন। সেই যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিবার আশায় যুধিষ্ঠির যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সাদরে সশ্রদ্ধায় আহ্বান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ উভয় সঙ্কটে পড়িলেন—শরণাগতকে রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য, আবার তিনি নিজেই বলিয়াছেন "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"—আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু—সুতরাং যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলীতে যাওয়াও একান্ত প্রয়োজন। এইরূপ কর্ত্তব্যসঙ্কটে অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ দাস উদ্ধবের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। প্রভু বলিলেন—"হে উদ্ধব, তুমি আমার বন্ধু, জ্ঞানচক্ষুস্বরূপ এবং মন্ত্রণাদাতা। আমার এই ক্ষেত্রে কি করা উচিত তাহা বল।" দাস উদ্ধবের প্রতি ইহা কত বড় সমাদর, কত বড় সম্মান তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এই একটি ঘটনার ভিতর দিয়া ভগবানের নিকট দাস্যভাবের সমাদর সহজেই প্রকাশিত হইয়াছে। মধুর রসের উপাসিকা গোপীগণ কি ইহার অধিক সম্মান কোনদিন প্রাপ্ত হইয়াছেন? সুতরাং দার্শনিকের বুদ্ধিদৃষ্টিতে দাসভাব অপেক্ষা মধুরভাব অধিকতর গৌরবময় হইলেও ব্যবহারিক

জগতে, ধর্ম্মসাধনায় ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষণীয় নহে। আরও ভাবিবার কথা আছে। শ্রীভাগবতে রাসলীলাই মধুর রসের উজ্জ্বলতম প্রকাশ—ধর্ম্মজগতে ইহার তুলনা নাই, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু শ্রেষ্ঠরস বলিয়া কি সকলেই এই মধুর ভাবের অধিকারী ? না, সকলেই মধুর রসের অধিকারী নহে। কামনাবাসনাবর্জ্জিত মন লইয়া রাস-বিহারীর রাসমহোৎসব শ্রবণ করিতে হইবে,—উজ্জ্বলরসের কথা শ্রবণ করিতে করিতে মনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইবে,—যদি মানুষ তাহা পারে তবেই সে রাসলীলা শ্রবণের অধিকারী, এইরূপ শুদ্ধ অধিকারীর জন্মজন্মান্তরের কামনাবাসনা চিরদিনের মত নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু যাহার মন ভাগবত শুনিতে শুনিতে টাকার দিকে ছুটিয়া যায়, সভাগৃহের দ্বিতলে উপবিষ্ট ভক্ত নারীবৃন্দের দিকে চুরি করিয়া তাকায়, পুত্রকন্যার ব্যাধির কথা চিন্তা করে, সে মানুষ রাসলীলা শ্রবণ করিবার অধিকারী নহে, শ্রবণ করিলে তাহার অশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। মধুর রসের অধিকারী হইতে হইলে বহুজন্মে অন্যান্য রসসাধনার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, পাঁচজনের দেখিয়া একেবারে লাফাইয়া মধুররস ধরিতে যাইলে হাত ফস্‌কাইয়া যায়, সব গোলমাল হইয়া যায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। মধুর রসের সাধনোপযোগী মন কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনেরও আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু দাস্যভাব সাধনার অধিকারী সর্ব্বজীব, এখানে ত্রুটি বিচ্যুতি নাই, এখানে অপরাধ হয় না, এখানে কাঠবিড়ালী সাগর বন্ধন করিতে সাহায্য করিলেও তাহা দোষণীয় নহে। সুতরাং বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী মধুররস শ্রেষ্ঠ রস হইলেও ইহা বিপদসঙ্কুল, সাধারণ মানুষের পক্ষে দাস্যভাব সাধনাই সহজ, নিরাপদ, সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ।

আরও ভাবিবার কথা আছে। অনেকে বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করিয়া থাকেন,—বাৎসল্যরস সর্ব্বজগতে চিরদিন সমাদৃত হইয়া

আসিতেছে। বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠ সাধিকা বিশ্বমাতা যশোদা। শ্রীকৃষ্ণ মাটি খাইয়াছেন,—সখাগণ মা যশোদার কাছে নালিশ করিয়াছে। মা শ্রীকৃষ্ণকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বেত্রদণ্ড আস্ফালিত করিয়া বালক শ্রীকৃষ্ণকে তাড়না করিতেছেন, বালক ভয়ে কাঁপিতেছে, কাঁদিতেছে, মাতার করুণা উদ্রেক করিবার জন্য কম্পিতকণ্ঠে বলিতেছে "নাহং ভক্ষিতবান্ অম্ব, সর্ব্বেতে মিথ্যাভাষিণঃ"—মা, আমি মাটি খাই নাই, এই বালকগণ সকলেই তোমাকে মিথ্যাকথা বলিতেছে,—বালকের বক্ষ ভয়ে স্পন্দিত হইতেছে, চোখের কাজল চোখের জলে ধুইয়া মুখটা কালিঝুলিমাখা একটা অপূর্ব্ব দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে,—এই বাৎসল্যরসের প্রকাশ অপরূপ, তুলনারহিত। কিন্তু বাৎসল্যরস একমাত্র মাতা যশোদারই শোভা পাইয়াছিল, সাধারণ মানুষের তো কথাই নাই, স্বয়ং পিতা নন্দও এই রসের সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন নাই। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভক্তগণ নিজগৃহে নাড়ুগোপাল, বালগোপাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাৎসল্যরসের অনুশীলন করিতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে খাঁটি বাৎসল্যরস হওয়া কঠিন, উপরন্তু ভাবের গোলমাল হইয়া সব হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এইরূপ ভক্ত নাড়ুগোপালের সেবা করিতেছেন আবার হয়ত রাসলীলা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। সব গোলমাল হইয়া যাইল—নাড়ুগোপাল ও রাসলীলার শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক অখণ্ড পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও ভাবজগতে ইহারা দুইজন বিভিন্ন পুরুষ। একজন অসহায়, স্নেহরসের উদ্রেককারী, অপরের প্রতি নির্ভরশীল বালকমাত্র, অপরজন বয়সে আট বৎসর মাত্র হইলেও স্বয়ং স্বতন্ত্র, লীলাময়, প্রেমরসের উদ্রেককারী মহান পুরুষ। অনেক প্রভেদ হইয়া যাইল, সুতরাং নাড়ুগোপালের ভজনা করিতে করিতে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিলে দুই কূলই হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। এমন অনেক উদাহরণের মধ্যে একটিমাত্র দেওয়া হইতেছে।

"ভক্তমাল" গ্রন্থে একজন বাৎসল্যরসসাধক ব্রাহ্মণের কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গোপালকে অসহায় বালকবোধে আদরযত্ন, লালন-পালন করিয়া থাকেন, স্নান করান, আহার করিবার সময় কাছে বসিয়া থাকেন, রাত্রে আপনার বক্ষে জড়াইয়া নিদ্রা যান। একদিন রাত্রে জানালার নিকট বিড়াল ডাকিতেছিল, বালগোপাল ভয়ে ব্রাহ্মণকে জড়াইয়া পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তখন গোপালকে

কোলের ভিতর দাবি ব্রাহ্মণ কহয়
না না না না ভয় নাই বিডাল ডাকয়॥

তবু গোপালের ভয় যায় না। তখন

মনে মনে ভাবে বিপ্র এ কি অদভূত
ত্রৈলোক্যের নাথ কৃষ্ণ ঈশ্বর অচ্যুত॥
দেবের দেবতা বিভু কালের যে কাল
ভয়ের যে ভয় হয় যমের করাল॥
বিড়ালের ডাকে ঞিহো ভয় পায় কেনে
মুগধ বালক প্রায় কান্দে কি কারণে॥

যাই বালগোপালের প্রতি ব্রাহ্মণের এইরূপ ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি আসিল তখনই তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মভাব গোলমাল হইয়া যাইল, বালগোপালের সাধনা নষ্ট হইল, ঈশ্বররূপেও শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি সুদূরপরাহত হইয়া দাঁড়াইল। তাই বাৎসল্যরসের সাধনাও কঠিন, দুই তিন ভাব একত্রে মিশিয়া যাইলে সর্ব্ব ভাবের হানি হওয়াই সম্ভবপর হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দাস্যভাবের সাধনায় সেইরূপ কোন আশঙ্কা দেখা যায় না।

মূলকথা এই যে মধুররস যুক্তিতর্কের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ রস, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলেন যে দাস্যরসের ভিতর শান্ত ও দাস্য উভয় রসই বিদ্যমান, সখ্যরসের ভিতর শান্ত, দাস্য ও সখ্য এই ত্রিবিধ রস নিহিত রহিয়াছে, বাৎসল্যের ভিতর শান্ত, দাস্য, সখ্য ও

বাৎসল্য এই চতুর্ব্বিধ রসই দেখিতে পাওয়া যায়, আবার মধুররসের ভিতর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসই বিদ্যমান। ইহা সত্য,—নিঃসন্দেহে সত্য। তথাপি মধুররস আদর্শই থাকিয়া যায়, কারণ রক্তমাংসগঠিত মানবশরীর এই মধুররস সাধনের অনুকূল নহে। কাম এবং প্রেম একাকার হইয়া ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে একমাত্র গোপীগণের জীবনেই সার্থক হইয়াছিল, অন্য কোথাও নহে। এমন কি মধুররসসাধক ভক্তপ্রবর শ্রীরূপগোস্বামীরও গোলমাল বাধিয়াছিল। পরমসাধিকা মীরা বাঈ বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর দর্শন প্রার্থনা করিলেন। শ্রীরূপ নারী দর্শন করিতে অস্বীকার করিলেন।

গোস্বামী কহেন মুই বনে করি বাস,
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ ॥

মীরা দেবী উত্তর পাঠাইলেন :

এতদিন শুনি নাই শ্রীধাম বৃন্দাবনে
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে ॥

শ্রীরূপ গোস্বামীর চৈতন্য হইল, তিনি লজ্জিত হইয়া মীরা বাঈয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনি ধন্য হইলেন, মীরা দেবীকেও ধন্য করিলেন। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মধুররসের সাধক শ্রীরূপ গোস্বামীরও আপনাকে পুরুষ বলিয়া বোধ ছিল, গোপীভাব তাঁহার মনকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিতে পারে নাই, যদি পারিত তাহা হইলে পুরুষ বলিয়া অভিমান তাঁহার থাকিত না। মূলকথা এই যে দাস্যভাবই সহজ ও নিরাপদ, বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠরস মধুররস কতিপয় ভাগ্যবানের জন্য, সকলের জন্য নহে। জন্মজন্মান্তর দাস্যভাব সাধন করিতে করিতে তবে হয়ত মানুষ মধুর রস সাধনের অধিকারী হইয়া থাকে। বড় ছোট লইয়া বিচার করা বৃথা, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, সেই মানুষই ভক্তপ্রবর,

সেই মানুষই আমাদের সকলেরই প্রণম্য। তাই উদ্ধবসংবাদ ভক্তগণের এত প্রিয়।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ সংক্ষেপে সংসার-বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া যদু ও এক অবধূতের সংবাদ বর্ণনপূর্ব্বক চতুর্ব্বিংশতি গুরুর বিষয় উপদেশ প্রদান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন যে, উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের লীলাসংবরণের কথা যাহা আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা সত্য,—শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই স্বীয় পরমধামে গমন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সমুদ্রঃ সপ্তমে হেতাং পুরীঞ্চ প্লাবয়িষ্যতি"—আজ হইতে সপ্তম দিবসে সমুদ্র এই দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করিয়া বিনষ্ট করিবে। তিনি পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে "লোকোঽয়ং নষ্টমঙ্গলঃ"—এই লোকসমূহের সমস্ত মঙ্গল বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং "কলিনাপি নিরাকৃতঃ"—কলি পৃথিবীকে আক্রমণ করিবে। সুতরাং ভক্ত উদ্ধবের আর গৃহস্থাশ্রমে থাকা উচিত নহে।

ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু
মষ্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্॥ ১১।৭।৬

—তুমি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এবং স্বজন ও বন্ধুগণের প্রতি মমতা বিসর্জ্জন দিয়া আমাতে মনোনিবেশপূর্ব্বক সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন কর।

তখন ভক্ত উদ্ধব বলিলেন,

ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ
সুতরাং ত্বয়ি সর্ব্বাত্মন্নভক্তৈরিতি মে মতিঃ॥ ১১।৭।১৫

—হে সর্ব্বব্যাপিন্, যাহাদিগের মন বিষয়ে আসক্ত, ভক্তি সাধন করিলেও তাহাদের পক্ষে বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করা দুষ্কর; আর যাহাদের ভক্তি নাই তাহাদিগের পক্ষে বিষয়পিপাসা অতিক্রম করা আরও সুকঠিন।

এই বলিয়া উদ্ধব "নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে"—অর্জ্জুনসখা নারায়ণ আপনার শরণাপন্ন হইলাম—বলিয়া সংসারবাসনা ত্যাগের সহজ উপায় জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। শরণাগতি ব্যতীত ঈশ্বর লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "শিষ্যস্তেঽহং, শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"—আমি তোমার অনুগত শিষ্য, আমি শরণাগত—তখন শ্রীকৃষ্ণ-মুখনির্গলিত গীতাতত্ত্বের সৃষ্টি হইল, তাহার পূর্ব্বে নহে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন যে, তিনি বহুবিধ জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু "তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া"—সমস্ত জীবগণের মধ্যে মনুষ্যশরীরই আমার প্রিয়। মনুষ্যদেহে এই আত্মার উদ্ধার বিষয়ে জ্ঞানীগণ ধর্ম্মজ্ঞ যদু ও এক ব্রাহ্মণ অবধূতের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, যদু ও অবধূতের কথোপকথন প্রসঙ্গে, বহু গুরুর নিকট বহু শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সপ্তম অধ্যায় হইতে নবম অধ্যায়ে বিবৃত করিতেছেন।

একদিন রাজা যদু যদৃচ্ছায় ভ্রমণ করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন—'বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ'—সেই ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ হইয়াও বালকের ন্যায় অভিমানশূন্য হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছেন। যদু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদাবাগ্নিনা,
ন তপ্যসেঽগ্নিনা মুক্তো গঙ্গাম্ভস্থ ইব দ্বিপঃ॥ ১১।৭।২৯

—দাবানলে জন্তুগণ দগ্ধ হইতে থাকিলেও দাবানলমুক্ত ও গঙ্গাজলস্থিত হস্তী যেমন অগ্নির দ্বারা তাপিত হয় না, সেইরূপ কাম ও লোভরূপ বাসনার অগ্নিতে সংসারীগণ দগ্ধ হইতে থাকিলেও আপনি বাসনানির্ম্মুক্ত হইয়া আনন্দে বিচরণ করিতেছেন। ইহা কিরূপে সম্ভব?

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, তিনি নিজ বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা বহুসংখ্যক জীবের নিকট হইতে বহুবিধ শিক্ষালাভ

করিয়াছেন, সুতরাং এই সকল জীব তাঁহার গুরুস্থানীয়। তাঁহার এইরূপ চতুর্ব্বিংশতি শিক্ষাগুরু আছেন। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত, অজগর, সাগর, পতঙ্গ, মধুকর, হস্তী, ব্যাধ, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যা, কুরর পক্ষী, বালক, কুমারী, বাণনির্ম্মাতা, সর্প, মাকড়সা ও কাঁচপোকা, ইহারাই তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি গুরু। ব্রাহ্মণ পৃথিবীর নিকট ক্ষমা, বায়ুর নিকট বিষয়সমূহের গুণদোষে নির্লিপ্ততা, আকাশের নিকট হইতে পরমাত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ও অসঙ্গ—ইহা শিক্ষা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ জলের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন যে মানুষের নির্ম্মল, স্নিগ্ধ ও মধুরবৃত্তি সম্পন্ন হওয়া উচিত। অগ্নি সর্ব্বদাই প্রদীপ্ত এবং শ্রদ্ধা অথবা অশ্রদ্ধায় প্রদত্ত আহার্য্যবস্তু সমভাবে গ্রহণশীল—ইহাই মানুষ অগ্নির কাছে শিক্ষা করিবে। যেমন চন্দ্রের কলাসমূহের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি নাই, সেইরূপ অলক্ষ্যগতি কালের দ্বারা দেহের জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, ও নাশ – এই ছয়টি ভাব ঘটিয়া থাকে, আত্মা কোনও পরিবর্ত্তনের অধীন নহে—এই শিক্ষা মানুষ চন্দ্রের নিকট গ্রহণ করিবে। সূর্য্য যেমন কিরণজালের দ্বারা জলরাশি আকর্ষণও করেন এবং যথাকালে বর্ষণ করেন অথচ সেই আকর্ষণ ও বর্ষণে সূর্য্য স্বয়ং আসক্ত হন না, সেইরূপ মানুষ অবস্থাবিশেষে বিষয় গ্রহণ ও বিষয়ত্যাগ করিয়াও আসক্তচিত্ত হইবে না,—ইহাই সূর্য্যের নিকট শিক্ষণীয় বিষয়। এক কপোতদম্পতি নিজ শিশু সন্তান-গুলির প্রতি অতিশয় মোহবশতঃ অবশেষে শিশুর সহিত নিজেরাও ব্যাধের কবলে পতিত হইয়া অতি দুঃখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। সংসারে প্রবল আসক্তি দুঃখপ্রদ, ইহাই কপোতের নিকট শিক্ষণীয়। জ্ঞানী ব্যক্তি অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চেষ্টাশূন্য হইয়া খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদ অথবা বিস্বাদই হউক, অধিক হউক বা অল্পই হউক, যদৃচ্ছাক্রমে যাহা উপস্থিত হইবে সেই খাদ্যদ্রব্যই ভোজন করিবেন। মানুষ সাগরের মত

বাহিরে প্রসন্ন, অন্তরে গম্ভীর হইয়া অবস্থান করিবে এবং সাগর যেমন বর্ষাকালে নদীজল প্রাপ্ত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করে না, গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায় না, সেইরূপ নারায়ণপরায়ণ লোক যথেষ্ট পাইয়া আনন্দিত অথবা অভাবে দুঃখিত হইবেন না। পতঙ্গ যেমন অগ্নির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে, সেইরূপ মানুষ রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নরকে পতিত হয়—পতঙ্গের জীবন হইতে এই শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ সাবধান হইবে। সঞ্চয়শীল মানুষের অনেক বিপদ—মধুমক্ষিকা মৌচাকে অতিরিক্ত মধু সঞ্চিত করিয়া অবশেষে বঞ্চিত হয়। বলবান্ হস্তী হস্তিনীর দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া মানুষের নিকট ধরা পড়ে এবং মানুষের দাসত্ব করিয়া থাকে, সেইরূপ স্ত্রীলোকের দ্বারা মোহিত হইয়া মানুষ ক্রীতদাসের ন্যায় দুর্ব্বহ জীবন যাপন করে। ইহাই হস্তীর নিকট শিক্ষণীয় বিষয়। ব্যাধ মৌমাছির সঞ্চিত মধু অপহরণ করে, সেইরূপ লোভী ও যক্ষবিত্ত মানুষের সঞ্চিত অর্থ অপরলোকে ভোগ করিয়া থাকে। হরিণ ব্যাধের গীতে মোহিত হইয়া জালে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ গ্রাম্যগীত বিষয়-ভোগোদ্দীপক সুতরাং পরিহার্য্য। মৎস্য খাদ্যদ্রব্যগ্রথিত বড়শীর দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করে, সেইরূপ মানুষের জিহ্বালালসা সর্ব্ববিধ অনিষ্টের আকর।

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাৎ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্,
ন জয়েৎ রসনং যাবৎ জিতং সর্ব্বং জিতে রসে ॥ ১১।৮।২১

—পুরুষ অপর ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়াও যে পর্য্যন্ত রসনেন্দ্রিয়কে জয় করিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। জিহ্বাকে জয় করিতে পারিলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জয় করা যায়।

অতঃপর পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যার নিকট ব্রাহ্মণ যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহাই বলিতেছেন। পূর্ব্বকালে বিদেহনগরে পিঙ্গলানাম্নী এক বেশ্যা বাস করিত। একদিন পিঙ্গলা বেশভূষা করিয়া বহির্দ্বারে আসিয়া ধনবান যুবকগণের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। কেহই আসে না, এইরূপে

"নির্গচ্ছন্তি প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত"—নিদ্রাশূন্যা পিঙ্গলার একবার ঘরের বাহিরে এবং আবার ভিতরে আসিতে আসিতে অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত হইল। অবশেষে "নির্ব্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ"—অর্থচিন্তা ও পাপচিন্তা হইতে তাহার সুখপ্রদ পরমবৈরাগ্য উপস্থিত হইল। সে ভাবিল,

যদস্থিভির্নির্ম্মিত বংশ বংশ্য-স্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্
ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্-বিন্মূত্র পূর্ণমদুপৈতি কান্যা ॥ ১১।৮।৩৩

—হাড়ের দ্বারা নির্ম্মিত যে পুরুষদেহরূপ গৃহ রহিয়াছে তাহা হস্ত-পদরূপ থামের উপর স্থাপিত, সেই দেহে বাঁশের মত বক্র একটা মেরুদণ্ড আছে, চর্ম্ম রোম ও নখসমূহের দ্বারা এই পুরুষ-দেহটি ঢাকা, এই দেহে ক্ষরণশীল নয়টি দ্বার বিদ্যমান আছে। এইরূপ বিষ্ঠামূত্র পরিপূর্ণ পুরুষ-দেহকে আমি ব্যতীত অপর কোন্ রমণী সুন্দর মনে করিয়া সেবা করিয়া থাকে? অতএব আমাকে ধিক্।

এইরূপে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করা স্থির করিয়া 'সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা'—পিঙ্গলা সুখে রাত্রিতে নিদ্রা যাইয়াছিল। এই পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যা ব্রাহ্মণের অপরতম শিক্ষাগুরু।

কুরর পক্ষীর নিকট যতক্ষণ আমিষ ছিল ততক্ষণ অন্যান্য বলবান্ পক্ষীরা তাহাকে আক্রমণ করিতেছিল, আমিষ পরিত্যাগ করামাত্র কুরর পক্ষী নিশ্চিন্ত হইল। "পরিগ্রহো হি দুঃখায়"—বিষয় সংগ্রহ করাই দুঃখের কারণ,—ইহা ব্রাহ্মণ কুরর পক্ষীর নিকট শিক্ষা করিয়াছেন। বালক অভিমানশূন্য, বালককে দেখিয়া ব্রাহ্মণ মান-অপমান চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কুমারীর হস্তে শঙ্খবলয়ের শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিলেন যে, বহু শঙ্খ থাকিলে কোলাহল, কিন্তু একটি মাত্র শঙ্খ থাকিলে যেমন শব্দ হয় না সেইরূপ বহুজনের সঙ্গ করিলে বৃথাবাক্য এবং কলহ উপস্থিত হয়, সুতরাং একাকী বাস করা ভগবৎভজনের পক্ষে

নিরাপদ ও অনুকূল। বাণনির্ম্মাতার মন একাগ্রনিষ্ঠ, তাহার পার্শ্ব দিয়া রাজা চলিয়া যাইলেও সে তাহা লক্ষ্য করে না,—এইরূপ একাগ্রতা বাণ-নির্ম্মাতার নিকট শিক্ষণীয়। সর্প একাকী বিচরণকারী ও গৃহহীন অথচ সতত সাবধান। সর্পের এইরূপ জীবন শিক্ষাপ্রদ। মাকড়সা যেমন নিজ হৃদয় হইতে উৎপন্ন লালার দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করতঃ পুনরায় সেই লালা গ্রাস করিয়া লয়, সেইরূপ পরমেশ্বর নিজ শক্তির দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতর বিহার করতঃ পুনরায় তাহার উপসংহার করিয়া থাকেন। কাঁচপোকার নিকট ব্রাহ্মণ যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা বলিয়া তিনি চতুর্ব্বিংশতি শিক্ষাগুরুর কথা শেষ করিতেছেন। কাঁচপোকা অপর দুর্ব্বল পোকাকে নিজ গর্ত্তে লইয়া যায় এবং তাহার ভয়ে তাহার দেহচিন্তা করিতে করিতে ক্ষুদ্র কীটটি দেহত্যাগ না করিয়াও কাঁচপোকার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ ভগবানের রূপগুণলীলা চিন্তা করিতে করিতে মানুষ তদ্‌ভাবভাবিত হইয়া তদাকারকারিত হইয়া যায়। ইহাই কাঁচ-পোকার নিকট হইতে শিক্ষণীয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বিংশতি শিক্ষাগুরুর কথা বলিয়া মনুষ্যদেহে কৃষ্ণভজনই একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাই বলিতেছেন।

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্
খগদংশমৎস্যান্,
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং
মুদমাপ দেবঃ॥
লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্য-
মপীহধীরঃ,
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ
খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ ১১।৯।২৮,২৯

—ভগবান পরমেশ্বর নিজশক্তি প্রকৃতির দ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, দংশ ও মৎস্য প্রভৃতি বিবিধ জীবশরীর সৃষ্টি করিয়া সেই সেই

শরীরের দ্বারা সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যশরীর সৃষ্টি করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন।

মনুষ্যজন্ম অনিত্য ও সতত মৃত্যুসম্ভাবিত হইলেও পুরুষার্থপ্রদ। এই জগতে বহু জন্মের পরে তাদৃশ সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ধীর ব্যক্তি, যে পর্য্যন্ত এই দেহ পতিত না হয় তাহার মধ্যেই শীঘ্র মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করিবেন। ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয়সমূহ সকল জন্মেই পাওয়া যায়, সুতরাং দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া বিষয়ে আসক্ত না হইয়া মোক্ষলাভের জন্যই যত্ন করা উচিত।

অতঃপর দশম অধ্যায়ে নানাবিধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া শেষ শ্লোকে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"নিত্যবদ্ধো নিত্যমুক্ত এক এবেতি মে ভ্রমঃ" —আপনার অংশভূত জীবাত্মাসকলের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যমুক্ত এবং কেহ বা নিত্যবদ্ধ হয় কেন, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ একাদশ অধ্যায়ে উদ্ধবের সংশয় মোচন করিবার জন্য বলিলেন, জীব সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণের জন্য বদ্ধ এবং শ্রীহরির দয়ায় মুক্ত হইয়া থাকে,—ইহাই সিদ্ধান্তবাক্য। জীব নিজ হইতেই মুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু গুণত্রয় শ্রীহরির প্রকৃতিমূলক বলিয়া তাঁহার নিজের মোক্ষও নাই, বন্ধনও নাই। শ্রীহরির ইচ্ছায় প্রবর্ত্তিত আদ্যাশক্তি বিদ্যা মোক্ষের কারণ এবং অবিদ্যা বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে "অনিত্য অশুচি দুঃখ অনাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা"—অর্থাৎ অনিত্য বিষয়বস্তুতে নিত্যজ্ঞান, অশুচি পদার্থে শুচিজ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান এবং অনাত্ম দেহাদিতে আত্মপ্রতীতির নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই মানুষের বন্ধনের একমাত্র কারণ। যদি কেহ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে মন নিশ্চল ভাবে ধারণ করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে কর্ম্মফলের আশা না করিয়া মনঃশোধক কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করা উচিত। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে শ্রীহরির লীলাকথা শুনিতে হইবে এবং এইরূপে ভক্তি উৎপন্ন

হইলে সৎসঙ্গ লাভ করিয়া জীব নিত্যধামে গমন করিতে সমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া যজ্ঞাদি ও জলাশয় খননাদি নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, তাহার সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং সেই সাধুসঙ্গ হইতে শ্রীহরিবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার ফলে সেই ব্যক্তি উত্তম ভক্তিভাব লাভ করিয়া থাকে। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব,
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥ ১১।১১।৪৮

—হে উদ্ধব, সৎসঙ্গলব্ধ ভক্তিযোগ ব্যতীত আমাকে পাইবার উপায় আর কিছুই নাই, কারণ আমিই সাধুগণের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশ অধ্যায়ে সৎসঙ্গের মহিমা, ভগবৎশরণাগতি ও শরণ্য ভগবানের সর্ব্বাত্মতা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্নেহভরে উদ্ধবকে বলিলেন, "সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা"—তুমি আমার ভক্ত, সুহৃৎ ও সখা। অতএব পরম গোপনীয় হইলেও তোমার নিকট সৎসঙ্গের রহস্য বর্ণনা করিব। সৎসঙ্গ যেরূপ শ্রীহরিকে বশীভুত করিতে পারে, যোগ, বেদাভ্যাস, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যজ্ঞ, জলাশয়-খনন, দান, ব্রত, দেবপূজা, গোপনীয় মন্ত্র, তীর্থসমূহ, যমনিয়মসমূহ শ্রীহরিকে তত সহজে ও গভীরভাবে জীবের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারে না। গোপীগণ মুহূর্ত্তকাললব্ধ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করিয়া এবং তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করিয়া পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে চিরদিনের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শরণাগতি এইরূপ চিরকল্যাণপ্রদ। অতএব

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্,
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥ ১১।১২।১৫

—সমস্ত জীবগণের আত্মাস্বরূপ আমার প্রতি যদি কেহ আত্মনিবেদন করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে ভয়শূন্য হইতে পারিবে।

অতঃপর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বুদ্ধির,—আত্মার নহে। অতএব সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণকে বিনাশ করিয়া এবং অবশেষে শমদমাদি অভ্যাসের দ্বারা সত্ত্বগুণকেও অভিভূত করিয়া মানুষ ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। এই উপদেশ উদ্ধবের মনে দৃঢ় করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আপনার হংসাবতারের ইতিহাস বর্ণনা করিলেন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা ও ধ্যানযোগ বর্ণনা করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়াঃ দিশঃ ॥ ১১।১৪।১৩

—যিনি অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচিত্ত ও আমাকে পাইয়া সন্তুষ্ট চিত্ত হন, সেই ব্যক্তির সমস্ত দিক্ সুখময় হইয়া উঠে। কিন্তু—

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ,
যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংস স্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ১১।১৪।৩০

—স্ত্রীসঙ্গ করিলে এবং স্ত্রীসঙ্গকারী মানুষের সঙ্গ করিলে জীবের যে-প্রকার ক্লেশ ও বন্ধন হয়, অন্য পুরুষের সঙ্গ হইতে তদ্রূপ বন্ধন মানুষের হয় না।

অতঃপর ভক্ত উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে যেরূপ মূর্ত্তিতে এবং যে স্বরূপে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই ধ্যানযোগ বর্ণনা করিলেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অণিমাদি যোগসিদ্ধি বর্ণনকালে বলিলেন যে, "ময়ি ধারয়তশ্চেতঃ উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ"—আমাতে সমাহিতচিত্ত যোগীর নিকট অণিমা, লঘিমা, পরকায়প্রবেশ, ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতি সিদ্ধিসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু,

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতাঃ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্,
ময়াসম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥ ১১।১৫।৩৩

—যিনি মুক্তিকামী ও সতত শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত সেই মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে সিদ্ধিসমূহ অন্তরায় স্বরূপ, কারণ এই সকল সিদ্ধি বৃথা সময়নাশের কারণ। সুতরাং মুমুক্ষু যোগীর এই সকল সিদ্ধি উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎবিভূতিসমূহ বর্ণনা করিতেছেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিসমূহ জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বলিলেন যে উদ্ধব তাঁহাকে যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন তাঁহাকে অনুরূপ প্রশ্নই করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যে সমস্ত নিজ বিভূতির কথা বলিলেন তাহা গীতায় দশম অধ্যায়ে বর্ণিত বিভূতিযোগের অনুরূপ। এই সকল সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, ভক্ত উদ্ধব বিভূতি সমূহের সংখ্যা ও বিস্তার শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়াছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন যে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়া উদ্ধবের ভীতির কোন কারণ নাই; তিনি সহজ উপায় অবলম্বন করিয়াই জন্ম-মরণপ্রবাহরূপ সংসারপথ অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণিচ,
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে ॥
যো বৈ বাঙ্মনসী সম্যক্ অসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ,
তস্য ব্রতং তপোদানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ ॥ ১১।১৬।৪২,৪৩

—উদ্ধব, তুমি বাক্য সংযত কর, মন সংযত কর, ইন্দ্রিয়সমূহ ও প্রাণ সংযত কর এবং বিশুদ্ধ মনের দ্বারা বুদ্ধি সংযত কর। এইরূপ করিলে তুমি পুনরায় জন্মমরণরূপ সংসারপথে পতিত হইবে না।

যে সন্ন্যাসী বিশুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা বাক্য ও মনকে সম্যক্‌রূপে সংযত না করিয়া সাধনভজনের চেষ্টা করেন,—"তস্য ব্রতং তপোদানং স্রবত্যামঘটাম্বুবং"—কাঁচামাটির ঘটে রক্ষিত জলের মত সেই সাধকের ব্রত, তপস্যা ও দান ক্ষয় হইয়া যায়।

এইস্থলে বিশেষরূপে পরিলক্ষণীয় যে জিহ্বাসংযমকেই সাধন ভজনের প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তর বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

সপ্তদশ অধ্যায়ে ভক্তির উদ্বোধক ব্রহ্মচারিধর্ম্ম ও গৃহস্থধর্ম্ম বর্ণনা করা হইতেছে। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে, পূর্ব্বে যে ভক্তিযোগের কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন তাহা বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত ও বর্ণাশ্রমাচারবিহীন সকল মনুষ্যের জন্যই সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। এক্ষণে মনুষ্যগণ নিজ নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে তাহার দ্বারা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিলাভ করিয়া থাকে তাহাই উদ্ধব বিশেষভাবে জানিতে চাহিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী জটাধারণ করিবেন, দন্তমার্জ্জন ও বস্ত্রপ্রক্ষালন করিবেন না এবং রঞ্জিত আসনে উপবেশন করিবেন না। তিনি কখনও স্বয়ং বীর্য্যপাত করিবেন না, স্বপ্নাদি দোষবশতঃ বীর্য্যপতন হইলে জলে অবগাহন-স্নান করিয়া প্রাণায়াম করতঃ গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিবেন। তিনি আচার্য্যকে মৎস্বরূপ বলিয়া জানিবেন, কখনও মনুষ্যবোধে তাঁহার উপর দোষারোপ করিবেন না। কারণ, 'সর্ব্বদেবময়োগুরুঃ'—গুরু সর্ব্বদেবময়। এই উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করিয়া অবশেষে অধ্যয়ন শেষ হইলে গুরুকে দক্ষিণাপ্রদানপূর্ব্বক গুরুর অনুমতি লইয়া অঙ্গে তৈলাদি মর্দ্দন পূর্ব্বক সমাবর্ত্তন-স্নান করিবেন এবং অবশেষে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী চিরজীবনের জন্য ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিবেন। তিনি অগ্নি, গুরু, নিজের আত্মা ও সর্ব্বভূতে পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া ভেদবুদ্ধি বিহীন হইয়া বাস করিবেন। তাঁহার পক্ষে সর্ব্বকালে রমণীদর্শন, স্পর্শন, আলাপন, ও স্মরণ পরিত্যাজ্য। গৃহস্থগণ সবর্ণা, অনিন্দিতা ও বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবেন। গৃহস্থব্যক্তি প্রতিদিন অন্নজলাদি প্রদানের দ্বারা যথাক্রমে ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ ও মনুষ্যগণকে পূজা করিবেন, এইরূপ নিত্য পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান গৃহীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এইরূপ পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার জন্য পোষ্যবর্গের ভরণপোষণে কোনরূপ কার্পণ্য প্রদর্শন করিবেন না,—পোষ্যবর্গের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করিয়া তবে অবশিষ্ট অর্থের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ সমাপন করিবেন। ভক্তিমান গৃহস্থ গার্হস্থ্য-আশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহের দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করতঃ গৃহস্থাশ্রমেই বাস করিবেন। তিনি 'গৃহেম্বতিথিবদ্বসন্'—গৃহে অতিথির ন্যায় উদাসীনভাবে মমতাশূন্য ও অহঙ্কারবিহীন হইয়া বাস করিবেন। কারণ,

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ,
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা ॥ ১১।১৭।৫৩

—নানাদিক্-দেশ হইতে আগত পথিকগণের পথিমধ্যে মিলন যেমন ক্ষণস্থায়ী, সেইরূপ পুত্র, পত্নী, স্বজন ও বন্ধুগণের মিলনও স্বল্পকাল স্থায়ী। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইলে যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট মিলন মিথ্যা হইয়া যায় সেইরূপ, পুত্র, পত্নী, স্বজন ও বন্ধু-নামক দেহগুলি বিনষ্ট হইলে জীবনের সেই মিলন মৃত্যুর পর মিথ্যা হইয়া যায়।

অতএব গৃহস্থগণ সর্ব্বদা মমতাবর্জ্জিত হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিলে শ্রীহরির প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হইবে, অন্যথায় গৃহস্থজীবন বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ গৃহস্থগণকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন,

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যাবালাত্মজাত্মজাঃ,
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্ত হৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ ॥ ১১।১৭।৫৭,৫৮

—গৃহে আসক্তচিত্ত মূঢ়ব্যক্তি—"আহা, আমার বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশুসন্তানসমন্বিতা পত্নী ও পুত্রকন্যাগুলি আমাকে হারাইয়া রক্ষকবিহীন, দুঃখিত ও কাতর হইয়া কি প্রকারে জীবনধারণ করিবে?"—এইরূপ

চিন্তাগ্রস্ত হইয়া আত্মীয়গণের কথাই নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ঘোর তামসী যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে বানপ্রস্থধর্ম্ম ও সন্ন্যাসধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক গৃহস্থব্যক্তি পত্নীর ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার পুত্রগণের উপর ন্যস্ত করিয়া অথবা পত্নীর সহিত একত্র জিতেন্দ্রিয় হইয়া—"বনে এব বসেৎ শান্তঃ তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ"—আয়ুর তৃতীয় ভাগ, পঞ্চাশ হইতে পঁচাত্তর বৎসর পর্য্যন্ত, বনেই বাস করিবেন। তিনি গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে স্থাপিত চারি অগ্নি ও সূর্য্য এই পঞ্চতাপে দেহকে তাপিত করিবেন, বর্ষাকালে জলধারা সহ্য করিবেন এবং শীতকালে জলে আকণ্ঠনিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিবেন। কিন্তু "ন তু শ্রৌতেন পশুনা মাং যজেত বনাশ্রমী"—বানপ্রস্থ ব্যক্তি কখনই বেদবিহিত পশুর দ্বারা আমার উদ্দেশে যজ্ঞ করিবেন না। সন্ন্যাসী ব্যক্তি কৌপীন পরিধান করিবেন। মৌন, চেষ্টাশূন্যতা ও প্রাণায়াম, এই তিনটি যথাক্রমে বাক্য, শরীর ও মনের দণ্ড। যাঁহার এই সকল দণ্ড অর্থাৎ সংযম নাই, তিনি কেবলমাত্র বংশদণ্ড ধারণ করিয়াই সন্ন্যাসী হইতে পারেন না—'বেণুভি র্ন ভবেৎ যতিঃ'। মহাভারতে বনপর্ব্বে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে অনুরূপ কথাই উল্লিখিত হইয়াছে—'সর্ব্বাণ্যেতানি মিথ্যা স্যুর্যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ'—সন্ন্যাসীর মনের ভাব নির্ম্মল না হইলে বাহিরের সন্ন্যাসচিহ্ন সমস্তই নিষ্ফল। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন যে, সন্ন্যাসী সাতটি গৃহে ভিক্ষা করিবেন এবং সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের দ্বারাই দেহধারণ করিবেন।

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ, কুশলো জড়বৎ চরেৎ,
বদেৎ উন্মত্তবৎ বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥ ১১।১৮।২৯

—সন্ন্যাসী সর্ব্বসিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ হইয়াও বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিবেন, ধ্যানাদিতে নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন,

পণ্ডিত হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় কথা বলিবেন এবং বেদনিষ্ঠ হইয়াও বৃষের ন্যায় অর্থাৎ অনিয়তাচারীর ন্যায় আচরণ করিবেন।

এইরূপ সন্ন্যাসী—'শুষ্কবাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ'—বৃথা তর্কবিতর্কে কোনপক্ষই অবলম্বন করিবেন না, তিনি 'অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন'—অপরের দুর্ব্বাক্য সকল সহ্য করিবেন এবং নিজে দুর্ব্বাক্যের দ্বারা কাহারও মনে পীড়া দিবেন না, সময়ে সময়ে খাদ্যদ্রব্য না পাইলে সন্ন্যাসী বিষণ্ণ হইবেন না এবং আহার পাইলেও আনন্দ প্রকাশ করিবেন না। অবশ্য—'আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎপ্রাণধারণম্'—আহার সংগ্রহের জন্য সন্ন্যাসী চেষ্টা করিবেন, কারণ তাঁহার প্রাণধারণ ভগবৎ-চিন্তনের জন্য, সুতরাং তাঁহার প্রাণধারণ করা প্রয়োজন ও সার্থক। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে উদ্ধবকে বলিলেন যে, শ্রীহরির প্রতি নিষ্ঠা ও অহিংসা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তপস্যা ও তত্ত্ববিচার বানপ্রস্থের ধর্ম্ম, প্রাণিগণের রক্ষা ও যজ্ঞানুষ্ঠান গৃহস্থের ধর্ম্ম এবং আচার্য্যের সেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। এইরূপে সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বাশ্রমীগণ শ্রীহরিকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম আচরণ করিলে —'মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াং'—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

উনিশ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উপদেশ এবং যম-নিয়মাদির লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,

দষ্টং জনং সম্পতিতং বিলেঽস্মিন্ কালাহিনাক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষম্,
সমুদ্ধরৈনং কৃপয়াপবর্গ্যৈর্বচোভিরাসিঞ্চ মহানুভাব!

১১।১৯।১০

—হে মহানুভাব শ্রীকৃষ্ণ, সংসারকূপে নিপতিত, কালরূপ সর্প কর্তৃক দষ্ট ও বিষয়সুখে অতিশয় তৃষ্ণাসম্পন্ন আমাকে আপনি কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন এবং মোক্ষসাধক জ্ঞানভক্তিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবসান হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির সুহৃদ্‌বর্গের নিধনে বিহ্বল হইয়া শরশয্যায় শায়ীন ভীষ্মকে মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে উদ্ধবের প্রশ্নের অনুরূপ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের মুখ হইতে যে সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাই এখন উদ্ধবের নিকট বর্ণনা করিতেছেন। এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বিনয় পরিলক্ষণীয়। যিনি স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধা, যাঁহার জ্ঞানের আভাসমাত্র পাইয়া ত্রিভুবন জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি বলিতেছেন যে, ভীষ্মের মুখে শ্রবণ করিয়া তিনি যে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহাই এখন ভক্ত উদ্ধবকে শ্রবণ করাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের কথা কিছুই বলিতেছেন না, তিনি পরমজ্ঞানী ভীষ্মের নিকট হইতে পরিজ্ঞাত উপদেশ সমূহের পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হয়ত আর কিছু না বলিলেও এই বিনয় দেখিয়াই উদ্ধবের চৈতন্য হইত! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মসমূহের ফলকে পরিণামত্বহেতু অনিত্য ও অমঙ্গলস্বরূপ বলিয়া দর্শন করিবেন। এমন কি, স্বর্গাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত ফলপ্রাপ্তিই অনিত্য এবং পরম পুরুষের অনুভূতির পরিপন্থী। শাস্ত্রকারগণ শ্রীহরির প্রতি ভক্তিসূচক কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই জ্ঞান বলিয়াছেন, বিষয়সমূহে অনাসক্তিকেই বৈরাগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধিকে ভগবানের ঐশ্বর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, অসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা ও অভয়—এই দ্বাদশটি যম, এবং বাহ্যিক শৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, অর্চ্চনা, তীর্থপর্য্যটন, পরোপকার, ব্রত, সন্তোষ, ও গুরুসেবা—এই দ্বাদশটি নিয়ম। বিষয়সুখের আশা করিলে দুঃখ পাইতে হয়, যাহার দেহাদিতে অহংমমাভিমান

আছে সে মূর্খ, তর্ক করিবার কণ্ডূয়ন কুপথ, অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই দরিদ্র, এবং যাহার বুদ্ধি অনাসক্ত সেই ব্যক্তিই স্বাধীন।

বিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উদ্ধবকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ ১১।২০।৬

—হে উদ্ধব, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, মোক্ষপ্রাপ্তির এই তিন প্রকার উপায় আছে। এই তিনটি ব্যতীত অন্য উপায় আর কিছুই নাই।

কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে যাহাদের আগ্রহ নাই এবং বাসনা প্রভৃতি অন্তঃকরণের মলিনতা যাহাদের দূরীভূত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ। যাহাদের কর্ম্মের প্রতি আসক্তি আছে অথচ চিত্তশুদ্ধি করিতে অভিলাষী, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগই উপায়। আর যাহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায় শ্রদ্ধাশীল অথচ কর্ম্মের প্রতি আসক্ত অথবা উদাসীন নহে, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্ত ও কর্ম্মীর ভগবান সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ; জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম ও ভক্তি একই পরমপুরুষের নিকট যাইবার বিভিন্ন পথ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ১১।২০।৯

—যে পর্য্যন্ত বৈরাগ্য সঞ্চার না হয়, এবং আমার লীলাকথা শ্রবণ করিতে যে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবে।

এই মনুষ্যদেহে জ্ঞান ও ভক্তিসাধন করা সম্ভব বলিয়া মনুষ্যজন্ম দেবজন্ম হইতেও দুর্ল্লভ।

স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা,
সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যাং উভয়ং তদসাধকম্ ॥ ১১।২০।১২

—নরকবাসীগণ ও স্বর্গবাসী দেবগণ উভয়েই মনুষ্যদেহ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, কারণ মনুষ্যদেহে জ্ঞান ও ভক্তিসাধনের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভবপর। স্বর্গবাসী দেবগণের দেহ ও নরকবাসীর দেহ মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল নহে।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায় যাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তাহার কর্ম্মের প্রতি উদাসীনতাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়সংস্পর্শ দুঃখপ্রদ জানিয়াও যদি সেই ব্যক্তি বিষয় পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে বিষয়সমূহ ভোগ করিবার কালে তাহার স্মরণ রাখা উচিত যে, এই বিষয়সমূহ উত্তর কালে দুঃখপ্রদ, তাহার বিশ্বাস রাখা উচিত যে ভগবদ্ ভজনের দ্বারা তাহার জ্ঞানভক্তির উদয় একদিন অবশ্যই হইবে। কামনা বাসনা সত্ত্বেও ভক্তিযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি নিরন্তর শ্রীহরির ভজনা করে তাহার "কাম্যাঃ হৃদয্যাঃ নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে"—হৃদয়ে আমি আবির্ভূত হইয়া তাহার সমস্ত কামনা বাসনা দূর করিয়া দিই। শ্রীহরি সকল কামনাহরণ তাই তিনি হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ,
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥১১।২০।৩০

—নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মাস্বরূপ আমাকে দর্শন করিলে ভক্তের 'অহংমমাভিমানরূপ' হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, তাহার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়, এবং তাহার কর্ম্মসমূহ নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

উপরে উল্লিখিত শ্লোকটি উপনিষদ্ হইতে গৃহীত, কেবলমাত্র শেষের "ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি" কথাগুলির পরিবর্ত্তে উপনিষদে আছে "তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"—ভাষার সামান্য পরিবর্ত্তন, ভাব সম্পূর্ণ এক। অবশেষে ভক্তিযোগের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ,
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তি যোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি ॥ ১১।২০।৩২,৩৩

—মানুষ কর্ম্মসমূহের দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হয়, তপস্যার দ্বারা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য সাধনের দ্বারা, যোগের দ্বারা, দানধর্ম্মের দ্বারা এবং তীর্থবাসাদি অপর মঙ্গলকর উপায়সমূহের দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হয়, আমার ভক্ত যদি বাঞ্ছা করে তাহা হইলে একমাত্র মদীয় ভক্তিযোগের দ্বারাই সেই সমস্ত অনায়াসে লাভ করিতে পারে; এমন কি স্বর্গ, মোক্ষ ও মদীয় ধাম বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিও তাহার পক্ষে সহজ।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, ভক্তিযোগ সাধনের দ্বারা স্বর্গ ও মুক্তিলাভ স্বলভ হইলেও শুদ্ধ ভক্ত তাহা আশা বা প্রার্থনা করেন কি না। নিশ্চয়ই না। সমগ্র শ্রীভাগবতের শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেনা-পাওনা সম্বন্ধস্থাপনের প্রতিবাদী। শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার প্রসিদ্ধ “ভক্তিরসামৃত সিন্ধু” গ্রন্থে বলিয়াছেন,

ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাস্য কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

—বিষয়ভোগ অথবা মুক্তির স্পৃহা যতক্ষণ মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করে ততক্ষণ পরম সুখময়ী ভক্তির উদয় সম্ভবপর নহে।

ভক্তিলাভই ভক্তিসাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ভক্তিসাধকের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, যদি থাকে তাহা হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী। অনেক সময় দেখা যায়, ভক্তি-ভেকধারী মানুষের অবচেতন মন লাভ, পূজা, মান ও প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ইহা আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র। শাস্ত্র তাই মানুষকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন ঃ

অভিমানং সুরাপানং, গৌরবং রৌরবৈঃ সমম্,
প্রতিষ্ঠা শৌকরী বিষ্ঠা, ত্রয়ং ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ ॥

—ভক্তিসাধকের পক্ষে প্রতিষ্ঠার লোভ সুরাপানের মত গর্হিত, গৌরবের ইচ্ছা নরকের দ্বারস্বরূপ, প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠার ন্যায় তুচ্ছ ; অতএব এই তিনটির লোভ পরিত্যাগ করিয়া তবে হরিভজন আরম্ভ করিতে হয়।

একবিংশ অধ্যায়ে দেশ, কাল ও দ্রব্যসমূহের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

য এতান্ মৎপথো হিত্বা ভক্তিজ্ঞান-ক্রিয়াত্মকান্,
ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈঃ জুষন্তঃ সংসরন্তি তে ॥
স্বেস্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাৎ উভয়োরেষঃ নির্ণয়ঃ ॥ ১১।২১।১,২

—হে উদ্ধব, যে সকল ব্যক্তি আমাকর্ত্তৃক কথিত ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মাত্মক উপায়সমূহ পরিত্যাগ করিয়া চঞ্চল ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা তুচ্ছ বিষয়সমূহ ভোগ করে তাহারা জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারে পতিত হইয়া নানাবিধ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী নিষ্ঠাই গুণ, আর অপরের অধিকারে যে অবস্থিতি তাহাই দোষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। গুণ ও দোষের ইহাই নির্ণয়।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসার-মৃগবিহীন ও ব্রাহ্মণ-ভক্তবিহীন দেশ অশুদ্ধ, আসন, পাত্র ও বস্ত্র অশুদ্ধ হইলে ঘর্ষণ ও জলসেচনের দ্বারা তাহাদের শুদ্ধি, স্নান, দান ও ভগবৎ-স্মরণের দ্বারা আত্মার শুদ্ধি, গুরুমুখ হইতে শ্রুত মন্ত্রজ্ঞানের দ্বারা মন্ত্রের শুদ্ধি, শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বফল সমর্পণের দ্বারা কর্ম্মশুদ্ধি বর্ণনা করিয়া বলিলেন,

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্
শ্রেয়ো বিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্য রোচনম্ ॥ ১১।২১।২৩

—বেদ বলেন যে 'স্বর্গকামো যজেত'—স্বর্গকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে, কিন্তু বেদোক্ত এই ফলশ্রুতি মনুষ্যগণের পরম প্রাপ্য ফলকে জানাইয়া দিতেছে না। কিন্তু বহির্মুখ মনুষ্যগণকে মোক্ষরূপ পরম প্রাপ্য ফলের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য বেদে ঐরূপ ফলশ্রুতি উক্ত হইয়াছে। যেমন তিক্ত ঔষধ সেবনে বালকের রুচি উৎপাদনের জন্য মিষ্ট দ্রব্য প্রদান করিতে হয়, সেইরূপ বেদে স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ফলকীর্ত্তন কেবল বহির্মুখ মনুষ্যগণের কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের নিমিত্তই করা হইয়াছে। বেদ স্বর্গাদি ফলের দ্বারা প্রলোভিত করিয়া মনুষ্যগণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন। কেননা কর্ম্মানুষ্ঠানে মনুষ্যগণের চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হইবে এবং তাহার ফলে মনুষ্যগণ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন যে, মানুষেরা নিত্যসুখ কি তাহা জানে না সুতরাং তাহারা কর্ম্মাসক্তিবশতঃ উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মজন্মান্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। বেদ কখনও এই সমস্ত মানুষকে অহিতকর কাম্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন না। কোন কোন মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া বহির্মুখ ব্যক্তিগণের নিকট স্বর্গাদি রমণীয় প্রাসঙ্গিক ফলকেই পরম ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। তাহারা বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত নহে। এইরূপ কুশিক্ষা-প্রচারের ফলে মূর্খ ব্যক্তিগণ বিষয়াভিলাষী, বিষয়-চিন্তায় কাতর ও বিষয়-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া আপাতরমণীয় প্রাসঙ্গিক ফলকেই মুখ্যফল বলিয়া গ্রহণ করে, এবং অগ্নিসাধ্য কাম্যকর্ম্মসমূহের আসক্তিতে বিবেকহীন হয় এবং যে মার্গে গমন করিলে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, সেই ধূমমার্গই অন্তকালে তাহাদিগের আশ্রয় হইয়া থাকে। যে মার্গে গমন করিলে সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহারা সেই অর্চ্চিরাদি

মার্গের প্রাপ্য পরম লোককে জানিতে পারে না। এই সকল হতভাগ্য লোক শ্রুতিমধুর ও স্বপ্নের ন্যায় অনিত্য স্বর্গাদি পরলোক এবং ঐহিক বিষয়ভোগ হৃদয়ে কামনা করিয়া বণিকের ন্যায় যজ্ঞাদিকর্ম্মে অর্থব্যয় করতঃ বৃথা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে আপাত-রমণীয় বেদবাক্যের ভ্রান্ত অর্থবাদের দ্বারা যাহাদিগের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় সেই 'মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে'—দেহাত্মাভিমানী অতিলুব্ধ মনুষ্যগণের শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথায় রুচি উৎপন্ন হয় না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়ে তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ মতের বিরোধ ও তাহার নিরসন বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রকৃতি প্রভৃতি শক্তিসমূহের স্বরূপ বুঝিতে পারেন না বলিয়া "তুমি যে প্রকার বলিতেছ, ইহা সেইরূপ নহে, আমি যাহা বলিতেছি তাহাই ঠিক"—এইরূপ বাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের শমগুণ ও দমগুণ উপস্থিত হইলে মতভেদ দূরীভূত হইয়া যায়, সুতরাং বিবাদও নিরস্ত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, মনুষ্যগণের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রবিশিষ্ট মনঃপ্রধান সূক্ষ্মদেহ মৃত্যুর পর এক স্থূলদেহ হইতে অপর স্থূলদেহে গমন করে, আর এই সূক্ষ্মদেহ হইতে ভিন্নস্বরূপ আত্মা তাহার অনুবর্ত্তন করে। "জন্তোর্ব্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ"—কোনও কারণে দেহের বিয়োগ ও পূর্ব্বদেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃতিই জীবের মৃত্যু। দেহাত্মাভিমানী জীবের দেহবিয়োগই মৃত্যু এবং সম্পূর্ণরূপে দেহে আত্মাভিমানই জীবের জন্ম। অবিবেকী ব্যক্তি কর্ম্মসমূহের দ্বারা চালিত হইয়া কখনও কখনও সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিহেতু ঋষিযোনি ও দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, কখনও বা তমোগুণের দ্বারা ভূতযোনি ও পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ মনঃসংযমের উপায় সম্বন্ধে উদ্ধবকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। মালবদেশে ধনাঢ্য এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, কৃষি

বাণিজ্যাদি তাঁহার জীবিকা ছিল, তিনি অর্থব্যয়ের ভয়ে ধর্ম্ম কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অর্থসঞ্চয়ের লোভে স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে ও আপনাকে সর্ব্ববিধ সুখ স্বচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত করিয়া সর্ব্বদাই অর্থসঞ্চয়ে মনঃসংযোগপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। "প্রায়েনার্থঃ কদর্য্যানাং ন সুখায় কদাচন" —কৃপণদের অর্থ প্রায়ই সুখের কারণ হয় না, সেইজন্য "শ্বিত্রোরূপমিবেপ্সিতম্"—ধবলকুষ্ঠ যেমন মানুষের সমস্ত রূপ বিরূপ করিয়া দেয়,— এই ব্রাহ্মণের কৃপণতাই তাহার সমস্ত সুখ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্ত অর্থ ক্ষয় হইয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের এই বিলাপ ভাগবতে "ভিক্ষুগীতা" নামে প্রসিদ্ধ। সেই ব্রাহ্মণ দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া অবশেষে মননশীল শান্ত ভিক্ষুর জীবন অবলম্বন করিলেন। তখন গ্রামস্থ নীচ ব্যক্তিগণ সেই বৃদ্ধ মলিন ভিক্ষুককে দর্শন করিয়া বহু তিরস্কারের দ্বারা অবমাননা করিতে লাগিল। এমন কি, কেহ কেহ "মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্দ্ধণি"—সেই সন্ন্যাসব্রতধারী ব্রাহ্মণের মস্তকে মূত্রত্যাগ ও থুথু নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ নীরবে মনঃসংযম পূর্ব্বক সমস্তই সহ্য করিলেন। তিনি ভাবিলেন,

> নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ
> মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ ॥ ১১।২৩।৪৩

—এই সব মানুষেরা আমার সুখ দুঃখের কারণ নহে, আর দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম এবং কালও আমার সুখ দুঃখের কারণ নহে। বেদসমূহ মনকেই সুখ ও দুঃখের মুখ্য কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ মনই জীবের জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসারচক্র প্রবর্ত্তিত করিতেছে। উপায় কি? "পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ"—মনের সংযমই পরমযোগ; অতএব তাহাই চিরসুখ ও চিরশান্তির উপায়। দান, নিত্য নৈমিত্তিক স্বধর্ম্মাচরণ, যম, নিয়ম, শাস্ত্রাভ্যাস, একাদশী প্রভৃতি ব্রতসাধন—

সবই মনঃসংযমের উপায়মাত্র, মনসংযমই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।
অতএব,

সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্,
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্য-দ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ ॥

১১।২৩।৪৭

—যাহার মন বিষয়বিরক্ত সুতরাং শান্ত, তাহার দানাদি কর্ম্মসাধনের আর প্রয়োজন কি? আবার যাহার মন বিষয়চিন্তায় আসক্ত সুতরাং বিক্ষিপ্ত, তাহার পক্ষে দানাদি কর্ম্মসাধন সম্পূর্ণ বৃথা ও নিষ্ফল।

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন—"জিহ্বাং ক্বচিৎ সন্দশতি স্বদদ্ভিঃ তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ"—যদি কেহ নিজের দাঁতের দ্বারা নিজের জিহ্বা কামড়াইয়া ফেলে, তখন তাহার দাঁত অথবা জিহ্বার প্রতি কুপিত হওয়া বৃথা। সেইরূপ মানুষ নিজের মনঃসংযমের অভাবে নিজে দুঃখ পায়, অপর কেহ তাহাকে সুখ দুঃখ প্রদান করিতে সমর্থ নহে। আমরা অপরকে আপনার সুখদুঃখের কর্ত্তা মনে করিয়া আপনার অন্ধক্রোধ ও অল্পবুদ্ধির পরিচয় দিই মাত্র। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে অনুরূপ শিক্ষাই প্রদান করিয়াছেন :

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা, পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা,
অহং করোমীতি বৃথাভিমানং, স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ ॥

—সুখ এবং দুঃখের দাতা অপর লোক নহে, অপর কেহ সুখ দুঃখ প্রদান করিতেছে মনে করা কুবুদ্ধি। মানুষ নিজেকে নিজের জীবনের কর্ত্তা মনে করিলে অহঙ্কারেরই পরিচয় দেওয়া হয়। মনঃপ্রসূত আপন আপন কর্ম্মফলই মানুষ ভোগ করিয়া থাকে।

অতঃপর ব্রাহ্মণ এইরূপে মনঃসংযম পূর্ব্বক স্থির করিলেন—"অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব"—আমি ভগবান শ্রীহরির চরণ-সেবার দ্বারা দুস্তর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইব, এবং ইহা স্থির

করিয়া অবশেষে ভগবৎপ্রসাদে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত! নিগৃহাণ মনো ধিয়া,
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ॥ ১১।২৩।৬১

—অতএব হে বৎস, তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে, একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার প্রতি বুদ্ধি নিবেশিত করিয়া মনকে সংযত কর। এই মনঃসংযমই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, "বাঙ্মনোঽগোচরং সত্যং"—বাক্য ও মনের অগোচর সত্যস্বরূপ এক পরব্রহ্ম সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষবেশে প্রকাশিত হন এবং সেই দুই অংশের মধ্যে প্রকৃতি কার্য্যরূপিণী ও কারণরূপিণী এবং অপর অংশ জীব, —এই জীব পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণ অভিব্যক্ত হয়। এই সমস্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্য বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে, সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের লক্ষণসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে,
চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে॥ ১১।২৫।১২

—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় জীবেরই, আমার নহে; কারণ, এই গুণত্রয় জীবের চিত্তেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ গুণত্রয়ের দ্বারা জীব সংসারপাশে আবদ্ধ হইয়া যায়।

অতএব "গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ"—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ গুণত্রয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ হইয়া শ্রীহরির ভজনা করিয়া থাকেন। নির্গুণ অবস্থা শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করিতেছেন:

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥ ১১।২৫।২৪

—যে জ্ঞান কেবল জীবাত্মা বিষয়ক তাহা সাত্ত্বিক, যে জ্ঞান দেহাত্মাভিমান বিষয়ক তাহা রাজস, এবং যে জ্ঞান আহার বিহারাদি বিষয়ক তাহা তামস। আর যে জ্ঞান উপস্থিত হইলে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবদাত্মক বলিয়া প্রতীত হয় সেইরূপ ভগবৎ-অনুভূতিমূলক জ্ঞান নির্গুণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

ষড়বিংশ অধ্যায়ে চন্দ্রবংশীয় নরপতি পুরূরবার বৈরাগ্যপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বিষয়ীসঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধুসঙ্গ গ্রহণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই রাজা পুরূরবার জন্মবৃত্তান্ত নবম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে এবং অপ্সরা উর্ব্বশীর প্রতি তাঁহার আসক্তি নবম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। মনুকন্যা ইলা ভগবদনুগ্রহে পুরুষ হন এবং সুদ্যুম্ন নাম ধারণ করেন। একদা ঐ সুদ্যুম্ন উমাবনে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীয় সৈন্যগণের সহিত স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। পরে ঐ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত সুদ্যুম্নের গর্ভে চন্দ্রপুত্র বুধের ঔরসে পূরূরবার জন্ম হয়। ইলার পুত্র বলিয়া পুরূরবা ঐল নামে পরিচিত। একাদশ স্কন্ধের ষড়বিংশ অধ্যায়ে পুরূরবার বিষয় বৈরাগ্যের বর্ণনা আছে বলিয়া এই অধ্যায় "ঐলগীত" নামে পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,

> সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ,
> তস্যানুগমস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ ॥
> ঐলঃ সম্রাড়িমাং গাথামগায়ত বৃহচ্ছ্রবাঃ
> উর্ব্বশী বিরহান্মুহ্যন্ নির্ব্বিণ্ণঃ শোকসংযমে ॥ ১১।২৬।৩,৪

—হে উদ্ধব, যাহারা কাম ও উদরের তৃপ্তিসাধন করিতে ব্যস্ত, সেইরূপ অসজ্জনগণের সঙ্গ মঙ্গলকামী ব্যক্তির কখনই করা উচিত নহে। অন্ধ ব্যক্তির অনুগমনকারী অন্ধব্যক্তি যেমন ঘোর অন্ধকূপে নিপতিত হয়,

সেইরূপ বিষয়ীর সঙ্গ হইতে বিষয়ীলোকের চিরকালের জন্য অধঃপতন ঘটিয়া থাকে।

ইলাপুত্র বিপুলকীর্ত্তি ও রাজচক্রবর্ত্তী পুরূরবা উর্ব্বশীর মোহে পতিত হইয়া এবং অতঃপর বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইস্থলে বর্ণনা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, উর্ব্বশী পুরূরবার চৈতন্য হরণ করিয়াছিল, সুতরাং রাজা ভোগে অপরিতৃপ্ত হইয়া উর্ব্বশীর সহিত তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সুখ নিরন্তর ভোগ করিয়া বহুবৎসর অতীত হইলেও তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অতঃপর উর্ব্বশী যখন পুরূরবাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিল তখন রাজা বিরহকাতর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উলঙ্গ হইয়াই বিলাপ করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন,—'ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্ত্তী নরদেবশিখামণিঃ'—রাজগণের শিরোমণি ও সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হইয়াও তিনি রমণীগণের ক্রীড়ামৃগের ন্যায় বৃথাই কাল অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন,

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্ ॥ ১১।২৬।১২

—যাহার মন রমণীর প্রতি আসক্ত, তাহার বিদ্যার দ্বারা কি হয়? তাহার বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, শাস্ত্রজ্ঞান, নির্জ্জনবাস এবং মৌনাবলম্বন সবই বৃথা।

এইরূপে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত রাজা পুরূরবা স্থির করিলেন

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ
বিদুষাং চাপ্য বিস্রব্ধঃ ষড়্ বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্ ॥ ১১।২৬।২৪

—অতএব ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা স্ত্রীগণের অথবা স্ত্রীর বশীভূত পুরুষগণের সঙ্গকরা উচিত নহে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—এই ছয়টিকে পণ্ডিতগণও

বিশ্বাস করিতে পারেন না, কারণ অনেক সময় ইন্দ্রিয়গণ পণ্ডিতের মনকেও বিমোহিত করিয়া ফেলে। আমার মত জড়বুদ্ধি লোকের তো ইন্দ্রিয়গণকে বিশ্বাস করা মোটেই সমীচীন নহে।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন যে, অতঃপর পুরূরবা বিষয়-ভোগ বর্জ্জন করতঃ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন। অতএব মানুষের সাধুসঙ্গ করা প্রয়োজন, কারণ "সন্তঃ এতস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-মুক্তিভিঃ"—সাধুগণ উপদেশাবলীর দ্বারা শরণাগত ব্যক্তির বিষয়াসক্তি দূর করিয়া দেন। যাঁহারা, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাশূন্য, অহঙ্কারবিহীন, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত ও নিঃসঙ্গ, তাঁহারাই সাধু। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥ ১১।২৬।৩১

—ভগবান অগ্নিকে আশ্রয় করিলে যেমন মানুষের শীত, ভয় ও অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ যিনি সাধুর শরণাগত হন, তাঁহার ভগবৎবিমুখতারূপ জড়তা, অজ্ঞান ও পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ ভয় তিরোহিত হইয়া থাকে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পূজাবিধি উপদেশ করিয়াছেন। এই অধ্যায় ক্রিয়াযোগ নামে পরিচিত। কিরূপে দন্তধাবন ও মুখ-প্রক্ষালন পূর্ব্বক দেহশুদ্ধির পর পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া কুশময় আসনে পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তর মুখে উপবেশন করতঃ পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপদীপ প্রভৃতি প্রতিমার সম্মুখে নিবেদন করিয়া শ্রীহরির জপ ধ্যান করিতে হয়—তাহা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে জ্ঞানযোগের কথা বলা হইয়াছে তাহার সার-সঙ্কলন করিয়া অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন। এই অধ্যায় 'পরমার্থ-নির্ণয়' নামে পরিচিত।

উনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রার্থনা অনুসারে পুনরায় সংক্ষেপে ভক্তিযোগ বর্ণনা করিয়া অবশেষে তাঁহাকে বদরিকাশ্রমে গমন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। উদ্ধব বলিলেন,

সুদুষ্করামিমাং মন্যে যোগচর্য্যামনাত্মনঃ,
যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেৎ তন্মে ব্রহ্যঞ্জসাচ্যুত ॥
প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ, যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ
বিষীদন্ত্যসমাধানাৎ মনোনিগ্রহকর্ষিতাঃ ॥ ১১।২৯।১,২

—হে কৃষ্ণ, অজিতেন্দ্রিয় সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে আপনাকর্তৃক বর্ণিত যোগানুষ্ঠান অতীব দুষ্কর বলিয়া মনে করি; অতএব অনায়াসে মানুষ যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে সেই উপায় সহজভাবে আমাকে বলিয়া দিন।

হে কমললোচন, প্রায়ই যোগিগণ মনঃসংযম করিতে আরম্ভ করিয়া পরে অসমর্থ হইয়া পড়েন এবং ভগবানে মন সমাহিত করিতে না পারিয়া দুঃখপ্রাপ্ত হন।

উদ্ধবের কথাগুলি যেন সাধারণ গৃহীর মর্ম্মকথা। এই কলিযুগে অন্নগতপ্রাণ, ক্ষীণজীবী, আধিব্যাধি প্রপীড়িত মানুষের পক্ষে জ্ঞানসাধন অথবা যোগসাধন উভয়ই সুদুষ্কর, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অনুকূল নহে, কালপ্রভাবে সদ্‌গুরুও ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছেন। তবে গৃহীর উপায় কি?

তখন উদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্
যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্ মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জ্জয়ম্ ॥
কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্,
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ ॥ ১১।২৯।৮,৯

—হে উদ্ধব, মনুষ্য শ্রদ্ধা সহকারে যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিয়া জন্মমৃত্যু-প্রবাহরূপ দুর্জ্জয় সংসার জয় করিয়া থাকে, আমি আমার সেই সুমঙ্গল ধর্ম্ম তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি।

—আমার ভক্ত আমাতে মন ও চিত্ত সমর্পণ করিতে করিতে ভাগবতী ধর্ম্মে ক্রমশঃ তাহার রুচি হইবে। তারপর ধীরে ধীরে আমার রূপ-গুণলীলা স্মরণ ও অভ্যাস করিয়া আমার প্রীতির জন্য বর্ণাশ্রমোচিত কার্য্যসমূহ অনুষ্ঠান করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন যে, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে, সূর্য্য ও বিস্ফুলিঙ্গে, শান্ত ও ক্রূর ব্যক্তিতে যিনি সমদর্শী হন তিনিই পণ্ডিত। এই সমদৃষ্টিসাধন করিবার জন্য ভক্ত "প্রণমেৎ দণ্ডবৎ ভূমৌ আশ্বচাণ্ডালগোখরম্"—কুকুর, চণ্ডাল, গো ও গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীকে ভূমিতে দণ্ডবৎ পূর্ব্বক প্রণাম করিবেন। এইরূপে সর্ব্বভূতের সেবা করিতে করিতে ভক্তের নিকট সমস্ত পৃথিবীই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া প্রতিভাত হইবে। এই সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন মোক্ষলাভের উপায়সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও নিশ্চিত। এই ভাগবতী ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ত্রুটি-বিচ্যুতির দ্বারা ইহার অণুমাত্রও বিফল হয় না, কারণ এই ধর্ম্মসাধন নির্গুণ। সুতরাং এই ত্রিগুণাতীত ধর্ম্ম কোন প্রকার বিঘ্নের অধীন নহে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

এষ তেঽভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ,
সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ ॥ ১১।২৯।২৩

—হে উদ্ধব, আমি সংক্ষেপে অথচ সহজভাবে দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয় সম্পূর্ণ বেদান্তের সার তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। এই শ্লোকটি বিশেষভাবে পরিলক্ষণীয়। সমগ্র ভাগবতের মূলকথা "ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ" —বেদান্তের সার। নবযোগীন্দ্র-সংবাদে যেমন অদ্বৈত-দ্বৈতবাদের অপূর্ব্ব সমন্বয় সংঘটিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদেও সেইরূপ দ্বৈতাদ্বৈতবাদের চিরন্তন কলহ নিরসন করা হইয়াছে। যিনি শ্রীভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই

বেদান্তের পরম ব্রহ্ম, যিনি ভাগবতের মাতা যশোদাকে দেখিয়া ভীত ও অশ্রুপূর্ণলোচন, যাঁহার ইচ্ছাশক্তি মাতা যশোদার শাসনদণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যিনি মাতাকর্ত্তৃক উদূখলে আবদ্ধ হইয়া স্বচ্ছন্দগতিশক্তিবিহীন, তিনিই বেদান্তের প্রতিপাদ্য শুদ্ধবুদ্ধপরমাত্মাস্বরূপ। কেবল কতকগুলি সুনির্ব্বাচিত মনোরম কথার দ্বারা শ্রীভগবানের অনুভূতি হয় না, শ্রীভগবান্ যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মীর আস্বাদনের বিষয়বস্তুস্বরূপ। তাই ভাগবতী কথা "ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ"—বেদান্তের সার-সঙ্কলন, তাই শ্রীভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য বলা হইয়া থাকে। এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পুনরায় বলিতেছেন,

জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগেচ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে,
যাবানর্থো নৃণাং তাত, তাবাংস্তেঽহং চতুর্ব্বিধঃ ॥ ১১।২৯।৩৩

—হে উদ্ধব, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, কৃষি-বাণিজ্য, দণ্ডনীতি অনুশীলন—এই সমস্ত সাধন করিলে যে মোক্ষ, ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ এই চতুর্ব্বিধ ফলপ্রাপ্তি হয়, একমাত্র আমার প্রতি ভক্তিযোগ সাধন করিলেই সেই সমস্ত ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। উদ্ধব, আমিই তোমার চতুর্ব্বর্গ স্বরূপ।

সমগ্র ধর্ম্মকথা নানাবিধরূপে বর্ণনা করিয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

অপ্যুদ্ধব, ত্বয়া ব্রহ্ম সখে, সমবধারিতম্,
অপি তে বিগতো মোহঃ শোকশ্চাসৌ মনোভবঃ ॥১১।২৯।২৯

—হে সখে উদ্ধব, আমার উপদেশ শ্রবণ করিয়া তুমি ব্রহ্মকে ধারণ করিতে পারিয়াছ? তোমার অহংমমাভিমানরূপ মোহ বিনষ্ট হইল? মনে উপজাত সংশয়রূপ শোক দূরীভূত হইয়াছে?

প্রশ্নটি ঠিক গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নের অনুরূপ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা,
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ।

—হে পার্থ, তুমি কি একাগ্রচিত্তে আমার উপদেশগুলি শ্রবণ করিয়াছ ? তোমার কি অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট হইয়াছে ?

শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে উদ্ধব বলিলেন,

বিদ্রাবিতো মোহমহান্ধকারো য আশ্রিতো মে তব সন্নিধানাৎ
বিভাবসোঃ কিং নু সমীপগস্য শীতং তমোভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য ।
॥১১।২৯।৩৭

—হে অনন্ত, সর্ব্বকারণকারণ, আমার দেহাভিমানরূপ অজ্ঞান আপনার কৃপায় দূরীভূত হইয়াছে। এখন আপনাকে হৃদয়মধ্যে এবং হৃদয়ের বাহিরে সমভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি। আর অজ্ঞান আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। অগ্নির নিকটবর্ত্তী মানুষের উপর শীত, অন্ধকার ও ভয় কিরূপে প্রভাব বিস্তার করিবে ?

সমগ্র গীতা শ্রবণ করিয়া সখা অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে অনুরূপ কথাই নিবেদন করিয়াছিলেন ঃ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎ প্রসাদাৎ ময়াচ্যুত,
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

—হে অচ্যুত, আপনার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে এবং পরমাত্মবিষয়ক স্মৃতি আমার মনে উদিত হইয়াছে। আমার আর কোন সন্দেহ নাই, আমি এখন আপনার উপদেশমত কার্য্য করিব ।

উদ্ধবের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় উদ্ধবকে বলিলেন,

নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্ব্বিনীতায় দীয়তাম্ ॥১১।২৯।৩০

—হে উদ্ধব, তোমাকে যে সকল ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলাম সেই বেদগুহ্য তত্ত্বসমূহ তুমি দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, শ্রবণে অনিচ্ছুক, অভক্ত ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিকে উপদেশ করিও না।

ঠিক অনুরূপ উপদেশই শ্রীকৃষ্ণ গীতার শেষ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন ঃ

ইদং তে নাঽতপস্কায় নাঽভক্তায় কদাচন,
ন চাঽশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥

—হে অর্জ্জুন, আমার নিকট হইতে শ্রুত এই গীতোক্ত উপদেশ তপস্যাহীন, ভক্তিহীন, শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুক, এবং ঈশ্বরের প্রতি হিংসা-দ্বেষভাবপূর্ণ ব্যক্তির নিকট বলা কখনও তোমার উচিত হইবে না।

অনুকূল মনের অবস্থা না হইলে ধর্ম্মকথা শ্রবণ কেবলমাত্র নিরর্থক নহে, ক্ষতিজনক। সর্পকে দুগ্ধ পান করাইলে তাহার বিষই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সত্ত্ব-গুণ বর্দ্ধিত হয় না, সেইরূপ যে মানুষের অন্তর হিংসা-দ্বেষ-কুটিলতা সমাকীর্ণ সে ধর্ম্মভাব নিজেও গ্রহণ করিতে পারিবে না, বরং অপরের ধর্ম্মভাব কুতর্কের দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। এইরূপ হতভাগ্য লোক শাস্ত্রশ্রবণের অধিকারী নহে,—ইহাদের সঙ্গ দূরতঃ পরিত্যাজ্য।

শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞানমূলক উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া উদ্ধব কৃতার্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন,

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্, প্রপন্নমনুশাধি মাম্,
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥১১।২৯।৪০

—হে মহাযোগিন্, আপনাকে নমস্কার; আমি আপনার নিকট আত্মনিবেদন করিতেছি; এরূপ বিধান করুন যেন আপনার শ্রীচরণ-কমলে আমার অচলা ভক্তি জন্মে। ভক্ত উদ্ধবের এইরূপ ভক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"গচ্ছোদ্ধব, ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমম্" —হে উদ্ধব, আমার আজ্ঞায় তুমি বদরিকাশ্রমে গমন কর, এবং

"ম: ত্ত্বাহনুশিক্ষিতং যং তে বিবিক্ত মনুভাবয়ন্"—আমার নিকট হইতে তুমি যে সুবিচারিত তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছ তাহা তুমি পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে "অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্"—অনায়াসে সত্ত্বরজতমো গুণাশ্রিত গতাগতিশীল জীবন অতিক্রম করিয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারিবে। "অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্"—ইহাই উদ্ধবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শেষ কথা, ইহাই দাস উদ্ধবের প্রতি প্রভু শ্রীকৃষ্ণের শেষ আশীর্ব্বাদ।

অতঃপর ভক্ত উদ্ধব প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করতঃ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া শোকাচ্ছন্নহৃদয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীশুকদেব ষষ্ঠ দিবসে শ্রীভাগবতের এই পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবতের অবশিষ্ট অংশ শ্রীশুকদেব সপ্তম দিবসে কীর্ত্তন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন।

(৪)

যদুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সংবরণ

ত্রিংশ অধ্যায়ে যদুবংশ ধ্বংসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমত শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রভাস তীর্থে গমন করিলেন। অতঃপর

ততস্তস্মিন্ মহাপানং পপুর্মৈরেয়কং মধু
দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়ো যদ্দ্রবৈর্ভ্রশ্যতে মতিঃ ॥
মহাপানাভিমত্তানাং বীরাণাং দৃপ্তচেতসাম্
কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সঙ্ঘর্ষঃ সুমহানভূৎ ॥১১।৩০।১২,১৩

—যত্নবংশীয় সকলে সেই প্রভাসতীর্থে দৈবপ্রভাবে মতিভ্রষ্ট হইয়া বুদ্ধিবিলোপকারী মহাপানীয় সুরস মদিরা পান করিতে লাগিলেন।

—তাহার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় বিমোহিত, সুরাপানে অতিশয় মত্ত ও বিবেকহীন সেই যত্নবীরগণের মধ্যে মহা কলহ উপস্থিত হইল।

এইরূপে সুরামত্ত যত্নগণ গদা, অসি, তীরধনুক লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট হইলে সমুদ্রতীরস্থ দীর্ঘ ও সূচীমুখ গ্রন্থিবিহীন এরকা নামক তৃণ বিশেষ গ্রহণ করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। এই এরকাসমূহ মুষলের চূর্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলে যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে প্রতিপক্ষ মনে করিয়া বধ করিবার মানসে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া যাদবগণকে বধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক মহাভয়ঙ্কর কলহ উপস্থিত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব উপায়ে সমগ্র যত্নবংশের নিধন-সংঘটিত করিল। বাকী রহিলেন শুধু শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম।

অবশেষে বলরামও যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া সমুদ্রতীরে দেহত্যাগ করিলেন। তখন দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নীরবে নিকটস্থ অশ্বত্থ-বৃক্ষের মূলদেশে উপস্থিত হইলেন এবং চতুর্ভুজরূপ ধারণ করতঃ ধূমবিহীন অগ্নির ন্যায় স্বীয় প্রভার দ্বারা দিক্‌সমূহ আলোকিত করিয়া বামপদ উরুদেশে স্থাপন পূর্ব্বক ভূতলে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে যে জরা নামক ব্যাধ মুষলের চূর্ণাবশিষ্ট লোহখণ্ডের দ্বারা বাণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে মৃগমুখের আকৃতিসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকে মৃগ মনে করিয়া সেই বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরণ বিদ্ধ করিল। তখন

চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স কৃতকিল্বিষঃ,
ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ ॥ ১১।৩০।৩৪

—সেই অপরাধী ব্যাধ বাণবিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভুজপুরুষ দর্শন করিয়া ভীত হইয়া পড়িল, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন শ্রীকৃষ্ণ জরা নামক ব্যাধকে বলিলেন,

মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্ ॥১১।৩০।৩৯

—হে জরাব্যাধ, তুমি ভয় করিও না ; গাত্রোত্থান কর, তুমি আমার অভিলষিত কর্ম্মই করিয়াছ। এখন তুমি আমার আজ্ঞায় পুণ্যকারী ব্যক্তিগণের আশ্রয় স্বর্গলোকে গমন কর।

তখন জরা শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া বিমানযোগে সশরীরে স্বর্গে গমন করিলে সারথি দারুক প্রভুকে অন্বেষণ করিতে করিতে তুলসী-গন্ধে আমোদিত বায়ু অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দ্বারকায় গমন করিয়া যদুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণ বলরামের দেহত্যাগের সংবাদ বন্ধুগণকে প্রদান করিতে বলিলেন। দ্বারকানগরী শীঘ্রই সমুদ্র কর্তৃক প্লাবিত হইয়া বিনষ্ট হইবে, ইহাও তাঁহাদিগের শ্রুতিগোচর করিতে বলিয়া বন্ধুবান্ধবগণকে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিলেন। সারথি দারুক শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ ও সংবাদ বহন করিয়া তাঁহার চরণযুগল মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন।

একাদশ স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পরমধামে গমন ও বসুদেব প্রভৃতির মহাপ্রয়াণ বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, ব্রহ্মা, শিবদুর্গা, দেবযক্ষ, গন্ধর্ব্বসিদ্ধবিদ্যাধরগণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিতে করিতে বিমানসমূহের দ্বারা আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সকলকে দর্শন করিয়া কোন কথা না বলিয়া "সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে

ন্যমীলয়ৎ”—শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহাশ্রিত আত্মাকে স্বীয় পরমাত্মায় যোজনা করিয়া নিজ কমলসদৃশ চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিলেন। অতঃপর নিজদেহ আগ্নেয়ী যোগধারণার দ্বারা দগ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধামে গমন করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

এদিকে সারথি দারুক দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বসুদেব ও রাজা উগ্রসেনের নিকট যাদবগণের নিধন-বৃত্তান্ত ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা সংবরণের সঙ্কল্প বিবৃত করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সকলে উদ্বিগ্নচিত্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বিরহে দেবকী, রোহিণী ও বসুদেব কাতর হইয়া দেহত্যাগ করিলেন, যাদবগণের পত্নীগণ নিজ নিজ স্বামীর মৃতদেহের সহিত সহমরণে গমন করিলেন, সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদ ব্যতীত সমগ্র দ্বারকাপুরীকে ক্ষণকালের মধ্যে প্লাবিত করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের মানবলীলার অবসান হইল।

দ্বাদশ স্কন্ধ

(১)

কলিযুগ

ইহাই শ্রীভাগবতের শেষ স্কন্ধ। এই দ্বাদশস্কন্ধে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যুভয় নিবারণ ও তাঁহার মুক্তি প্রধানতঃ বিবৃত করিয়া শ্রীশুকদেব আনুষঙ্গিকরূপে যুগধর্ম্ম, কলিযুগের দোষ ও সত্যযুগের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া এই বিরাট ধর্ম্মগ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন। এই দ্বাদশস্কন্ধ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত,—মাত্র ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত। একাদশ স্কন্ধের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসংবরণ ও দেহত্যাগের কথা বর্ণনা করিয়া দ্বাদশ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েই যদুবংশধ্বংস হইবার পর ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশ রাজত্ব করিবেন তাহা শ্রীশুকদেব উল্লেখ করিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত মহাপদ্মনামধারী মহারাজ নন্দ, ব্রাহ্মণ চাণক্য ও মৌর্য্যবংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাস-পাঠকের নিকট বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব কলিযুগের দোষ, কল্কি অবতারের আবির্ভাব ও সত্যযুগের উৎপত্তির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, কালক্রমে দিন দিন জীবগণের আয়ু, ধর্ম্ম ও বল ক্ষয় হইতে থাকিবে।

বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ
ধর্ম্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি ॥ ১২।২।২

—কলিযুগে বিত্তই মনুষ্যগণের জন্ম, আচার ও গুণের উৎকর্ষ নির্দ্ধারণ করিবে, এবং বাহুবলই মানুষের ধর্ম্ম ও ন্যায়ের মানদণ্ড বলিয়া গৃহীত হইবে।

কলিযুগে "দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুঃ"—পরস্পরের আকর্ষণ হইলেই নরনারীর বিবাহ হইবে—কুলশীল, আচার, শিক্ষা, ব্যবহার কিছুই বিবাহে পরিগণিত হইবে না, "বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি"—গুণবিহীন মানুষ কেবলমাত্র যজ্ঞসূত্রের দ্বারাই ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইবে, "পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ"—বেশীকথা বলিতে পারিলেই মানুষ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইবে, "যশোঽর্থে ধর্ম্ম সেবনম্"—মানুষ যশ পাইবার লোভে ধর্ম্মসাধন করিবে, "ত্রিংশদ্বিংশতি বর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাম্"—মানুষের আয়ু সাধারণতঃ পঞ্চাশ বৎসর হইবে। এইরূপে যখন কলিযুগ অতীত-প্রায় হইলে দেহধারী জীবগণ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইবে, বেদমার্গ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ ধর্ম্মের বহু মত গ্রহণ করিবে, রাজগণ যখন দস্যুর ন্যায় উৎপীড়ক হইবে, মানবগণ পশুধর্ম্মী হইবে, তখন "ধর্ম্মত্রাণায় সত্ত্বেন ভগবানবতরিষ্যতি"—অবসন্ন ধর্ম্মকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইবেন।

শম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥
অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ
অসিনাসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্য্যগুণান্বিতঃ ॥
বিচরন্নাশুনা ক্ষৌণ্যাং হয়েনাপ্রতিমদ্যুতিঃ
নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যূন্ কোটিশো নিহনিষ্যতি ॥ ১২।২।১৮-২০

—শ্রীহরি শম্ভল নামক গ্রামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণুযশার ভবনে কল্কি অবতাররূপে আবির্ভূত হইবেন।

অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যযুক্ত, গুণবান ও অতুলনীয় দীপ্তিশালী সেই জগৎপতি কল্কিদেব অসাধু ব্যক্তিগণের দমনকারী দেবদত্ত নামক এক বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করতঃ খড়্গের দ্বারা কোটি কোটি রাজবেশধারী প্রচ্ছন্ন দস্যুকে বধ করিবেন।

কলিযুগে বহু নরপতি জীবহিংসার দ্বারা আপনার জীবন ব্যর্থ করিয়া মিথ্যা যশ ও বিষয়ভোগের আশায় প্রমত্তের মত এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে "কালেন তে কৃতাঃ সর্ব্বে কথামাত্রাঃ কথাসু চ"—কাল-প্রভাবে মানুষের কথাবার্ত্তায় নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে। এই "রাজা" নামধারী জীবগণের পরিণাম সাধারণ বিষয়ভোগী জীবের পরিণাম হইতে লেশমাত্র পৃথক্ নহে,—'কৃমিবিড়ভস্মসংজ্ঞান্তে রাজনাম্নোঽপি যস্য চ'—রাজানামধারী দেহও অবশেষে কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের নরদেহে অবস্থান করিবার সময়ই কলি পৃথিবীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল কিন্তু "তাবৎ কলির্ব্বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তুং ন চাশকৎ"—শ্রীকৃষ্ণের মানবলীলার সময়ে কলি পৃথিবীতে নিজশক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর কলিযুগ বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপে কলিযুগ পরিপক্ব হইয়া নানাবিধ অনাচার ও অমঙ্গলের সৃষ্টি করিলে কল্কিদেব আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর পাপভার হরণ করিবেন, এবং তাহার পর হইতেই সত্যযুগ আরম্ভ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে যুগধর্ম্ম, কলিদোষ ও কলিদোষ-নিবৃত্তির উপায় বর্ণনা করা হইয়াছে। পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

কেনোপায়েন ভগবন্ কলের্দ্দোষান্ কলৌ জনাঃ
বিধমিষ্যন্ত্যুপচিতাং স্তন্মে ব্রূহি যথা মুনে ॥ ১২।৩।১৬

—হে ভগবন্, কলিযুগে জনগণ যে উপায়ে কলিকালোচিত পাপরাশি বিদূরিত করিতে পারিবে, তাহা আপনি আমার নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা করুন।

শ্রীশুকদেব বলিলেন, সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ—সত্য, দয়া, তপস্যা ও দান এই চারিটি তখন ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম এক-চতুর্থাংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, দ্বাপরযুগে আরও চতুর্থাংশ লোপ পাইবে, কলিযুগে

ক্ষীণপ্রায় ধর্ম্মের এক-চতুর্থাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধিত মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহরূপ অধর্ম্মের পাদচতুষ্টয়ের বৃদ্ধি সংঘটিত হইলে ধর্ম্মের এক-চতুর্থাংশও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তখন কলির প্রভাবে "বেদাঃপাষণ্ডদূষিতাঃ"—বেদসমূহ পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক কলুষিত হইবে, ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও উদরবিলাসী হইবেন, "তপস্বিনো গ্রামবাসাঃ"—তপস্বীগণ গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিবেন, রমণীগণ—"হ্রস্বকায়া মহাহারা ভূর্য্যপত্যা, গতহ্রিয়ঃ,"—খর্ব্বাকৃতি, অত্যধিক ভোজনকারিণী, বহুসন্তানবতী ও লজ্জাবিহীন হইবেন। এই কলিযুগে

পিতৃভ্রাতৃ সুহৃদ্জ্ঞাতীন্ হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ
নন্দান্দৃশ্যালসংবাদাঃ দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ ॥ ১২।৩।৩৭

—মানুষের সকল প্রীতি ও মমতা রতিক্রিয়ামূলক হইবে, এবং এইরূপ স্ত্রৈণ ও হতভাগ্য মানুষগণ পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্যালী ও শ্যালকগণকে লইয়া বাস করিতে থাকিবে।

এই কলিযুগে সাধারণ প্রজাগণ

নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকরকর্ষিতাঃ
নিরন্নে ভূতলে রাজন্, অনাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ ॥ ১২।৩।৩৯

—অন্নাভাবে, অনাবৃষ্টিভয়ে সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া দুর্ভিক্ষ ও রাজকরে প্রপীড়িত হইয়া জীবনধারণ করিবে।

অথচ যাঁহার শরণ লইলে ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ সংঘটিত হইয়া থাকে, কলিহত জীবগণ সেই শ্রীহরিকে বিস্মৃত হইয়া জড়ের ন্যায় জীবন্মৃত অবস্থায় বাস করিবে। কিন্তু হরিনাম গ্রহণ করিলে মানুষের "জন্মাযুতাশুভম্"—দশহাজার জন্মেরও পাপরাশি ধৌত হইয়া যায়—কলিযুগে নামগ্রহণই সহজ অথচ পরমধর্ম্ম। যুগধর্ম্মরূপে হরিনাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া শ্রীশুকদেব মেঘমন্দ্রস্বরে ঘোষণা করিলেন,

কলের্দ্দোষনিধেঃ রাজন্ অস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ,
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ,
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তৎ হরিকীর্ত্তনাৎ॥ ১২।৩।৫১-৫২

—হে রাজন্, কলিযুগ অশেষ দোষের আকর হইলেও তাহার একটি মহান্ গুণ আছে যে,—কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামাদি কীর্ত্তনের ফলেই মানুষ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সত্যযুগে ভগবানের ধ্যান করিলে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে যে ফল হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই সেই তিনযুগের সমগ্র ফল সমষ্টিভাবে ভক্তগণ লাভ করিয়া থাকেন।

অতঃপর শ্রীশুকদেব চতুর্থ অধ্যায়ে প্রলয়বর্ণনা করিয়া রাজা পরীক্ষিৎকে বলিলেন যে, তিনি অখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিখিল প্রাণীর আশ্রয়স্বরূপ ভগবান শ্রীহরির লীলাকথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। স্বয়ং ব্রহ্মাও এই লীলাকথা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ নহেন। এই ভাগবতী কথার রসাস্বাদন ব্যতীত মানুষের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির আর কোন উপায় নাই। এই ভাগবতী কথা কিরূপে শ্রীশুকদেব প্রাপ্ত হইলেন এবং কিরূপে তাহা জগতে প্রচার লাভ করিবে এই প্রসঙ্গে শুকদেব বলিলেন,

পুরাণসংহিতামেতাং ঋষির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ,
নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নায় সঃ ॥
স বৈ মহ্যং মহারাজ, ভগবান্ বাদরায়ণঃ,
ইমাং ভাগবতীং প্রীতঃ সংহিতাং বেদসম্মিতাম্ ॥

এতাং বক্ষত্যসৌ সূতঃ ঋষিভ্যো নৈমিষালয়ে,
দীর্ঘসত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ! সম্পৃষ্টঃ শৌনকাদিভিঃ ॥ ১২।৪।৪১-৪৩

—পূর্ব্বকালে নারায়ণ ঋষি দেবর্ষি নারদকে এই ভাগবত নামক পুরাণ সংহিতা উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে ইহা উপদেশ করেন।

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই ভগবান বেদব্যাসই প্রসন্ন হইয়া এই বেদতুল্য ভাগবতীসংহিতা আমাকে প্রদান করিয়াছেন।

হে পরীক্ষিৎ, ঐ যে সম্মুখে উপবিষ্ট উগ্রশ্রবা সূত, ইনিই নৈমিষারণ্যে বহুদিনব্যাপী যজ্ঞে শৌনকাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট এই ভাগবতী-সংহিতা বর্ণনা করিবেন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভাগবতের মূলবিষয়ের উপসংহার বর্ণিত হইয়াছে।

(২)

পরীক্ষিতের দেহত্যাগ

শ্রীশুকদেব সমগ্র ভাগবতীকথা রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রবণ করাইয়া বলিলেন,

ত্বন্তু রাজন্, মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি,
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবৎ ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি ॥
স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদং পঞ্চত্বাদ্যাত্মনঃ স্বয়ম্,
যস্মাৎ পশ্যতি দেহস্য তত আত্মা হ্যজোঽমরঃ ॥ ১২।৫।২,৪

—হে রাজন্, আপনি এই ভাগবত শ্রবণ করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সুতরাং আপনার মৃত্যুভয় থাকা উচিত নহে। মৃত্যুভয় পশুবুদ্ধি অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। আপনার এই দেহ

পূর্ব্বে ছিল না, এখন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে না, কিন্তু আত্মা-স্বরূপ আপনি চিরদিনই আছেন এবং থাকিবেন।

জীবাত্মা স্বপ্নে যেমন নিজের শিরশ্ছেদ দর্শন করে, সেইরূপ দেহ হইতে পৃথক্ এই জীবাত্মা জাগ্রদবস্থায়ও দেহ হইতে পৃথক্ থাকিয়া নিজ দেহের মরণাদি দর্শন করিয়া থাকে। দেহ মৃত্যুর অধীন, আত্মা জন্মশূন্য ও মৃত্যুরহিত।

মহারাজ পরীক্ষিৎ এখন বুঝিলেন যে, মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়াই জীবনের জয়যাত্রা, সুতরাং শ্রীশুকদেবের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা,
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ ॥
ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্,
প্রবিষ্টো ব্রহ্ম নির্ব্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া ॥
অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্, বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে,
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্ ॥
অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া,
ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্ ॥ ১২।৬।২,৫-৭

—হে ভগবন্, আমি কৃতার্থ হইলাম, অনুগৃহীত হইলাম, যেহেতু করুণার্দ্রচিত্তে আপনি আমাকে শ্রীহরির কথা ও তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় শ্রবণ করাইয়াছেন।

হে শুকদেব, আমি আর তক্ষকদংশনে মৃত্যু হইতে ভয় পাইতেছি না, কারণ, এক্ষণে আমি আপনাকর্ত্তৃক প্রদর্শিত অভয়স্বরূপ ও কেবল আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নামক পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়াছি।

হে ব্রহ্মন্, আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিব এবং বিষয়-বাসনা বর্জ্জিত চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারা আমার অজ্ঞান ও অজ্ঞানজনিত সংস্কার দূরীভূত হইয়াছে,—ইহা আপনারই কৃপা। আপনি আমাকে পরম মঙ্গলস্বরূপ ভগবানের পরমপদ দর্শন করাইয়াছেন।

এইস্থলে একটি বিষয় পরিলক্ষণীয়। শ্রীভাগবতী কথার প্রারম্ভেই মৃত্যুভয়ভীত রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

কথয়স্ব মহাভাগ, যথাহমখিলাত্মনি,
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্তক্ষ্যে কলেবরম্ ॥ ২।৮।২

—হে মহাভাগ, আমাকে উপায় বলিয়া দিন, যাহাতে আমি বিষয়-চিন্তাবর্জ্জিত মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি।

ইহাই ছিল শ্রীভাগবতের মূল বিষয়, প্রধান প্রশ্ন, এবং মহারাজ পরীক্ষিতের মর্ম্মকথা। আজ সমগ্র ভাগবত শ্রবণ করিয়া সপ্তম দিবসে পরীক্ষিৎ বলিতেছেন,

মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্।

—বিষয়-বাসনাবর্জ্জিত মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত করিয়া আমি এখন প্রাণত্যাগ করিব।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভাগবতী-কথা শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিতের জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তিনি বিষয়-বাসনা বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি এখন শ্রীকৃষ্ণে সমগ্র মন সমর্পণ করিয়া অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত। সাত দিন পূর্ব্বে যে প্রার্থনা তিনি শ্রীশুকদেবের চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন, সেই প্রার্থনা শ্রীশুকদেবের কৃপায় আজ ফলবতী হইয়াছে। এই মৃত্যুভয়বিজয় ভাগবতী-কথা শ্রবণের একমাত্র সার্থকতা। দেশে দেশে, যুগে যুগে এই দ্বাদশ স্কন্ধ

ভাগবত সহস্র সহস্র নর-নারীর নিকট পঠিত হইতেছে, কোন পণ্ডিত হয়ত এই ভাগবতী-কথা শ্রীবৃন্দাবনে অথবা অন্য কোন শ্রীকৃষ্ণ-লীলাময় তীর্থস্থানে বসিয়া স্বয়ং পাঠ এবং অনুশীলন করিতেছেন, কত অশ্রু, পুলক, কম্প ও ভাব এই ভাগবতী-কথা শ্রবণ করিয়া জীবদেহে জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু সমগ্র ভাগবতী কথা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া অথবা অপরের মুখে শ্রবণ করিয়া যদি কেহ মহারাজ পরীক্ষিতের মত না বলিতে পারেন

মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্।

—এখন বাসনা-কামনাবর্জ্জিত মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য আমি প্রস্তুত—যদি এই স্বচ্ছ, সরল সাহস ও বিশ্বাস শ্রোতার মনে উদিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শ্রীভাগবত গ্রন্থ তাঁহাকে কৃপা করেন নাই, তাঁহার নিকট ভাগবতী-কথা নীরস অক্ষর সমষ্টি মাত্র, তাঁহার ভাগবত শ্রবণ সম্পূর্ণ নিরর্থক না হইলেও প্রধানতঃ উদ্দেশ্যভ্রষ্ট। অবশ্য ভাগবতী-কথা শ্রবণ কখনও সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হইতে পারে না,—"অমোঘা ভগবৎ-সেবা নেতরেতি মতির্মম"—ভাগবত-কথা শ্রবণ অমোঘ, জন্মজন্মান্তরেও ইহা অবশ্যই ফলপ্রসূ হইবে। এই ভাগবতী-কথা শ্রবণ করিলে অবশ্যই হৃদয়ে শুভ-সংস্কার সঞ্চারিত হইবে এবং সেই শুভ-সংস্কার, মনন ও অনুশীলনের অভাবে যতই ক্ষীণ হউক না কেন, তথাপি তাহা মৃত্যুবিজয়ী, এবং বহু জন্ম-জন্মান্তরের পরেও চিরস্থায়ী। তবে একবার সপ্তাহকাল মাত্র ভাগবতী-কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের মত

মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্।

—আমি এখন বিষয়বাসনাবর্জ্জিত মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি;—ইহা বলিবার সামর্থ্য সাধারণ বদ্ধজীবের নাই, ইহা বহু জন্ম-জন্মান্তরের সাধনভজন সাপেক্ষ।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীভাগবতের মূলকথা এইস্থানেই পরিসমাপ্ত হইল। ইহার পর আরও যে সাতটি অধ্যায় রহিয়াছে তাহা শ্রীসূত মহাশয়ের নিজের কথা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ঘটনার বর্ণনামাত্র। শ্রীসূত মহাশয় শৌনকাদি মুনিগণকে বলিলেন যে, ভগবান ব্যাসনন্দন শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক এইরূপে পূজিত ও অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রার্থিত অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক মুনিগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই অনুমতিই গুরুকৃপা।

অনন্তর রাজর্ষি পরীক্ষিৎ মনকে সমাহিত করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে তক্ষক নামক সর্প "দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নঃ"—ব্রাহ্মণের রূপ ধারণকরতঃ গঙ্গাতীরে পরীক্ষিতের নিকট যাইতে যাইতে পথিমধ্যে কাশ্যপকে দেখিতে পাইল; তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ গ্রহণের পর তক্ষক বুঝিতে পারিল যে, কাশ্যপ বিষ-চিকিৎসায় পারদর্শী এবং রাজাকে তক্ষক-দংশনের পর পুনর্জীবিত করিবার জন্য তিনি হস্তিনাপুরে গমন করিতেছেন। তখন তক্ষক অর্থ-প্রদানের দ্বারা কাশ্যপকে বশীভূত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রলুব্ধ করিল এবং স্বয়ং গঙ্গাতীরে রাজসভায় যাইয়া সমাধিস্থ মহারাজ পরীক্ষিৎকে দংশন করিল।

ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষের্দ্দেহোঽহিগরলাগ্নিনা,
বভূব ভস্মসাৎ সদ্যঃ পশ্যতাং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১২।৬।১৩

—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত রাজর্ষি পরীক্ষিতের দেহ তৎক্ষণাৎ সমস্তলোকের সমক্ষে তীব্র বিষের অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাইল।

রাজর্ষি পরীক্ষিতের দেহ ভস্মীভূত হইয়া যাইল, কিন্তু জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইল। আমাদের সকলের দেহই শ্মশান-ভূমিতে ভস্মীভূত হইয়া যায় কিন্তু আমরা পুনরায় জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া যাতায়াত করি। আমরা অনেকেই ভাগবত পাঠ শুনি কিন্তু সাধারণতঃ

আমাদের "মুক্ত কামাশয়ং চেতঃ"—কামনাবাসনাবর্জ্জিত মন—হয় না। শাস্ত্রপাঠ অথবা শ্রবণ করিয়া যাঁহার মন ও চরিত্র তদাকারকারিত হইয়া যায় তাঁহাকে মহাভারতে "অভিন্নশ্রুতচারিত্রঃ" মানুষ—শাস্ত্রজ্ঞান ও চরিত্র একরূপ—বলা হইয়াছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ "অভিন্নশ্রুতচারিত্রঃ" হইয়াছিলেন, তাই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মনটি বিষয় হইতে উঠাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ আসক্তিশূন্য শুদ্ধ মনের একটি চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে দেওয়া হইয়াছে। মহর্ষি পঞ্চশিখ মহারাজ জনককে বলিয়াছিলেন—

দ্রুমং যথা বাপ্যুদকে পতন্তমুৎসৃজ্য পক্ষী নিপতত্যসক্তঃ,

তথা হ্যসৌ সুখদুঃখে বিহায় মুক্তঃ পরার্দ্ধ্যাং গতিমেত্য লিঙ্গঃ ॥

—অর্থাৎ পাখী যেমন জলে পতনপ্রবৃত্ত গাছ পরিত্যাগ করিয়া গাছের দিকে ফিরিয়া না চাহিয়া আকাশে উড়িয়া যায়, তেমনই সাধু-পুরুষগণ সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের দিকে আর না চাহিয়া লিঙ্গদেহশূন্য হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সাধারণ মানুষের মৃত্যু এইরূপ নহে। মানুষ মরিবার সময় এবং মৃত্যুর পরও পিছুদিকে তাকাইয়া দেখে, সুখদুঃখ স্মরণ করে, সুতরাং সাধারণ মানুষ লিঙ্গদেহ অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ লইয়া, মন ও সমগ্র বাসনা-কামনার সহিত মৃত্যুকালে স্থূল দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। আমাদের মনের মৃত্যু হয় না, মনটি সমস্ত সংস্কার জড়াইয়া লইয়া মৃত্যুর পর লিঙ্গদেহ অবলম্বন করিয়া থাকে। মন যদি দেহের সহিত বিলুপ্ত হইত তাহা হইলে মানুষের মুক্তি হইত,—শ্রীভাগবতে বলা হইয়াছে "মনসোঽপি লয়াৎ মুক্তিঃ"—অর্থাৎ মনকে—কামনা-বাসনারাশিকে—বিলুপ্ত করিতে পারিলেই মুক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মন থাকিয়া যায়, জন্মজন্মান্তরে থাকিয়া যায়, যেরূপ স্থূলদেহে মনের

প্রবৃত্তিসমূহ ছিল, মৃত্যুর পর লিঙ্গদেহেও মানুষ সেই প্রবৃত্তিসমূহ টানিয়া লইয়া যায়, সুতরাং মানুষ মনের অবস্থা অনুযায়ী পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে। মুক্তি মোটামুটি দুই প্রকার—ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তি। মহারাজ পরীক্ষিতের মন বিলুপ্ত হইল, লিঙ্গদেহ বিলুপ্ত হইল, শুধু রহিল তাঁহার চিন্ময় আত্মা,—সেই শুদ্ধ আত্মা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইল, মহারাজ সদ্যোমুক্তি লাভ করিলেন, বিন্দু সিন্ধুর সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া যাইল।

অতঃপর পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় তক্ষকদংশনে পিতার মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বিজগণের সাহায্যে সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে মহাসর্পদিগকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া তক্ষক, ভয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। তক্ষক যজ্ঞাগ্নিতে পতিত হইতেছে না দেখিয়া জনমেজয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট কারণ অবগত হইয়া ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে যজ্ঞাগ্নিতে নিপতিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণগণ আহুতি প্রদান করিয়া বলিলেন,—'তক্ষকাশু পতস্বেহ মহেন্দ্রেণ মরুত্বতা'—হে তক্ষক, তুমি মরুদ্গণ সমন্বিত ইন্দ্রের সহিত এই যজ্ঞাগ্নিতে সত্বর নিপতিত হও। এইবার ভীষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল—স্বয়ং আশ্রয়দাতা দেবরাজ শরণাপন্ন তক্ষককে সঙ্গে লইয়া বিমানারূঢ় হইয়া যজ্ঞাগ্নির দিকে পরিচালিত হইলেন। এমন সময়ে দেবগুরু বৃহস্পতি জনমেজয়কে তক্ষকের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন,

জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্ম্মণা,
রাজংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১২।৬।২৫

—হে রাজন্, প্রাণিগণের জীবন, মরণ ও পরলোক নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রাণিগণের সুখ বা দুঃখপ্রদাতা

অপর কেহ নহে, নিজ কর্ম্মফলের জন্যই মানুষ সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

জনমেজয় তখন বুঝিলেন যে, রাজা পরীক্ষিতের প্রতি তক্ষকদংশন পিতার নিজ কর্ম্মফল বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, তক্ষক এইজন্য অপরাধী নহে। সুতরাং ঋষিবাক্য গ্রহণ করিয়া জনমেজয় সর্পযজ্ঞ হইতে বিরত হইলেন।

অতঃপর সূতমহাশয় বেদের শাখা-বিভাগ, পুরাণ-বিভাগ, মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যা ও তৎকর্ত্তৃক ভগবৎ-স্তব, মার্কণ্ডেয়ের ভগবন্মায়াদর্শন, মহাদেব ও উমাদেবীর সহিত মার্কণ্ডেয় ঋষির সাক্ষাৎ, শিব কর্ত্তৃক মার্কণ্ডেয়কে বরপ্রদান, বিরাট পুরুষের স্বরূপ ; বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারি মূর্ত্তিতে বিরাট পুরুষের প্রকাশ—এই সমস্ত বিবৃত করিয়া দ্বাদশ স্কন্ধের শেষ দুইটি অধ্যায়ে সমগ্র শ্রীভাগবত গ্রন্থের প্রধান বিষয়সমূহের সূচী, পুরাণ সমূহের শ্লোকসংখ্যা ও শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিলেন,

ইদং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে
স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্ ॥ ১২।১৩।১০

—পূর্ব্বে ভগবান নারায়ণ কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ স্বীয় নাভিকমলে অবস্থিত ও সংসারভয়ে ভীত ব্রহ্মাকে সম্যকরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন।

(৩)

শ্রীভাগবত মাহাত্ম্য

এই শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য অসীম এবং ইহা পাঠ করিলে মানুষ অনায়াসে দেহবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মার দর্শনলাভ করিয়া থাকে। শ্রীসূত বলিলেন,

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥
নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা,
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥
ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং যথা কাশীহ্যনুত্তমা,
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে,
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥ ১২।১৩।১৫-১৮

—শ্রীভাগবতই সর্ব্ববেদান্তের সার বলিয়া কথিত হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবতের রসামৃত পান করিয়া যিনি পরিতৃপ্ত হন তাঁহার অন্য কোনও বিষয়ের প্রতি আর আকর্ষণ থাকে না।

নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু, বৈষ্ণবগণের মধ্যে মহাদেব, সেইরূপ পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

হে দ্বিজগণ, সমস্ত তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে যেমন কাশীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীভাগবতকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনারা জানিবেন।

যে গ্রন্থ বৈষ্ণবগণের প্রিয়, যাহাতে পরমহংসজ্ঞান কীর্ত্তিত হইয়াছে, যাহাতে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত মুক্তি-বিরোধী সকাম কর্ম্মত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে, মনুষ্য ভক্তিসহকারে তাদৃশ নির্ম্মল শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

এইরূপে শ্রীসূত মহাশয় শ্রীভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া অবশেষে পাঁচটি শ্লোকে বেদমুখ ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব, যোগিশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে স্মরণ করিয়া এবং শ্রীহরিকে বন্দনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ

সমাপ্ত করিয়াছেন। নিম্নে উল্লিখিত শ্লোকটি শ্রীভাগবতের সর্ব্বশেষ শ্লোক।

নাম সঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্,
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥ ১২।১৩।২৩

—যাঁহার নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বপাপের বিনাশক এবং যাঁহাকে প্রণাম করিলে সর্ব্বদুঃখের অবসান হইয়া থাকে, আমি সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

শ্রীভাগবতের এই সর্ব্বশেষ শ্লোকটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রীভাগবতে সর্ব্বত্রই বলা হইয়াছে যে সাধুকৃপা ব্যতীত ভগবৎকৃপালাভ অসম্ভব। এখন প্রশ্ন উঠে যে বদ্ধজীব সংসারে বাস করিয়া ভজনামোদী ও বিবিক্তসেবী সাধুর সঙ্গ কোথা হইতে লাভ করিবে! ভাগবতে জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করা হইয়াছে, উভয়মার্গই মহাপ্রস্থানের উপায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি লাভ কি সহজ কথা! ভক্তি সম্বন্ধে মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"—ঈশ্বরে একান্ত অনুরক্তিই ভক্তি। ইহা কি সহজে লাভ হয়! সংসার, স্ত্রী, পুত্রকন্যা, ধনৈশ্বর্য্য, মান যশ কিছুই ভাললাগেনা, সবই আলুনি লাগে, ভাল লাগে শুধু কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণস্মরণ। মনের এই অবস্থা সংসারীজীবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাই ভক্ত বলেন

ব্রহ্মাণ্ডভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।

জন্মজন্মান্তর ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে তবে কোন ভাগ্যবান জীব কোন জন্মে ভক্তির বীজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সে অনেক দূরের কথা। জ্ঞানের পথ তো আরও দুর্গম। মহাভারত হইতে জ্ঞানের একটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া হইতেছে, এবং ইহা হইতেই জ্ঞানমার্গের দুর্গমতা

সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। রাজা জনক কথাপ্রসঙ্গে একদিন সুলভা নাম্নী সন্ন্যাসিনীকে বলিয়াছিলেন—

যশ্চ মে দক্ষিণং বাহুং চন্দনেন সমুক্ষয়েৎ
সব্যং বাস্যাপি যস্তক্ষেৎ সমৌ এতৌ উভৌ মম ॥

—যে লোক আমার দক্ষিণবাহু চন্দনলিপ্ত করিয়া দেয়, এবং যে লোক অস্ত্রের দ্বারা (বাসী নামক অস্ত্র) আমার বাম বাহুর মাংস ছেদন করে এই দুইজনই আমার কাছে সমান। ইহাই জ্ঞান। এমন জ্ঞান কয়জন, মানুষের পক্ষে সম্ভব ?

তাই জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্গম বলিয়া শ্রীশুকদেব পরমার্থলাভের জন্য সহজ ও সরল পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন—সাধুসঙ্গ ও নামসঙ্কীর্ত্তন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সাধুসঙ্গ বহুভাগ্যে লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু সদ্‌গ্রন্থ পাঠও সাধুসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিলেও সাধু-সঙ্গের অভীপ্সিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানুষ শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীভাগবত পাঠ করুক, শ্রীভাগবত কৃপা করিবেন, দেবর্ষি নারদ, শ্রীশুকদেব, শ্রীউগ্রশ্রবা সূত, শ্রীভরত মহাশয়, এই সকল মহাপুরুষগণের সঙ্গলাভ করিয়া মানব জীবন ধন্য হইবে। পরমার্থলাভের দ্বিতীয় সহজ উপায় নামসঙ্কীর্ত্তন। যুগে যুগে সর্ব্বশাস্ত্রে শুভনাম সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে হরিনাম সম্বন্ধে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব বলিয়াছেন :

প্রাণকান্তারপাথেয়ং সংসারোচ্ছেদভেষজম্
দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥

—অর্থাৎ "হরি" এই দুইটি অক্ষর জীবনরূপ দুর্গমপথের পাথেয় স্বরূপ, সংসারবুদ্ধিরূপ ব্যাধির মহৌষধি, এবং দুঃখশোক হইতে পরিত্রাণ দাতা। "প্রাণকান্তারপাথেয়"—কী চমৎকার কথা !

তাই জগদ্‌বাসীর কল্যাণের জন্য নাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শ্রীউগ্রশ্রবাসূত মহাশয় শ্রীভাগবতকাহিনী শেষ করিতেছেন। সংসারী

বদ্ধজীবকে তিনি সাবধান করিয়া দিতেছেন যে অদূরদর্শী বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে। শুধু নিত্যদিনই চিরকাল নহে, নিত্য দিনের অর্থোপার্জ্জন, সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিলেই চলিবে না, চিরদিনের পাথেয় সংগ্রহ করিতে হইবে। যাহারা শুধু বর্ত্তমানটিই দেখে, শাস্ত্রে তাহাদের বুদ্ধিকে "অদ্যকালিকা বুদ্ধিঃ" বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে—"অদ্যকালিকাবুদ্ধিঃ" অর্থাৎ অদ্যকাল পর্য্যন্ত দেখিবার মত বুদ্ধি—দূরদর্শী বুদ্ধি নহে। তাই পরমকৃপাশীল শ্রীউগ্রশ্রবাসূত মহাশয় বলিতেছেন—

যে নাম কীর্ত্তনে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সর্ব্ববিধ দুঃখ বিনষ্ট হইয়া যায়, যে নাম কীর্ত্তন করিলে ইহকাল ও পরকালের পাপরাশি নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়, আমি সেই পরমাত্মাস্বরূপ নামরূপী শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ।
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে
আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা
যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান।
সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ॥—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমদ্‌ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত।